বৈশাখ ১৩৬০ : দাম আট

: শ্রীসজনীকান্ত দাস

Apl.-May : Price As. 8

হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠাতারা যে বীজ রোপণ করেছিলেন সেই-
বিপুল বীজ আজ সুমহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে
বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর বহু বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে
দেশের বহু পরিবারের আর্থিক সংস্থান করা, শিল্প বাণিজ্য
ব্যবসায়ের প্রসার ও উন্নতিকল্পে সহায়তা করা, শত শত
কর্মীকে লাভজনক কাজে নিযুক্ত করা, এবং দেশবাসীর কল্যাণে
তার অর্থ সংরক্ষণ করার কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত।
হিন্দুস্থানের এই কর্মসাফল্যে আমি গৌরব বোধ করি।

১৯৩৩ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নববর্ষে দেশব্যাপী কোনো উৎসব ছিল না আমাদের। এ যুগে পুণ্যবান বাঙালী শিক্ষিতেরা তাঁদের চিত্তের ঐশ্বর্য আর হৃদয়ের মহিমা, চিন্তার প্রকরণ আর প্রকাশের ভাষা, কণ্ঠের গান, এমন কি চারিত্র পর্যন্ত মুখ্যত যাঁর কাছে লাভ করেছেন তিনিই দিয়ে গেছেন বৈশাখ উৎসবেরও আমাদের পক্ষে একটি পরম উপলক্ষ্য। বছরের প্রথম ২৫ তারিখটি কেন্দ্র করে যে উৎসব আজ আমরা করি সে আমাদের মুক্ত প্রাণের উৎসব। নিয়ত জীবনের মালিন্য ধুয়ে যায় সেই উৎসবের ধারাজলে, পূর্ণের পানে আমাদের ব্যাকুলতা নিবেদন করি, খণ্ডকাল আলোকিত হয়ে ওঠে। কবিপক্ষে আমাদের স্মরণ তাই রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর সঙ্গে অনেক কিছুকে, সব কিছুকে—যার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ।

কবিপক্ষে এবার সিগনেট বুকশপের দুটি দোকানেই ২১শে বৈশাখ থেকে ৪ঠা জৈষ্ঠ পর্যন্ত বাংলাকাব্যের সমগ্র সংগ্রহ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, সেই সঙ্গে প্রাচীন-আধুনিক প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ, যা এখনো পাওয়া যায়। বাংলা-কাব্যসাধনার প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পবিত্র স্মৃতি তাঁর 'প্রকৃষ্টতম পন্থা' কাব্যস্রোতের প্রবহমানতা রক্ষা করা। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মতো কবিপক্ষে সেই জন্যে অধিকাংশ বাঙালী কবির কাব্যগ্রন্থই কদিন অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

'শনিবারের চিঠি'র নূতন নিয়মাবলী

বার্ষিক ৬৲ ও ষাণ্মাসিক ৩৲; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৬।৶০ ও ৩।৶০; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ১০॥০ ও ৫।০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ॥১০; ভি. পি.তে ৸৶০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়; পাকিস্তানে ভি. পি. করিয়া পাঠানো হয় না; চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

বনফুল

সে ও আমি

নানা বিচিত্র টেকনিকে বিচিত্রতর কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে রূপায়িত ক'রে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা বনফুলের এবং বোধ করি একমাত্র বনফুলেরই আছে। গভীর নিশীথে লেখকের চিন্তাকুল মনের সম্মুখে একের পর এক বহু বৃত্তের উদয় এবং বিলয় ঘটছে—তারই অবকাশে 'সে' এসে মিলছে 'আমি'র সঙ্গে। 'আমি'র অবচেতন মন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে 'সে'-র সচেতন মনে। 'সে' শুধু 'আমি'র কাছেই রহস্যময়ী নয়, জিজ্ঞাসু পাঠক এর মধ্যে 'মিস্ট্রি' এবং 'ওয়াণ্ডারে'র অদ্ভুত সম্মিলন দেখতে পাবেন। 'সে' কে? 'আমি'ই বা কে? উত্তরের চিন্তায় রসে সরস কাহিনী। রসিক পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করবে।

আড়াই টাকা

অমলা দেবী

শেষ অধ্যায়

সহজ সুরের গল্পের মাধ্যমে নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণের অপূর্ব দক্ষতা অমলা দেবীর রচনার মধ্যে সুপরিস্ফুট। 'শেষ অধ্যায়' উপন্যাসখানি রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত হ'লেও মূলত স্বাধীনতা-আন্দোলনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'মাষ্টার মশায়' ও 'উমা'র অন্তরগত ভালবাসা নিয়েই এর গল্পাংশ গ'ড়ে উঠেছে। লেখিকার সুনিপুণ কাহিনীবিন্যাসে এদের মিলন-বিচ্ছেদ একটি করুণ রসের ধারায় অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের জটিল পথে চলতে চলতে কি অবস্থায় এদের দেখা হ'ল এবং বিচ্ছেদই বা ঘটল কেন, তারই বেদনাঘন কাহিনী। মাষ্টার মশায়ের আদর্শ জীবনের সার্থক রূপায়ন। উমার কোমলকঠোর চরিত্র পাঠক-মনেও চমক লাগায় বইকি।

দু টাকা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

॥ র বী ন্দ্র ক থা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মপরিচয় ১।০

ছেলেবেলা ১৲

অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ১।০

ব্রহ্মবিদ্যালয় ১৶০

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রসংগীত ৪৲

রাণী চন্দ

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ৩৲

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রভাতরবি ২।০

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী । প্রথম খণ্ড ৮।০

দ্বিতীয় খণ্ড ১০৲

তৃতীয় খণ্ড ১০৲

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরোয়া ২।০

জোড়াসাঁকোর ধারে ৩।০

শ্রীপ্রতিমা দেবী

নির্বাণ ১৲

নৃত্য ৩৲

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

রবীন্দ্র-চিত্রকলা ৬৲

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৩৲

সরসীলাল সরকার

রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা ১

---

25 Portraits of Tagore
Rs. 7/8, Rs. 10/-

Santiniketan 1901-1951
An album Rs. 7/8, 10/-

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

সৌন্দর্য্যের জন্য
মলয় চন্দন সাবান
শরীর স্নিগ্ধ রাখে, চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল ...
সুপরিশ্রুত মধুর সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন, চিকণ ও রেশমের মত মসৃণ হয়।
স্নো ও ক্রীম
মুখের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

সুন্দরের পূজায়...
কেশরঞ্জন
অসাধারণ
কেশ তৈল
কবিরাজ
এন, এন, সেন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা-৯

একমাত্র

সুলেখা স্পেশাল

ফাউণ্টেন পেন
কালিতেই
এক্স-সল
"X-Sol"
সলভেণ্ট
আছে।

এই
বার্লির
ওপরেই
আমি
নির্ভর
করতে
পারি...
কেননা আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব
সময়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত
উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে
সত্যিকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি।
'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে
দেড়শো বছরের পেষাইয়ের অভিজ্ঞতা।
PURITY
INDIAN BARLEY
পিউরিটি বার্লি

এই বার্লির ওপরেই আমি নির্ভর করতে পারি...
কেননা আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব সময়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে সত্যিকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি। 'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।
PURITY
INDIAN BARLEY
পিউরিটি বার্লি

সুস্বাদু ও
পুষ্টিকর
আর্য্যের
থিন এরারুট ও
ফুল বিস্কুট
আর্য্য বেকারি
এণ্ড কনফেকসনারী
৪/১, পণ্ডিতিয়া রোড ও ৭/১, রসা রোড :- ফোন পি, কে,

রঞ্জন পাবলিশিং-এর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ভারত-মঙ্গল (নাটক) ১।০

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ঘৃতং পিবেৎ (নাটক) ১॥০
গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর (নাটক) ২৲

বনফুল
তৃণখণ্ড (উপন্যাস) ১॥০
মৃগয়া (উপন্যাস) ৩৲
রাত্রি (উপন্যাস) ২॥০
কিছুক্ষণ (উপন্যাস) ১॥০
বিন্দু-বিসর্গ (গল্প) ২৲
অগ্নি (উপন্যাস) ২৲
বৈতরণী-তীরে (উপন্যাস) ২৲
সে ও আমি (উপন্যাস) ২॥০

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
আবর্ত (গল্প) ১৸০

শ্রীকালিদাস কাঞ্জিলাল
ক্যাপ্টেন সিকদার (উপন্যাস) ৪৲
মানুষ চাই (উপন্যাস) ৪৲

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিটেকটিভ (নাটক) ৸০

"সব্যসাচী"
ডায়লেক্‌টিক (ব্যঙ্গ গল্প) ২॥০
শিকার-কাহিনী (গল্প) ২॥০

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)
স্বর্গের চাবি (গল্প) ৩৲
মহাস্থবির জাতক (উপন্যাস)
১ম পর্ব ৫৲ ২য় পর্ব ৫৲

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
রাণুর প্রথম ভাগ (গল্প) ২॥০
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (গল্প) ২॥০
রাণুর তৃতীয় ভাগ (গল্প) ৩৲
রাণুর কথামালা (গল্প) ৩৲

শ্রীঅমলা দেবী
মনোরমা (গল্প) ১॥০
সুধার প্রেম (উপন্যাস) ১॥০
সরোজিনী (উপন্যাস) ৪৲
কল্যাণ-সঙ্ঘ (উপন্যাস) ৫৲
শেষ অধ্যায় (উপন্যাস) ২৲

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৩॥০

শ্রীজীবনময় রায়
মানুষের মন (উপন্যাস) ৪৲

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র
মনঃসমীক্ষণ ৩৲

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার
বাণী ও ভস্ম (গল্প) ১॥০
অনেক স্বর্গ (নাটক) ১॥০

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিটেকটিভ (গল্প) ৪৲

জীবন-পরিপ্রেক্ষিতে

কত ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন-পথের বাঁকে বাঁকে
কত না অপরিচিত ঘুরপথে ঘোরায় আমাকে।
বাজিছে বিদায়-ঘণ্টা, শুনি অনুরণনের সুর,
ক্রমে দূরে ক্ষীয়মাণ, চমকে স্মৃতির অন্তঃপুর।
উবিয়া গিয়াছে কত কল্পনার কর্পূরী পর্বত,
অকস্মাৎ অসমাপ্ত দরবারী কানাড়ার গৎ।
নূপুর বাজায়ে পরী ছড়াল রঙিন পেশোয়াজ,—
রামধনুকের ছিলা কেটে দিল কোন্ তীরন্দাজ?
মহাকবি গাহে তার প্রীতি কে করিল পরিহাস,
স্পর্শাতুর শুশুকতে হানিল সে মুক্ত চন্দ্রহাস।
অবহেলি প্রতিশ্রুতি পলাইল প্রেমিক নয়ান,—
উচ্ছ্বসিত মহাকাব্যে অমর সে প্রত্যাখ্যান-গান।
সোনালি যৌবন-ছবি নিবে গেল রঙ্গমঞ্চ 'পরি,
কত না রজনীগন্ধা এড়াইল সজাগ প্রহরী।
রাজকন্যা সংগোপনে বরিল কৌমারহরে তার
বাধে যুদ্ধ, সন্ধি-শঙ্খে শুভদৃষ্টি হ'ল দুজনার।
রূপসীরে ভালবাসি' সন্ন্যাসীরও ঘটেছে বিকার,
স্পর্শি তার শবদেহ ডাকে, "জাগো, প্রভাতী আমার।
দেখে তব মুখশ্রীতে দিনের আলোর ইন্দ্রজাল,
ছিনু যেন সুরামত্ত চির-নেপথ্যের অন্তরাল।"
প্রেমের সে জাতি নাই, প্রবেশিয়া কারার ভিতর
সুন্দরী স্বীকার করে—'এই বন্দী মোর প্রাণেশ্বর'।
উপেক্ষিত পূর্বরাগ বাগ্‌দত্তা-প্রীতির অঞ্জলি,
লতাফাঁস বিনাইল মৌনবতী কোন্ 'রত্নাবলী'?...

কত না প্রিয়-বিচ্ছেদ, অসহ অপ্রিয় সমাগমে
কাঁদিয়াছে নরনারী, চোখ ফেটে রক্তকণা জমে।
কী ভাবে কে সাজাইল এ-জীবন-স্বপ্নের পসরা,
প্রাণের আনন্দ-ফল্গু রূপে-রঙে-রসে দিল ধরা।
চিত্রিত বারিধারায় জুড়ায় কি হিয়ার পিয়াস ?—
সঙ্কট-মুহূর্তে কত অর্ধ-উক্তি, প্রেতহাস্য, ত্রাস !
অভিনয় ক'রে গেল কত লোক কত না নাটক,
ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজা পথের ফকির, পলাতক।
ভাগিস্ ভুলি গো মোরা জীবনের ক্ষতিক্ষতগুলি,—
মায়ামন্ত্র-ছন্দে কাল বুলাইয়া সম্মোহন-তুলি
না যদি ভুলাত ব্যথা, মানুষ পাগল হয়ে যেত,
যোগ-সূত্রে গাঁথা কেহ থাকিত না কাহারো সঙ্গে তো !
স্তব্ধ হ'ত প্রিয় শব্দ, থেমে যেত আশার ঝঙ্কার,
পৃথিবীর শোভাযাত্রা, ঋতু-নৃত্য হ'ত অন্ধকার !

তবু, তবু বলে মন দাঁড়াইয়া অন্তিম বেলায়,
সেটুকুই মিঠা ছিল, যেটুকুন্ হারায়েছি হায় !
যৌবন সুন্দর বটে, বার্ধক্য সে বিরহ-হরণ,
আশ্চর্য রহস্যময় মানুষের জীবন-দর্শন।—
মনের অদ্ভুত গতি,—চণ্ডাশোক হ'ল ধর্মাশোক,
দেশে দেশে পাঠাইল অহিংসা-তন্ত্রের প্রচারক।
প্রবাসে নিষ্পর কত, সুখে দুখে দরদী আমার,
নিবেদিল আদরায়, তাহাদের করি নমস্কার।
একদা যাদের সাথে এক পাত্রে করেছি ভোজন,
যে নারীকে মানিয়াছি জন্মে জন্মে আপনার জন,
আমার পবিত্র অশ্রু সবারে দিলাম উপহার,—
ধরিব গো ধন্য তারা, এক ঠাঁই মিলিব আবার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় প্রস্তাব*

"১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গ-বিভাগের সরকারী ঘোষণা কার্যে পরিণত করিয়া বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। বিভক্ত বঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগ অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান। নেতৃমণ্ডলীর নির্দেশে বাংলা দেশের নগরে ও গ্রামে অরন্ধন ও রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হইল। বাঙালীরা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া স্নানান্তে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। রাখী-বন্ধনের জন্য জাতীয় মিলন-যজ্ঞের হোতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥"

* * *

"খণ্ডিত বাঙলার মিলনের আদর্শ এবং সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে ঐক্য সাধনের মহান উদ্দেশ্য লইয়া রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান ও ফেডারেশন হল্ নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহাতে ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল বাঙালীর কবি-চিত্তের পরিচয় মিলে।"

এই উক্তি দিয়াছি আমার রচিত 'শহীদ যুগল' (প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের জীবন-চরিত ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থের "স্বদেশী আন্দোলন" অধ্যায় হইতে। রাখী-বন্ধনের পরিকল্পনায় "ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল বাঙালীর কবি-চিত্তের পরিচয় মিলে"—বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা লিখিবার পূর্বে আমার মনে হইয়াছিল, রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত। ধারণা বা অনুমান ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে কিংবা সত্য নির্ধারণে স্থলবিশেষে সহায়ক বটে; কিন্তু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই কারণে আমি উহা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত

---

* 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৫৩ সনের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

বলিয়া লিখিতে পারি নাই। বস্তুতপক্ষে রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠান যে রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পনা, তৎসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। স্বদেশী যুগের দেশবিশ্রুত নির্বাসিত নেতা 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' হইতে সেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ক্রমে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অঙ্গচ্ছেদের দিন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, বঙ্গদেশকে অখণ্ড রাখিবার সংকল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, গবর্নমেণ্ট বাঙ্গলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলা, বাঙ্গালীর প্রীতির ছুশ্ছেদ্য সূত্রে আরও নিকটবর্তী হইবে। তাহার চিহ্নস্বরূপ বাঙ্গালী নরনারী ৩০শে আশ্বিন রাখী বন্ধন করিবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাখীবন্ধন ব্যতীত এই নির্ধারণ করিলেন, শোকচিহ্ন স্বরূপ ৩০শে আশ্বিন শিশু ও রোগী ব্যতীত, আর কেহই অন্নজল গ্রহণ করিবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাকিবেন। কোন বাঙ্গালীর ঘরে চুলা জ্বলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকিবে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী চলিবে না। দোকানপাট ও বাজার বন্ধ থাকিবে। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে কলিকাতার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত স্থানে যুবকগণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত করিতে করিতে গঙ্গার ধারে সমবেত হইয়া তথায় স্নান করিয়া বীডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সেণ্ট্রাল কলেজে সমবেত হইবে। প্রথমতঃ, সেখানে রাখীবন্ধন ও বঙ্গচ্ছেদজনিত প্রাণের খেদ ও সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্নকালে এক বিরাট সভা হইবে। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার বাঙ্গালীদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, তাহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সভাস্থল ক্রয় করা হইবে এবং তদুপরি অখণ্ড-বঙ্গভবন নির্মাণ করা হইবে। তৃতীয়তঃ, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে আর এক সভা হইবে। সে স্থলে স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুতের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।"

স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে যখন বিদেশী সরকার নিরঙ্কুশ দমন-নীতি প্রয়োগ করিয়া বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন বাংলায় দেশসেবকগণকে রাজপুরুষদের হস্তে নানা ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল বিদ্যালয় হইতে ছাত্র বহিষ্কৃত হইল, শিক্ষক কর্মচ্যুত হইলেন, বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করার জন্য আন্দোলনের স্বয়ংসেবকগণ গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আটক হইলেন,—ইঁহাদের কেহ কেহ অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইলেন।

স্বদেশের সেবা করিতে যাইয়া যাঁহারা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন 'হিতবাদী'-সম্পাদক স্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি (১৩১২ সালের ২রা ফাল্গুন) তারিখে কলিকাতা "গ্রান্ড্ থিয়েটার" নামক রঙ্গালয়ে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার'-পত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ; লাঞ্ছিত স্বদেশসেবকগণকে রৌপ্যপদক, বন্দেমাতরম্-অঙ্কিত রৌপ্য লকেট এবং প্রশস্তি-পত্র বিতরণ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের গায়কগণ কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণে লাঞ্ছিত দেশসেবকগণকে অভিনন্দিত করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় অনুপস্থিত জননায়কগণের এতদুপলক্ষ্যে লিখিত পত্রাবলী সভায় পাঠ করিয়া শুনান। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিখানি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল। চিঠিখানি এই :—

"স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন

"বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমা সঞ্চার না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে 'বন্দেমাতরম্'। ২রা ফাল্গুন ১৩১২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' নামক মাসিক পত্রের ১৩১২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত সভার বিশদ বিবরণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত তৎকালের বিখ্যাত ইংরেজ দৈনিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার পরদিনের অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৩১২ সালের ৩রা ফাল্গুন) তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

"The Swadeshi Martyrs." "Public appreciation of their services" "Monster meeting at Grand Theatre."

সভার উদ্দেশ্যবর্ণনায় আছে :—

"To show sympathy with the sufferers and to give expression to the public appreciation of their services in furtherance of the Swadeshi movement..."

অন্যান্য সংবাদপত্রেও সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বজাতিকে সত্য ন্যায় ও বীর্যের পথে পরিচালিত করিতে। নবজাগৃতির উন্মাদনায় তাঁহার স্বদেশবাসীগণ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। সেই কামনা তাঁহার স্বদেশী যুগের নানা রচনা ও ভাষণের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বদেশ-সেবকগণের মধ্যে যখনই তিনি সত্যানুরাগ, ন্যায়-বোধ ও বীর্যবত্তার পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। যে স্থলে তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই স্থলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। জাতীয় অগ্রগতির যাত্রীদল তাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছেন পথ ও পাথেয় দুইয়েরই সন্ধান। মদমত্ত বিদেশী শাসকগোষ্ঠী যখনই অন্যায় অবিচার করিয়াছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক লেখনী তখনই তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। সে সতর্কবাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা তেজোগর্ভ হইলেও বিদ্বেষ বা বিক্ষোভশূন্য, তাহা যুক্তিপূর্ণ সঙ্গত ও সংযত। বয়কট-আন্দোলন যখন প্রবল বেগে চলিতেছিল, তখন আন্দোলনের বিরোধী স্বদেশীয়গণের উপর আন্দোলনের সমর্থক দল কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আন্দোলনের সমর্থক হইয়াও এই অন্যায় পন্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।...

"...আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি।" ("পথ ও পাথেয়")

স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার মুখে বাঙালী যখন কেবল হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হইতেছিল এবং সেই হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তখন দূরদর্শী কবি তাঁহার দেশবাসীকে জাতীয় চরিত্রের সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আকুল আবেদন জানান। তখন জাতির দৃষ্টি কেবল ভাঙনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি তৎসম্পর্কে জাতিকে সাবধান করিয়া দিয়া গড়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

"...হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

"...পূর্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই ত চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনো মতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না।" ("পথ ও পাথেয়")

স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে বিদেশী রাজ-শক্তির উদ্দাম দমন-নীতির প্রয়োগে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মুখে জাতি যেন বিপথগামী না হয় এবং সংযম ও ধৈর্য না হারায়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল আবেদন জানাইয়াছেন। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁহার বাণী :—

"...মানুষ বিস্তৃত মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের

লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে।

"ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহার নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়।"

উত্তেজনার কুফল সম্পর্কে দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাবধান-বাণী :—

"...উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোনও সার্থকতাই দেখিতে পায় না।"

দেশসেবকগণের মধ্যে এক দল যে বিপ্লবের গুপ্ত পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তৎকালে লোক-চক্ষুতে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। ওই পন্থার অনুসরণে দেশ ও জাতির যে অকল্যাণ হইবে, তাহা ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে :—

"...দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান, এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিবে এবং যে সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে।"

এই দুর্গম গুপ্ত পথের দুঃসাহসী যাত্রীদলকে প্রবল রাজপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া চণ্ড নীতির প্রয়োগে উৎপাটিত করার চেষ্টা করিলে তাহার ফল যে বিপরীত হইবে, সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি রাজপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া :—

..লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে "অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।" ("পথ পথের")

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কীকরণে যে কিছুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহাদের অনুসৃত নিগ্রহ-নীতির কঠোরতা বৃদ্ধি হইতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কবি-বাণী তো মিথ্যা হয় নাই। স্বদেশী-যুগের মধ্য-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী-যুগের দ্বিতীয় আইন অমান্য (সিভিল্ ডিস্ওবিডিয়েন্স্) আন্দোলন পর্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দমন-নীতির কঠোরতায় গুপ্ত বিপ্লব-পন্থী মুক্তি-সাধকেরা ভীত ও দুর্বল হওয়া তো দূরের কথা বরং দুঃসাহসী ও প্রবল হইয়াই উঠিয়াছিল। আইনের অস্ত্রাগার হইতে পুরাতন মরিচা-ধরা অস্ত্র বাহির করিয়া শানাইয়া লইয়া তাহা প্রয়োগ করা হইল, নূতন নূতন আইন রচিত ও প্রযুক্ত হইল,—কিন্তু কিছুই তো ফলপ্রদ হইল না। বৈদেশিক রাজশক্তির প্রতিকূলে সৃষ্ট 'বিরোধবুদ্ধি' যে 'গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত', তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজে বুঝিতে পারিয়াছিলে বলিয়া শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই স্বৈরাচারী শাসকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষমতার মাদকতায় মত্ত বলিয়া তাঁহারা ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যখন 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের বিদেশী রাজশক্তিকে বলপূর্বক উচ্ছেদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া আলিপুর বোমার মামলার উদ্ভব হয়, তখন শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়িল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা দূরদর্শী ভারতীয় মনীষীর সদুপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলেন না এবং রুদ্র নীতির ভ্রান্ত পথ পরিহার করিলেন না। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে গুপ্ত বিপ্লবের পথ বর্জিত হইয়াছিল, মহামানব গান্ধীজীর প্রদর্শিত ও অনুসৃত পন্থার সাফল্যে এবং তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর প্রভাবে।

ওই 'বিরোধবুদ্ধি' বলপ্রয়োগে উৎপাটিত করিয়া নিঃশেষ করার চেষ্টা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে এবং উহার ফল যে বিপরীত হইবে, সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাবধান-বাণী রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধের মাধ্যমেও রাজপক্ষকে শুনাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"...বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় ক'রবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানব-হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে।"

এই উদ্ধৃতি দিলাম রবীন্দ্রনাথের "সমস্যা" নামক প্রবন্ধ হইতে। প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধের অনুবৃত্তিস্বরূপ। "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে তিনি যে "দুইটি কথার আলোচনা" করিয়াছেন, তাহা হইল এই:—"প্রথমতঃ দেশহিত ব্যাপারটা কী? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর কিছু? দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?" "সমস্যা" প্রবন্ধে তিনি আমাদের সম্মুখে সমস্যা উত্থাপিত করিয়াই নিজ কর্তব্য সমাপ্ত করেন নাই। সমস্যা কঠিন এবং জটিল হইলেও তাহার সমাধানের পথের সন্ধানও তিনি আমাদের দিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে শুনাইয়াছেন আশার বাণী:—

"ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ এ কথা আমরা স্বীকার করিব না। কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতিবর্ণনির্বিচারে—দুর্ভিক্ষ-কাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজন-কালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার আমাদের উপর যে আহ্বান আসিয়াছে তাহা সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে।

প্রকারে, সেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে ;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব-পশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পর আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চিত জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য ? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিব।" ("সমস্যা")

নিজের মতে আনিবার জন্য অপরের উপর বলপ্রয়োগ এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশী-যুগে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে। "পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নি প্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা"—এই সমুদয়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে "সদুপায়" প্রবন্ধটির মধ্য দিয়া। ওই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে (১৯০৮ খ্রীঃ) "চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার আয়োজন" এবং "কুষ্টিয়ায় নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত" হওয়ার ঘটনার পরে। দূরদর্শী দেশহিতৈষী চিন্তানায়কের ব্যথিত চিত্তের খেদোক্তি :—

"...কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় ; অতএব সকলে যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।"

দেশের হিত-সাধনপ্রচেষ্টায়, দেশবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অন্যায় মনে করিতেন, তাহা নহে, ইহাতে দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইবে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। উত্তরকালে সেই ধারণা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিজের মতে আনিবার জন্য প্রবল পক্ষ দুর্বল পক্ষের উপর বলপ্রয়োগ করিবে, ইহা তিনি কোন অবস্থায়ই সমর্থন করেন নাই। তীব্র ভাষায় ইহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন :—

"...দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবল মাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্যসাধন বলে না। এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী।"

বলপ্রয়োগের পন্থা অনুসরণ দ্বারা জাতীয় প্রগতি ব্যাহত হইবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সুবিবেচিত অভিমত। তাঁহার মতে—"অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব?"

বলপ্রয়োগের পন্থা, অবৈধ উপায়, অন্যায়ের পথ পরিহার করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতিকে জানাইয়াছেন আকুল আবেদন। কেন না তিনি জানিতেন যে, ওই সমুদয় পথে চলিয়া আমাদের কল্যাণ সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ অমঙ্গলই হইবে বেশি। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামতে যে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই তাহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের ভাবী অমঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তবে তাঁহার মতামতে ভাবাবেগ যেমন রহিয়াছে, সুযুক্তিও আছে যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার উৎপত্তিস্থানের প্রতি, দেশকে আহ্বান করিয়াছেন প্রশস্ত ধর্মের পথ ধরিয়া চলিবার জন্য। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের বাণী :—

"অতএব বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা ; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে ; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে ? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একবার প্রশ্রয় দিলে সয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়।" ("সদুপায়")

"ইম্পিরিয়ালিজম," "রাজভক্তি" এবং "বহুরাজকতা"—এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনটি লিখিত হইয়াছে ১৩১২ সালে অর্থাৎ স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথম বৎসরে। ওই তিনটি প্রবন্ধ এবং পূর্বালোচিত "পথ ও পাথেয়" এবং "সমস্যা" প্রবন্ধ দুইটি গ্রথিত হইয়াছে 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে। "ইম্পিরিয়ালিজম্" প্রবন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণপূর্বক অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যবিস্তারের দুর্লালসা ও দুর্নীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদ্ ইম্পিরিয়ালিজ্মের মাদকতায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"বিলাতে ইম্পিরিয়ালিজমের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোন রাজা স্বর্গের রাজার প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

"দেখা যাইতেছে এইরূপ বড় বড় মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ সকল মতলব টেকে না—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

"তাহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন।"

ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাধিপাল-

(Chancellor)-স্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন-উৎসব উপলক্ষ্যে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্য দেশ ও প্রাচ্য দেশের অধিবাসীগণের চরিত্রের সমালোচনা করিয়া পাশ্চাত্য দেশের সত্যবাদিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য দেশের ধূর্ততার নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অন্যায় মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে উগ্র সাম্রাজ্যবাদের দাম্ভিকতা প্রকট হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের নেশায় মত্ত হইয়া প্রবল জাতি যে দুর্বল জাতির ন্যায্য অধিকারে অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টিত হয়, তাহা তিনি নির্মমতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী স্বজাতির একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতবর্ষের মত একটা বৃহৎ দেশের অসংখ্য অধিবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বিচারে ইহা অধর্ম বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌মকে তিনি কশাঘাত করিয়াছেন এই বলিয়া :—

"অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় 'শিকার' তবে সে ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষ্যে যে ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে ব্যক্তি শিকারীর চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাব-নিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারীর দল অনেক বেশি নিদারুণ।

"ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ সভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় 'ইম্পিরিয়ালিজম'—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

"নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটা বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।" ("ইম্পিরিয়ালিজম")

প্রায় অর্ধশতক পূর্বে রচিত ওই "ইম্পিরিয়ালিজম প্রবন্ধটি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আধুনিক কালের কোন সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাজনীতি-বিদের রচনা পড়িতেছি কিংবা ভাষণ শুনিতেছি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কত অগ্রগামী, তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধ হইতেও মিলিবে। তিনি যে ইম্পিরিয়ালিজমের কিরূপ বিরোধী ছিলেন এবং ইম্পিরিয়ালিস্টের অনুসৃত নীতি ও পন্থাকে কতটা গর্হিত মনে করিতেন, নিম্নোদ্ধৃত উক্তির মধ্য দিয়া তাহা সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কার্যকে চৌর্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজম্-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্য ব্যক্তিদিগের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।"

"বহুরাজকতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের ভারত-শাসন-নীতির নিন্দা করিয়াছেন, কেননা সেই নীতির লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ব্রিটেনকে সমৃদ্ধ করা। তাঁহার মতে ব্রিটিশ জাতির ভরণ-পোষণ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করিতেছে ভারতবাসীকে শোষণ করার উপর; ভারতীয়গণ যদি শোষিত ও নিঃস্ব হয়, তবেই ইংরেজেরা পুষ্ট ও বিত্তশালী হইবে। তিনি বলিয়াছেন :—

"...দেশ একজন রাজাকে বহন করিতে পারে, কিন্তু একটা গোটা জাতকে রাজা বলিয়া বহন করা দুঃসাধ্য।..."

"...একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভাল রাজা হইলেও এ রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড় কঠিন।..."

"...একটা জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানা রকম আকারে নানা রকম পাত্রে যোগাইতে হইতেছে।..."

লর্ড কার্জনের শাসনকালে মুসলমান বাদশাহগণের অনুকরণে দিল্লীতে যে দরবারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে "রাজভক্তি" প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"...প্রাচ্য রাজমাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্ধা প্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দ-সম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত

(৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডানা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। কবির মনে হচ্ছিল যেন মধ্য-রাত্রি, রহস্যময় মধ্য-রাত্রি। নিশীথ-গগনের অসংখ্য নক্ষত্রমালাই সহসা যেন কোনও মন্ত্রবলে একত্রিত হয়ে সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর জানলা দিয়ে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে সেটা যেন বাস্তবের নয়, রূপকথালোকের। যদিও বাল্যকাল থেকে বহুবার তিনি এ দৃশ্য দেখেছেন কিন্তু কিছুতেই তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর পূর্ব-জীবনের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে। ওই কর্ণিকার, পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উদ্দাম অথচ নীরব বর্ণসমারোহকে ঘিরে ফটিক-জলের যে তীক্ষ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে পার্থিব— এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সহসা আজ পরম মুহূর্তে আবিষ্কার করেছেন পরম সত্য—সে সত্য এতই অপরূপ যে, ভাষায় তাকে প্রকাশ করতেও ভীত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অন্তরলোকে একটা অস্ফুটভাব রূপায়িত হচ্ছিল কেবল অসম্বদ্ধ লীলায়, মনে হচ্ছিল ছন্দবন্ধনে বাঁধলেই ওর অপরূপ অসীমতা খণ্ডিত হবে। মনের মধ্যে তবু ছন্দ জাগছিল, গুঞ্জন করছিল কবিতার মিল। ফটিকজল পাখীর 'ফটি—ক জল' সূক্ষ্ম সুন্দর তীক্ষ্ণ সুরে যেন তাঁকে বলছিল, তুমি চুপ ক'রে আছ কেন, তুমিও তোমার গান গাও না। তোমার মনে যদি সুর থাকে, কণ্ঠে তার ফুটবেই কিছুটা। সবটা নাইবা ফুটল! তা ছাড়া সবটা তুমি ফোটাতে পারবে, এত অহঙ্কারই বা কেন তোমার? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি সবটা ফোটাতে পেরেছেন একসঙ্গে?

পাখীর সুরে তিরস্কৃত হয়ে লজ্জিত হলেন কবি। কবিতার খাতাটা বার ক'রে নীরবে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে
তারি টানে তারি পানে ছুটেছে সুরের বেগ
পুলকিত বিহগের স্বরে,
সে সোনার মেঘ হতে নামিছে ফটিক-জল-ধারা
বৃক্ষলতা করে স্নান, পুষ্পে বর্ণ হ'ল মাতোয়ারা
চঞ্চল পতঙ্গদল, মুখরিত পাখী আত্মহারা
মানুষ ঘুমায় শুধু ঘরে।
ওরে কবি, দ্বার খোল্—বাহিরে বারেক দাঁড়া এসে
সোনার স্বচ্ছ মেঘ নেমেছে যে তোরই দ্বারদেশে
রুদ্রের অন্তর হতে বাহিরিল যে মোহন বেশে
দেখ্ তারে দু'নয়ন ভ'রে
রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে।

কবিতাটা লিখে কবির সত্যিই মনে হতে লাগল যে, বাইরে যে কড়া রোদ দিগ্‌দিগন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে তা রোদ নয়, তা সোনার স্বচ্ছ মেঘ, যে মেঘ থেকে ফটিকজল নামে। কপাট খুলে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই অনবদ্য অপরূপ প্রকাশকে অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব তো তাঁরই, তিনি যে কবি। সাধারণ মানুষ কপাটে খিল লাগিয়ে বৈশাখের এই পরম প্রকাশকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তিনি কি পারেন? বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, কোথাও কেউ নেই, চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে যেন। তিনি যেন অকস্মাৎ কোনও রূপকথা-লোকের নিদমহলে ঢুকে পড়েছেন। প্রখর রৌদ্রালোকিত নিদমহল। আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা—ওটা কি কর্ণিকার বৃক্ষ? অপ্সরীই বা নয় কেন? ওই যে দূরে রক্তশিখার মত দেখাচ্ছে, ওটা পলাশ, না, শিমুল, না, ধরণীর মর্মভেদী কামনা? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি।

একটা তপ্ত হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে, এসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবির চমক ভাঙল। কোথা থেকে ডাকছে পাখীটা? দূরের ওই বড় গাছটা থেকে নিশ্চয়। ঘন পত্রপল্লবের মাঝখানে উঁচুতে ছোট্ট একটি ডালে ব'সে আছে বোধ হয়। কয়েক দিন আগে দেখেছিলেন তিনি পাখীটিকে। অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতের পর দেখেছিলেন। ছোট্ট পাখী, সুন্দর দেখতে। কালো সাদা আর সবুজাভ হলুদের অপরূপ সমন্বয় পুরুষটির গায়ে, সঙ্গিনীটির গায়ে কিন্তু কালোর ছোঁয়াচ নেই। পুরুষ পাখীটিকে দেখে মনে হয়েছিল, অমানিশীথিনীর কালোর সঙ্গে যেন স্বর্ণকান্তি সূর্যালোকের দ্বন্দ্ব চলেছে ওর সারা অঙ্গ জুড়ে, মনে হয়েছিল পুরুষ পাখীটি তামসিকতার কালোকে জয় করতে পারে নি, সঙ্গিনীটি কিন্তু পেরেছে, তার সারা গায়ে কেবল সবুজ আর হলুদের দ্যুতি, কালোর আভাসমাত্র নেই।

'ফটি—ক জল'—'ফটি—ক জল'—

কবি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দিন কয়েক আগে ফটিকজলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন একটা। তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, কবিতাটা এখন একবার পড়া দরকার। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কথা ভুলে গেলেন আবার। অসংলগ্নভাবে মনে পড়ল অমরেশ-বাবুর জমিদারিতে কোথায় যেন খুন হয়ে গেছে একটা। জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে হয়তো থানায় যেতে হবে। একজন গোমস্তাকে তিনি যেতে বলেছেন, কিন্তু সে যদি এসে বলে যে তাঁকেও যেতে হবে, তা হ'লে—। বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন তিনি। অমরেশ-বাবুর স্ত্রী এ কি বিপদে ফেলে গেলেন তাঁকে! সঙ্গে সঙ্গে ডানার কথাও মনে হ'ল তাঁর। শুধু তাঁকে নয়—ডানাকেও বিপদে ফেলে গেছেন ওঁরা। দুজনকে দু রকম 'টাস্‌ক্‌' দিয়ে গেছেন যেন। এই বিপন্ন ভাব সত্ত্বেও কিন্তু মনে মনে ঈষৎ আনন্দিত হলেন তিনি। ডানার সঙ্গে একই কারাগারে বন্দী হবে আছি কেবল অর্থাভাবে—এই ধারণাটা মনে স্পষ্ট

হওয়া মাত্র ডানার সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের আত্মীয়তা-বোধ মনে জাগল। কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়াটা অনুচিত—এ কথাও মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। একটু লজ্জিত হলেন।

'ফটি—ক জল'—

কবিতার খাতাটা খুলে পাতা ওলটাতে লাগলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে, কর্তব্যে অবহেলা ক'রে ধরা প'ড়ে গেছেন যেন। কবিতাটার অনেক কাটাকুটি ছিল, তবু পড়তে কষ্ট হ'ল না তাঁর।

বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে
সবুজাভ হলুদে সাদাতে ও কালোতে
সাজিয়া আসিল কে অজানারে চাহিয়া
ফটিকজলের গান বারে বারে গাহিয়া
সাথে ল'য়ে সঙ্গিনী তন্বী শ্যামলীকে
আলোকের রূপ ওর সারা মন ভরিয়া
পালকের কালো তবু যায় না যে সরিয়া
হয়তো বা আশা আছে ওরই গাঢ় কালিমা
প্রেয়সীর অন্তরে জাগাইবে লালিমা
শস্তের সুষমায় সাজাইবে পলিকে।

বেরিয়ে পড়লেন আবার। দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ব'সে আছে একদল গরু, অর্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করছে, একটা ছোট বাছুর কেবল লেজ তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তাঁর সুন্দরীও কি আছে ওদের মধ্যে? কর্তব্যবোধেই যন্ত্রচালিতবৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু গরুগুলির কাছাকাছি গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা গরু নয়—গাছের ওপর এক ঝাঁক হাঁড়ি-চাঁচা পাখী। দুটো পাখী দুলে দুলে কি মিষ্টি ক'রেই না ডাকছে! 'খুকু নেই' বলছে কি? না, কু অক্ রিং, না, ববো লিং? সহসা কবির মনে হ'ল, ওরা যেন পরস্পরকে বলছে—ধর দিকিন ধর দিকিন, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি খেলার সময় যেমন বলে। দুই কিশোরী

মেয়ের মতই দেখতে তো। সারাটা দুপুর এ-গাছ ও-গাছ ক'রে বেড়াচ্ছে, কখনও মগডালে মগডালে, কখনও ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে। ফল চুরি করছে, অন্য পাখীর ডিম চুরি করছে, পোকা মাকড় যা পাচ্ছে খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উঁচু ডালে ব'সে দুলে দুলে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন। স্নেহরসে কবির মন সিক্ত হয়ে উঠল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা যেন। পর-মুহূর্তেই কোকিল ডেকে উঠল একটা। তারপর, শোনা গেল—'ফটি—ক জল'। দূরে স্বর্ণাভরণভূষিতা কর্ণিকার বীথিতে নীরব সমারোহে যে বর্ণ-বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে তারই প্রভাব যেন উন্মত্ত ক'রে তুলেছে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পগুচ্ছকে। ওরা যেন রঙের ভাষায় ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কবির আবার মনে হ'ল, তিনি রূপকথা-লোকে প্রবেশ করেছেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্বস্ত আনন্দিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল, তিনি দূর প্রবাস থেকে সহসা নিজের দেশে ফিরে এসেছেন যেন। এই পাখীর ডাক, ফুলের ভাষা, রৌদ্র-মণ্ডিত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষে লতায় তৃণে গুল্মে সহস্র ইঙ্গিতভরা অসংখ্য আবেদন—এই তো তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এরই ক্রোড়ে, এই বৈচিত্র্যের দোলায়, এই সহজ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতেই তো মানুষ হয়েছেন তিনি। কত জন্ম, কত জন্মান্তর, কত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনার কত সংঘাত আন্দোলিত করেছে তাঁকে এই প্রকৃতির কোলেই। মায়াবিনী সভ্যতার পিছু পিছু কোথায় গিয়েছিলেন তিনি এতদিন ঘর ছেড়ে? জটিল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এতকাল কিসের মোহে? নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ ক'রে কোথায় চলেছে মানুষ! কোথায় এর পরিণতি! হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত হাওয়া তাঁকে ঘিরে ছোট্ট একটু নাচ নেচে দূরে ছুটে চ'লে গেল কতকগুলো শুষ্কপাতাকে নাচিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, বৃদ্ধ বটের পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে। মুগ্ধ কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেবেলার সাথী একজন যেন পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ছুটে পালাল। ও তো এখনও তেমনি দুষ্ট, তেমনি চঞ্চল, তেমনি উত্তপ্ত, তেমনি উদ্দাম

আছে। তিনিই কি বুড়ো হয়ে গেলেন না কি? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ ক'রে উঠল। দেহটা হয়তো অপটু হয়েছে, মন তো একটুও বুড়ো হয় নি। তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল ওই দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে। একটু ছুটলে ক্ষতি আর কি হবে। বড় জোর হাঁপিয়ে পড়বেন একটু। কেউ দেখতে পেলে হয়তো হাসবে, পাগল ভাববে। তাতেই বা ক্ষতি কি! ঊর্ধ্বপুচ্ছ কচি বাছুরটা তাঁর দিকে একছুটে চ'লে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর সামনে। যেন বলতে লাগল—ছুটবে? বেশ তো, এস না। কবি সত্যিই ছুটতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। রাস্তার বাঁকে পিওনকে দেখতে পেয়ে তাঁর গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে গেল, টান পড়ল ভব্যতার নিগড়ে। সহজ মন্দ গতিতেই এগিয়ে গেলেন তিনি পিওনের দিকে। পিওনও তাঁর দিকেই আসছিল, তাঁর চিঠি ছিল একখানা। বেশ মোটা একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে পিওন নিজ গন্তব্যপথে চ'লে গেল। কবি চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝলেন, অমরেশবাবুর চিঠি। হাতের লেখাতেই ভদ্রলোকের চরিত্র পরিস্ফুট। গোটা গোটা বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষর। বেশ মোটা চিঠি। খামটা ছিঁড়েই কবির মনে হ'ল, এ চিঠি এখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। বেশ লম্বা চিঠি। প্রথমেই চোখে পড়ল—"একটা দোয়েল পাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আমি আরও খান কয়েক বই পাঠালাম। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে—" এইটুকু প'ড়েই কবির মনে হ'ল, চিঠিখানা নিয়ে ডানার কাছে যাওয়াই উচিত। যা এতক্ষণ মনের প্রত্যন্তদেশে গোপন ইচ্ছা ছিল তা এইবার কর্তব্যরূপ পরিগ্রহ ক'রে দ্বিধামুক্ত হ'ল। চিঠিখানা হাতে ক'রে, দুপুর রোদে মাঠ ভেঙে তিনি ডানার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। কবি বাইরে যদিও একটা সপ্রতিভতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু

মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রূপকথালোকের যে অবাস্তব চিত্রটা সহসা তার মনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব তখনও কাটে নি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চিরন্তন রাজপুত্র, চিরন্তনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলেছেন। যে মেঘ স্ফটিকজল বর্ষণ করে, সে তার স্বচ্ছ স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করেছে চতুর্দিক, তাঁর বয়স যেন অনেক ক'মে গেছে, তাঁর কবিতা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁকে।...

কল্পনার পক্ষীরাজে চ'ড়ে তিনি যখন সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন তখনও তাঁর ঘোর কাটে নি। শিকল-তোলা দরজাটার দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চমকে উঠলেন চাকরটার সাড়া পেয়ে।

মাইজী বেরিয়ে গেছেন।

ঘোর কেটে গেল? মুখ দিয়ে কিন্তু কথা বেরুল না তবু।

আপনি কি বসবেন?—চাকরটাই প্রশ্ন করল আবার।

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কোথায় গেছেন মাইজী?

জোর ক'রে কথা কটা বলতে পেরে যেন আশ্বস্ত হলেন তিনি। মনের একটা অজানা গুরুভার যেন নেবে গেল।

তা ঠিক জানি না বাবু। মাইজী আমাকে ডাকঘরে পাঠিয়েছিলেন খাম পোস্টকার্ড আনতে। এসে দেখছি, বেরিয়ে গেছেন তিনি। কাছাকাছিই গেছেন কোথাও। আপনি বসেন তো একটু বসুন। আসবেন এখুনি।

কপাটটা খুলে দিলে সে। কবি ভিতরে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল টেবিলের উপর তিনখানা মোটা মোটা পক্ষীবিষয়ক বই রয়েছে। অমরেশবাবু পাঠিয়েছেন নিশ্চয়। কবির একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। অমরেশবাবু শুধু পাখীদেরই খাঁচায় পোরেন নি। তাঁকে এবং ডানাকেও পুরেছেন। অদৃশ্য যন্ত্র দিয়ে তাঁদেরও ঠোঁট নখ পালক মাপছেন কি না কে জানে?

"বনফুল"

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

[অর্দ্ধ-পাগল ও বদ্ধ-পাগল অবস্থায় রচিত]

বৈশাখী

জানি জানি জানি রে বৈশাখ,
পাস্‌ বা না পাস্‌ নিমন্ত্রণ
দক্ষযজ্ঞে অনাহুত শিবের মতন
তবু যে হাজির হবি, দিই বা না দিই তোরে ডাক।
হা রে রে রে বে-লাজ বৈশাখ!

•

বছরের তুই বড় ছেলে
তবু তোর এগারোটা ছোট ভাই পর পর
তোরে পিছে ফেলে
এসে ফের যাবে চ'লে কালের চাকায় খেয়ে পাক্‌—
মহাকাল-রথচক্রে চক্রমাণ হায় রে বৈশাখ!

•

রে রুদ্র ভৈরব, হায়, ভৈরবী কি পলায়েছে চক্ষে দিয়ে ধুলি?
তাই কি অসহ দুঃখে আত্ম ভুলি'
এলোমেলো রুক্ষকেশে খুঁজিয়া ফিরিস পথে-ঘাটে,
রৌদ্র-ফাটা মাঠে মাঠে,
হাটে বাটে,
আর বেদনায় বক্ষ ফাটে—
লোহিত লোচন জলে ললিত ললাটে?

•

ধূর্জটির ধূর্জটায় অবগুপ্ত গঙ্গার মতন
নির্মম মরমে তোর—যেথায় জ্বলিছে চৈত্র-চিতা—
রয়েছে কি সুপ্ত হয়ে মমতার সংবেদন-গীতা?
তাই বুঝি বন্ধু তোর অগ্নি-ঝরা জ্বালা-ভরা দুঃসহ তপন
বহু জলে বাষ্প করি' তুলিয়া সঘনে

বুনিছে মেঘের বীজ গগনে গগনে
কাঁপিছে আবেগে তাই অন্তরীক্ষ মুগ্ধ হতবাক্ ?

*

রে বৈশাখ, পুরাতন ঘৃণ্য যত কিছু আবর্জনা
নূতনের ঝাঁটা দিয়ে নিঃশেষে ঝাঁটায়ে ফেল্ না ক'রে মার্জনা ;
মজিনার মত তুই বল্ "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল !"
দগ্ধ কর্, ভস্ম কর্ পুরাতন বস্তা-পচা মাল।
পুরাতন বৎসরের স্থদে স্থদে বর্ধমান দেনা
চৈত্র-সীমা পার হয়ে কেহ যেন এপারে আসে না ;
কর্জ আর বন্ধকী দলিলগু'লি
ওরে রুদ্র, তোর দাহে ভস্ম হয়ে হয় যেন ধূলি।
স্ফীতোদর যত পাওনাদার
শূন্যোদর ঋণীদের ভুলে যায় যেন ঋণ-ভার
স্থদে ও আসলে
রে বৈশাখ, তোর স্থকৌশলে।
কুটিল কৌশলে কিংবা চাঁদির চাঁটিতে জেতা পুরাতন যত মোকদ্দমা,
বৈশাখ, ভাই রে মোর, তাহাদের করিস নে ক্ষমা,
তাহাদের কোন ডিক্রী জারি হতে, ওরে রে বৈশাখ,
এপারে দিস নে তুই এতটুকু ফাঁক।

*

পুরাতন দুঃখ যেন নূতন বছরে যাই ভুলে
পুরানো ক্ষতির খতিয়ান খুলে খুলে
চক্ষে বৃথা অশ্রু নাহি আনি।
পুরাতন ঘৃণা যেন নূতন প্রেমের পদ্ম হয়ে ওঠে ফুলে—
রে বৈশাখ, নববর্ষে দে রে এই বাণী।

*

সকল ক্ষুদ্রতা তোর ভুলে গিয়ে ওরে রুদ্র তবে
মোরা সবে

বিগত বর্ষের দুঃখী কিম্বা ঋণ-ভার-বক্র-যারা,
মোকদ্দমা-হারা,
সবে মিলে চাঁদা ক'রে বাজাইব তোরি জয়ঢাক
উচ্চকণ্ঠে চীৎকারিব "জয় জয়, রে রুদ্র বৈশাখ!"

ইঁদুরের প্রতি আলেক্‌জাণ্ডার

(কোন এক বৈশাখ মাসের এক বিস্মৃত তারিখে মাসিডন নগরীতে দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের খাঁচায় একটি ইঁদুর ধরা পড়ে। হেলেনের বাবা সেনাপতি সেলুকাস খাঁচা-সহ ইঁদুরটিকে আনিয়া আলেক্‌জাণ্ডারের সম্মুখে রক্ষা করেন এবং সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডারের আদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ইতিহাসে ইহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বন্দী ইঁদুরটিকে আলেক্‌জাণ্ডার যে ব্যঙ্গোক্তি এবং অন্যান্য প্রকার কড়া কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইয়াছে।)

বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে গিয়ে এবার পড়লি ফাঁদে।
বামন হয়েও হাত মেরেছিলি আকাশের নীল চাঁদে?
এত বড় আস্পর্ধা !!!!!!!!!!
কুট্ কুট্ ক'রে কেটেছিলি মোর বালিসের খোল, বিছানা চাদর,
গেঞ্জি, ফতুয়া, রুমাল, পা-জামা, আলুখাল্লা ও পর্দা !!!!!!!!!!
(আর) সেদিন রাত্রে ঘুমন্ত পেয়ে ওরে দুরন্ত পামর!
(মোর) পায়ে দিয়েছিলি কামড়।
বহু প্রেমিকার প্রেমের লিপিকা
সযতনে মোর প্যাঁটরায় ছিল রাখা।
পুরাতন স্মৃতি ঝালাতে সেদিন
উতলা হইয়া যেমনি খুলেছি ঢাকা
দেখি হায় হায় সবগুলো লিপি
কুচি কুচি ক'রে কেটে করেছিস ফাঁকা!

হায়, সেই সব লিপির লেখিকা দিকে দিকে মোর অসংখ্য প্রিয়তমা
এ খবর পেলে মোরে কি করিবে ক্ষমা ?
চামড়ার জুতো, বর্ম ও ঢাল ছিল যে আমার ঘরে
ওরে হতভাগা, দাঁতের পরশ হেনেছিলি তারো পরে
অকাট্য ভেবে তাদেরো দিস নি রেহাই
ওরে বেহায়ার বেহাই !
চোখ লাল ক'রে মাথা ঝেঁকে তুই আমারে দেখাবি ভয় ?
জানিস আমি যে দিকে দিগন্তে অভিযান ক'রে করেছি দিগ্বিজয় ?
মোর শির হেরি হিমসিম খায় উদ্ধত হিমালয় !
(মোর) শিরায় শিরায় বীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফোটে,
চ'টে গেলে আমি দুটি চোখ থেকে আগুনী হলকা ছোটে,
হুঙ্কারে মোর সিংহ ব্যাঘ্র আতঙ্কে যায় মূর্ছাই
বজ্রের ভীমগর্জন শুনে অবহেলে বলি—"দূর ছাই।"
ওরে রে ধৃষ্ট দুষ্ট বেহায়া, পড়েছিস ধরা খাঁচায়,
(দেখি) এবার কে তোরে বাঁচায় !
এই হাতে আমি এই অসি দিয়ে
ছিন্ন করেছি অনেক হাতীর শুণ্ড ;
অনায়াসে পারি কেটে নিতে তোর মুণ্ড ।
যদি খোঁচা মারি বোঁচা তোর নাকে
দেবে নাকো সাড়া কেহ তোর ডাকে,
লাথি মেরে যদি মাথা ভাঙি তোর, ঝাড়ে মারি জোর ডাণ্ডা
হিম্মৎ কারো হবে না আসিয়া আমারে করিতে ঠাণ্ডা ।
দে রে পাষণ্ড, মোর প্রশ্নের জবাব ।
কাণ্ডজ্ঞানের এত কেন তোর অভাব ?
যখন তখন যা খুশি তা ঘেঁটে
সেখানে যেখানে যা-তা কেটে কেটে
বেড়াবার এ কি স্বভাব ?

ক্ষিদে পায় যদি, চাইলেই হয় খাবার।
ভেবেছিস বুঝি তামাম মুলুকে জমিদারি তোর বাবার?
ঘর-পোড়া গরু ভয় পেয়ে কাঁপে আকাশে দেখলে সিঁদুর।
আমার ধমকে চমকে গেছিস, ওরে মুখপোড়া ইঁদুর?
ইতিহাসে তুই নাম রেখে যাবি মোর শ্রীহস্তে ম'রে?
হেন অমরতা দেবো না দেবো না তোরে।
ওরে বেল্লিক বেতমিজ পাজী বেহায়া বেকুব,
ন্যাকা শয়তান, জঘন্য জানোয়ার।
হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার।
খাঁচা খুলে আমি ক'রে দিনু তোরে পার।
দূর—বহুদূর যা রে চ'লে, ফের
এ পাড়ায় যেন দেখি নে, খবরদার।
ফের এলে বাপু, বুঝে সুঝে তবে এসো—
আছে মোর পোষা পেটুক পেটুকী বাঘের মাসী ও মেসো॥

খাঁচা হইতে বিদায়

আলেক্‌জাণ্ডারের প্রতি ইঁদুর)

(ওগো) দিগ্বিজয়ী, যাই তবে যাই তোমার খাঁচা থেকে।
অনেক কিছু গেলাম শুনে, অনেক কিছু দেখে।
আমার মতই পরম হেলায়
বন্ধু, তুমি খেয়াল-খেলায়
বেড়াও নাকি হেথায় হোথায় দাঁতের চিহ্ন এঁকে?

•

তোমার কাছেই অনেক ছিল, কিসের ছিল অভাব?
ভুবন জুড়ে দাঁত ফুটানো তবুও তোমার স্বভাব
ছুঁচে ছুঁচে মাসতুতো ভাই

তোমায় আমায়, বোঝো না ছাই ?
ভেবেই দেখ আপন মনে, নাই বা দিলে জবাব।

•

তবে আমি যাই গো, তবে যাই।
আবার ফিরে আসব জেনো, সুযোগ যদি পাই।
(ইঁদুরের প্রস্থান)

শ্রীশ্রী৺বাথরুম-গীতিকা-মালা

[খোল, হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী, বেহালা, ব্যাঞ্জো, শানাই, গীটার, তম্বুরা, পিয়ানো, বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ, একতারা, ডুগডুগি, ঝুমঝুমি ইত্যাদির অ-সহযোগে গীত।]

(রামপ্রসাদী কানাড়া—ঝাঁপতাল)

শোনো শোনো সখি, সাহারার বুকে মা-হারা কপোতী কাঁদে গো
মেঘেরে চাহিয়া উতলা চকোরী, চাতকী চাহিছে চাঁদে গো।
সেতারের তার নিভে নিভে যায়,
প্রদীপের শিখা নীরবে শুকায়,
আলেয়ার পিছে পতঙ্গ হায়, বারে বারে কারে সাধে গো ?
হে চিরসারথি, আরতি তোমার করিছে সে কোন্ নটিনী
তটিনীরে তট ভুলে গেছে হায়, তটেরে ভুলেছে তটিনী।
একটি নদীর কেন ছুটি ধার ?
কোথা যায় আলো, কোথা বা আঁধার ?
বাঁকা-শ্যাম হাতে সোজা বাঁশী ঐ বাজে কেন "রাধে! রাধে!" গো ?

(ভাটিয়ালী-তোড়ী—মিশ্রতাল)

ওরে আমার প্রথম প্রেমের প্রথম লিপিখানি!
কোন্‌খানে হায় হারিয়ে গেলি, কেমন ক'রে জানি ?

কি কথা তায় ছিল লেখা,
কেমন ক'রে কোথায় শেখা ?
নয়ন হতে ঘুম-ভুলানো নাম-হারা কোন্ বাণী ?
সেই গগনের হিয়া আমার কোথায় আজো কাঁদে ?
গানের সুরে মন ভুলায়ে চরণ ধ'রে সাধে !
নাই বাধা তার, নাই সীমানা,
তাই তো তারে যায় না জানা,
তাই তো নিখিল ভুবন জুড়ে নীরব কানাকানি ।

(কীর্ত্তন-বাহার—স্বচ্ছন্দতাল)

হায় রে গরু, হায় রে গরু !
তুই সাদা তোর দুধ সাদা,
(তুই) কালো হ'লে তবু দুধ সাদা হতে হয় না বাধা,
(তোর) জালার মতন মোটা ভুঁড়ি, আর ঠ্যাংগুলো সরু সরু—
হায় রে গরু !
(তুই) খাস না নিজের দুধ
(মরি হায় হায় রে !)
আন-জনমে কি ধার করেছিলি ভাই রে,
(তাই) দিয়ে চলেছিস চক্রবৃদ্ধি সুদ ?
ময়রারা আহা নিজের মিঠাই
মাঝে মাঝে খায় রে
চাষের ফসলে চাষারাও ভাগ পায় বা বসায় রে
আহা, কস্তুরী-মৃগ—সেও যে আপন
নাভীর গন্ধ পায় রে,
আপন গন্ধে মাতে চন্দন গন্ধ-তরু—
হায় রে গরু !

আহা, আপন ছাওয়ালে দুগ্ধ খাওয়ালে
গুঁতো খেয়ে তুই মরবি—
এ যে বিধির বিধান, তুই বেচারী কি করবি ?
(তোর) লাল বাঁট হতে সাদা নির্ঝর
বালতি ভরিয়া ঝরে ঝর্ঝর,
(তোর) বাছুরের তরে তারাই যে হায়
শুকনো মরু—
হায় রে গরু !

(বাউল-মল্লার—মহাবৃহদারণ্যক তাল)

ওগো বাঁশের ব্যাপারী !
বাঁশীর তুমি ধারবে কি গো ধার ?
(তুমি) রূপোর রূপে আলো দেখ,
বাঁশীর সুরে অন্ধকার ।
গাঙের বুকে ভাসাও তরী,
বাঁশের বোঝায় নাও যে ভরি,
তোমার কাছে মালের আদর,
কদর কিছুই নাই মালার ।
বাঁশীর তুমি ধারবে কি গো ধার ?
যখন) সাঁঝের বেলায় বাঁশের ঝাড়ে ঝিঁঝি ডাকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
আঁধার-ঢাকা সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে গো !
তখন ভাবি ওগো দাদা,
তুমি যদি হতে রাধা,
আহা) নিকুঞ্জে বাজিলে বাঁশী
কান্দিত না প্রাণ তোমার ॥

(মিশ্র ওমরখেয়ামী ভৈরবী—মোগলাই-ঠুংরী তাল)

(ও তুই) বল্ আমারে বল্
(আহা) অন্ধ চোখে চশমা দিয়ে
কি হবে আর ফল ?
ওরে ও বদ্ধ কালা
মিছে হায় গানের পালা,
(ও তোর) গাছে তেল গোঁফে কাঁটাল
এই যদি সম্বল।
যদি তোর প্রাণের নদী
তোলে জোয়ার-ভাঁটা
কাঁদিস নে রে পথের ধারে
ফুটলে পায়ে কাঁটা।
পাকা কালোয় অঙ্গ ঢেকে
মিছেই মরিস সাবান মেখে,
কয়লা-জলা ময়লা ধোঁয়ায়
কোথায় পাবি জল ?

(ভাটিয়ালী সারং—জগঝম্প তাল)

(আমি) রাজ্য ও রাজা ভাঙি আর গড়ি ব'সে ব'সে এই কামরায় ;
দূরে সাহারার সুড়সুড়ি খেয়ে কাতুকুতু লাগে চামড়ায়।
আজি এই ক্ষণে যত্র তত্র
কত বিরহিণী লিখিছে পত্র,
কত যে বিরহী নিরালায় রহি রুমাল চাপিছে চক্ষে !
কাটিছে সাঁতার কত তিমি হায় কত সাগরের বক্ষে !
কালো পাহাড়ের হিম-বুকে সাদা হিমানী কাঁদিছে ঠাণ্ডা
হাওয়া-তরঙ্গে ভর ক'রে ভাসে বিনা-তারী প্রোপাগাণ্ডা

কত যে রাসভ গাহিতেছে গান
তাই শুনে শুনে কাঁদিছে দু'কান,
কোথা যেন রাই দুহিতেছে গাই, বাঁশী হাতে কাঁদে শ্যামরায়।
(তাই) রাজ্য ও রাজা ভাঙি আর গড়ি একা ব'সে এই কামরায়।

(ধ্রুপদাঙ্গ ভাটিয়ালী—চতুষ্পদীতাল)

ওরে ভাই, প্রেমের খেলায় বিষম ঠেলা
প্রেম-করা নয় মসকরা।
(যারে) আর কিছুতে ধরা না যায়,
প্রেম দিয়ে যায় বশ করা।
যদি চাস প্রেম ঝালাতে
আয় রে প্রেমের পাঠশালাতে
(হেথায়) প্রেমের সা-রে-গা-মা সেধে
শিখবি প্রেমের রস-করা।
(ওরে) মক্‌সো বিনা প্রেম জমে না
প্রেম করা নয় মস্‌করা।
(ওরে) প্রেম-দরিয়ার অথই পানি
পান করা না যায়।
প্রেম-তরীতে পাল তুলিয়া
বৈঠা বাওয়া দায়।
কি যন্ত্রণা প্রেমের বিষে
প্রেম বিহনে বুঝবি কিসে?
(ওরে) প্রেম-ভুজঙ্গ দাঁত ভাঙিলেও
ভোলে না হায় ফোঁস-করা—
তাই বলি ও প্রেম-পিয়াসী,
প্রেম-করা নয় মস্‌করা।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

মহাস্থবির জাতক

ছয়

সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে রিভলভার সম্বন্ধে পরামর্শ করি আর ভয়ে গায়ে কাঁটা দিতে থাকে। ভাবতে থাকি যে, আমরা কি মনে ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম আর কি হ'ল! দিব্যি চাকরি-বাকরি করব, সুখে শান্তিতে খাব-দাব জীবনযাত্রা নির্বাহ করব, তা নয়—রিভলভার কি রে বাবা! খুন-খারাপি রক্তপাত এ সবের প্রতি আমাদের কারোরই কোন আকর্ষণ ছিল না। মনে মনে আমরা যে খুব অহিংস অথবা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলুম তা নয়। আমরা কল্পনা করতুম, যুদ্ধের পোশাক পরে, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দল বেঁধে 'বন্দে মাতরম্' গাইতে গাইতে যুদ্ধে চলেছি, মেয়েরা এসে গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে—দেশের জন্য সে রকম ভাবে মরার মধ্যে সমারোহ আছে, মাদকতাও আছে। কিন্তু রিভলভার নিয়ে লুকিয়ে একজনকে হত্যা ক'রে পলায়ন করা, তারপরে ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলা—সে কথা যে কল্পনা করতেও ভয় লাগে। অবিশ্যি অন্য কেউ সে কর্ম করলে তাকে প্রাণ খুলে তারিফ করতে পারি—কিন্তু নিজের হাতে হত্যা! বাস্ রে!

সত্যি কথা বলতে কি, রাত্রে বার বার ফাঁসির স্বপ্ন দেখে চমকে উঠতে লাগলুম।

পরের দিন ভয়ে ভয়ে সত্যদার বাড়িতে গেলুম। কিন্তু কোথায় কি? কালকের রিভলভার আজ গাঁজার কল্‌কেতে পরিণত হয়েছে। সত্যদার সে কথা মনেও নেই—আমরাও খুঁচিয়ে আর তা মনে করিয়ে দিলুম না।

দিনকতক চেপে থেকে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললুম, সত্যদা, সেই রিভলভারের কি হ'ল?

সত্যদা অমনি বললে, দেখ হে, ব্যাটার আয়ু কিছু বেড়ে গেছে। গুরুদেব রিভলভার চালাতে বারণ করেছেন। ওদের মারবার একটা নতুন কায়দা তিনি বলে দিয়েছেন। শুধু আগ্রায় নয়, সারা

ভারতবর্ষে যেখানে যত ইংরেজ ও সাদাচামড়া আছে তাদের বাবুর্চিদের যোগাড় করতে হবে। ব্যাটাদের খাবারের সঙ্গে বাঘের গোঁফ মিশিয়ে দিলে রক্ত-আমাশা হয়ে ঠিক তিন দিনে সব সাফ হ'য়ে যাবে—শিবের বাবাও রক্ষা করতে পারবে না।

যুদ্ধের এই অভিনব অস্ত্রের কথা শুনে আমরা যে কি পর্যন্ত আশ্বস্ত হলুম তা কি বলব! যাক, রিভলভারের হাত থেকে আপাতত উদ্ধার পাওয়া গেল।

সত্যদা বলতে লাগলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় রাজ্যে খবর পাঠানো হয়েছে—বাঘের গোঁফ যোগাড় হচ্ছে। ওদিকে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায় বড় বড় হোটেলের বাবুর্চিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ চলেছে—দেখ না কি হয়!

রিভলভার না পাওয়ার কারণ শুনে আমরা যে খুবই নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হলুম তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না। সত্যদা বলতেন, তিনি গুরুর আদেশ ছাড়া কোন কাজই করেন না। গুরুদেব থাকেন হিমালয় পাহাড়ের কোন শিখরে, নিভৃত এক গুহার মধ্যে। সে স্থান এতই দুর্গম, মানুষ তো দূরের কথা—এমন কি পিঁপড়ে পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারে না! কিন্তু গুরুর কৃপায় সত্যদার যখনই দরকার হয় তখনই এক নিমিষে সেখানে পৌঁছে যান—অবিশ্যি সূক্ষ্ম শরীরে। গুরু নাকি মাঝে মাঝে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে থাকেন। তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে আর দেরি নেই।

ওখানকার বাঙালীরা ছাড়া ওই দেশবাসী অনেক লোকও সত্যদাকে চিনত এবং অনেক ধনী ব্যক্তি তাকে খাতিরও করত। আমি এ পর্যন্ত অনেক বাঙালীকে ভাল উর্দু বলতে শুনেছি, কিন্তু সত্যদা যখন ওই দেশীয় লোকদের সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে কথা বলতেন তখন বুঝতে পারা যেত না যে, উর্দু তাঁর মাতৃভাষা নয়।

ওই-দেশীয় লোকদের নানা আড্ডায় সত্যদা আমাদের নিয়ে গিয়ে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতেন। কোথাও বলতেন—সরকারী কলেজের

ইংরেজ অধ্যাপক ঠেঙিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি, কোথাও বা বলতেন—লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর ফুলারকে সেলাম করি নি বলে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোট কথা আমরা যে কেওকেটা লোক নই সে কথা অনেকেই জেনে গেল। সত্যভাষণ সম্বন্ধে সত্যদার মনোভাব যাই হোক না কেন, এমনিতে তার ব্যবহার ছিল খুবই মিষ্টি ও অমায়িক। তা ছাড়া আমাদের সে বড় ভালবাসত—কাজেই কয়েক দিনের মধ্যেই আমরাও তার খুবই অনুগত হ'য়ে পড়লুম।

আমাদের মতনই ওই-দেশীয় দুটি যুবক ছিল সত্যদার মহাভক্ত। তারা দুজনেই ছিল কলেজের ছাত্র। একজনের নাম বিরিজনাথ আর একজনের নাম ছোতিলাল। এরা যেদিন আসত সেদিন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে সত্যদার বৈঠকখানাতেই আসর জমাতুম।

সে সময়ে বাংলা দেশের বাইরে বাঙালীদের খুবই খাতির ছিল। বিশেষ ক'রে 'স্বদেশী'র কোন কিছুতে যুক্ত ব্যক্তিকে লোকে খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখত। সত্যদার কাছে আমাদের ওই রকম পরিচয় পেয়েই হোক কিংবা বয়সের ধর্মেই হোক প্রথম দিনেই বিরিজনাথ ও ছোতিলালের সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব জমে গেল। আলাপের দু-তিন দিন পরেই একদিন বিরিজনাথ আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বাঙালীরা তো বোম্বা (বোমা) তৈরি করতে খুবই ওস্তাদ—বলি কিছু জানা-টানা আছে ?

সুকান্ত বললে, জানা নেই, তবে তোমার দরকার থাকে তো ফরমুলা আনিয়ে দিতে পারি।

তারপরে শোনা গেল বিরিজনাথ বোমা তৈরী করতে একজন ওস্তাদ। শোনা গেল বিরিজনাথরা ছোটখাট জমিদার। শহরে বোমা তৈরী ক'রে দেশে নিয়ে গিয়ে তার পরীক্ষা করে। তার তৈরী বোমায় একটা ছোট খোলার ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। বিরিজনাথ কথায় কথায় বলত, মার্ দুজা শালেকো এক বোম্বা ইত্যাদি।

ব্যাপার দেখে তো আমরা মনে মনে পরমাদ গুণতে লাগলুম।

আগ্রা শহরে কেল্লা ও তাজমহলের মাঝামাঝি জায়গায় একটা চমৎকার বাগান আছে—বাগানটি সে সময় তৈরী হচ্ছিল। বাগানটির নাম ছিল ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্‌। ভারতবর্ষের অনেক শহরেই তখন ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌স্‌ ছিল। এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু সে সময় আগ্রার ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্‌সে চমৎকার একটি ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি ছিল। প্রতিমূর্তির চারিদিকে ফোয়ারা, তারই মাঝখানে জলের মধ্যে মূর্তিটি খাড়া করা ছিল। একদিন বিরিজনাথ কোথা থেকে হন্তদন্ত হ'য়ে এসে বললে, আজ রাত্রে বোঙা মেরে ভিক্টোরিয়ার ওই মূর্তিটি সে উড়িয়ে দেবে। সে কোথা থেকে বোমা তৈরী করবার একটা নতুন ফরমুলা পেয়ে বোমা তৈরী করেছে, আজ রাত্রে তার পরীক্ষা হবে।

সর্বনাশ! বিরিজনাথের সঙ্কল্প শুনে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছে উঠল। সত্যদা আধ মিনিট-টাক্ চোখ বুজে থেকে বললে, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি হাঁ কিংবা না কিছুই বলতে পারি না।

হোত্তিলাল কিন্তু মহা আপত্তি করতে লাগল। সে বললে, মিছিমিছি এ সব জিনিস নষ্ট ক'রে কি হবে! কারণ একদিন না একদিন এখানকার সব ছেড়ে-ছুড়ে ব্যাটাদের লম্বা দিতেই হবে—তখন এ সব তো আমাদেরই হবে।

বিরিজনাথ প্রায়ই বলত, আজ হাসপাতাল উড়িয়ে দেব, কাল স্টেশন উড়িয়ে দেব, ইত্যাদি। যমুনার ওপরে দোতলা পোলটার ওপরে তার আক্রোশ ছিল সব থেকে বেশি। কিন্তু হোত্তিলাল তাকে বাধা দিয়ে বলত, আরে ইয়ার, যানে দো—

আজ মনে হচ্ছে, হোত্তিলালের দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। কারণ সাজা হুঁকো হাতে পেয়েও কর্তারা যা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েছেন তাতে মনে হয়, ঢেলে সাজতে হ'লে না জানি এঁরা কি কেলেঙ্কারিই না করতেন! কিন্তু দূরদৃষ্টি প্রখর থাকলেও বন্ধু হোত্তিলালের নিকটদৃষ্টি কম ছিল, কারণ কয়েক বছর পরেই বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে কোথায় বোমা মেরে

সে ধরা পড়ে, এবং ফলে তার দ্বীপান্তর না ফাঁসি হয়েছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না।

সত্যদার কল্যাণে আমাদের মান ইজ্জৎ ও যশের মাত্রা যেমন বাড়তে লাগল, সেই অনুপাতে তবিলের সিকি দুয়ানির সংখ্যা কমতে লাগল। বিস্কুটের টিন খালি হয় হয়—এমন অবস্থায় সত্যদাকে একদিন বলে ফেললুম, এবার অর্থ উপায়ের একটা সুরাহা না করলে তো চলে না দাদা।

আমাদের কথা শুনে সত্যদা বললেন, এর আর কি! তোমরা কিছু ভেবো না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সত্যদা পরামর্শ দিলেন, আগে তোমরা বাড়িটা ছেড়ে দাও। আমি একটা ডেরা তোমাদের ঠিক ক'রে দিচ্ছি, আপাতত সেখানে গিয়ে ওঠ। মাস পোয়ালেই বাড়ি ভাড়ার ভাবনাটা তো আর ভাবতে হবে না। তার পরে ধীরে সুস্থে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা লাগিয়ে দিচ্ছি।

পরদিন সত্যদা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুটি ওই-দেশীয় লোক, একজন ধনী ব্যবসাদার। সত্যদা প্রথমে ভদ্রলোকের কাছে আমাদের খুব তারিফ ক'রে শেষকালে বললেন, এরা এখন কিছুকাল এ দেশে থাকবে। তোমার বাড়ির পেছন দিকে—সেই অমুক ব্যক্তি যেখানটায় থাকত—সেটা খালি আছে?

ভদ্রলোক বললেন, খালি নেই, কিন্তু তাতে কি! তোমার বন্ধুরা থাকবেন এ তো আমার ভাগ্যের কথা। আমি এখুনি খালি করিয়ে দিচ্ছি।

দিন দুই পরে আমরা ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নতুন ডেরায় উঠে এলুম। একটা বড় ঘর। রাস্তার দিকে অর্থাৎ ঘরের সামনেই খানিকটা বারান্দা আছে। বাড়ির ভেতর থেকে এ ঘরে আসবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। একতলায় খানিকটা উঠোন ও একটা ছোট মতন ঘর, সেটাতে আমরা রান্নাঘর করলুম। বাড়িতে

ঢোকবার দরজা, সিঁড়ি সবই আলাদা। আসল বাড়ির খানিকটা অংশ হ'লেও ব্যবস্থা সবই আলাদা।

আমাদের অর্থ ফুরিয়ে আসছে দেখে আমরা শুধু ঘি দিয়ে ভাত আর আলু-ভাতে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কথায় বলে—বড়লোকের এবং সেই বড়লোক যদি ভদ্রলোক হয় তবে তার আওতায় থাকলে মানুষের অনেক কষ্টের লাঘব হয়। আমরা আসবার পর প্রায়ই আমাদের জন্ম কখনো মিঠাই, কখনো নানা রকমের আচার, কখনো পুরি প্রভৃতি আসতে লাগল। সত্যদার কল্পিত আমাদের অশেষ গুণের কথা সে বাড়ির অন্তঃপুর অবধি পৌঁচেছিল এবং সেখান থেকে করুণার নির্ঝর খাদ্যে রূপান্তরিত হ'য়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে লাগল। মাঝে মাঝে আমরা মালিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতুম। তিনি আমাদের খুব খাতির করতেন ও কলকাতার স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাবলী শুনতে চাইতেন। মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁকে 'বন্দে মাতরম্' গান আবৃত্তি ক'রে শোনাতুম। ভদ্রলোক বড় বড় দুটি চোখ বার ক'রে সেই ধ্বনি শুনতেন আর বলতেন—সাবাস্!

আমরা যে ঘরে বাস করতুম ঠিক তার পাশের ঘরখানিতে দুপুরবেলা বাড়িওয়ালা শেঠদের বাড়ির মেয়েদের মজলিস বসত। পাঁচ-সাতটি মেয়ে দুপুরবেলা কলরোল ক'রে আমাদের দিবা নিদ্রাটি মাটি করত। আমরা তাদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারতুম, কিছু বুঝতুম না। তাদের দেখতে পেতুম না, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর ধরে আন্দাজ করতুম কে কি রকম দেখতে—কার কত বয়স হয়েছে! এই অদৃষ্ট কুলবালাদের নামকরণও করেছিলুম একটা একটা ক'রে। কেউ থনথনে, কেউ ঝড়ঝড়ে, কেউ বাজখাঁই, কারুর নাম বা মিহিগলা। মধ্যে মধ্যে বাড়িওয়ালাদের বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেড়াতে যেত—আমাদের চোখে পড়লে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতুম, কোন্‌টি কে? সে ঘরে মাঝে মাঝে মেয়েরা দশ-পঁচিশ খেলতে বসত। মনে পড়ে সেই সব দিনে গোলমালের

আর মাত্রা থাকত না। এই সময় কখনো কখনো খন্‌খনের সঙ্গে বাজখাঁইয়ের বেত ঝগড়া লেগে আর মিষ্টিগলা তাদের মাঝে পড়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করত—সুরে আর বেসুরে মিলে বিচিত্র ধ্বনির তরঙ্গ উঠত সেদিন। কোন কোন দিন ঘরখানা নিঃশব্দে পড়ে হা-হা করতে থাকত—সেদিন মনে হ'ত, আজ দুপুরটা বৃথাই কাটল।

একদিন অনেক রাত্রে জনার্দন আমাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, কিছু শুনতে পাচ্ছ?

কিছুক্ষণ কান খাড়া ক'রে থেকে কিছুই শুনতে না পেয়ে বললুম, কই, কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না—বাতিটা জ্বালাও না।

জনার্দন বললে, না, বাতি জ্বালিও না। কান পেতে থাক, এখুনি শুনতে পাবে।

কি আর করি! অন্ধকারে সজাগ হ'য়ে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ বাদেই জনার্দন আমার গা টিপে বললে, ওই শোন!

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এতক্ষণ মনে করছিলুম হয়তো কোনো চোরের পদধ্বনি কিংবা সিঁদ-কাটা বা বাক্স-ভাঙার আওয়াজ পাব। কিন্তু সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে অতি ক্ষীণ নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি এল আমার শ্রবণে। অতি মৃদু,—কখনো শোনা যায় কখনো শোনা যায় না এমন সুরে কোন নারী তার বুকের ব্যথা উজাড় ক'রে দিচ্ছে। একটু পরেই বুঝতে পারলুম যে, কান্নার শব্দটা আসছে আমাদেরই পাশের ঘর থেকে—দিনের বেলায় কলহাস্যে যে ঘর মুখরিত হ'য়ে ওঠে। ব'সে ব'সে কিছুক্ষণ কান্না শুনে শুয়ে পড়া গেল। তখনো কান্না থামে নি, এক-একবার সে শব্দ বেড়ে উঠে করুণ ঘুমপাড়ানি ছড়ার মতন মনে হতে লাগল—সেই একঘেয়ে করুণ সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

তার পরের রাত্রে সজাগ হ'য়ে রইলুম, কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেলুম না।

আগ্রায় রাত্রে শীতের ঠেলায় প্রায়ই আমার ভাল ক'রে ঘুম

হ'ত না। ভাল বিছানা তো দূরের কথা, বিছানা বলতে আমাদের কিছুই ছিল না বললেই হয়। যদিও সে সময় আগ্রায় অতি সামান্ত খরচেই লেপ তোষক তৈরী করা যেত, কিন্তু আমরা তা করি নি। কারণ আমাদের কখন কোথায় যেতে হয়, কোথায় আশ্রয় পাই বা না পাই, বিছানার মত অত বড় লটবহর বাড়াবার দরকার কি! আমাদের তিন জনের জন্তে তিনটে মাথার বালিশ ও একটা পাতলা লাল কম্বল ছিল। কিন্তু ধরণীর বুকে আগুন আছে বলে ভূতাত্ত্বিকেরা যতই প্রচার করুন না কেন, প্রতি রাত্রে সেই পাথরের মেঝে ফুঁড়ে যে জিনিসটি উঠে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করত তা আগুন নয়, আগুনের উল্টো পিঠ। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্তে আমরা মেঝেতে ধুতি জামা কাগজ ইত্যাদি পেতে বিছানা গরম করবার চেষ্টা করতুম। ভাগ্যে পরেশদা তিন জনকে তিনটে খোসা কিনে দিয়েছিল—তাই চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া যেত। প্রথম রাত্রে বয়সের ধর্মে ঘুমিয়ে পড়তুম বটে, কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে যেত, বিশেষ ক'রে পাশ ফেরবার সময়।

এই রকম এক রাত্রে শীতের চোটে উশ্‌খুশ্‌ করছি, জনার্দন ও সুকান্ত দিব্যি ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে, এমন সময় আবার সেই নারীর কান্নার আওয়াজ কানে এল। বন্ধুদের না তুলে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে কারুকে দেখা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ওদিকে কান্না কখনো থামছে, কখনো বাড়ছে, কখনো বা একেবারে থেমে যাচ্ছে। একবার কানে এল—ও আমার প্রাণের রাজা, ও আমার একমাত্র 'তুই'—আমায় ছেড়ে কোথায় আছিস! একবার কি ভুলেও মনে পড়ে না!

মনে মনে হিসাব ক'রে ঠিক করলুম, এ নারী নিশ্চয় পতিহারা বিধবা। কিন্তু দিন কয়েক চেষ্টা ক'রে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলুম যে, ও-বাড়িতে বিধবা কেউ নেই। এদিকে একদিন দুদিন অন্তর দু-তিন

দিন উপরি উপরি সেই কান্না শুনতে পাই। কোনো দিন খুবই মৃদু, কোনো দিন ওরই মধ্যে একটু জোরে।

তারপরে একদিন শুনলুম—হে পরমাত্মা! সে যে মা ছাড়া আর কারুকেই জানত না—তুমি তাকে দেখো—

এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সন্তান-শোকে আকুলা জননী এই নারী! সন্ধান নিয়ে জানতে পারা গেল, আমার অনুমান ঠিক। বছর দুয়েক আগে শেঠের একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে—অনেক পুজো, হোম, যজ্ঞ ক'রে, অনেক সন্ন্যাসীকে গাঁজা খাইয়ে মাদুলী যোগাড় ক'রে নাকি সেই ছেলে হয়েছিল। দেবতা সন্তান দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল পুত্রশোক দেবার জন্য। ছেলেটি চার বছরের হ'য়ে মারা গিয়েছে।

এই সংবাদ পাওয়ার পর কি জানি কেন সেই অজানা অদেখা নারীর প্রতি সমবেদনায় আমিও ব্যথিত হ'য়ে উঠলুম—সেই রোদনের সুরে আমিও বাঁধা পড়ে গেলুম। নিশীথ রাত্রে সেই নির্দিষ্ট সময়ে তার কান্না শোনা আমার যেন একটা নেশার মতন হ'য়ে দাঁড়াল। যেদিন কান্নার সুর শুনতে পাওয়া যেত না, সেদিন আমার অস্বস্তি বোধ হ'ত। মনে হ'ত, বিশ্বনিয়ন্তার রচিত একখানি করুণ কাব্য শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন ছন্দপাত হ'ল। এক-একদিন এমনও হয়েছে—আমি আগে উঠে সেই বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে বসেছি তার কিছুক্ষণ পরে কান্না আরম্ভ হয়েছে। পুত্রশোকবিধুরা সেই জননীর রোদন-ধ্বনির মধ্যে আমি যেন আমার নিজের জননীর রোদনধ্বনির আভাস পেতুম। আমার মনে হ'ত, আমার মাও নিশীথ রাত্রে তাঁর পলাতক পুত্রের জন্য এমনি ক'রে অশ্রু বিসর্জন করছেন। সে কথা মনে হওয়া মাত্র চোখে জল ঠেলে আসত—সেই অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমিও অশ্রুপাত করতুম। এমনি ক'রে কেউ কারুকে না দেখে, বন্ধ দরজার দুপাশে দুজনে বসে কত রাত্রি আমরা কেঁদে কাটিয়েছি তার হিসাব প্রকৃতির ভাণ্ডারে জমা হ'য়ে আছে।

এই ভাবে আমাদের আগ্রায় দিন কাটতে লাগল। একদিন দুদিন অন্তর আমরা পরেশদার সেই বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে পরেশদার খবর করি। সে ভদ্রলোক বলতে থাকে, পরেশনাথ আমাকে মজিয়ে গিয়েছে। তার জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে এখানে, বাড়িখানা ভাড়া দিতে পাচ্ছি না। জিনিসগুলো নিয়ে কি করব তাও বুঝতে পাচ্ছি না। দিল্লিতে তার কেউ নেই, কার কাছে এখন এ সব জিনিস জিম্মা ক'রে দিই—এ রকম ফ্যাসাদে আজ পর্যন্ত কোন বাড়িওয়ালা পড়ে-নি।

আমরা তাকে কতবার বুঝিয়ে বললাম যে, পরেশদা আর ফিরবে না। সে কথা লোকটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। সে বললে, তা হ'লে পরেশনাথ অন্তত একটা চিঠি লিখেও আমাকে জানিয়ে দিত।

একদিন সত্যদা বললে, ওহে, সুখবর আছে। এখানকার একজন ধনী জমিদার, আমার বন্ধুলোক সে—কয়েক পুরুষ ধরে লগ্নীর কারবার ক'রে অনেক টাকা করেছে। লোকটা কিছুদিন থেকে একটা ব্যবসা করবার তালে ঘুরছে। কাল সন্ধ্যেবেলা সে আমার কাছে এসেছিল। তোমাদের কথা বলতেই সে লাফিয়ে উঠল। বললে—এই রকম লোকই আমি খুঁজছি; এদের যদি পাই তা হ'লে আমি কারবারে নামতে রাজী আছি। আমি বলেছি, তাদের যদি লাভের অংশ দাও তা হ'লে তোমার খাতিরে তাদের ব'লে-ক'য়ে তোমার সঙ্গে ব্যবসায় নামতে রাজী করাতে পারি।

প্রস্তাব শুনে তো আমরা আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলুম। সত্যদা বললেন, কথা হয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা তোমাদের নিয়ে আমি তার কাছে যাব। কথাবার্তাও হবে আর রাত্রের আহারও ওইখানেই হবে।

সেদিন বিদায়ের সময় সত্যদা বিশেষ ক'রে বলে দিলেন, ওহে, কাল একটু তাড়াতাড়ি এস। সে আবার এখান থেকে অনেক দূরে, একা না হ'লে যাওয়া যাবে না।

মোটা মানুষ হ'লেও সত্যদা অসম্ভব হাঁটতে পারতেন—পাঁচ-সাত মাইল যাওয়া ও আসা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না বললেই হয়।

আশায় ও আনন্দে সারারাত্রি ভাল ক'রে ঘুমই হ'ল না আমাদের। পরদিন দুপুরেই সত্যদার ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। তারপরে দুখানা একা ক'রে প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে আমরা এক গ্রামে, সেই জমিদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। জমিদার সাহেব মোটা-সোটা লোক, রাস্তার ওপরেই বড় তক্তাপোশের ওপর বসেছিলেন, দু-চার জন মোসাহেবও তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, দেখলুম। জমিদার সাহেব বললেন, আপনাদেরই অপেক্ষায় বসে আছি। দু-পক্ষ থেকে আদর-আপ্যায়ন হবার পর সকলেই সেই চৌকিতে আসন নিলুম।

প্রথম দর্শনে জমিদার সাহেবকে ক্যাবলা ভোলা লোক মনে হ'লেও তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল, বেশ চতুর লোক। বিশেষ ক'রে অর্থের লেন-দেন ব্যাপারে ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন না ক'রেও বেশ সাবধানী। নিজের প্রাপ্য কড়ির ষোল আনা বুঝে নেবেন বটে তবে অন্যের প্রাপ্য কড়ির এক পয়সাও তঞ্চকতা করবেন না ধরণের। ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন এবং একখানা ইংরেজী দৈনিকও নিয়ে থাকেন। আগ্রা শহরেও কাউকে কলকাতার কোন ইংরেজী দৈনিক নিতে দেখি-নি।

জমিদার সাহেব আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমাদের বয়স তখন সতেরো এবং জমিদার বাবুর বছর পঁয়ত্রিশ হবে। কিন্তু তিনি আমাদের তারিফ করবার জন্যে বলতে লাগলেন, আপনারা আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়—তা ছাড়া আপনাদের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত, ইত্যাদি।

অন্যকে বড় বলা ও মান দেওয়া উর্দু কৃষ্টির একটা লক্ষণ। যেমন—আপকা দৌলতখানা—

যা হোক, সত্যদা আমাদের জন্য জমি তৈরী ক'রেই রেখেছিলেন। আমরা যে দেশ-ভক্তি ও সততার অবতারবিশেষ, সে সম্বন্ধে দেখলুম জমিদার সাহেবের সন্দেহ-মাত্র নেই। যদিও সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি

প্রকাশ করলেন, বাবু সাহেব, টাকা বড় খারাপ জিনিস—টাকার লোভে অতি বড় সাধুকেও আমি পাকা চোরে পরিণত হ'তে দেখেছি।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এ কথাও তিনি প্রকাশ করলেন যে, তাঁর সাত পুরুষ জমিদারিই ক'রে এসেছেন—ব্যবসার মতন হীনবৃত্তি তাঁদের বংশে কখনও কেউ অবলম্বন করেন-নি। অবিশ্যি বিষয় অথবা অলঙ্কারাদি বন্ধক রেখে সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসাও তাঁরা ক'রে থাকেন। টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা তাতে নেই বললেই চলে। কিন্তু আজকাল দুনিয়ার ঢং ফিরেছে। অনেক বড় বড় জমিদার ব্যবসায় নামছেন এবং তাতে দেশের উপকারও হচ্ছে দেখে তিনিও ব্যবসা-রূপ হীনবৃত্তি অবলম্বন করবেন ব'লে স্থির করেছেন। এতে ওষুধ ও পথ্য অর্থাৎ একাধারে অর্থবান হওয়া এবং দেশের কাজ করা এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হবে।—ব'লেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন।

অতি বিনয় সহকারে জমিদার সাহেব আমাদের আবার বললেন, আপনারা গুণী এবং জ্ঞানী, বলুন আমার এই খেয়াল ঠিক আছে কি না।

আমরাও তাঁর তারিফ ক'রে বললুম, আপনার এই খেয়াল খুবই ঠিক আছে। আপনি একজন এত বড় জমিদার হ'য়ে সামান্য ব্যবসাদারি করতে যে রাজী হয়েছেন এতে আপনার মহানুভবতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এখন কি ব্যবসা করবেন সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছেন কি?

ভদ্রলোক একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে সত্যদার দিকে একবার চেয়ে বললেন, নিশ্চয়। সে একটা কিছু না ভেবেই কি আপনাদের এত কষ্ট দিয়েছি! দেখুন; আপনাদের দেশে বয়কট চালু হবার আরম্ভ থেকেই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করছি। অনেক ভেবে স্থির করেছি, আপাতত মোজা ও গেঞ্জির কল আনিয়ে এখানে সেই সব তৈরী করবার ব্যবস্থা করা যাক। এই ব্যবসা চালাবার ভার থাকবে আপনাদের ওপর। আপনারা যদি এই ব্যবসাকে লাভবান ক'রে তুলতে পারেন, তা হ'লে পরে আমরা ব্যবসা আরও বাড়াব ও অন্যান্য ব্যবসার জন্যও টাকা ঢালব—আপনারাও তাতে থাকবেন।

আমরা বললুম, খুবই ভাল কথা। কলকাতায় কয়েক জায়গায় মোজা-গেঞ্জির কল বসেছে দেখেছি, কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু ক'রে উঠতে পারে-নি।

আমাদের কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। বললেন, বাবু সাহেব, সে সবই আমি জানি এবং তারা কেন যে কিছু ক'রে উঠতে পারে-নি তাও জানি। ও-রকম দু-একটা কল কিনে ব্যবসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমি জাপান, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি জায়গায় চিঠি লিখে ক্যাটালগ আনিয়েছি। সেখানকার অনেক কোম্পানির এজেন্ট আছে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে। তারা বলেছে, কল বসিয়ে আমাদের লোককে শিখিয়ে দিয়ে যাবে। এখনও বাজারে অন্য কেউ আসে-নি, আমার বিশ্বাস—এই সময়ে যদি আমরা বাজারে নামতে পারি তো কেল্লা ফতে করতে পারব। আমি ঠিক করেছি, প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা ফেলব। এই টাকায় যন্ত্রপাতি কেনা হবে এবং কিছু টাকা অন্যান্য কাজের জন্যে রেখে দেওয়া হবে। ব্যবসা যদি ভাল চলে, ধরুন মাস ছয় পর থেকে এই দশ হাজার টাকার শতকরা সাড়ে বারো টাকা ক'রে সুদ এবং বছরে আড়াই হাজার টাকা ক'রে আমাকে শোধ দিয়ে দিতে হবে। টাকা ক্রমে ক্রমে শোধ হ'য়ে গেলে তখন লাভের শতকরা পঞ্চাশ টাকা আমার আর পঞ্চাশ টাকা আপনাদের। অবশ্য যতদিন আমার টাকা শোধ না হচ্ছে ততদিন সমস্ত সম্পত্তির মালিক থাকব আমি। অর্থাৎ আপনারা যদি ব্যবসা চালাতে না পারেন তবে আমি আপনাদের সরিয়ে দিয়ে আবার অন্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারি কিংবা যন্ত্রপাতি বিক্রি ক'রে যতখানি সম্ভব আমার টাকা তুলে নিতে পারি। আপনারা এখুনি জবাব দেবেন না—তিন দিন ভেবে দেখুন, তার পরে এই শর্তে যদি রাজী থাকেন তা হ'লে বাবুজীকে অর্থাৎ সত্যদাকে জানিয়ে দেবেন, তা হ'লেই আমি টের পেয়ে যাব।

সেদিন আর কোনও কথা হ'ল না। আমরা সেখান থেকে উঠে

অন্ত একটা বাড়িতে খেতে গেলুম। শুনলুম, এই বাড়িটাই নাকি জমিদার সাহেবের আসল বৈঠকখানা।

কিছুক্ষণ রহস্যালাপের পর আমাদের খেতে দেওয়া হ'ল।

এর আগে সত্যদার কল্যাণে ও-দেশীয় দু-তিনজন ধনীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। বলা বাহুল্য যাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু। লোকের বাড়িতে খেয়ে নিন্দে করতে নেই, তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, সেই আমিষ-বর্জিত খানা খেয়ে আমাদের তৃপ্তি হ'ত না। তার ওপরে তরকারি, আচার ও মিষ্টি নামে পাতে যা পড়েছিল তা আমাদের রসনায় খুব স্বাদু ব'লে মনে হয় নি। এখানেও সেই রকম আহার্যেরই আয়োজন হয়েছে ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু দেখলুম আমাদের এই জমিদার সাহেব হিন্দু হ'লেও আহার সম্বন্ধে খুবই উদার ও শৌখিন। দেখা গেল তিনি আমাদের জন্ম ভূরি-ভোজনের আয়োজন করেছেন। ছাগ-মাংসের বিরিয়ানি ও কবাব, পরোটা ও সুখা মুরগীর মাংস, তা ছাড়া রাবড়ি ইত্যাদি মিষ্টি।

অনেক দিন পরে মাংস পেয়ে তো খুব ঠাসা গেল। খেতে বসে নানারকম গালগল্প হ'তে লাগল। সত্যদা বললেন, বিরিয়ানি জিনিসটি মুসলমানদের আমদানি।

শেঠজী সত্যদার এই কথার ভীষণ প্রতিবাদ ক'রে বললেন, এ জিনিসটি আমাদের শাস্ত্রীয় খাদ্য। আমাদের পুরাতন ধর্মগ্রন্থে এই খাদ্যের উল্লেখ আছে—আপনি খোঁজ ক'রে দেখবেন। হ্যাঁ, তবে 'বিরিয়ানি' শব্দটা হয়তো মুসলমানদের, এ বিষয়ে ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারব না।

জমিদার সাহেবের এই উক্তি আমি ভুলি-নি। কারণ বিরিয়ানির মতন অমন একটা সুখাদ্য ভারতের বাইরের কোন জায়গা থেকে আমদানি হয়েছে এমন কথা সেই 'স্বদেশী' যুগে শুনে আমাদের দেশাত্মবোধে আঘাত লেগেছিল। তাই কোন্ শাস্ত্রে বিরিয়ানির উল্লেখ আছে সারাজীবন তার খোঁজ করেছি, পাই নি। শেষকালে বিরিয়ানি

খাওয়া যখন শরীরে আর সহ্য হয় না, তখন তা আবিষ্কার করেছি। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্তে এখানে তা উল্লেখ করছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এক স্থানে কি রকম আহারের ফলে কি রকম সন্তান হবে উপদেশচ্ছলে তার অবতারণা করেছেন। এইখানে এক জায়গায় তিনি বলছেন—অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং ভাষিত জায়েত সর্বান বেদান অনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াত ইতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম।

অর্থাৎ যদি কেউ ইচ্ছা করেন যে তাঁর পুত্র পণ্ডিত এবং মীটিং-মারায় ওস্তাদ হবে, প্রিয় অথচ মিষ্টভাষী, সর্ববেদে পারদর্শী অর্থাৎ সবজান্তা এবং এর ওপরেও দীর্ঘায়ু হবে—তা হ'লে তিনি মাংসের সঙ্গে চাল ও ঘৃত (ডালদা অথবা ওই-জাতীয় কোন স্নেহপদার্থও চলতে পারে) মিশ্রিত ক'রে পাক ক'রে আহার করুন।

এই খাদ্যটি যে আধুনিক বিরিয়ানির পূর্বপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই ;

যাই হোক সেদিন আহারাদির পর একটু গল্পগুজব ক'রে জমিদার সাহেব আমাদের বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় বলে দিলেন—আমার প্রস্তাব যদি আপনাদের মনোনীত হয় তা হ'লে বাবুজীকে অর্থাৎ সত্যদাকে জানাবেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হবে।

ফেরবার সময় সত্যদা বললেন, আর কি, এবার ভগবানের নাম ক'রে ঝুলে পড়।

আমরা বললুম,—নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে। একেবারে কথা দিয়ে এলেই হ'ত। এমনিতেই তো জিনিসপত্র আনা ইত্যাদিতে দেরি হবেই—তার ওপরে—

আমাদের বাধা দিয়ে সত্যদা বললেন, না হে না, বোঝ না। সব দিক ভাল ক'রে বিবেচনা না করলে শেষকালে পস্তাতে হ'তে পারে। তোমরাও প্রস্তাবটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে দেখ—আমিও ভেবে-চিন্তে দেখি।

আমরা মাঝে মাঝে আমাদের আশ্রয়দাতা বাড়িওয়ালা শেঠের

বৈঠকখানায় গিয়ে বসতুম। আমরা গেলে ভদ্রলোক ভারি খুশি হতেন এবং অনেক রাত্রি অবধি উঠতে দিতেন না—বাড়িতে ফিরে আবার রান্না-বান্নার হাঙ্গামা করতে হবে ব'লে এক রকম জোর ক'রেই উঠে আসতে হ'ত। পরের দিন আমরা বাড়িওয়ালার বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কাল আপনারা অমুক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন শুনলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, তাঁকে চেনেন নাকি?

—খুব চিনি। সে যে আমাদের আত্মীয় হয়। হঠাৎ সে আপনাদের নেমন্তন্ন করলে কোন্ সুবাদে?

বললুম, তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা ব্যবসা করব। সেই সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলুম।

আমাদের কথা শুনে বাড়িওয়ালা দেখলুম দস্তুরমতন উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন। আমাদের সঙ্গে কি রকম শর্তে সে ব্যবসায় নামতে রাজী হয়েছে, কথায় কথায় সে প্রসঙ্গও এসে পড়ল। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, আপনারা এই শর্তে ব্যবসায় নামতে রাজী হয়েছেন?

বললুম, হ্যাঁ, এক রকম রাজী হয়েছি বই কি।

এবার তিনি বেশ গম্ভীর হ'য়ে বললেন, বাবুজী, আমি তোমাদের ভালর জন্যই বলছি, ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা ক'রো না। তোমাদের ভালমানুষ ও অনভিজ্ঞ পেয়ে ও তোমাদের দিয়ে নিজের ব্যবসাটি জমিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এই যে ব্যবসায় ও টাকা দিচ্ছে, তার সুদ নিচ্ছে টাকায় দু আনা ক'রে। ব্যবসা যতই চলুক, আমার বিশ্বাস এত সুদ দিয়ে কোনদিনই তার টাকা শোধ করতে আপনারা পারবেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, আপনারা সুদও দেবেন আসলও শোধ করবেন, কিন্তু এই সময়টিতে আপনাদের খরচ কি ক'রে চলবে সে কথা ভেবে দেখেছেন কি? শেষকালে ব্যবসাটি যখন বেশ চালু হ'য়ে যাবে তখন টাকা শোধ করতে পারছেন না ব'লে দেবে আপনাদের তাড়িয়ে।

"মহাস্থবির"

নবীনা

ভদ্রলোক আবার বললেন, ওঁকে কি তবে কাল একবার নিয়ে আসব ?

আমি বললুম, না, না, তেমন তাড়া তো কিছু নেই, রিপোর্টগুলি আমি দেখলুম তো, সব কিছু একেবারে নর্ম্যাল। কোন গোলমালই হওয়া উচিত নয়। ব'লে হাসলুম। আশা করি, আমার হাসিটা যত চেষ্টিত ছিল ঠিক ততটা অনান্তরিক দেখায় নি। নতুন ডাক্তারের পসার বাড়াতে হ'লে রোগীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করবার উপায় নেই। তাই আবার বললুম, দিন পনেরো পরে একবার দেখা যাবে, এখন কিছু তাড়া নেই। আরও হেসে বললুম, ফজলুল হক কি বলেছিলেন মনে নেই ? বিধি সময় বেঁধে দিয়েছেন। তাড়া ক'রে লাভ নেই। এই রসিকতাগুলি আমার ভাল লাগে না, কিন্তু রোগীরা পছন্দ করে। পরুরুচি বোলূনা—সাফল্যের জন্যে এই মূল্য দিতেই হয়।

আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার নিজের তাড়া ছিল। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। রাত আটটায় তরুণের বিয়ে। তার আগে আমায় মেসে ফিরে পোশাক বদল ক'রে নিতে হবে। তারপর তরুণের বাড়ি, সেখান থেকে বরানুগমনে বালিগঞ্জ যাত্রা। দীর্ঘ পথ। সময় অল্প। আমার সত্যি তাড়া ছিল।

কারও বিয়েতে আমি আজকাল সাধারণত যাই নে। কিন্তু তরুণের কথা আলাদা। সে আমার পুরনো বন্ধু। পুরনো মানে মেডিক্যাল কলেজে আসবারও আগে। প্রথম চেনা সেই স্কটিশে আই. এস-সি. পড়বার সময়। দু বছরের পরিচয়, কিন্তু দুজনের দুজনকে এমন ভাল লাগল যে পরে যখন তরুণ বিজ্ঞানের আঁগুন ছেড়ে আর্টের ধোঁয়ায় আলো খুঁজল, আর আমি ডাক্তারির মত ব্যবহারিক বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করলুম, বন্ধুত্ব তখনও অটুট রইল। আমি মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি মির্জাপুরে একটা মেসে উঠে এলুম, তরুণও তাই করল। যদিও তার কলেজ র'য়ে গেল স্কটিশ চার্চ। আরও পরে তরুণ কমার্স প'ড়ে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হ'ল। আমি তো ডাক্তার। তবু

(নাকি সেই জন্যেই ?) অন্তরঙ্গতা অক্ষুণ্ণ রইল। বস্তুত, তরুণের পরে আর আমার নতুন বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে হয় নি। অতএব, বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক না কেন, তরুণের বিয়েতে না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, না গেলে এমন কি যেতে দেরি হ'লে, আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতুম না। তাই এত তাড়া।

তাড়া মানেই দেরি। তখন ট্রামের সামনে বাস এসে দাঁড়াবে, বাসের সামনে গরুর গাড়ি। ডাক্তারের সামনে পুরনো রোগী। নতুন ডাক্তার। এড়াবার উপায় নেই। কুশল জিজ্ঞাসা করতেই হয়। অন্তের বেলায় যে প্রশ্নের উত্তরেরই প্রয়োজন হয় না, ডাক্তারের বেলায় তার উত্তরের শেষ নেই।

যোগেশবাবু যে ? ভাল তো ?

তা ভালই ছিলুম। কিন্তু কাল হ'ল কি, কি জানেন, এই গলদা চিংড়ির লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে। কিন্তু কাল আমার বড় শ্যালা, ওই যে যিনি লয়েডস ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু, তা ইনচার্জ বললেই হয়, ওপরে এক ছোকরা সাহেব এসেছে সে কিছুই জানে না, আমার শ্যালার কথায় ওঠে বসে, হ্যাঁ, কি বলছিলুম, ওই শ্যালা পাতিপুকুরে গিয়েছিল মাছ ধরতে। হ্যাঁ মশাই, ওই এক বাতিক ওর। তা যা বলছিলুম, সারা দিন ব'সে ব'সে আমার নস্কর মশাই কিছু পান নি। হে-হে। শেষে বিরক্ত হয়ে ফেরবার সময় শ্যালা এক রাশ গলদা চিংড়ি কিনে আনলে। সত্যি এক রাশ। আমার গিন্নী আবার—জানেন তো ?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়, ভান করতে হয় যে শুনতে ভাল লাগছে। সেদিনও তাই হ'ল। এমনি একজন ভূতপূর্ব (অতএব, আশা রাখি, ভবিষ্যৎ) রোগীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনতে হ'ল। ট্রামে উঠতেই সাতটা বেজে গেল।

ট্রামে উঠেও দেখি একেবারে অপর প্রান্তে আমার একজন রোগী

দাঁড়িয়ে। রোগী মানে রোগীর স্বামী। দেখেই চিনতে পারলুম, তবু মুখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে মনে বললুম, আমার রোগীর সংখ্যা অল্প। তাই তো আমার সব রোগীর মুখ ও নাম মনে থাকে। আমি যদি কেদার দাস হতুম, বা বিধান রায়,—যা একদিন হবই—তা হ'লে কি আমার মনে থাকত সব রোগীর কথা, তাদের নাম, ধাম, অসুখ—সব বৃত্তান্ত? অসম্ভব। তখন আমি আমার রোগীদের পথে চিনতে না পারলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না। আজও তাই হোক।

আমি (ডাক্তার হিসাবে) বিধান রায় হব—এই কথাটা মনে হ'লেই ভাল লাগে। কিন্তু তখন আমি আমার রোগীদের চিনব না, তারা সবাই আর আমার কাছে বিভিন্ন এক-একটি ব্যক্তি থাকবে না, অসংখ্য রোগীদের মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে যাবে, জীবন্ত মানুষগুলি সব 'কেস্' হয়ে যাবে—এটা ভাবতে ভাল লাগল না। আমি সফল হতে চাই, কিন্তু হৃদয়হীনতায় সাফল্যের যে মূল্য দিতে হয় তা দিতে বাধে। পরে কি হবে জানি নে, এখন আমি চার বছর প্র্যাক্টিস করছি, কত রোগী দেখেছি বলতে পারব না, কিন্তু দেখা হ'লে আজও সবাইকে চিনতে পারি। শুধু চেনা নয়, কে কেন এসেছিল তার সব কিছু আমার চোখের সামনে নিমেষে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে, গোপালবাবু তাঁর প্রথম পুত্রের জন্মের সময় পুত্রের জননীর চেয়েও বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সুরেনবাবু তাঁর স্ত্রীর ছটো সীজারিয়ান হবার পরেও সাবধান হন নি। গোপালবাবু বা সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই সবটা মনে প'ড়ে যায়—যেন কাল বা পরশু তাঁদের আমি চিকিৎসা করেছিলুম। আমার এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি একাধারে গর্বের বস্তু ও বিড়ম্বনার সূত্র। ট্রামের অন্য দিকে তাই নারায়ণবাবুকে দেখেও (স্ত্রীর নাম নারায়ণী, মমতাজের প্রতিযোগিনী, ত্রয়োদশ কন্যার জন্মের আগে আমার কাছে এসেছিলেন) আমি না-চেনার ভান ক'রে তাঁর দৃষ্টি এড়ালুম।

আমি ভাবছিলুম, তরুণের বাড়ি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে পারব

কি না! আশা ক্ষীণ। ট্রাম চলছিল আস্তে, ঘড়ি জোরে। গতিতে চিন্তা সাধারণত স্থগিত থাকে, গতির নেশাই মনকে অধিকার ক'রে থাকে। কিন্তু চলিষ্ণু যানে আরোহণ ক'রে স্থাণু হয়ে থাকলে অলস চিন্তা প্রশ্রয় পায়। তাই আমি ভাবছিলুম আমার আসন্ন বন্ধু হারানোর কথা। বন্ধুর বিয়ে মানেই তো বন্ধু-বিচ্ছেদ। তরুণ বিবাহিত হবে, আমি 'বিধবা' হব। তরুণ জীবনের সাথী পাবে, আমি আমার একমাত্র সাথী হারাব। ভাল লাগছিল না।

কিন্তু নিজের ক্ষতির কথা চিন্তা না করলে তরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল। ও বিয়ে করবারই মত ছেলে। ও আরও অনেক আগে বিয়ে করলেও অবাক হবার কারণ ছিল না। ও মাঝে-মাঝে ছোটগল্প লেখে। ওর জীবনের কল্পনাও ওই ছোটগল্পেরই মত। বিস্তার নেই, অনাবশ্যক বিশ্লেষণ নেই, চরিত্রবাহুল্য নেই, সংসারের সামগ্রিকতা নিয়ে মিথ্যা মাথাব্যথা নেই—ছোট, সংক্ষিপ্ত, জমাট, জটিল, সুডৌল, সুগঠিত একটি কাহিনী। একটি, ছুটি, বড় জোর তিনটি চরিত্র। নাটকের প্রথম অঙ্কের ভণিতা নেই, তৃতীয় অঙ্কের সংঘাত নেই: শুধু মাঝের ঘটনার মনোরম বিবরণ।

তরুণের স্বপ্ন ছিল জীবনকেও তার ছোটগল্পের মত নিখুঁত ও সংক্ষিপ্ত করা। তার অ্যাকাউণ্টেন্সির ব্যালান্স শীটের মত ডেবিট আর ক্রেডিটে মিলিয়ে দেওয়া সর্বশেষ পাইটি পর্যন্ত। সেই হিসাবে সুন্দরী স্ত্রী না থাকলে জমার ঘরে অর্ধেক শূন্য থাকত। তরুণ বেহিসেবী নয়, সে অ্যাকাউণ্টেণ্ট। সে যে এত শীঘ্র বিয়ে করবে তা আর বিচিত্র কি?

আমি আমার নিজেরই কাছে আমার দুঃখ গোপন ক'রে নিজেকে বললুম, তরুণ সুখী হোক, ব্যাচিলরত্বের উজান-ভাঁটার নদীতে নৌকাবিহার এবার শেষ হ'ল, সে তীর খুঁজে পেয়েছে, এবার সে নীড় বাঁধুক। আমার শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ওদের উপর বর্ষিত হোক অজস্র ধারায়। আমি দূর থেকে ওদের দাম্পত্যসুখ

অবলোকন ক'রে ধন্য হব। ঈর্ষা করব না, অভিশাপ দেব না; আর সুখের কথাই যদি বল, তরুণের চেয়ে কে বেশি তা অর্জন করেছে? আমার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও, তরুণের বিবাহপূর্ব জীবন শুধু তার বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠ প্রস্তুতিই ছিল। বিবাহিত সুখে তার সত্যি অধিকার ছিল।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হ'ল। আমার মেসে গিয়ে বরযাত্রীর যোগ্য বস্ত্র পরিধান ক'রে কোনক্রমে কোঁচা সামলাতে সামলাতে যখন তরুণের বাড়ি পৌঁছলুম, তখন সবাই চ'লে গেছে বিবাহবাসরে। বাড়ির সামনে একটাও হাঁসওয়ালা গাড়ি না দেখে তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না। আমি ভাবলুম, ভালই হ'ল। সারাটা পথ এক-শহর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রেও এবার একা একা বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া যাবে। বিয়েটা (এক স্বামী-স্ত্রীর কাছে ছাড়া) এমন কি একটা অসাধারণ ঘটনা যে আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে তা প্রচার না করলে হবে না?

বিয়ে-বাড়িতে গিয়েও আমি প্রায় সকলের শেষে পৌঁছলুম। তরুণকে তখন বিয়ের আসরে নেওয়া হয়ে গেছে। কর্ণবিদারী কোলাহলের মধ্যে ইতস্তত অতিথিবৃন্দ আহারে ব্যস্ত, যেমন হয়ে থাকে প্রত্যেক বাঙালীর বিয়েতে। কোনক্রমে খাওয়া সেরে ট্রাম ধরা, বিয়েটা যেন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আমি পৌঁছতেই তাই কন্যাকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন এসে বললেন, পাতা পড়েছে, এখনি ব'সে গেলেই ভাল। আমি এসব উপরোধ উপেক্ষা-ক'রে বিয়ের জায়গায়, অর্থাৎ ছাতের উপরে, যেতে চেষ্টা করলুম। আমি খেতে আসি নি, আমি আমার একমাত্র বন্ধুর বিয়েতে এসেছি।

কিন্তু বরের এক মাইলের মধ্যে আমার মত কারও যাবার উপায় ছিল না। চতুর্দিকে মহিলাপরিবেষ্টিত হয়ে বেচারী তরুণ যথাসাধ্য আশানুরূপ পরিহাসে ব্যস্ত ছিল। সত্য বলতে কি, তরুণ পারে এগুলি; আমি পারি নে। মেয়েদের-ভাল-লাগে এই রকমের রসিকতা ওর সহজেই

আসে। আমার আসে না। রোগী নয়, আত্মীয়া নয়, এই রকম কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করি। বলবার মত কোন কথা খুঁজে পাই না, কলারের তলায় শুধু ঘামতে থাকি। তার উপর যদি একের বদলে এক ঝাঁক মেয়ে হয় তা হ'লে তো কথাই নেই। আমাকে বরং এক দল ম্যান-ঈটার দিয়ে ঘিরে রাখ, কম গাল দেব।

আমি তাই ছাতের স্বল্পালোকিত একটা কোণে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেখান থেকে আমি সব কিছু দেখতে পাব কিন্তু আমাকে কেউ দেখবে না। এইটেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। জীবনে কখনও ক্রিকেট খেলি নি, কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে। জীবনেও আমার স্থান মাঠে নয়, গ্যালারিতে। মঞ্চে নয়, গ্রীন্নার স্টলে।

কিন্তু নাটক ও খেলায় বিরাম আছে। তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্ব'লে ওঠে, অন্যান্য দর্শকের অলস চক্ষু শিকার-সন্ধানে ব্যাধের মত ইতস্তত চতুর্দিকে বিচরণ করতে থাকে। আমিও সেই দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। একজন অতিব্যস্ত ভদ্রলোক দ্রুতপদে এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। সর্বাঙ্গে স্বেদ ও হলুদের অবস্থিতি থেকে বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে তিনি কন্যাপক্ষের কর্তাব্যক্তি। অতিথিদের, বিশেষ ক'রে বরযাত্রীদের, পরিপূর্ণ তুষ্টিবিধানই তাঁর একমাত্র চিন্তা। আমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন, আসুন, আসুন, আর সবাই ব'সে গেছে, এর পরে ট্রাম—

ভদ্রলোক কাছে এসে আর কথাটা যেন শেষ করতে পারলেন না। আমিও ভদ্রলোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলুম। বিরতির পরে তিনি বললেন, ও, আপনি? তা—তা—এখনও আপনার খাওয়া হয় নি বুঝি? তা—আসুন না আমার সঙ্গে, আর সবাইয়ের খাওয়া যে হয়ে গেছে প্রায়। আসুন।

স্পষ্টতই ভদ্রলোক আমাকে চিনেছেন। আমারও মনে হ'ল, এ কে

কোথাও দেখেছি। কিন্তু অন্তত এই একবার আমার স্মৃতিশক্তির গর্ব খর্ব হ'ল। কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, ভদ্রলোক কে, বা কোথায় তাঁকে দেখেছি, বা কবে আর কেন। তবু বিস্মৃতি গোপন ক'রে চেনবার ভান ক'রে বললুম, আমি এখন খাব না। যদি কিছু মনে না করেন, তরুণের সঙ্গে একবারটি দেখা ক'রে পরে নীচে যাব।

অনিশ্চিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে কি আর এখন পাবেন? বেশ, পরেই না হয় খাবেন। আমাদের কিন্তু সব আয়োজন তৈরী। সময় হ'লেই সোজা দোতালার ঘরে চ'লে আসবেন।

ভদ্রলোক বিদায় নিলে আমি মনে মনে আমার রোগীর নাম-তালিকায় তাঁর সন্ধান করলুম। বার বার মনে হ'ল যে, তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলুম না কেন— সন্তান হয় না ব'লে, না, কি সন্তান আসন্ন ব'লে?

আমি ওঁর কথা ভাবতে ভাবতে ছাতের অপর প্রান্তে আবার আমার বন্ধু তরুণকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, বছর না ঘুরতেই সে-ও হয়তো আমার কাছে আসবে খবর দিতে—আর কতদিন বাকি, কোন ভয়ের কারণ আছে কি না, ইত্যাদি। কিন্তু অত দূরের কথা চিন্তা করবার সুযোগ ছিল না। আমার চোখের সামনে হিন্দু বিয়ের আগেকার নানা অনুষ্ঠান চলছিল মহাসমারোহে। একসঙ্গে অন্তত কুড়ি জন মহিলা কুড়ি রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ওগুলি থামলে চলছিল সমবেত উলুধ্বনি। এই প্রথাগুলি নিশ্চয়ই এক সময়ে সুন্দর ছিল, এখনও অনেকে এর মধ্যে হিন্দুধর্মের অজেয় ঐতিহ্য ও মাধুর্য আবিষ্কার ক'রে অভিভূত হন; কিন্তু আমি ডাক্তার মানুষ। অত কবিত্ব আমার আসে না। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও গ্রাম্য ব'লে মনে হয়। আমি— কিন্তু থাক্ আমার কথা। আমি তো আর বর নই। তরুণ তার বিবাহানুষ্ঠানের সব কিছু প্রাণ ভ'রে উপভোগ করছিল, সেইটেই বড় কথা।

ক্রমে বিয়ের লগ্ন এল। রাত তখন অনেক। বেশির ভাগ

অতিথিই আহারান্তে বিদায় নিয়েছেন। বিবাহবাসরে বড় জোর জন কুড়ি লোক। আমি সকলের অগোচরে পিছনের একটা জায়গায় ব'সে যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছিলুম। অশুদ্ধ, অশ্রাব্য, অবোধ্য সংস্কৃতে পুরোহিত যা খুশি মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তরুণও (যে কিনা সংস্কৃত জানে) সেগুলি ঠোঁট নেড়ে পুনরুচ্চারণ করছিল। পরে শুভদৃষ্টির সময় এল। তরুণের মুখে আশা না আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছিল বলতে পারব না। আমি তরুণকে দেখেছি, তরুণের স্ত্রীকে দেখতে আমিও তরুণের চাইতে কম কৌতূহলী ছিলুম না।

দুজনে এসে দুটো চিত্রিত পিঁড়ির উপর দাঁড়াল। যে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলছিলেন, তিনিই দুজনের উপর একটা চাদর না কি বিছিয়ে দিলেন। তরুণের দিকে আমি এতক্ষণ তাকাই নি, কিন্তু চাদরের অন্তরালে সে অদৃশ্য হতেই আমি কনের কথা ভুলে গিয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার যখন তরুণকে দেখা গেল তখন তার আনন আনন্দে উদ্ভাসিত। যেন তার সব কিছু প্রার্থনার উত্তর নিমেষে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন এক মুহূর্তের মধ্যে তার এতদিনের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। আশাপূরণ নয়, ওটা সামান্য ব্যাপার। তখন তরুণের মুখ দেখে মনে হ'ল, হঠাৎ তার জীবন যেন পূর্ণতা লাভ করল। আর কিছু চাইবার নেই। এবার এক দুই হ'ল। এর পর থেকে এদের দুজনের মিলিত জীবনে দুজনের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হবে শুধু একটি সাধনায়। দুই তখন এক হবে। দুজনের মিলিত আত্মা প্রদীপশিখার মত প্রজ্বলিত হয়ে ওদের মিলিত নীড়টিকে মন্দির ক'রে তুলবে। ধ্যানমগ্ন সাধকের পরিপূর্ণ আনন্দের আভাস সত্যি তখন প্রতিফলিত হয়েছিল তরুণের মুখে। সে মুহূর্তে আমি সত্যিই প্রায় কাথলিকদের মত বিশ্বাস করতে পারতুম যে মানুষের বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয়, যে কোন অদৃশ্য দেবতা এসে একটি পুরুষকে মিলিয়ে দিয়ে যান একটি মেয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হ'লেও, বিবাহিত জীবনটা কাটাতে হয়

এই পৃথিবীর কারাগারে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে আমার বন্ধু বোধ হয় বিয়ের কাছ থেকে বড় বেশি প্রত্যাশা করেছে। শেষে নিরাশ হবে না তো? বিয়ের পরে তো দেবপুরোহিতগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন বর দেবার জন্যে অবশিষ্ট রইবেন শুধু তরুণের স্ত্রী নবীনা দেবী। তিনি কি ভাবছিলেন সেই মুহূর্তে?

পঞ্চপ্রদীপ না কি যেন একটা আলো নিয়ে একটি মহিলা বধূর মুখের চার দিকে ঘোরাচ্ছিলেন। আবার চতুর্দিকে উলুধ্বনি উঠল। এত কোলাহলে আর এত বেশি আলোয় আমি আমার বন্ধুপত্নী নবীনা দেবীকে আর ভাল ক'রে দেখতে পেলুম না। তা ছাড়া আমি বেশ অনেকটা দূরেও দাঁড়িয়ে ছিলুম। তবু বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, নবীনা সুন্দরী। শুধু রূপ নয়; দৃষ্টি ও শ্রুতির শত বাধা সত্ত্বেও বুঝতে পারলুম যে, নবীনার মুখে শুধু বুদ্ধির দীপ্তি ছিল না, সারা মুখে ও দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ নির্মল লাবণ্যের আবেশ ছিল যা বোধ হয় এই বাংলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এবারে যেন বুঝতে পারলুম তরুণের মুখের অভিব্যক্তির পূর্ণ মর্মার্থ। বস্তুত, আমিও মনে মনে তরুণের যোগ্যা স্ত্রীর যে রূপটি কল্পনা করেছিলুম, নবীনা ঠিক তাই, ঠিক তাই।

কিন্তু বিবাহ-বাসর এমন নির্বিঘ্ন রূপোপভোগের প্রশস্ত স্থান নয়। তাই সেই ভদ্রলোক আবার এসে উপস্থিত হলেন, যিনি কিছুতেই আমাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। বললেন, তরুণবাবুও আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আজ কি তাঁর দেখা হবে? দেখছেন তো কি ভীড় ওখানে ওঁকে ঘিরে! তার চেয়ে চলুন খেয়ে নেবেন, ইতিমধ্যে বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবে। পরে বরং ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন। ভদ্রলোক আমি আর দূরের বরবধূর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই কিছুই আর দেখবার উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আবার বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

এখনও কিছুতেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম না। কিন্তু তিনি

এমন বার বার খেতে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, কি ক'রে এড়াব তাও ভেবে পেলুম না। যেতেই হ'ল তাঁর সঙ্গে। খেতেই হ'ল অন্যান্য জন কুড়ি অতিথির সঙ্গে। ভদ্রলোক নিজে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহকারীদের পরিবেশন তত্ত্বাবধান করছিলেন। অপর ভোক্তাদের এ কথা মনে হয়েছে কিনা জানি নে, আমার নিজের একটু অস্বস্তি লাগছিল যে আমার দিকে যেন বড় বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল।

বিয়ে-বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, উপরের ছাদ থেকে অনবরত কেউ না কেউ কোন না কোন অজুহাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছিলেন। আমারও বার বার সেদিকে না তাকিয়ে উপায় ছিল না। হিন্দু বিবাহের নানা জটিল উপচারের বিশদ বিবরণ আমি জানি নে। অনুষ্ঠানের কোথাও কোন ছেদ প'ড়ে থাকবে। হয়তো বা অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ কোন অংশের জন্যে কন্যাকে বিবাহবাসর থেকে নীচে আনবার দরকার হয়েছিল। আগে কয়েকজন মহিলা, পিছনে আরও কয়েকজন, মাঝখানে বধূ। চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। এবারে আমি অল্পবিস্তর স্বাভাবিক আলোয় আমার বন্ধুপত্নী নবীনাকে দেখতে পেলুম। আতিথ্যপরায়ণ ভদ্রলোককেও এবারে চিনতে পারলুম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে আমি বিয়ে-বাড়ি থেকে বিদায় নিলুম। তরুণের সঙ্গে আর দেখা করলুম না। ভদ্রলোককে ব'লে এলুম তরুণকে বলতে যে, আমি এসেছিলুম, জরুরী একটা কাজের জন্যে ওর সঙ্গে আর দেখা ক'রে যেতে পারলুম না।

* * *

এতক্ষণে আমার স্মৃতিপটে এক বছর আগেকার একটা কাহিনী কুশীলবসমেত ভেসে উঠেছিল।

মনে আছে। স্লিপে লেখা ছিল—সতীশ সেন উইথ সন্ধ্যা সেন।

যথারীতি অভিবাদন ও আসন গ্রহণের পরে আমি বললুম, হ্যাঁ, বলুন।

আমার ঘরে তখনও বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে কি যেন একটা কাজ করছিল। ভদ্রলোক ইঙ্গিতে জানালেন যে, একেবারে একা থাকলে ভাল হয়। এটা অস্বাভাবিক অনুরোধ নয়। আমি বেয়ারাকে যেতে বললুম।

ভদ্রলোক বললেন। বিব্রত, বিপন্ন; কিন্তু নিশ্চিত যে আমি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব না।

আমি সন্ধ্যা সেনের দিকে তখনও একবারও তাকাই নি। মহিলা—মেয়েটি বললেই ঠিক হয়, একটা কালো চশমা প'রে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি বিরক্তি এবং ক্রোধ দমন ক'রে ভদ্রলোককে আস্তে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, ইংরেজীতে, বললুম, আপনি ভুল দোকানে এসেছেন। ব'লেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

সন্ধ্যা সেন এতক্ষণে কথা বললেন, দাদা, তুমি বরং বাইরে গিয়ে ব'সো। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

নিতান্ত সাধারণ এই কথাগুলি। কিন্তু এই কয়েকটা সামান্য কথায় নিমেষের মধ্যে আমার ঘরের কার্বলিক সাবানের গন্ধ যেন অন্য কোন সুরভিতে পরিণত হ'ল। সমস্ত আবহাওয়াটার এমন আকস্মিক আমূল পরিবর্তন হ'ল যে, আমার ডাক্তারী সত্তা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার সামনে আমার রোগী ব'সে নেই, যার হৃদ্‌যন্ত্র আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করব। সন্ধ্যা দেবীর কাঠের চেয়ারটা সিংহাসন ব'লে মনে হ'ল—সেখানে থেকে সম্রাজ্ঞী সবাইকে আদেশ দেবেন আর সবাই তা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে ধন্য হবে। সন্ধ্যার কণ্ঠেই কি যেন একটা একেবারে বিভিন্ন রকমের স্বর ছিল যা অমান্য করা আমার মত লোকের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু শুধু আমার মত লোকের নয়। সন্ধ্যা দেবী যাঁকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনিও বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঘরে রইলুম সন্ধ্যা আর আমি। সন্ধ্যা বললে, বসুন।

আমি বসলুম। সন্ধ্যা তার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলল। আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটা কাগজ পড়বার ভান করলুম।

সন্ধ্যা বললে, কি আপনার আপত্তি?—জিজ্ঞাসা নয়, জেরা।

আমি জানতুম, তর্কে প্রবৃত্ত হ'লে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বললুম, কি কি আপত্তি হতে পারে তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

তা ছাড়া?

নীতিবিরুদ্ধ।

নীতি? কোন্ নীতি?

আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলুম যে, তর্কের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল করছি, নিজের পরাজয় ডেকে আনছি। হয়তো শুধু তর্কে পরাজয় নয়, আরও ভয়ানক কোন পরিণাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে কোন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। বললুম, ক্ষমা করবেন, আমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ আপনি করবেন না।

আপনি শুধু অনুরোধ করতে বারণ ক'রে ক্ষান্ত হন নি, অনুরোধটাকে অন্যায় ব'লেও অভিহিত করেছেন। আমার আপত্তি সেইখানে। তার চেয়ে সরাসরি বলেন না কেন, আপনি ভয় পেয়েছেন, আপনার সাহস নেই একজন অসহায় মেয়েকে তার জীবনের চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সন্ধ্যা সত্যই বলেছে। কিন্তু হই দুর্বল, পুরুষ তো। একজন অপরিচিতা মেয়ের হাতে এমন অপমান আমিও বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করতে পারলুম না। নির্বোধের মত বললুম, বিপদ আপনি আসে নি।

না, তা আসে নি। আপনারই মত কাপুরুষ আর একজনের স্কন্ধে ভর ক'রে এসেছে।

সন্ধ্যা আমার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থিনী, কিন্তু তার বাক্যে কোথাও

এতটুকু আবেদনের সুর ছিল না। বরং তিরস্কারের ঝাঁজ ছিল প্রতিটি কথায়। আমি সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি নই, কিন্তু সন্ধ্যাকে সে কথাটা বলবার সাহস আমার কিছুতেই হ'ল না। আমি শুধু আবার ক্ষীণস্বরে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নতুন ডাক্তার। দরিদ্র থাকব, কিন্তু অসদুপায়ে ধনী হব না, আমার পকেট শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হোক, কিন্তু বিবেক বিক্রয় ক'রে তার স্ফীতি ঘটাবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।

ঠিক এই কথাগুলি সন্ধ্যাকে বলতে পেরেছিলুম কি না মনে নেই, কিন্তু সত্যি যে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে অসহায় ভাবে আমার ভীত আত্মার জন্যে প্রার্থনা করেছিলুম তা আজও মনে আছে। সন্ধ্যা তার পরে উঠে দাঁড়াল; আমি ভাবলুম, ঈশ্বর, তুমি আমাকে মহাপাতক থেকে ত্রাণ করেছ। আমি অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করি নি। মোটা টাকা রোজগার করবার সুযোগ গেল কিন্তু আমার বিবেক অক্ষত রইল। ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু সন্ধ্যা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে তার ব্যাগটা খুলে একটা একটা ক'রে আটটা টাকা গুনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বললে, এটা আপনার ফীর চেয়ে কম নয় আশা করি।

সন্ধ্যার কণ্ঠে আবার এই সামান্য কথাগুলি এমন শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞামিশ্রিত শোনাল যে, আবার নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হ'ল। সন্ধ্যার দাদার উপর রাগ করা সহজ ছিল, সন্ধ্যার উপর রাগ করা অসম্ভব। সে যদি অসহায় ভাবে কাঁদত, জানতুম কি ক'রে তাকে তার পূর্বতন দুষ্কৃতির (বা দুর্বলতার) কথা স্মরণ করিয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। সে যদি চটুলা সুলভা রমণী হ'ত, জানতুম কি ক'রে তাকে অপমান ক'রে বের ক'রে দিতে হয়। কিন্তু আবেদন নিয়ে এসেও যে দাবি করে, যার কথায় কোথাও এতটুকু অনুতাপের কোমলতা নেই—তাকে নিয়ে কি করব? দোষ স্বীকার না ক'রে যে অপরকে দোষী ব'লে অভিযুক্ত করে, তার কি বিধান করব?

শুধু বললুম, থাক্, ফী দিতে হবে না। আমি তো আপনার জন্তে কিছু করতে পারলুম না।

পারলেন না নয়; বলুন, করলেন না।

আবার অভিযোগ। আবার আমার পৌরুষের উপর কশাঘাত। নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে আর একবার সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে দেখেছি; ওই দৃপ্ত চোখ দুটোর দিকে বেশিক্ষণ তাকাবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বুঝেছি যে সন্ধ্যার ব্যক্তিত্বের সামনে আমার সকল প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাই কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। সন্ধ্যা সামান্য বিরতির পরে বললে, অর্থাৎ একটি অজাত অবাঞ্ছিত প্রাণীর বিনাশের দায়িত্ব এড়িয়ে দুটি প্রাণীর হত্যার অপরাধ বরণ ক'রে নিলেন।

আমার কিছু বলবার উপায় ছিল না।

একটু থেমে সন্ধ্যা বললে, সেইজন্যেই আপনাকে দ্বিগুণ ফী দিয়েছি।

এবারে শুধু ব্যক্তি হিসাবে আমাকে অপমান করা নয়, শুধু সমগ্র পুরুষ জাতিকে অপমান নয়, পুরো ডাক্তারী পেশাটার অপমান। তবু আমার জিহ্বায় কি পক্ষাঘাত হয়েছিল বলতে পারব না, প্রতিবাদে কোনও একটি বর্ণ উচ্চারণ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল।

পরবর্তী সমস্ত ঘটনার স্মৃতিই আমার অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে আছে সন্ধ্যাকে বলেছিলুম, আপনার সব কথা শুনব, শুধু তার আগে আপনার দাদাকে বিদায় ক'রে দিতে হবে। গোড়াতে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু পরে রাজী হয়েছিল।

তার পর? স্পষ্ট কিছু মনে নেই। মনে আছে, সন্ধ্যা আমাকে স্টেফান ৎসাইগের 'এমক্' গল্পটা প্রায় পুরো শুনিয়েছিল, ওটাকে সঙ্গেই এনেছিল। মনে আছে, আমি তার পরে সন্ধ্যাকে শুনিয়েছিলুম ফরাসী নাট্যকার ব্রিয়োর 'মাতৃত্ব' নাটকের গল্প। আমার সংকীর্ণ ভারতীয় বিবেক তৎক্ষণে সার্বজনীন উদারতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। আমি তখন শুধু হিপোক্রেটিসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ চিকিৎসক ছিলুম না।

আমি তখন যুক্তিবাদী। পাপপুণ্যের অবাস্তর কুসংস্কার তখন আমার প্রভু ছিল না; আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরুষজাতির ত্রুটিস্খালন; নীতির ভয় ছিল না, আইনের ভয় ছিল না, একমাত্র প্রার্থনা ছিল সন্ধ্যার কোনও কাজে আসা, তার শাপমোচনে সহায়তা করা।

করেছিলুম।

কিন্তু এর আগে যা কিছু লিখেছি তার সবগুলি মিথ্যা কথা। ৎসাইগ বা ব্রিয়ো আমাকে অজুহাত জুগিয়েছেন মাত্র, আমার একমাত্র সত্যকার উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যাকে আমার কাছে ঋণী করা। জটিল কোনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় নি। সামান্য অপসারণের পরে সন্ধ্যা যখন একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আমার বসবার ঘরে ফিরে এল, আমি বললুম, আশা করি এবারে আর আমাকে কাপুরুষ মনে করবেন না।

সন্ধ্যা একটু হাসল। সে হাসির অর্থ যেন এই যে সন্ধ্যার আদেশ অমান্য করবার অক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে আমি আমার কাপুরুষতাই বেশি ক'রে সপ্রমাণ করেছি। কিন্তু তখন আমার এত সব বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। সন্ধ্যা যে হাসছিল সেইটেই আমার সকল পরিশ্রমের পর্যাপ্ত পুরস্কার ছিল। সন্ধ্যা বললে, অনেক—অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমি যাব।

এতক্ষণে আমার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সহাস্য আনন দেখে আমার নিজেরও আনন্দের অন্ত ছিল না। বললুম, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?

সহসা সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, আর তো দেখা হবে না। ব'লেই সন্ধ্যা আবার তার ব্যাগ খুলে কতকগুলি—অনেকগুলি—নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এবারে যেন দাম দেবার পালা। আমি যা করেছি সন্ধ্যার জন্যে, তার মূল্য যেন একশো টাকার নোটের সংখ্যা দিয়ে গোনা যায়! যেন অর্থ ছাড়া সংসারের মূল্য নিরূপণের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। যেন সব ঋণের শোধবোধ হয়ে যায় রাজার

মার্কাওয়ালা কতকগুলি কাগজের হাতবদল হ'লে। সন্ধ্যাকে বললুম সে কথা। বললুম, আমি ভীরু কাপুরুষ হতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এমন জঘন্য ধারণা আপনি ক'রে বসেন নি যে শুধুমাত্র টাকার জন্যেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আমি—

তবে?

আমি তখন ডাক্তারও নই, মানুষও নই। সন্ধ্যার বিনীত দাস মাত্র। বললুম, থাক্। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।

অর্থাৎ অনেক কিছু দিতে হবে। কিন্তু তা তো পারব না, ডাক্তারবাবু। তার বদলে বরং এগুলো রেখে দিন। আমার পাওনাও একজন এই দিয়েই শুধেছিল, আমার দেনাও তাই দিয়ে শুধলুম। আপনার কাছে সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলুম।

আমি তখন কৃতজ্ঞতা চাইছিলুম না। ওই একান্ত লৌকিক অনুভূতিটাতে আমার তখন কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আমি আমার বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করবার বিনিময়ে যে পুরস্কার চাইছিলুম তা দুটো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়ে প্রতিশোধ্য নয়। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে কিছু চাইবার না ছিল সাহস, না উপায়। আমার টেবিলের উপরে এক তাড়া নোট অবহেলিত হয়ে প'ড়ে রইল।

একেবারে চ'লে যাবার আগে সন্ধ্যা বললে, সত্যি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু হ্যাঁ, আমি কে বা কোথায় থাকি তা জানবার দয়া ক'রে কিছুমাত্র চেষ্টা করবেন না। তা হ'লে আমার যতখানি উপকার করেছেন তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি ক্ষতি করবেন। আপনারও লাভ হবে না। বরং—

বরং?

যাক, জানি আপনি ওসব কিছু করবেন না। আপনাকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার।

নিশ্চয়ই আমার সমস্ত সত্তা চেয়েছিল সন্ধ্যার অনুধাবন করতে। জানতে যে, সে কোথায় থাকে, যেন আমাদের সেই ডাক্তারী দেখাই

শেষ দেখা না হয়। কিন্তু, ওই যে বলছিলুম, আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আদেশের অংশমাত্র অমান্য করবার ক্ষমতা আমার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই আমার টেবিলের কাছে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার চ'লে যাবার শব্দ শুনলুম। প্রথমে পাশের ঘরে, তার পরে রাস্তায় গাড়ির রওনা হবার শব্দ। কে জানি না, কোথায় গেল জানি না, আর কখনও দেখা হবে না, অথচ আমাকে দিয়ে সে সেই কাজ করিয়ে নিয়ে গেল, যাতে এতটুকু গোলমাল হ'লে শুধু সন্ধ্যারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হ'ত না, আমার নিজেরও। কেন সন্ধ্যা অপরিচিত আমার উপর এত আস্থা অর্পণ করেছিল? আমি কি ক'রে সমস্ত বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে অপরিচিতা এক রোগিণীর জন্যে এমন সর্বনাশা ঝুঁকি নিয়েছিলুম? কিসের লোভে? কিসের আশায়? কার জন্যে?

দ্বিতীয় উত্তর নেই। সন্ধ্যা, ওরফে, নবীনার জন্যে।

* * * *

বলা বাহুল্য, এর পরে আমার তরুণের সঙ্গে দেখা করবার উপায় ছিল না। বিয়ের রাত্রেও না, তার পরেও না। তরুণকে আমি মিথ্যা বলতে পারতুম না কোন মতেই, এদিকে সত্য বলবারও উপায় ছিল না। এ অবস্থায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বন্ধুরও। এমন কি ভূতপূর্ব বন্ধুরও। আর নবীনাই বা আমাকে দেখলে কি ভাবত?

কিন্তু তরুণই একদিন, বোধ হয় বিয়ের দিন পাঁচেক পরেই আমার চেম্বারে এসে হাজির হ'ল। বিয়ের দিন এবং তার পরের দিনগুলি দেখা করি নি ব'লে অনেক অনুযোগ করল। আমি যথাসম্ভব অনৃতভাষণ এড়িয়ে সত্য গোপন ক'রে যুগপৎ ভদ্রতা ও সততা রক্ষা করলুম। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম, তারপর? লেজ কাটাবার পরে কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এতদিন লেজটাকে কি ক'রে ব'য়ে বেড়িয়েছ? আমি দৃষ্টি এড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করলুম।

তরুণ বললে, তা মনে হচ্ছে। তবে—

তবে? তবে কি তরুণ এখন আমায় এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে বসবে যা ডাক্তার বা বন্ধু হিসাবে আমি উত্তর দিতে পারব না, অথচ উত্তর না দিলেও উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে? আমি একবার ভয়ে ভয়ে তরুণের দিকে তাকিয়ে একটা স্লাইড নিয়ে গভীর মনোযোগ-সহকারে পরীক্ষা করতে লাগলুম। একটু হেসে তরুণ বললে, তবে কি জান—

কি?

আমাদের দেশের মেয়েরা একেবারে বোকা, একেবারে শিশু। কিচ্ছু জানে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তরুণ আমার একেবারে কাছে এসে কানে কানে বললে, ডু য়ু নো, নবীনা ইজ অ্যান অ্যাবসল্যুট কিড্। শী ডাজন'ট নো এ থিং অ্যাবাউট দি ফ্যাক্টস অব লাইফ!

ব'লে তরুণ স্বচ্ছ শব্দে তার কলেজী দিনের তৃপ্ত সরল সলজ্জ হাসি হাসতে থাকল। "রঞ্জন"

বর্ষণ-স্বপ্ন

নবীন প্রেমের মত অন্ধকার ঘন হয়ে এলো।
বাইরে এখন বর্ষা। মনে সব স্বপ্ন এলোমেলো।
কত কবিতার কথা মনে হয় আভাসে এখন,
কত মানুষের কথা মনে মনে ধরালো গুঞ্জন,
বর্ষণে ব্যথিত সন্ধ্যা রিম-ঝিম ঝরালো অঝোরে
ক্লান্ত দিনের শেষে সুর শুনি এ প্রৌঢ় প্রহরে
অনুভব করি ক্রমে চেতনার বলয়ে গভীর
ধীরে ধীরে জন্ম হয় ছায়াচ্ছন্ন একটি নদীর।

নদীটির ছায়াপথে কতকালে কত পুরুষের
বিচিত্র মানস-রেখা। কত শান্ত স্তব্ধ হৃদয়ের
হস্ত অবলেপ তাতে—আজো তাই করালো স্মরণ,
বাইরে এখন রাত্রি। ঘনতর মেদুর বর্ষণ।
আর সব চুপচাপ। কি আশ্চর্য শান্তি নামে মনে
বিদিশার দিন থেকে কাকে যেন চেয়েছি স্বপনে॥

শ্রীপ্রণব মিত্র

আমার সাহিত্য-জীবন

বারো

পাটনার কথা এখানেই প্রায় শেষ। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে আছে। এ পর্যন্ত ওখানেই ছেদ পড়েছে।

পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কথা একটু আছে। সেখানে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসেবে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সে নিয়ে একটা বড় বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কিছু অসৌজন্য-জ্ঞাপক মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু সেই অভিভাষণে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর দূরদৃষ্টিতে যে ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর বিরোধী দলের মধ্য থেকে একজন তরুণ যে উদ্ধত ব্যবহার করেছিলেন বা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা স্মরণ করলে আজও লজ্জায় মাথা হেঁট করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোহিতলাল সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র রাগে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছিল। সেদিন বিক্রম এবং সাহস দেখেছিলাম সজনীকান্তের। সজনীকান্ত মোহিতলালের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং সে সময়ও পাশেই ছিলেন। সজনীকান্ত মুহূর্তে ছেলেটির সম্মুখীন হয়ে কঠিন প্রতিবাদে তাকে আত্মস্থ এবং নিরস্ত করেছিলেন।

মোহিতলালের সেদিনের অভিভাষণে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ। তা নিয়ে আজও দ্বন্দ্ব রয়েছে। আজ আবার সেকালের দুই শিবির ভেঙে তিন শিবির হয়েছে। তাঁর কথা ছিল— বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীর জীবন থাকবে, বাঙালীর বাংলা-ভাষা থাকবে, মানবজীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখ হাসি কান্না থাকবে; পটভূমিতে বিশেষ কাল এবং বিশেষ ভৌগোলিক গণ্ডী থাকবেই হবে। এই রচনা রচনাগুণে রসোত্তীর্ণ হ'লেই হবে সার্থক সাহিত্য; এবং তাই হবে সবকালীন ও বিশ্বজনীন। ইংরেজীতে মনে মনে বাক্য রচনা ক'রে সেই ভাবকে

বিন্যাসে সুমার্জিত বাংলা শব্দ বসিয়ে রচনার পদ্ধতিকে তিনি মারাত্মক ভ্রম এবং অনিষ্টকর মনে করতেন। ভাব ও ভাবনার কথা এ ক্ষেত্রে বলাটাই বাহুল্য হবে। এক বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের বিশেষ প্রভাবে জীবিকানির্বাহের বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণের ফলে মানুষ এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়—এই ধারণাই ধ্যানযোগে পরিপুষ্ট হয়ে পরিণত হয়েছে মানসিকতা গঠনের ধাতুতে। তার মনোজগতের তাই উপাদান। ক্ষেত্রে এবং বাতাবরণের পার্থক্যে ফসলের পার্থক্যের মত ভাবজগতের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। তাই এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের দিকে তাকিয়ে তার সাধনায় সিদ্ধিফলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যখন খুঁজতে যাই, তখন সর্বাগ্রে দুটি আবির্ভাব চোখে পড়ে। একজন কার্ল মার্কস, অপর জন লেনিন। হিটলারও এই সাধনার ফল। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে চোখে পড়বে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সুতরাং ভাবগত পার্থক্য অস্বীকারের উপায় কোথায়?

ভারতবর্ষের রূপ যদি কেউ আকাশ-পথে ঘুরে এসে ছবি আঁকে, তবে তাকে আঁকতে হবে, অসংখ্য দেউল মন্দির আকাশ-পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের কথা, রঘুপতি-যদুপতির উত্তর কোশল মথুরার প্রাসাদ নেই; বিক্রমাদিত্যের স্বর্ণপুরী নেই, কিন্তু মন্দির আছে। অসংখ্য মন্দির। তার আকাশমুখী চূড়ার সূক্ষাগ্র, যেন মনোলোকের ঊর্ধ্বমুখী বাসনার প্রতীক। বিচিত্র গঠন-কৌশলে মনে হয় সে যেন সত্যই আকাশ ছুঁয়েছে।

ইউরোপের বস্তুবাদতত্ত্ব যখন এসে এর উপর সংঘাত হানলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারতথ্য যখন ডিনামাইটের মত তাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে চাইলে, বাইরের বহু উপকরণে তখনই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হ'ল। এবং ইউরোপীয় ভাববাদ ও তার ভাবনা-রস আকণ্ঠ পান ক'রে গঠিত হ'ল নব-ভারতের ভাব ও ভাবনা। যা ছিল বাইরে তাকে তিনি

অন্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাইরের ভারত ভারত-জীবনের অন্তরলোকে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে সেই সনাতন ভারতের পরমোপলব্ধির অপরূপ নবীন প্রকাশ। মনোলোকে মন্দির গড়া হয়েছে, দেবতা সেখানে নবীন প্রকাশে মহিমান্বিত, সেখানে শঙ্খ বাজে, আরতি হয়, প্রদীপ জ্বলে, ফুল আছে, চন্দন আছে, বাইরের ভারতের সব কিছুই আছে সেখানে। ইউরোপীয় শাসনের রক্ষণাবেক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মঠ-মন্দিরের চারিদিকে বস্তুপুঞ্জ পাহাড়ের মত জ'মে উঠল, তার ইয়ার্ডের বৈদ্যুতিক আলোর জ্যোতিতে মন্দিরের আলোক নিষ্প্রভ হ'ল; কিন্তু তাতেও কোন ক্ষতি হ'ল না। ভিতরের আয়োজন বাইরের সংঘাতকে প্রতিহত ক'রে ব্যর্থ ক'রে দিলে। সে আয়োজনের ফল যখন আবার বাইরে রূপ পরিগ্রহ করলে গান্ধীজীর সাধনায়, তখনকার ভারতের রূপের কথা, মহিমার কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? নেই।

তাই আজ এ দেশের ইউরোপীয় ভাববাদীদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রচেষ্টা হয়েছে, এই দুই ভারত-জীবনের প্রতীককে অস্বীকার করবার। ভারতের জীবন-ক্ষেত্রে এই দুই সিদ্ধমূর্তি যতক্ষণ স্থান জুড়ে আছেন, ততক্ষণ ইউরোপের ওই দুই মূর্তিকে এনে অধিষ্ঠিত করা অসম্ভব। গান্ধীজীর নাম এবং তাঁর ছবি বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে সাহস নেই। যদিও একখানি বামপন্থী পত্রিকায় দেখেছি যে, এঁরা ভিতরে রবীন্দ্রনাথকে কদর্য অভিধানে অভিহিত ক'রে থাকেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-মেলায় রবীন্দ্রনাথকে এ-যুগে অচল ব'লে আসার মধ্যেও এরই প্রকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে আজ এ কথা বলতে দ্বিধা করব না যে, হায়, এরা যদি এ দেশের মানুষকে জানত! এ দেশের মানুষেরই অন্তরের অভিব্যক্তি এঁরা দুজনে। কর্মে এবং বাণীতে যা তাঁদের মধ্যে প্রকাশমান হয়েছে, তার উৎসমূল ওই মানুষেরা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সাময়িক ঘটনার উপর প্রকাশিত মত সম্পর্কে মোহিতলাল ভিন্নমত হ'লেও উপরের

মতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল না। গান্ধীজী এবং নেতাজী নিয়ে তিনি বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও সেটা ছিল হিংসা ও অহিংসাবাদ নিয়ে বিরোধ। তিনি ছিলেন শাক্ত।

* * *

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পাটনার কালের মধ্যে চার বছর সময় জুড়ে রয়েছে।

এই চার বছরে কলকাতায় আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে এই সময়ের মধ্যে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছে। 'বঙ্গশ্রী' থেকে সজনীকান্ত জবাব দিয়ে চ'লে এসেছেন। আমি দক্ষিণ কলকাতার সেই পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘর ছেড়ে এসেছি বউবাজারে একটি মেসে। সেখান থেকে হ্যারিসন রোডে একটি বোর্ডিঙে।

বউবাজারের মেসটি ছিল একটি অতি বিচিত্র স্থান। এমন বিচিত্র সংস্থান কদাচিৎ ঘটে জীবনে। বাড়িটি কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে বউবাজার স্ট্রীটের উত্তর ফুটপাথের উপর। সামনেই একটি গির্জে আছে। এবং উত্তর দিকের ফুটপাথে বাড়িটার ঠিক একখানা বাড়ির পরেই আছে ফিরিঙ্গী-কালী। চীনেম্যান, দেশী কৃশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মুসলমান নিয়ে পাড়াটা। শুধু তাই নয়, বড় বড় বাইজীদের বাসা এখানে। যে বাড়িটায় আমাদের মেস ছিল, সেই বাড়িতে এককালে ছিল বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'সারভেণ্ট' পত্রিকার আপিস। একদিন পবিত্র গাঙ্গুলী মেসে এসে সে কথা ব'লে গেলেন। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। নিচের তলায় চামড়ার গুদাম; সামনেটায় ফার্নিচারের দোকান। একটা গলি-পথে ঢুকে পূর্বমুখী দরজায় উপরতলার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটাই বাড়িটাকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। সামনের ভাগ অর্থাৎ দক্ষিণে বউবাজারের রাস্তার দিকটা দোতলা এবং তিনতলায় চারখানা বড় বড় ঘরে পশ্চিমদেশীয়া বাইজীরা থাকে। উত্তরে চারখানা চারখানা

আটখানা ঘরে চারটে মেস। দুখানা ক'রে ঘর এক-একটি মেস। এক এক ঘরে দশ-বারোজন থাকে, যাত্রার দলের আসামীই বলুন আর ধর্মশালার যাত্রীই বলুন—যা বলবেন উপমায় বেমানান বেখাপ্পা হবে না। চট্টগ্রাম কুমিল্লা ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া বর্ধমান বীরভূম লোক সব জায়গারই আছে। আমি যে মেসটায় গিয়ে ছিলাম, সে মেসটা ছিল লাভপুরের নির্মলশিববাবুদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন কর্মী একটি বীমা-প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি হাতফেরে তখন নির্মলশিববাবুর ছোট ছেলে নিত্যনারায়ণের হাতে এসেছে। তাঁরাই তার সর্বেসর্বা। শান্তিনিকেতনের কর্মীরা দূরে পড়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় কর্মীরা সেই শান্তিনিকেতনের কর্তৃত্বের আমলের। চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে এক দিকে কথা হচ্ছে, এক দিকে ঢাকাই কর্মীরা চালাচ্ছেন তাঁদের জেলার কথাবার্তা। ওদিকে চলেছে বাঁকুড়া ও বীরভূঁইয়াদের ঝগড়া। এরই মধ্যে খাস কলকাতার একটি প্রিয়দর্শন তরুণ, সে লাভপুরের থিয়েটারে এবং কলকাতার অ্যামেচারে নারীভূমিকায় অভিনয় করে, সেই সূত্রেই তার এখানে চাকরি, সে মিঠে গলায় গান ধরে—

"আমার জলে নি আলো অন্ধকারে
দাও না, দাও না দেখা কি তাই বারে বারে!'

এরই মধ্যে হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে একখানি কচিমুখ উঁকি মারে—বাবুজী!

ছেলেটিকে শরৎবাবুর 'শ্রীকান্তের' সেই রেঙ্গুন-প্রবাসী চতুর বাঙালী ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করব না, যে নাকি বর্মী মেয়েকে বিয়ে ক'রে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে আসবার সময় কান্নার সুরে তাকে বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ করেছিল—হায় রে, আর তোর কিছু নেই যে নিয়ে যাই। ওঃ, এই যে হাতে একটা চুনীর আংটি রয়েছে, ওটাই দে রে। তবে এটা বলব যে সে হৃদয় নিয়ে কৌতুকবশে হৃদয়হীন খেলা খেলতে গিয়েছিল। আমাদের মেসের পাশেই সিঁড়ি; তার

ও-ধারে দুটি ঘরে থাকত দুটি বাইজী—দুই বোন, লক্ষ্ণৌ কি এলাহাবাদ তাদের দেশ। এটি ছোট বোন। বয়স আঠারো কি উনিশ। সুন্দরী বলব না। তবে প্রিয়দর্শিনী তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের মেসের আটাশ-তিরিশ জন এবং পাশের মেসের জন পঁচিশেক—সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জনের একশো একশো দশটি চক্ষু অহরহই উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরত তার সন্ধানে। মেয়েটি কৌতুকে মধ্যে মধ্যে উঁকি মেরে কটাক্ষ হেনে বক্র হেসে আবার মুখ টেনে নিত। সন্ধ্যায় সাজ-সজ্জা ক'রে বারান্দায় বেড়াবার অছিলায় এক পাক ঘুরে পঞ্চান্নটি যুবকের হৃদয় জর্জরিত ক'রে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসত। তারপর আসত মলমলের পাগড়ী, আদ্দির পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম, হীরের আংটি-পরা শেঠের দল। ও-দিকের ঘরে তবলা বাঁধা হ'ত; চাকর ঘন ঘন উঠত নামত, পান পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করত। খুসবাইয়ের গন্ধ ছুটত। গান শুরু হ'ত—গুয়্ যা গুয়্ যা পিয়া—

ঘুঙুরের ধ্বনি উঠত। এরা এ-ঘরে বিছানায় শুয়ে বুক বাজাত। কেউ তারিফ করত, কেউ করত—হায় হায়! এখানে বলা ভাল যে, পূর্ববঙ্গের ছেলেদের শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল কুমারের দল। রাজসাহীর দুই ভাই থাকত। তাদের একজন ছিল মুগুর-ডাম্বেল-ভাঁজা ছেলে। সে এই সময়েই মুগুর ঘোরাতে শুরু করত।

কলকাতার এই থিয়েটার-করা ছেলেটি মেসে থাকত না। তবে আসত যেত। এদের এই অবস্থা দেখে সে হাসত, কৌতুক করত। একদা এই নিয়ে তপস্যার হয়; এবং সে বাজি রাখে যে, সে যদি এখানে এক মাস থাকে তবে ওই তরুণীটি—যার পায়ে নাকি পঞ্চান্নটি হৃদয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওর ঘুঙুরের প্রতিটি দানার ঘায়ে আহত হচ্ছে, তাকেই সে জয় ক'রে ওঠাতে পারে, বসাতে পারে, হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে—এমন কি ওর যে ঘরে ব'সে গান শুনতে পঞ্চাশ বা একশো টাকা লাগে, সেই ঘরে তাদের বিনা দক্ষিণায় সমাদর ক'রে ডেকে বসিয়ে ওর নাচ-গান শুনিয়ে দিতে পারে।

বাজি হয়েছিল। কি বা কত বাজি তা আমি জানি না। এ সব আমি ওখানে যাবার আগের ঘটনা। আমি যখন গেলাম, তখন ছেলেটি বাজি জিতে ব'সে আছে। এবং বোধ করি বাজি জিতেও নিজের অগোচরে নিজে দেউলে হয়েছে। সাধারণ কথায়—মরেছে।

ওদিকে মেয়েটির দিদি প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার এ মোহের কাজল মুছতে। ছেলেটির প্রাণপণ চেষ্টা বন্ধন কাটতে। কিন্তু তা কি হয়? সেও কাঁদে, ওদিকে মেয়েটিও কাঁদে। কেঁদেই সে ক্ষান্ত থাকে না, গানের সাড়া পেলেই বংশীরব-মুগ্ধা কুরঙ্গিণীর মত দীর্ঘবেণী দুলিয়ে এসে উঁকি মেরে ডাকে—বাবুজী!

কখনও কখনও মধ্যরাত্রে পানীয়ের প্রভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত নটবর শেঠ-মহারাজদের দু-একজন এসে ভুল ক'রে বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে মোড় ফিরে আমাদের বারান্দায় ঢুকে প'ড়ে ডাকত—কাঁহা হো পিয়ারী?

পঞ্চাম্রটি কণ্ঠস্বর গর্জন ক'রে উঠত মুক্ত আগ্নেয়গিরির মত—কৌন রে?

কেডা?

পাকড়ো হালার পোকে!

মধ্যে মধ্যে এক-আধজন ভয়ে আছাড় খেত।

আরও একটা বিচিত্র সংস্থান ছিল। সরু মিহি গলায় চিৎকার উঠত ছাদে বা সিঁড়িতে—ঈ—ওল্ড্ হ্যাগ—

উত্তরে আরও একটা গলা চেঁচাত—হোয়ৎ? ইউ বিচ্!

উপরের ছাদে এই ফ্ল্যাটেই বলুন আর ঘরেই বলুন এগুলির অন্তে কাঠের রান্নাঘর ছিল। বোধ হয় খান তিনেক রান্নাঘর খালি ছিল, সেখানে থাকত দুটি ক্রিশ্চান মেয়ে।—একটি যুবতী একটি বুড়ী। ওদের দুজনে ঝগড়া বাধত। বুড়ী ওই যুবতীটির রান্নাবান্না করত। তার সঙ্গেই খেত-দেত। যুবতীটি বিকেলে সাজসজ্জা ক'রে বের হ'ত, রাত্রে প্রায়ই মাতাল হয়ে ফিরত। তখনই বাধত ঝগড়া। মধ্যে মধ্যে সঙ্গে আসত ফিরিঙ্গী ছোকরা। খানিকটা দাপাদাপি ক'রে

শেষে গালাগাল করতে করতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাত। মাতাল যুবতীটা তাড়া করত খাটের ভাঙা বাজু বা মশারির ডাণ্ডা নিয়ে।

বুড়ীটা মধ্যে মধ্যে কাঁদত। হিন্দীতেই বলত, ছোকরী সেও এককালে ছিল।

বাবুরা অনেকে তাকে ডাকত 'ম্যাগী' ব'লে।

সে কিছু বলত না। কিন্তু একদিন আমাকে বলেছিল, দেখ, আমি ম্যাগীর মানে জানি।

বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে ছিল খানিকটা পতিত জায়গা, সেখানে ছিল রিক্‌শর আড্ডা। আর তার পাশেই ছিল চীনে-ম্যানদের বাসা। ছাদে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর সারি সারি নীল কাপড়ের জামা পেণ্টালুন ক্লিপ এঁটে শুকুতে দিত আর এক পাল ছেলে নিয়ে—সে যে কি বকাবকি সে আর কি বলব?

রবিবার দিন ছাদে উঠে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকত উত্তর-পশ্চিম দিকের একখানা বাড়ির ছাদের দিকে। কি? কানে কানে চুপিচুপি একজন বললে,—এর বাড়ি। ওই যে ফুলের টবওয়ালা ছাদ।

নামটা একজন বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেত্রীর।

রবিবার দিন তিনি নিজে হাতে গাছগুলিতে জল দেন এবং পরিচর্যা করেন। তাই রবিবার সকালে ছাদে সকলে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়।

আমাদের একজনের নাম ছিল রাজেনবাবু, চাটগাঁয়ের ছেলে। ছিমছাম অবিবাহিত যুবক। তাঁর বাই ছিল এই সিনেমা-স্টার দেখে বেড়ানোর। এবং মধ্যে মধ্যে এমন সব খবর নিয়ে আসতেন যে, সকালে থ মেরে যেত।

একদিন বললেন,—দেবীকে দেখে এলাম এই দু হাত পাশ থেকে। শাড়িটা ছুঁয়ে দেখেছি। লোকে বলে—কালো, আমি দেখলাম গোলাপী সাটিনের মত চকচকে গায়ের রঙ আর তেমনি কি চামড়া।

এই আসরের মধ্যে আমার আসর পাতলাম।

সুবিধে ছিল দুপুরের সময়। খাঁ-খাঁ করত সব মেসগুলি। ওদিকে বাইজীরা নিদ্রামগ্ন। উপরে ফিরিঙ্গী মেয়ে দুটিও ঘুমোত। আমি লিখতাম।

এইখানেই বোধ করি 'অগ্রদানী' লিখলাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে সে?

(শ্রীঅরবিন্দের 'Who' কবিতার অনুবাদ)

গগনের নীলিমায় বনানীর শ্যামলিমা-মাঝে
লীলায়িত যে সৌন্দর্য বল তাহা কেবা বিরচিল,
কাহার নির্দেশে বল প্রবাহিল সমীরণ-স্রোতে
নিথর ইথারতলে যে পবন ঘুমাইয়া ছিল?
হৃদয়ে হৃদয়ে আর প্রকৃতির কন্দরে কন্দরে
সে জন রয়েছে লীন, অস্তিত্ব তাহার পরকাশ
মায়ুকেন্দ্রে চিন্তারূপে, কান্তিরূপে কুসুমের মাঝে,
নক্ষত্রের জ্যোতির্জালে দীপ্যমান তাহারি আভাস।
পুরুষে পৌরুষরূপে, নারীদেহে লাবণ্য-আকারে,
শিশুর হাসির মাঝে, তরুণীর গণ্ড-শোণিমায়,
নিক্ষেপিল মহাশূন্যে যেই কর সূর্যের গোলকে
কুঞ্চিতে অলকগুচ্ছ সেই পুনঃ নিয়োজিত হায়।
দৃশ্যমান যাহা কিছু তাঁরি ছায়া—তাঁরি মায়া-লীলা,
কিন্তু সে কোথায় তিনি, কোন্ নামে পরিচয় তাঁর?
তিনি ব্রহ্মা—তিনি বিষ্ণু—প্রকৃতি পুরুষ কিংবা তিনি
দ্বৈত বা অদ্বৈত তিনি—সাকার অথবা নিরাকার?
কালো রূপে আলো-করা কিশোর সে সখা আমাদের,
আরাধ্যা মোদের দেবী বিবসনা বিভীষণা নারী,

কভু তিনি ধ্যানমগ্ন তুষারমণ্ডিত গিরিশিরে,
নিখিলের কেন্দ্রে কভু লীলারত দেখি হৃত তাঁরি।
অপূর্ব তাঁহার লীলা—অপরূপ ছলনা তাঁহার :
ব্যথার আঘাত হানি আনি দেন আনন্দ-আস্বাদ,
বেদনার অশ্রুধার বহাইয়া নিঠুর কৌতুকে
বিছাইয়া দেন পুনঃ পুলকের মনোহর ফাঁদ।
তাঁহার মধুর হাসি গান হয়ে উঠিতেছে বাজি,
তাঁহার আনন্দ আভা বিকশি উঠিছে রূপরাগে,
মোদের জীবন-ছন্দ তাঁরি হৃদ্‌-স্পন্দনের ধ্বনি,
মোদের আনন্দে রাজে রাধা-কৃষ্ণ মিলন-উৎসব,
যুগল অধর-স্পর্শ প্রেমরূপে প্রাণে প্রাণে জাগে।
তাঁর শক্তি বিঘোষিত উদাত্ত সে তূর্যের গর্জনে,
আঘাত আয়ুধমুখে, দুর্বার তাঁহার রণ-রথ,
অক্রোধ নিধনলীলা সীমাহীন করুণায় দ্রব,
সংগ্রাম-বিশ্বের লাগি গড়িবারে নব ভবিষ্যৎ।
বিঘূর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডের বহু উর্ধ্বে যুগান্তের পারে
মানবের পঙ্গুচিন্তা আরোহিতে যেথা শক্তিহীন
উর্ধ্বতম সেই লোকে মহান আসন তাঁর পাতা
অকলঙ্ক মহিমায় সে আসনে তিনি সমাসীন।
নিখিল-বিশ্বের প্রভু নিখিলের প্রেমের ঠাকুর
হৃদয়ের এত কাছে তবু তাঁরে দেখিতে না পায়
অভিমান-অন্ধ আঁখি গর্বান্ধ মোদের দু নয়ন,
স্বাধীন চিন্তার নামে বদ্ধ মোরা চিন্তার সীমায়।
ভাবর সে ভাহুমাঝে কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী তিনি,
নিশীথ আকাশে হেরি তাঁরি কৃষ্ণ ছায়ার বিথার,
তিমির যখন ছিল তমিস্রার অঞ্চলে আবৃত
বিরাজিত বিরাট সে একামাত্র উপস্থিতি তাঁর।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

হারানো মানিক

গাড়ের মাঠের ফাঁকা একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া ক্ষিতিনাথের মন বল্গাহীন ঘোড়ার মত ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া গেল যেন। শুধু ক্ষিতিনাথের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া রহিল। বন্ধু সমরের কাছে যে সব সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কাহিনী অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল, তার কেন্দ্র সে নিজে—'আমি'।

ক্ষিতিনাথের এই ফাঁপিয়া-উঠা 'আমি'কে সযত্নে স্থান করিয়া দিতে সমর নীরব শ্রোতার ভূমিকায় নিজেকে এক কোণে সরাইয়া রাখিল।

আমি, ক্ষিতিনাথ বলিতেছিল, মাঝে মাঝে আমি স্পষ্ট অনুভব করি আমার শক্তি। নজরুলের লাইনটা মনে পড়ে তখন। আমি উল্কা, আমি ঝঞ্ঝা—। তুচ্ছ চাকরির দরখাস্ত নিয়ে ঘুরে মরব আমি? না, তা আমি করব না। কিন্তু কি করব?

তাই তো, একটা কিছু করতে তো হবেই।—মৃদুস্বরে সমর বলিল।

করব। একটা কিছু করবই আমি, তুই দেখে নিস। বড় রকমের কিছু করব।

কোন্ লাইনে কিছু ভেবেছিস?—সমর আবার ছোট্ট করিয়া বলিয়া আলোচনা জিয়াইয়া রাখিতে গেল।

তা ভাবি নি।—এবার হাসিয়া বলিল ক্ষিতিনাথ, ভাবতে গেলেই বড় ছোট হয়ে পড়ি। পাট কোম্পানির অফিসে আর মাস্টারির জন্যে যে দরখাস্ত করেছি—ও-ছুটোর কথাই তখন মনে প'ড়ে যায়।

একটু থামিয়া ছোট একটা নিশ্বাস চাপিয়া গেল ক্ষিতিনাথ। বলিল, আরও অনেক কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে। শুক্লার কথা তোমাকে আগেও বলেছি। কি যে সে আমার মধ্যে পেয়েছে, সে-ই জানে। বিয়ে সে আর কাউকে করবে না। কিছুদিন আগেও এক সাব-ডেপুটি ছোকরার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল। তারাও খুব পছন্দ করেছিল, ওর বাপ-মায়ের আগ্রহ ছিল খুব। কিন্তু ও এমন বেঁকে

বস্ল— । আমি নিজে কত বুঝিয়ে বললাম। না, কিছুতেই না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় তাও রাজী। অবশ্য আমি তাকে বলেছি যে, তা হ'লে জীবনের শেষদিন পর্যন্তই সত্যি তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাই রাজী।—গর্বভরে বলিয়া ক্ষিতিনাথ হাসিমুখে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইল।

তোর মনের কথাটা কি ওর সম্বন্ধে ?—মৃদুকণ্ঠে সমর প্রশ্ন করিল

আমার ?—হাসিল ক্ষিতিনাথ।—অত ছোট ক'রে এখুনি আমাকে বাঁধতে পারি নে আমি। অবশ্য শুক্লাকে আমি, হ্যাঁ, ভালবাসি বইকি। কিন্তু ভালবাসাই জীবনের সব কথা নয় সমর।

সমর বলিল, জীবনের সবচেয়ে বড় কথা কি, সেটা তো ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার। নইলে তো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে।

হ্যাঁ, সেইটে অবশ্য এখনও ঠিক হয় নি। আমি—আমি কি যে হতে চাই এখনও জানি নে। কিন্তু হতে চাই আমি। হয়ে একটা উল্কার মত, একটা ঝঞ্ঝার মত পৃথিবীকে চমকিয়ে দিতে চাই।

হাসি গোপন করিল সমর।

না, হয়তো উপনিষদের ঋষিদের মত ঈশ্বর হব আমি। ব্রহ্ম হব।

খুব বড় কথা।—সমর উৎসাহ দিল।—তবে তাদের কথা ঠিক ব্রহ্ম হব নয়। আমিই যে ব্রহ্ম—সেই কথা জানব। আমাকে বড় করবার পথে এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আমার ঈশ্বর হবার ইচ্ছেই করে বেশি। ব্রহ্মজ্ঞানের আগের ধাপ পর্যন্ত উঠলেই নাকি ঈশ্বর হওয়া যায়। আমি তা হ'লে শেষ ধাপ পর্যন্ত আর যাব না।

বেশ।—নীরবে যেন পথ ছাড়িয়া দিল সমর।

আমি, বুঝলি, সেই জন্যেই আমাকে বাঁধতে চাই নে কোনখানে। মুক্ত থাকতে চাই।

যদি পাটের অফিসের দরখাস্তটা তোর মঞ্জুর হয় ?—সমর খোঁচা করিয়া প্রশ্ন করিল।

যদি মঞ্জুর হয়? মঞ্জুর হ'লে—। কিন্তু হবে না। তুই দেখে নিস।

মাস্টারিটা তো হতেই পারে?

ক্ষিতিনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কি ক'রে হবে বল্? সেক্রেটারির আত্মীয় ক্যাণ্ডিডেট আছে যে।

তার মানে?

মানে সোজা। গুণে কিছু কম থাকলেও আত্মীয়তার গুণটা যোগ হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

সমরের মুখখানা এবার বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল, থাক্, ও আর শুনতে চাই নে। এ ধারার কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

এমনি তুচ্ছতা, এমনি কদর্যতার মাঝখানে আমার মত মানুষ থাকতে পারে? এমনি জঘন্য পরিবেশের মধ্যে আমার মত লোকের যেতে ইচ্ছে করতে পারে? কাজেই, এখন মনে প্রাণে চাইছি আমার দরখাস্ত যেন মঞ্জুর না হয়।

কিন্তু—। বলিয়া একটু টান রাখিয়া থামিল সমর। ক্ষিতিনাথের একটু-আগে-বলা কথা কয়টি মনে পড়ায় হাসি পাইল। যদি মঞ্জুর হয়? মঞ্জুর হ'লে—। আর সেক্রেটারির আত্মীয় আছে যে।

ক্ষিতিনাথ বলিয়া যাইতেছে, মঞ্জুর না হ'লেই আমার ভাল। বাধা পেলেই আমার পথ আমি খুঁজে পাব। পথ আমি করব। পাহাড়ে নদীর মত পাহাড় কেটে পথ ক'রে নেবার শক্তি আমার আছে। সোজা বাঁধা-কাটা পথ আমার নয়।

বাধার জন্যে ভাবিস নে।—সমর আলগোছে বলিল, বাধা অনেক পাবি।

আমি বুক পেতে নেব বাধা। বাধা ভেঙে চুরমার ক'রে অগ্রসর হওয়াই জীবন। বাধা আমি চাই। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমি তখন স্কুলে পড়ি। স্কুল থেকে আমাদের গ্রামের মাঝখানে

একটা নদী ছিল। একদিন স্কুল থেকে ফেরবার সময় দেখি, খেয়ার নৌকো ওপারে আছে, মাঝি নেই। আমার তখন মুহূর্ত দেরি সয় না। মাঠে খেলা আছে। কি করলাম জানিস? জামা খুলে এক হাতে বই আর জামা উঁচু ক'রে ধ'রে আর এক হাতে সাঁতরে নদীটা পার হয়ে এলাম।

ছোট নদী বুঝি?

ছোট? বলিস কি? না না। রীতিমত বড় নদী। কিন্তু কোন বাধায় আমাকে আটকাতে পারে না।

নদী কিন্তু অনেক স্কুলের ছেলেই সাঁতরে পেরিয়েছে।—সমর হালকা টিপ্পনী কাটিল একটু।

ক্রুদ্ধ ক্ষিতিনাথ আহত স্বরে বলিল, ওই রকম নদী? তাও আবার এক হাতে? যারা পেরিয়েছে তাদের বলিস, আমাদের ঐ নদীতে একবার নামতে। নামতেই সাহস পাবে না, বুঝলি?

সমর চুপ করিয়া গেল।

এ রকম ঘটনা আমার জীবনে অনেক আছে।—ক্ষিতিনাথ আবার আরম্ভ করিল।—একবার সেদিন—

আর এক নদীর কথা বলছিস?—সমরের মৃদু প্রশ্ন বাধা দিল।

ক্ষিতিনাথ হাসিয়া বলিল, না, এবার নদীর কথা বলছি নে। আচ্ছা, থাক্‌গে ও-কথা।

ব'লে যা—

কি আর বলব? ভাল লাগে না কিছু।

সে কি রে?

না, চল্ যাই এখন। কি করব বল্। আমাকে—আমি ক্ষিতিনাথ—আমাকেও ঠাট্টা করে লোকে। তুচ্ছ লোকে। যাদের মানুষ ব'লেই মনে করতে পারি নে, তারা।

কি রকম?

সেদিন বাবার পেড়াপিড়িতে এক বড়লোক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিলাম। চাকরির জন্তে।—একটু যেন দম লইল ক্ষিতিনাথ।—চাকরির জন্তে। সেই জন্থেই সুবিধে পেল কিনা।

কি বললে ?

বললে ভাল। হাওড়ার হাট থেকে গামছা নিয়ে এসে ফিরি ক'রে বিক্রি কর।

তুই কি বললি ?

আমাকে চিনেছে সেদিন ভদ্রলোক। আমি বললাম, ব্যবসাই যদি করি আপনার মত চুরির ব্যবসা করব। কাপড় চুরির ব্যবসা।

বললি ?

বললাম। আমি—আমাকে চিনত না, চিনিয়ে দিলাম।

মুখের ওপর খুব বলেছিস তো ?

ক্ষিতি চক্রবর্তী ওই রকমই বলে। যারা জানে, তারা ঘাঁটায় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেলে সমর একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চল্, এবার উঠি।

চল্।

উভয়ে রাস্তায় নামিয়া হাঁটিতে লাগিল। কিছু ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। সামনে পিছনে ও পাশেও কয়েকজন লোক চলিতেছিল। মাঝখানে দুইজনে নীরবে চলিতে লাগিল। ক্রমে চলনটা একমাত্র সত্যের মত রূপ লইয়া সুখ দুঃখ রাগ অভিমানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া মননক্রিয়াই প্রায় বন্ধ করিয়া দিল।

ও কি, ওখানে অত লোক কেন ?—সমর মনুমেণ্টের দিকে তাকাইয়া বলিল।

ও-হোঃ, আজকে বিরাট সভা আছে যে !—ক্ষিতিনাথ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, চল্—যাব।

সমর কৌতূহলের সঙ্গে ক্ষিতিনাথের দিকে তাকাইয়া বলিল, বক্তৃতা শুনতে যাবি ?

৬

দু-এক মিনিট শুনব, চল্।

চারিদিকে মোটা এক স্তর লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সমর আর ক্ষিতিনাথ বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না।

পণ্ডিত লোকেশ্বরনাথ এসেছেন?—পাশের একজনকে ক্ষিতিনাথ জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক পায়ের উপর ভর দিয়া শরীরটাকে কয়েক ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, আসেন নি মনে হচ্ছে।

ক্ষিতিনাথ যৎসামান্য ফাঁক যেখানে পাইতেছিল সেখানেই মাথাটা গলাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমর দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একটা কলরোল সৃষ্টি হইল। একজন গর্জন করিয়া উঠিল, পণ্ডিত লোকেশ্বরনাথ কি—

সমবেত জনতা গর্জিয়া উঠিল, জয়—

ক্ষিতিনাথ তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সমর দেখিতে পাইতেছিল ক্ষিতিনাথকে। ক্ষিতিনাথ তখন ডান হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া সকলের সঙ্গে গর্জন করিতেছিল, জয়—

বার কয়েক জয়ধ্বনির পর ক্ষিতিনাথকে আর দেখিতে পাইল না সমর। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া উঁচু হইয়া, দুই-একজনকে ধাক্কাইয়া একটু অগ্রসর হইয়া, বহুপ্রকারে চেষ্টা করিল সমর। ক্ষিতিনাথকে আর দেখা গেল না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গেল সে।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

—

উপদেশ

মন রে আমার মন,
তুই হ'লি বিলক্ষণ,
বোকামি তোর ঘুচল কি রে
হ'লি বিচক্ষণ?
রাম-সীতারা বনের কাছে
সুখে কুটির বাঁধিয়াছে
ফল ধ'রে র'স পাছে পাছে—
অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ।
বহুদিন তো র'স উপোসী
অনেক তারা পড়ল খসি'
এবার ভাঙ্ রে একাদশী
কর্ ফল-ভক্ষণ।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজ-শাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।"

কিন্তু লর্ড কার্জনের দিল্লীর দরবারে এই সমুদয়ের কিছুই ছিল না, ছিল শুধু স্পর্ধার প্রকাশ, আর ঐশ্বর্যের বহ্বাড়ম্বর। রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি বলিয়াছেন যে, রাজপুরুষদের প্রতাপের আড়ম্বরে "আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।" তাঁহার মতে প্রজাকুলের ভক্তিভাজন হইতে হইলে রাজাকে দিল্লী-দরবার-জাতীয় স্পর্ধা ও দম্ভের পথ পরিহার করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে নম্রতার পথ, যেহেতু "প্রেমের পথ নম্রতার পথ"। রাজভক্তি যে কখনও বলপ্রয়োগে আদায় করা যাইতে পারে না, সেই কথাটা রবীন্দ্রনাথ রাজপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এই ভাবে :—

"...ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজা যে আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবিটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না—অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।"

চণ্ডনীতির বিভীষিকায় দেশ যেন ভীত না হয়, নিস্তেজ ও নির্বীর্য হইয়া না পড়ে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া না যায়,—তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক আবেদন জানাইয়াছেন স্বদেশবাসীর নিকট। পৌরুষ-দীপক কণ্ঠে তিনি জাতিকে শুনাইয়াছেন অভয়-বাণী :—

"দেবই হউন, আর দানবই হউন, লাটই হউন, আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো

আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জনগর্জন, এই সমস্ত উচ্চ পদের অভিমান, এই সমস্ত শাসনশোষণের আয়োজন আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলা মাত্র—ইহারা যদিবা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ার গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিও, ঋজু রাখিও, দীনতা স্বীকার করিও না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিও, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিও। কারণ নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেজন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশ-প্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনই নহে। তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয়ই জানি—তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের অনেক মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইও না, লুব্ধ হইও না, ভীত হইও না, তুমি 'আত্মানং বিদ্ধি' আপনাকে জানো এবং 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

যখন লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য সরকার পক্ষের তোড়জোড় চলিতেছিল, তখন সেই আসন্ন জাতীয় বিপর্যয়কে রোধ করিবার জন্যও বাঙালীরা প্রস্তুত হইতেছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের মধ্যভাগে বঙ্গব্যবচ্ছেদের সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণের শেষ ভাগে (১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগস্ট) বিলাতী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'ভাণ্ডার' পত্রের প্রথম বৎসরের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "উদ্বোধন" শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল বঙ্গ-মহিলাদের জন্য, এবং একটি মহিলা-সভায় উহা জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাংলার নবজাগরণে বঙ্গনারীকে কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের এক স্থলে আছে :—

"প্রতিদিন সংসারে কর্মশালার দ্বার প্রথম কে উদ্‌ঘাটন করে? গৃহলক্ষ্মী নারী। যখন সকলে নিদ্রিত, তখন জীব-ধাত্রী ধরণীর এই কন্যাগণই জাগরণকালের প্রথম ব্যবস্থা করিবার জন্য শয়নগৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসেন। জাগ্রত জগতের স্নান-পান, পোষণ-তোষণের জন্য দিবসের সর্বপ্রথমেই রমণীগণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দেন। এই যে প্রতিদিনের প্রয়োজন সমাধার জন্য—এই যে প্রতিদিনের মঙ্গল সাধনের জন্য সংসারে রমণীর প্রথম জাগরণ, প্রথম উদ্যোগ,—ইহার দ্বারাই জগতের প্রত্যেক দিবস পবিত্র হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে।

"আজ প্রত্যূষে কেবল আমাদের প্রাত্যহিক—আমাদের সাংসারিক ক্ষুদ্র দিনের নহে—আমাদের দেশের, আমাদের জাতির একটি মহৎ দিনের অভ্যুদয়কাল আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই জ্যোতিঃ-সমুজ্জ্বল দিব্য দিবারম্ভের প্রথম বিহঙ্গগান আজ শুনা যাইতেছে—সেই দিব্য প্রথম বায়ু-হিল্লোলে অরণ্যের প্রত্যেক পল্লবের মধ্যে আজ একটি মর্মরিত আন্দোলন দেখা যাইতেছে—কিন্তু আজ নারী কোথায়? এই সুপ্রভাতের শুকতারা আজ কোন্‌খানে? দেশের সুদিনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আজ দেশের কন্যাগণ কি এখনো প্রস্তুত হন নাই?

"আমাদের মাতৃগণ, আমাদের ভগিনীগণ, আমাদের কল্যাণীয় কন্যাগণ, দেশ তোমাদের প্রসন্নতার জন্য চাহিয়া আছে। তোমরা প্রস্তুত হও। তোমরা প্রীত

হও। তবেই দেশের নবজাগরণ সুন্দর হইবে, সম্পূর্ণ হইবে। তোমরা যদি উদাসীন থাক, যদি বিমুখ হও, তবে বাহিরের বাধাতের অপেক্ষা ঘরের কণ্টকের দ্বারা দেশের যাত্রাপথ দ্বিগুণতর দুর্গম হইয়া উঠিবে। পরম দুঃখের দিনে ঈশ্বর যে কল্যাণকে আমাদের দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা মাতৃরূপে, পত্নীরূপে, ভগিনীরূপে গ্রহণ কর, বরণ করিয়া লও; তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত কর, তাহাকে তোমাদের বিগলিত হৃদয়ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দাও।"

এই উপাদেয় প্রবন্ধটির উপসংহার আরও প্রাণস্পর্শী। উপসংহার এইরূপ :—

"আর তোমরা—যাহারা আজ বিশ্ব-বঙ্গের বেদনায় ব্যথা পাইয়াছ, বিশ্ব-বঙ্গের মিলনাবেগে গৌরব অনুভব করিতেছ, তোমরা আজ সকলে প্রস্তুত হইয়া এস, তোমাদের দুটি চক্ষু হইতে বিদেশী হাটের মোহাঞ্জন আজ চোখের জলে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া এস—যে বিদেশের অলঙ্কার তোমাদের অঙ্গকে সোনার শৃঙ্খলে আপাদ-মস্তক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া এস, আজ তোমাদের যে সজ্জা, তাহা প্রীতির সজ্জা হউক, মঙ্গলের সজ্জা হউক, তাহাতে বিদেশের রেশম-পশম-লেস্‌-ফিতার জাল-জালিয়াতি অপেক্ষা তোমাদিগকে অনেক বেশী মানাইবে। আমরা আজ সমস্ত দেশের চেয়ে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রমাণ করিতে নাই বসিলাম। দেশকে আমাদের তর্ক, আমাদের বুদ্ধি উৎসর্গ করিলাম। এই বুঝিলাম যে, সমস্ত দেশকে অভূতপূর্বরূপে আজ এই যে এক আবেগে বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম—দেশের এই উদ্বোধনে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—দেশের এই উদ্যোগে যোগ দিয়া তাঁহারই পূজা সমাধা করি।

"তবে আজ বঙ্গের মাঁঙা, বঙ্গের বধূ, বঙ্গের কুমারীগণ, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রিগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি।—বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্‌।"

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

চাকা

মোটর গাড়িতে চাপিয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা। স্ত্রী সিন্দুক হইতে জড়োয়া গহনা বাহির করিয়া পরিয়াছেন, পরনে সিল্কের বাহারী শাড়ি, মুখে রুজ-পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখে সুর্মা—দেখিয়া মনে হইতেছিল পরস্ত্রী কোথায় লাগে! পুত্র-কন্যারাও সাজিয়াছে। নিজের পুত্র-কন্যা থেঁদা-বোঁচা হইলেও সুন্দর। এ ক্ষেত্রে সাজিয়াছে যখন, তখন চোখে আরও সুন্দর লাগিবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আর আমি? গৃহিণী আমার জন্য আলমারি হইতে সিল্কের পাঞ্জাবি বাহির করিয়া তাহাতে মিনে-করা সোনার বোতাম পরাইয়া দিয়াছেন, শান্তিপুরী ধুতিখানা অবশ্য আমিই কোন রকমে কুঁচাইয়া লইয়াছি। পামশু জোড়া আমার মেয়ে, মানে কমলীই কালো কোবরা কালি দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া পালিশ করিয়া দিয়াছে। আর লজ্জা কি বলিতে—গৃহিণী সুযোগ বুঝিয়া, অর্থাৎ পুত্র কন্যারা নাই দেখিয়া আমার রুমালে ও জামায় সেণ্ট লাগাইয়া দিতেও ভুলেন নাই। এবং আমিও এদিক ওদিক কেহ নাই দেখিয়া গৃহিণীর পাউডারের পাফটা লইয়া চট করিয়া মুখে ঘষিয়া লইয়াছি দুই-চারবার।

নিজেই গাড়ি চালাইতেছি। গৃহিণী পাশে বসিয়া। পুত্র-কন্যারা পিছনের সিটে। অনেকটা পথ যাইতে হইবে—শহরের সীমানার বাহিরে। পাকা ও ফাঁকা রাস্তা। সাঁ-সাঁ করিয়া গাড়ি চলিতেছে, সোঁ-সোঁ করিয়া হাওয়ার শব্দ। হাওয়া লাগিয়া মন বেলুনের মত হালকা। এক-একবার গান গাহিবার ইচ্ছা হইতেছে মনে।

কিন্তু ভগবান যে কাহারও এত সুখ সহ্য করিতে পারেন না, তাহা খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হইল, যখন পিছনের ডান দিকের চাকার কটাং করিয়া একটি শব্দ হইল। পরে কটাস্ কটাস্ শব্দ হইতে

লাগিল। চাকা খুলিয়া যাইবে নাকি! তাড়াতাড়ি গাড়ির গতি কমাইয়া এক পাশে দাঁড় করাইলাম। নামিয়া, চাকাটি পরীক্ষা করিয়া মনে হইল, যেন উহা একটু হেলিয়া আছে। সর্বনাশ!

পাঠক, তুমি কি আমার মনের অবস্থা বুঝিবে? যদি তোমার নিজের গাড়ি থাকে এবং কখনো এই অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবেই বুঝিবে আমার মানসিক অবস্থা। আর যদি তুমি ট্রামে বাসে ঘুরিয়া বেড়াও এবং ট্রামের 'করন' বন্ধ হইলে বা বাস বিকল হইলে কণ্ডাক্টরের নিকট হইতে টিকিট বদলাইয়া পয়সাটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া স্রেফ নামিয়া যাও, তবে, হে নিষ্ঠুর, তুমি বুঝিবে না আমার মনোকষ্ট। বরং হাসিবে। অবশ্য, এ হাসির জন্য তোমাকে দোষ দিই না। কারণ, তুমি যখন বাসে বা ট্রামে ঝুলিতে থাক, আর আমি গাড়িতে চাপিয়া বন্ধুর সঙ্গে হাসি-গল্প করিতে করিতে তোমারই পাশ দিয়া ভোঁ-ও-ও করিয়া চলিয়া যাই তখন তোমার মনের অবস্থা কি আমি বুঝিতে যাই বা চেষ্টা করি? এখন আমার দুরবস্থায়, তোমারই তো হাসিবার পালা। জানি সুখ দুঃখ চাকার মতই বদলাইয়া থাকে।

চাকার সঠিক কি হইয়াছে দেখিবার উদ্দেশ্যে গাড়ির পিছনের বাক্স হইতে 'জ্যাক্' বাহির করিলাম। পুত্র নামিয়া আসিল সাহায্য করিবার জন্য। এ কাজে স্ত্রী বা কন্যার করণীয় কিছু নাই। গৃহিণী সংসারের চাকা ঘুরাইতে জানেন, কন্যাকে তালিম দিয়া থাকেন; বাহিরের চাকা ঠিক রাখিবার ভার আমার উপর, এবং এ বিষয়ে পুত্রকে শিক্ষা আমি ছাড়া আর কে দিবে? কমলু আমার নির্দেশমত হাঁটু গড়িয়া বসিয়া, মাথার খানিকটা গাড়ির তলায় ঢুকাইয়া জ্যাকটি যথাস্থানে বসাইল। সুসজ্জিত পোশাকে তাহাকে এই সব ধুলা-বালি-কালির কাজ শিখাইবার সৎচেষ্টা আমার ছিল না—কিন্তু আমার দেহের আয়তন ও মেদ একরূপ জেদ করিয়াই ছেলেটাকে ধুলা-বালি মাখাইল। আমি তখন যথাসাধ্য নীচু হইয়া জ্যাকে রড লাগাইয়া মোচড দিয়া গাড়িখানা উঠাইয়া দিলাম। তিন পায়ে দাঁড়াইয়া

ঘোড়া চাঁট ছুঁড়িলে যেমন দেখিতে হয়—আমাদের গাড়িখানা যেন তেমনই একটি স্থায়ী চাঁট ছুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা পিতা-পুত্রে তাহার পদসেবা করিতে লাগিলাম।

গায়ের মেদ গলিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। হাত-ময় ধুলা-কালি। ঘামে গা চিড়বিড় করিতে লাগিল। কোন্ সময়ে নিজেরই অজ্ঞাতে ঐ ধুলা-কালি হাতেই গা-হাত-পা মুখ চুলকাইয়াছি জানি না, খেয়াল হইল যখন গৃহিণী খেয়াল করাইয়া দিলেন—কি চেহারা হ'ল! জামায় যে কালি! নেমন্তন্ন-বাড়ি যেতে হবে, সে খেয়াল আছে?

বলিলাম, খেয়াল আছে, কিন্তু চাকার খেয়াল মিটুক আগে।

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না। হয়তো খোঁড়া গাড়িতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যাত্রা করিবার সময় কাহার মুখ তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল!

পাশ দিয়া যাত্রী-বোঝাই বাসগুলি সশব্দে চলিয়া যাইতেছিল। যাত্রীদের চোখ আমাদের উপর পড়িতেছিল নিশ্চয়ই। আমাদের দুরবস্থা তাহাদের চোখে একটু আরাম দিতে পারিল সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদেরও চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, উহাদের উদ্বেগহীন যাত্রা দেখিয়া। হঠাৎ আমার চোখ আরও জ্বালা করিয়া উঠিল—কপালের নোনতা ঘাম গড়াইয়া চোখে আসিয়া পড়িয়াছে। কাপড়ের কোঁচায় চোখ মুছিলাম।

দিনের সূর্য সারাটা দিন আকাশে তাহার চাকা চালাইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমের মাঠে নামিয়া পড়িল। ওদিকে আকাশটাকে খালি পাইয়া পূর্ণিমার চাঁদ একখানা সোনার চাকা লইয়া সেখানে হাজির। আমি কিন্তু তখনও গাড়ির লোহার চাকা লইয়া নাস্তানাবুদ হইতেছি। শেষ পর্যন্ত চাকাখানাকে বাহির করিয়া মনোযোগ সহকারে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, কপালে আরও দুঃখ আছে। চাকার অ্যাক্সেলের চাবি কাটিয়া গিয়াছে। গাড়িকে ওই

খানেই বসাইয়া রাখা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। আমিও যেন বসিয়া পড়িলাম হতাশায়। গৃহিণী বলিলেন, কি হ'ল? হ'ল না? শুধু বলিলাম, না। আপাতত কোন উপায় নেই। শুনিয়াছি, দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, আমি এক চক্রের চক্রান্তে পড়িয়া কালি-ঝুলি মাখিয়া অদ্ভুত বেশে নিরুপায় হইয়া গাড়িতে আসিয়া বসিলাম।

সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি হইল। বাহিরে প্রকাশ না করিলেও মনে মনে ভয় হইতে লাগিল। নিমন্ত্রণে যাওয়া মাথায় উঠিয়া গেল, এখন কোন রকমে বাড়ি ফিরিতে পারিলে বাঁচি। ভাগ্য ভাল, কাছেই একটি কারখানা ছিল; সেখানকার চাকা তখনও ঘুরিতেছিল, কারণ, খোলা ছিল। সেখানে গিয়া কলিকাতার এক মোটর-মেরামতী কারখানায় ফোন করা গেল, ক্রেনসমেত তাহাদের রোড-ব্রেক-ডাউন-সারভিসের গাড়িখানা পাঠাইবার জন্য। ফিরিয়া গাড়িতে আসিয়া গৃহিণীকে খবরটা দিলাম। গৃহিণী দেখি, শাড়ি দিয়া তাঁহার জড়োয়া গহনা ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। পরকে দেখাইবার জন্য যে গহনার সৃষ্টি, এখন পর যাহাতে না দেখিতে পায় তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। হায় রে, ভাগ্যচক্রের চক্রান্ত!

মনে হইল, আগেকার দুই-চাকার গরুর গাড়ি বোধ হয় এতটা বিশ্বাসঘাতক ছিল না। দ্বিচক্রযান সাইকেলও ট্যাঁ-কোঁ করিলে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া বা কাঁধে করিয়া খানিকটা আগাইয়া লোকালয়ে আসা যায়। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সহিত চাকার গতি বাড়িয়াছে সত্য, ঘটিয়াছে সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তাহাদের উপর বিশ্বাস হারাইতেছি ক্রমশই। অথচ এই চাকাকে যে অস্বীকার করিব, তাহারও উপায় নাই। এই পৃথিবীটাই যখন সূর্যের চারিদিকে চাকার ন্যায় ঘুরিতেছে, তখন এই পার্থিব জগতে চাকার স্থান যে কোথায় তাহা কে না জানে। সংসারের চাকায় বাঁধা আমরা সকলেই। যেন কলুর বলদ। কেবলই ঘুরিতেছি, ঘুরপাক খাইতেছি। বাবুর চারিদিকে মোসাহেবরা

ঘুরিতেছে, অফিসারের চারিদিকে চাকুরে বাবুরা ঘুরিতেছে, নেতাদের চারিপাশে ঘুরিতেছে অনুচরবর্গ। মাংসের দোকানের চারিপাশে কুকুরকে ঘুরিতে দেখিয়াছি; গণিকালয়ের চারিপাশে ঘুরিতে থাকে রসিকের দল। টাকা ধার করিবার আগে মহাজনের বাড়িতে কাহাকে না ঘুরিতে হয়। আবার সুদের আশায় উত্তমর্ণ ঘুরিতে থাকে অধমর্ণের বাড়ির সামনে। পথেঘাটে মেয়েদের পিছনে ছেলেরা ঘুরিতেছে; আবার ছেলেদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে মেয়েদের বাপেরা—সৎ পাত্রের আশায়। আচ্ছা, এতক্ষণে হয়তো বিয়ে-বাড়িতে ক'নে পিঁড়িতে চাপিয়া বরের চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। তাই তো, আমার গৃহিণীও তো একদিন আমার চারিদিকে ঘুরপাক খাইয়াছিলেন তাই আমার পাশে কেমন স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছেন। আর গত পরশু, তিনি যখন অভিমান করিয়াছিলেন, মনে আছে, আমি তাঁহার আশেপাশে ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিতেছিলাম। পরে তিনি যখন মাথা ঘুরিতেছে বলিয়া শুইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার 'মাথা ঘোরা'র সুযোগ লইয়া কপালে জল-পটি দিতে, তবেই তো তিনি 'জল' হইয়া গেলেন।

সহসা মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের ব্যাপারটা মগজে অতি সহজেই আসিয়া গেল। দ্রুপদ রাজার অমন বিদ্ঘুটে কাণ্ড করিবার কারণ আর কিছুই নয়, ভাবী জামাতাকে বুঝাইয়া দেওয়া—বাপু হে, সংসারে ঢোকা বড় যা-তা ব্যাপার নয়। সংসারচক্রের চক্রান্তকে থোড়াই কেয়ার করিয়া নিজের লক্ষ্যে যদি পৌঁছাইতে পার, তবেই তুমি যোগ্য ব্যক্তি, তোমার হাতে কন্যা সমর্পণ করিতে পারি। আবার তোমার লক্ষ্য যে দিকে, ঠিক তাহার উল্টা দিকে চাহিয়া থাকিয়া লোককে ব্লাফ দিবার চেষ্টা করিবে এবং সেই ফাঁকে কাজ হাঁসিল করিবে, নতুবা কাজ পণ্ড হইবার সমূহ সম্ভাবনা।

মাথার মধ্যে নানারূপ চিন্তা ঘুরপাক খাইতেছিল। হঠাৎ সব চিন্তা পায়ে আসিয়া নামিল—পায়ে মশা কামড়াইতে শুরু করিয়াছে।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে আরও কামড়ায়। কাজেই, গাড়ির আশেপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। হঠাৎ নজর পড়িল মাথার উপরে। জ্যোৎস্নালোকে দেখি, একপাল মশা আমার মাথার উপরে বন্ বন্ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে।

গৃহিণী উতলা হইলেন। বাংলা করিয়া বলিলেন, কই গো, ভাঙা গাড়ি টানবার গাড়ি আসছে কই ?

দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলাম, কি জানি! হয়তো সে গাড়িও পথে ভেঙে পড়েছে। কথায় আছে না, অভাগা যেদিকে চায়—

কিন্তু পথের দিকে চাহিতেই যেন মনে হইল, একখানা ক্রেনসমেত গাড়ি আমাদের দিকে আসিতেছে। সত্যই আসিল এবং সেখানা ব্রেক-ডাউন-সারভিসেরই গাড়ি। আহা, পূর্ণিমার চাঁদ যেন হাতে পাইলাম। একগাল হাসিয়া তাহার ড্রাইভারকে বলিলাম, এই দেখুন অবস্থা!

তাহারা চটপট গাড়ি ঘুরাইয়া লইল। আমাদের গাড়ির পিছন দিকে পিছু হটিয়া আসিল। পরে ক্রেনের দড়ি বাঁধিতে লাগিল আমাদের গাড়ির পিছনের সুবিধাজনক আংটায়।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। উহাদের লোক কাজ করিতেছে। আমি উহাদের গাড়ির আশেপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে গাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম—মানে, থমকাইয়া দাঁড়াইলাম। উহাদের গাড়ির রেডিয়েটারের ক্যাপের উপর একখানি ছোট জাতীয় পতাকা লাগানো। হাওয়ায় পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে। নজরে পড়িল পতাকার চাকাখানা—অশোকচক্র। আমাদের বিজ্ঞ সরকারকে মনে মনে অশেষ প্রশংসা করিলাম। আমাদের কর্তৃপক্ষ এই পার্থিব জগতের মূলমন্ত্র কি—নাড়ি টিপিয়া ঠিক ধরিয়াছেন। চাকা। সংসারে শুধু টাকা থাকিলে চলে না। ভাণ্ডার ফাঁকা হইতে বেশিক্ষণ লাগে না—যদি ভাগ্যের চাকা ঘুরিতে থাকে উল্টা দিকে।

মনে পড়িল, আমার এক বন্ধু বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় বিরক্ত হইয়া

বলিয়াছিল, জাতীয় রথ অচল হইবে না তো কি? এক চাকায় রথ চলে? পতাকায় দুইটা চাকা থাকা দরকার। সেদিন তাহার কথায় সায় দিয়াছিলাম, কিন্তু আজ একচক্র-ভগ্ন-যান-যাত্রী আমি বেশ বুঝিতেছি, সামান্য একটা চাকাও আমাদের কাছে অসামান্য। একটা চাকার চক্রান্তে যদি এসব গুরুতর দুর্দশা ভোগ করিতে হয়, তবে একটা চাকার স্থির-চলনে জাতির উন্নতি হইবে না কেন? আজ যদি চাকাখানা অচল না হইত, তবে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে লুচি-মাংস-পোলাও মারিত কে? আরও মনে হইল, কর্ণের রথের চাকাখানা যদি চকিতে না বসিয়া যাইত, তবে তাহাকে মারিত কে? আবার কেষ্টঠাকুরের মত চালাক চতুর লোকেরও একমাত্র অস্ত্র ছিল এক চক্র—সুদর্শনচক্র। মহাভারতে যখন এক চাকার এত আধিপত্য তখন ভারতের জাতীয় পতাকায় এক চাকা থাকিবে না তো দশ চাকা থাকিবে?

—আইয়ে বাবু, হো গিয়া।

ব্রেক-ডাউন-সার্ভিসের কুলির ডাকে চমক ভাঙিল। তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ির কাছে আসিয়া দেখি, ক্রেনের সাহায্যে গাড়িখানির পশ্চাদ্দেশ খানিকটা উঁচু করা হইয়াছে যাহাতে উহা সামনের দুই চাকার উপর ভর দিয়া টানিবার গাড়ির গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আগেকার মেমসাহেবদের হাইহিল জুতা দেখিয়াছেন? সে জুতার পিছনের হিলের খানিকটা ভাঙিয়া দিলে তখন যেমন দেখিতে হয়, বাস্, আমাদের গাড়িখানা ঠিক তেমনই হইয়া রহিয়াছে। আর ভিতরের যাত্রীরা, মানে আমার গৃহিণী ও পুত্র-কন্যারা বসিয়া আছেন যেন থিয়েটারের আট আনার সীটে। সামনের দিকটা ঢালু, কেবল নামিয়া আসিতে হয়; আর সেই অধঃপতন হইবার দৈহিক ইচ্ছাকে সামলাইতে হয়—ধরার বুকে দৃঢ় পদস্থাপন করিয়া। গৃহিণী ও পুত্র-কন্যাদের টানে আমিও মাথা নিচু করিয়া গাড়িতে ঢুকিয়া আট আনার সীটে বসিলাম; সত্য কথা বলিতে কি, যেন গাধার পিঠে বসিলাম

উল্টা দিকে মুখ করিয়া। শুধু তাহাই নহে, টানিবার গাড়িটার টানে এই প্রগতির যুগেও ক্রমশ পিছু হটিতে লাগিলাম।

নির্জন রাস্তায় এতক্ষণ চাঁদের আলো যেন বন্ধুর কাজ করিতেছিল। এখন চাঁদটাকে গোল একখানা পোড়া ঘুঁটে বলিয়া মনে হইল। আমাদের দেখিয়া হাসিতেছে যেন। এক ধ্যাবড়া কালো মেঘের কাদা যদি উহার মুখে এই সময় লেপিয়া যাইত! অন্তত অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বাঁচিতাম। আমরা বাড়িতে ফেরত আসিতে লাগিলাম। যে সুতার জট ভাগ্যচক্রে পাকাইয়া গিয়াছিল তাহাই উল্টা দিকে চাকা ঘুরাইয়া খুলিতে খুলিতে আসিলাম বাড়ির কাছাকাছি। লোকালয়ে আসায় মনের দুশ্চিন্তা অনেক কমিল বটে, কিন্তু বাড়িল যাহা তাহা লোক-লজ্জা এবং পেটের ক্ষুধা। আকাশের চাঁদটা নিমন্ত্রণ-বাড়ির ফুলকো লুচির মত আমাদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া বাড়িগুলির ফাঁকে ফাঁকে নির্লজ্জের হাসি হাসিতে লাগিল।

আমাদের পাড়ার লোকগুলার আবার রকে বসিয়া রাত বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মারা অভ্যাস। কাজেই পাড়ার কাছাকাছি আসিতেই গৃহিণী বলিলেন, এইবার নাম। এ ভাবে বাড়ি যাওয়ার চাইতে হেঁটে বাড়ি যাওয়া ঢের ভাল। আমারও যেন তাহাই মনে হইতেছিল। অতএব গাড়ি থামাইয়া, নামিয়া, পাড়াটাকে প্রায় এক চক্কর ঘুরিয়া গলি-ঘুঁজির পথে বাড়ি আসিলাম। একটু পরেই সদর-পথেই আমাদের দুই চাকার মোটর গাড়ি পিছু হটিতে হটিতে হাস্যাস্পদ অবস্থায় বাড়ির সামনে দাঁড়াইল।

ব্রেক-ডাউন-সারভিসের লোক গাড়িখানাকে গ্যারেজে ঢুকাইয়া দিবার পর মনে হইল, উহাদের কিছু বকশিশ দেওয়া দরকার। পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকাইয়া খুচরা সিকি, দু-আনি, আট-আনি, রূপার টাকায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। ইচ্ছা একটা আট আনি দেওয়া। লোকগুলার সামনে দাঁড়াইয়া খুচরাগুলা বাহির করাও রিস্কি ব্যাপার—হয়তো বেশি চাহিয়া বসিবে। কাজেই পকেটের ভিতরে

অতি সন্তর্পণে ও মনোযোগের সহিত খুচরাগুলির গোলাকার পরিধিতে বহু অনুভব করিয়া যে আট-আনিটাকে বাহির করিলাম—পোড়া কপালের দোষে উহাদের সামনে তাহা একটা আস্ত রূপার টাকা হইয়া যেন আমাকে ভেঙচি কাটিয়া বলিল, কেমন, বাহির হইয়া পড়িলাম তো! অগত্যা উহাদের টাকাটাই দিলাম এবং গালি দিলাম কেন্দ্রীয় সরকারকে। মুদ্রা দুইটার চক্রাকৃতি প্রায় এক করিবার কি দরকার ছিল, যখন দামের দিক দিয়া একটা আর একটার কোমরের কাছাকাছি মাত্র? সেণ্ট পারসেণ্ট লস্ করিয়া আমার মুখখানা নিশ্চয়ই তোলো-হাঁড়ির মতই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উপরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু ছানাবড়ার মতই গোলাকার হইয়া গেল বোধ করি।

গৃহিণীর মাথা ধরিয়াছে!

তিনি চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন।

ডাকিলাম, কিন্তু কথা বলিলেন না।

আর বেশি কথা বলিয়া তাঁহাকে চটাইবার মত উজবুক আমি নহি। দেখিলাম, পাখাটা আস্তে আস্তে ঘুরিতেছে—তাড়াতাড়ি রেগুলেটর ঘুরাইয়া পাখাটাকে বন্ বন্ করিয়া জোরে ঘুরাইয়া দিলাম।

তাঁহার মাথাটা টিপিয়া দিবার কথাও মাথায় আসিয়াছিল বইকি; কিন্তু দেখিলাম, ছেলেমেয়ে দুইটা আমাদের আশেপাশেই ঘুরিতেছে। আর দেখিলাম, কমলুর হাতে সুতায়-বাঁধা একখানা ছোট কাঠের চাকতি। তাহার অভ্যস্ত হাতের কায়দায় চাকতিখানা বন্ বন্ করিয়া খুলিয়া গিয়া আবার শন্ শন্ করিয়া সুতা গুটাইয়া তাহার হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িতেছে।

যাক, এই বয়সেই ছেলেটা চাকাকে রীতিমত হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তবু ভাল।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

'দনুজমর্দন'-সমস্যা

বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে বাঙালী ঐতিহাসিক-সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্‌ নন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায় ঐতিহাসিক নন। তদুপরি বাংলা দেশের বঙ্গাল রাজারা এমনই সব পণ্ডিতের শরণ নিয়ে দানপত্র বা প্রশস্তিপত্র লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, বর্তমান সংস্কৃত ব্যাকরণ-সূত্রের সঙ্গে যাঁদের অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাংলা দেশ সংস্কৃতভাষা চর্চার দেশ নয়—তা যদি হ'ত, তা হ'লে চর্যাপদ বা প্রাকৃতপৈঙ্গল সংস্কৃত ভাষায়ই লেখা থাকত। আসাম-রাজ বলবর্মা (যিনি হয়তো বাংলা দেশের দেবপালের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন) কালিদাসের রঘুবংশের কিয়দংশ প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ করেছিলেন, কিন্তু তারও ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। দরদী সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিতমহল এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ঐতিহাসিকের অভাবে এবং অনুশাসন-প্রশস্তি প্রভৃতির নির্ভুল পাঠোদ্ধার হয় নি ব'লেই আজ পর্যন্ত বাংলা দেশের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হ'ল না।

তা ছাড়া আর একটি বিষয়ও উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলা রাষ্ট্রের সীমানির্দেশ করতে অদ্যাবধি কেউ অগ্রসর হন নি। ব্রিটিশ-শাসন বাংলার যে ভৌগোলিক চেহারা তৈরী ক'রে গেছে, তা যে কয়েক দিন আগেও ছিল না, বাংলার ইতিহাস-প্রণেতারা সে কথাটি অধিকাংশ প্রসঙ্গেই স্মরণ রাখতে পারেন না। পঞ্চগৌড়ের সংজ্ঞা নিরূপণ তো দূরের কথা—'গৌর' আর 'গৌড়' যে নিকট সম্পর্কিত শ্রীহট্ট এবং মালদ—এই প্রাথমিক ভূগোল-জ্ঞানটিও অনেক ঐতিহাসিকের নেই। সুতরাং আজ যদি খেদোক্তি করি—বাংলার ইতিহাস রচিত হয় নি, তা হ'লে বলব যে, খেদ-উদ্রেককারী আর কেউ নন, আমাদের দেশেরই ইংরেজী-জানা ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

পণ্ডিত সজ্জনরা মিলে-মিশে বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে পারবেন ব'লে আমাদের আজও আশা আছে। অবশ্য আশা যে মাঝে মাঝে অন্তর্হিত হয়ে যায় না, এমন নয়। পাণ্ডিত্যের (কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য, তা ঠিক বলা যায় না) ত্রুটি এইখানে যে তা

পণ্ডিতদের মনে একটি বিশেষ ধরনের মতবাদ তৈরী ক'রে তোলে। রাংলার তথা ভারতের ইতিহাস বিপরীতমুখী মতবাদেরই বিতণ্ডা। যোগ-সাধন করবার অভিপ্রায় ঐতিহাসিক-মণ্ডলে অনুপস্থিত। আমাদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের হেতু তা-ই।

সম্প্রতি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন বিতণ্ডারই পুনরাবির্ভাব দেখতে পেলাম। রাজা গণেশ আর চণ্ডীপরায়ণ দনুজমর্দনদেরকে নিয়ে ৺রাখালদাস এবং ৺নলিনীকান্ত এক পশলা বিতর্ক ক'রে গেছেন, কিন্তু কিছুই ফয়সালা করতে পারেন নি। হয়সল যাদবদের নিয়ে ঐতিহাসিকরা সত্যি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। বল্লাল লক্ষ্মণ-সেনী সৈন্ভরা 'গর্গযবনান্বয়' হয়ে এমনি বিভ্রমের সৃষ্টি করেছেন (বিশ্বরূপ সেনের মদনপর-শাসন দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ দুই 'পালে' বাংলার রণতরী সাজিয়ে নিয়ে ঐতিহাসিকদের এমন মুশকিলেই ফেলেছেন যে, বাংলায় তুর্কী মুসলমানরা এসেও এমন মুশকিলে পড়েছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা দেখলেন, লক্ষ্মণসেনের পাত্রমিত্ররা কামরূদে (কামরূপে) আর শঙ্কনাটে (কম্বুজের অপর নাম) পালিয়ে গেলেন, যাভানীদের সঙ্গে মিশে যবন হবার জন্যে। চড়াও করতে গেলেন কামরূপ, গিয়ে দেখলেন তাঁদেরই মত তুর্কী মেচ-কোচ-থারু জাতির বসবাস সেখানে—রাজা হলেন কোচ হিন্দু। হিন্দু কোচ আর ব্যাকট্রিয়ার 'কুচা' একই জাতি। ব্যাকট্রিয়া থেকে এসেছিল ব'লে তারা মেচ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ হয়েছিল। কোচরা হলেন চুটিয়া-গার্গ-সেবী—সেই প্রাচীন গার্গী সংহিতার শুঙ্গ এবং শূর পালগোষ্ঠী। তাঁরাও একদা যবন গ্রীকদের 'হুস' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলেন। যাক, কোন প্রকারে মেচ-দের আশ্রয়ে তুর্কী বক্তিয়ার কামরূপ থেকে বেঁচে ব'র্তে দিনাজপুরে এসে পৌছুলেন। যে 'পঙ্গ' জাতি থেকে অহোম রাজবংশের উৎপত্তি, তাঁরা 'পাঙ্গা' ব'লে আজও উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এই 'পাঙ্গা'র সঙ্গে মহীপালদেবের (১ম) 'আল' (আলবাল) শব্দ যুক্ত হয়ে 'পাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' শব্দের জন্ম দিয়েছিল। নালন্দা-তোরণ-লিপি পাঠে জানা যায় তিনি ম্লাবন্য-দেশাগত পাল।

মনে হয় এই 'পাজা'রাই দিনাজপুরের 'মেচ' বা ভুঁয়ার কোচ জাতি। আর এঁরাই দিনাজপুরের 'সদাসেন' এবং দনুজমর্দনদেবের জন্মদাতা। লক্ষ্মণসেন-নন্দন মাধবসেন-কেশবসেন থেকেই চণ্ডীপরায়ণ দনুজমর্দনদেব আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁর মাতৃকুল ছিল 'পাল' বা 'পাজা' ভূস্বামী বংশ। পাঠান আমলে পাল বংশে 'নরনারায়ণ' কোচ-রাজ হিসেবে কামরূপে এবং 'মহানাদে' বিদ্যমান ছিলেন। বারো ভুঁইঞা (দ্বাদশ-মন্ত্রী) প্রথাটি বাংলা দেশে নরনারায়ণই প্রবর্তন করেন। নরনারায়ণের বারো ভুঁইঞারই এক ভুঁইঞার মত ছিলেন শঙ্কর, যিনি আসামের রাজমন্ত্রী-বংশজাত এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের সঙ্গে যাঁর দেখা হয়েছিল। শঙ্কর বৈষ্ণব-ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ ছিলেন 'রাজধর'। 'শ্রীরায়রাজ্যধর' নামে কথিত ব্যক্তিটি হয়তো শঙ্কর-পিতামহ 'রাজধর'। তিনি রাজ্যচ্যুত পিতার সন্তান—অহোম প্রবেশে তাঁর পিতা 'সন্তষ্ণ'-র রাজ্যচ্যুতি ঘটে। আসামে মুসলমান আক্রমণ খুব বেশি সাফল্য লাভ করে নি। গৌর বা শ্রীহট্টে তুর্কী ঘাঁটি ছিল, কিন্তু তুর্কীদাস বলবনকে অলতমশের মৃত্যুর পর তা-ও দনুজ রায়ের হাতে দিয়ে চ'লে যেতে হয়। (এলিয়টের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) তখন বর্ণসঙ্কর রাজধর বা দাস-রাজের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে দনুজরায় বা দনুজমর্দনদেব কেশবসেনের পর হয়তো রাজ্যভোগ করেন, তারই উল্লেখে আইন-ই-আকবরীতে এবং বিশ্বরূপের দানপত্রে 'স-দাসেন' কথাটির ব্যবহার হয়েছিল ব'লে মনে করা যায়। তা ছাড়া 'চলদী'-রীতিতে পুত্র আর দাস সমানার্থক। শূরপাল গ্রীক নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু মহীপালের নালন্দা লিপিতে দেখা যায় তাঁর দেহে 'চলদীয়ন' রক্ত ছিল। বিষয়টি ঐতিহাসিকরা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। অহোম-রাজরা যেটুকু লক্ষ্মণসেনী রক্তের অংশীদার ছিলেন, তার বলে এমনই বলবান হয়েছিলেন যে, আসামে পাঠানকে প্রবেশ করতে দেন নি। আর সেদিন বাংলা দেশ বলতে আসামকেও বোঝাত। বাংলার 'দনুজমর্দন' সমস্যাটি আসামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সমাধান করা যায় ব'লেই আমার ধারণা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৩৬০

একটি বছর হইল গত
পতাকা এখনও হয় নি নত।
বেড়েছে কমেছে চালের দর,
ভেঙেছে গড়েছে কত না ঘর,
মরিল কত যে বাঁচিল কত,
ঝরিল রক্ত, সারিল ক্ষত,
উঁচু উঁচু আছে, নীচুরা নীচু,
একঘেয়ে তবু হয় নি কিছু।

আকাশে পুরানো তপন তারা
ঢেলেছে নূতন কিরণধারা,
পুরানো নদীতে নূতন বান,
পুরানো পাখীর নূতন গান,
পুরানো প্রেমের নূতন সুর,
পথের ক্লান্তি করেছে দূর।

জেনেছি আমার দুঃখ ভয়
আমারই সৃষ্টি, পরের নয়।
যখনই দিয়েছি সার ও জল,
ফুটেছে ফুলেরা, ফলেছে ফল।
দিয়েছি যেটুকু পেয়েছি ফিরে
বিশাল প্রেমের সাগর-তীরে,
পেয়েছি দিয়েছি নিয়েছি কত,
পতাকা এখনও হয় নি নত।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৬০ বঙ্গাব্দ, শকাব্দ ১৮৭৫। 'শনিবারের চিঠি'র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে আর ছয় মাস বাকি। রজত-জয়ন্তীর কথা চিন্তা করিয়া আমরা এখন হইতেই নববর্ষের শুভকামনার সঙ্গে আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক-লেখক-পাঠক-সংগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা উৎসাহদাতা সকলকেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি; তাঁহাদের কৃপাবঞ্চিত না হইলে আমাদের পঁচিশ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ ষাট এবং ষাট একশত হইবে অর্থাৎ রজত স্বর্ণ, স্বর্ণ হীরক এবং হীরক অমৃত হইবে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম বৎসর পূর্ণ হইলে আমরা রহস্যচ্ছলে ভাবী শতবার্ষিকীর কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
আজিকে সেই কল্পনাতে রঙ ধরে মোর মন-খানাতে
বাতাস বহে নৃত্যচপল ছন্দ-ঝনৎকার।
মনের সে রঙ ছড়িয়ে পড়ে সব মাসিকের পাতার 'পরে
আকাশ-পথে হকার কহে, আজকে শনিবার।
শহর গ্রামে পথের বাঁকে 'শনির চিঠি' উচ্চে হাঁকে
কেউ বা খুশি, খোঁচা খেয়ে কারো বা মন ভার।
ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার।"

আমাদের সেদিনকার কৌতুক-কল্পনা বাস্তবে ওয়ানফোর্থ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই অঘটন যাঁহাদের সাহায্য সহানুভূতি ও সদিচ্ছায় সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই আজ আমাদের স্মরণীয়; এ কথাও আজ যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, যে অপর পক্ষ বিরোধিতার দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

* * *

১৩৬০ বঙ্গাব্দ। বিগত ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের একটা সালতামামি দিবার বাসনা হইয়াছিল; কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, মহাকালের

পদাঘাতে যিনি বহিষ্কৃত হইলেন সেই মৃত ও অতীতকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। যিনি গিয়াছেন, তাঁহার শান্তি হউক। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়াই আমরা বিব্রত। ভবিষ্যতের কথাই কিঞ্চিৎ চিন্তা করি।

পঞ্জিকা বলিতেছেন, এই বৎসরে ভৃগু রাজা, চন্দ্র মন্ত্রী, মতান্তরে চন্দ্র রাজা, বৃহস্পতি মন্ত্রী। যে মতই ঠিক হউক, পৃথিবীর ভাগ্যে এবার চন্দ্রাধিক্য; আমাদের নিকটতম পৃথিবী ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে চন্দ্রের প্রভাব ইতিমধ্যেই প্রকট হইতেছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং পাকিস্তানের নাজিমুদ্দীন-মহম্মদআলি সংঘর্ষ চাঁদেরই খেলা। একজন বিশেষ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি এই পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদিগকে একটি 'নোট' পাঠাইয়াছেন, আমরা নিম্নে সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া পাঁচশালা-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি :

সরকারী বড়কর্তাদের নির্দেশ ছিল, এবার জাতীয় সপ্তাহে পাঁচশালা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে। সেই কারণে বেতারে ও জনসভায় মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা পাঁচশালা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতার ঝড় বহাইয়া দিলেন। আমরা বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু পাঁচশালা-পরিকল্পনাটা যে কি তাহা এখন পর্যন্ত দেখিতেই পাইলাম না। কার্যক্ষেত্রে দেখার কথা বলিতেছি না, আপাতত সহজবোধ্য ভাষায় কাগজে কলমে দেখার কথাই বলিতেছি। শুনিয়াছি, উপরমহলে এ বিষয়ে যে তিন ভল্যুম বই বিতরিত হইয়াছে তাহা এম.পি.রা বালিশ হিসাবে (বালিশ কথাটা বাংলা অর্থে ব্যবহৃত; সংস্কৃত অর্থে নিশ্চয়ই নয়) ব্যবহার করিতেছেন। জনসাধারণের সহযোগিতা পাইতে হইলে আগে জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে, এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ইতিমধ্যে পুরানো 'পাঞ্চে'র পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দুইটি অমূল্য জিনিস চোখে পড়িল। যাঁহারা পাঁচশালা-পরিকল্পনা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি এই সব দুরূহ জিনিস কি

তাকে বোঝানো উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ। এক পিতা তাঁহার পুত্রকে আর্ট-সমালোচনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন; সে উপদেশ এখানেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য:—

Keep it general. Don't particularise. Don't say Rubens mixed his reds badly and was hopeless at drawing fish. People may contradict, or even challenge you to produce a fish drawn by Rubens. But there is no risk at all in saying that Ruben's essential objectivity and relentless refusal to lend himself to an animistic conception of nature owed nothing to Bellini's integrity of purpose and still less to Benozzo Gozzolli's forteen-century *bravura*. Nobody is likely to ask what you mean.

দ্বিতীয়টি প্ল্যানিং সম্বন্ধে একটি কবিতা। ইংলণ্ড লইয়াই কবিতাটি রচিত। কিন্তু সত্য সর্বত্রই সমান, একটু আধটু বদলাইয়া দিলেই ভারত সম্বন্ধে বেমালুম খাপ খাইয়া যায়। কবিতাটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ 'ইংলণ্ড' স্থলে 'ভারত,' 'ওয়েলসে'র স্থলে 'নেহেরু' ও 'বেভিনে'র স্থলে 'নন্দ' এই কথা কয়টি বসাইয়া লইবেন:—

The rights of Man! The right to Plan!
The right of you and me
To fight the Plan that fights to ban
The right to liberty!

When I have planned the Social Man
And you have planned his Bride
We shall, I think, have travelled far
And both be satisfied.

* * *

The Rights of Man! The right to ban
The right to be mistaken!
The right to plan a Partisan
For bringing home the bacon!

Then who will plan to scrap the soil
And nationalise cheese?
And who will plan for milk to boil
At twenty-five degrees?

Oh, who will plan the right of Man
To walk about on legs ?
And who will plan a frying-pan
For dehydrated eggs ?

And who will plan a Clergyman
Who won't discourage Sin ?
And who will plan a Pelican
Without a double chin ?

And who will plan a Football Fan
Who criticises Proust ?
And who will plan an odd-job Man
And get him mass-produced ?

And who wil plan to spray Milan
With chlorinated tar ?
And who will plan for astrakhan
To grow in Zanzibar ?

The Rights of Man ! The right to Plan !
The Right to know and see
The Plan-made Thing, the Man-made Thing
That England is to be !

When Wells has reached Utopia
With Bevin at his side,
They will, I think, have travelled far
And both be satisfied !

* * *

বিগত বৎসরে যে কয়টি শব্দ আমাদের ম্যাশনখির মস্তিকে ঘূর্ণিপাক তুলিয়াছিল, যথা—ভিয়েটনাম, পানমুনজন, মাউমাউ, কিকুউ, জেমো কেনিয়াট্টো—সেগুলি ধীরে ধীরে আমাদের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও এই বৎসর বাহাত্তরকে ঠেকাইতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের কোন অশীতিপর বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের পুনর্বিবাহ যোগ আছে। লেডি মাউণ্টব্যাটেন

তিনবার ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিবেন। কৃশীর ম'রে ম'রে গুরুতর লড়াই বাধিবে, চীনা ম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইবেন। এভারেস্ট-বিজয়াকাঙ্ক্ষী একুশ জন বীরপুরুষের মৃত্যু ঘটিবে। আচার্য যদুনাথ সরকারের বাংলা 'শিবাজী' গ্রন্থের জন্য, অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র জন্য এবং ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ'র জন্য এই বৎসর রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বাংলা দেশের যাবতীয় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক অর্থাৎ কথা-সাহিত্যিক ও কবি বিবিধ বিষয়ে গবেষণার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন, ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীজওহরলাল নেহেরু এই বৎসরে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল উড়িবেন এবং লোকসভায় ও বিভিন্ন জনসভায় তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ্য ইংরেজী ও উর্দু শব্দ উচ্চারণ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রভাব হ্রাস পাইবে। নেপালের রাজা ত্রিভুবন ত্রিভুবন দর্শন করিবেন, এবং মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজাগোপালাচারী বেদান্ত বিষয়ে একখানি বই লিখিবেন। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেকের মর্মরোগ ও মাদাম চিয়াং-কাই-শেকের চর্মরোগ এ বৎসর সারিবে না। রাজা ফারুক ও রাণী নরিমানের বিবাহ-বিচ্ছেদঘটিত সমস্যার সমাধান হইবে না। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের সিন্‌থেটিক বৃষ্টির মত সিন্‌থেটিক চাউল-নির্মাণও এই বৎসর সফল হইবে না। বোস-আইনস্টাইনে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অ্যাটম বোমার আণবিক বিকিরণে পৃথিবীর অনেক ছাগল দাড়িশূন্য হইবে। চার্লি চ্যাপলিন অতঃপর চার্লস্‌ চ্যাপলিন নামে পরিচিত হইবেন। ডক্টর গ্রেহাম একটি বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল উপহার পাইবেন। ওরেল একুশটি সেঞ্চুরি করিবেন। বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দার্জিলিঙে দেশবন্ধু-স্মৃতিরক্ষায় সফলকাম হইয়া ব্যারাকপুর-মণিরামপুরে ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভগ্নপ্রায় বাসভবন সংস্কার ও সংরক্ষণে যত্নবান হইবেন।

আরও অনেক খবর আমরা দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে

পঞ্জিকা ও ইয়ার-বুকের এলাকায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহা আমরা করিতে চাহি না। যেহেতু আমরা ১৩৬০ সালের 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' 'জগজ্জ্যোতি পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী' ও 'বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিমিটেডের পঞ্জিকা' এবং এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেডের 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক ১৯৫৩' ও এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিমিটেডের 'কারেণ্ট অ্যাফেয়ার্স ১৯৫৩' উপহার পাইয়াছি, আমাদের সহৃদয় পাঠকদিগকে সেগুলিই কনসল্ট করিতে বলি। অনেক সংবাদ তাঁহারা পাইবেন ও পাইয়া চমকিত হইবেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক পরিষদ্ বা "একাডেমি" স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। অব্যবস্থা যতই থাকুক, উদ্যম প্রশংসনীয়। সদস্যনির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই, তবে তাহার প্রতিকার সহজ। নাট্য-বিভাগে আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্থান সর্বাগ্রে হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, কালে সমস্ত অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা দূর হইবে এবং সমগ্র ভারতের উপযুক্ত শক্তিশালী শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিষদ্ গড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠন যথোপযুক্ত করিতে হইলে প্রাদেশিক পরিষদ্ গঠন একান্ত আবশ্যক। একতলায় শক্ত খুঁটি না হইলে দোতলায় "হল" নির্মাণ সম্ভব নয়। প্রাদেশিক সরকারের এ বিষয়ে উদ্যম দেখিতেছি না। বিধান সরকার বাংলা দেশে একেবারেই তৎপর নহেন, বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কতকটা তৎপর হইয়াছেন বলা যায়। সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত-আসর ও চিত্র-প্রদর্শনী মারফৎ তাঁহারা জাতীয় সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সরকারী সাহায্য ব্যতীত সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির পরিষদ্ গঠন ও নিয়মিত পরিচালন সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রদেশে পরিষদ্ গঠিত হইলে তাঁহারাই সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবেই সত্যকার সর্বভারতীয়

-কেত্র গঠিত হইবে। আমরা এ বিষয়ে বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর সহৃদয়তা-সহকারে বাংলা দেশের সাহিত্য এবং ইতিহাস বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার প্রসারকল্পে বৎসরে বৎসরে রবীন্দ্র-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সকলেরই উৎসাহিত হইবার কথা। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে পুরস্কারের ফলাফল যেরূপ ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে সাহিত্যিকদের ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সন্দেহ হয়, বিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নাই। একজন মাত্র প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক পুরস্কৃত হইয়াছেন, তাহাও মৃত্যুর পর। আমরা আগেও বলিয়াছি—সাহিত্যক্ষেত্রে সন্তপ্রসূত বই লইয়া বিচার সমীচীন নয়; সমগ্র জীবনের দান লইয়া সাহিত্যিকেরই বিচার হওয়া উচিত। সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চাসনে বসিতে পারেন এমন কথা-সাহিত্যিক বর্তমানে বাংলা দেশে একাধিক আছেন, সুষ্ঠু অনুবাদের জোরে ইঁহারা নোবেল পুরস্কারও দাবি করিতে পারেন; অথচ তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইতেছেন। বিচারকদের ব্যক্তিগত বিরূপতা এইরূপ ঘটাইতেছে ইহা আমরা সন্দেহ করিতে পারি। এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কয়েক জন একচক্ষু লোক একত্র হইয়া বৎসরে বৎসরে সমগ্র সাহিত্য-সমাজকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, এরূপ ঘটিতে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে উচিত হইতেছে না। গবেষণার বিচারে ইঁহাদের বিচার আমরা মানিয়া লইতেছি, কিন্তু সাহিত্য—সৃষ্টিমূলক শিল্প বিষয়ে ইঁহারা অনধিকার চর্চা করিতেছেন। সাহিত্য-বিচারে নূতন বিচারক মণ্ডলী গঠন করিয়া এই অন্যায় অবিলম্বে নিবারিত হওয়া প্রয়োজন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা'র একদিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, মহামান্ত স্টালিনকেও হত্যা করা হইয়াছে এইরূপ সন্দেহও কোন কোনও বামপন্থী মহল করিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একটা কথা আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, স্টেট অব ডেনমার্কের কুশল সর্বাঙ্গীণ নয়। যখন সমগ্র রুশিয়া মহামান্ত স্টালিনের সাম্যবাদী শাসনে সুখী ও নিরাপদ—বহিঃপৃথিবীতে এইরূপ প্রচার, তখনই সংবাদ পাওয়া গেল কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কয়েকজন ডাক্তারে মিলিয়া তিলে তিলে হত্যা করিয়াছেন। সংবাদ খোদ রুশিয়ার। ডাক্তারেরা ধৃত হইলেন, তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম সব-পেয়েছির দেশেও এইরূপ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অবকাশ এখনও আছে। তারপর মহামান্ত স্টালিন যেই দেহরক্ষা করিলেন অমনই সংবাদ প্রচারিত হইল, মিথ্যা মিথ্যা, ডাক্তাররা নির্দোষ, হত্যাকাণ্ডে ডাক্তারদের মিথ্যা করিয়া জড়ানো হইয়াছে। মহামান্ত স্টালিন বাঁচিয়া থাকিতে এ সংবাদ জানা যায় নাই, না, চাপিয়া রাখা হইয়াছিল জানি না। যদি শেষের অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, হত্যা-ষড়যন্ত্রের সহিত খোদকর্তাদেরই যোগ ছিল। তাহার পর এই স্টালিন-হত্যার গুজব। আমরা তাজ্জব বনিয়া যাইতেছি এই ভাবিয়া যে, যাহা মিশরে ইরানে আফগানিস্তানে সম্ভব রুশিয়াতেও তাহা অসম্ভব নয়; সেখানকার দেবতা বলিয়া বর্ণিত সকল মানুষ দেবতা নয়, শয়তানও আছে। দেবতা ও শয়তান এখানে ওখানে সেখানে সর্বত্রই যখন আছে,তখন নূতন চক্কানিনাদী পন্থায় বিশেষ ফল হইল কি। চাষী কবি বার্নসের কথাই ঠিক, ক্যাপিটালিস্টই হউক আর কমিউনিস্টই হউক "ম্যানস এ ম্যান কর অ' ত্থাট।"

—

স্থবির স্থবিরকে স্থবির বলিতেছেন—ইহাতে আমাদের আপত্তি করিবার নাই। বৈশাখের 'প্রবাসী'র "বিবিধপ্রসঙ্গে" আমাদের

চির-যৌবন বিধানচন্দ্রকে "স্থবিরচূড়ামণি" বলা হইয়াছে। বুড়ার বুড়ার ইয়ার্কি আমরা উপভোগই করিতে পারি, কোনও মন্তব্য সমীচীন নয়। কিন্তু বুড়া হইলেও 'প্রবাসী' "নববর্ষ"-প্রসঙ্গে কয়েকটি নবীন তাজা কথা বলিয়াছেন, যাহা বাঙালী জাতির প্রত্যেকের শোনা উচিত। 'প্রবাসী' বলিতেছেন :

"যদি ১৩৬০ সালে দেশের লোকের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়; যদি ব্যর্থতার অবসাদ দূর করিয়া নূতন বৎসরে নব উদ্যমে তাহারা স্বকীয় শক্তিতে নিজের ও দেশের পরিত্রাণের পথ সুগম করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তবেই ভরসা আছে, নচেৎ নহে। পশ্চিম বাংলার সন্তান যেদিন বুঝিবে যে সে উদ্দাম ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহার ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই খোয়াইতে বসিয়াছে এবং বর্তমানের কঠোর সমস্যাপূর্ণ বাস্তবকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার উপায় নাই, সেদিন হয়ত তাহার চেতনার সঞ্চার হইবে।

"বাংলার বাহিরে যেদিকে দেখি সকলেই নূতন উদ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হস্তে গড়িতে চেষ্টিত। বাঙালী ভিন্ন অন্য সকল সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রেও তাহাই ঠিক। আমাদের পাঁচ বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি পঞ্জাবী, সিন্ধী, সীমান্তপ্রদেশীয় ও বাহাওয়ালপুরী উদ্বাস্তুর দল সক্রিয়ভাবে নিজেদের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশ বেশ কিছু সাফল্যলাভও করিয়াছে। তাহারা কোন দলের ক্রীড়াকন্দুক হইতে রাজী হয় নাই বা অলীক প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া বাস্তুঘুঘুর শিকারও হয় নাই। একথা বলা ভুল হইবে যে, তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে বা তাহারা পূর্বেকার সঞ্চিতের দশমাংশও ফিরিয়া পাইয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা চলে যে তাহাদের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক অধোগতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই নূতন জীবনের পথে অগ্রগামী হইয়াছে। বাঙালী উদ্বাস্তু সে হিসাবে বহু বহু পিছনে, এবং তাহার কারণ সে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া সর্বস্ব খোয়াইতেছে।"

আমরা বরাবরই "মহান্ স্টালিন", "মহামান্য স্টালিন", "সর্বজ্ঞ স্টালিন" ইত্যাদি শুনিতেই অভ্যস্ত। বাংলা দেশে প্রগতিশীল কবিদের সাম্প্রতিক কাব্যে এমনও পড়িয়াছি যে, প্রিয়ার গালের টোল, কপোলের লালিমা, এমন কি সুপ্রসবও মহামান্য স্টালিনের দয়ায়। ইঁহারা স্টালিনকে কেহ দেখেন নাই, ধ্যানে জানিয়াছেন। এই অবস্থায় স্টালিনের তিরোধানের পর হঠাৎ যদি শুনি স্টালিন ভোঁতা, স্টালিন নীচুদরের লোক, তাহা হইলে চমকাইতে হয় বই কি। এ কথা বলিতেছেন এমন লোক যিনি স্টালিনকে দেখিয়াছেন। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। 'যাত্রী' নামে তাঁহার আত্মজীবনী 'চতুরঙ্গে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। 'চতুরঙ্গে'র সম্পাদক হুমায়ুন কবির—ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। সংখ্যাটি যদিও কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯, ইহা বাহির হইয়াছে স্টালিনের তিরোধানের পর। সুতরাং 'চতুরঙ্গে'র উক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিভ্রান্ত হইয়াই প্রশ্ন করিতেছি, ইহা কি ঠিক? অনেকগুলি কটূক্তির মধ্যে একটিমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি:

"স্টালিনের মতো নিজেকে দুষ্প্রাপ্য করে তিনি কখনও নিজের কদর বাড়ান নি। কাছ থেকে দেখে যার ব্যক্তিত্বের আলো মরীচিকা বলে বোধ হয় বুখারিণ সেই স্টালিন-জাতীয় লোক ছিলেন না আদবেই। যত কাছে গেছি তত তাঁর আলো আরও জ্বলজ্বল্ করে উঠেছে। তখন আমি বুঝি নি যে, তাঁর মনেও ঝড় উঠেছে, তিনিও স্টালিনের হিংস্রতা ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তখন ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে স্টালিনের লড়াইয়েতে বুখারিণই যুক্তি যোগালেন স্টালিনের অপকর্মের যে সমালোচনা করছিলেন ট্রট্স্কি সেই সমালোচনার উত্তরে। স্টালিনের সেই কদর্য হিংস্রতাকে সমর্থন করে যে দুর্বলতা দেখালেন বুখারিণ সেই দুর্বলতা যে শুধু তাঁকে আর আরও অনেক বিপ্লবীদের হত্যা করবার সুযোগ দিল স্টালিনকে তা নয়, সেই দুর্বলতা কমিউনিজমকেও মারাত্মক আঘাত হানল। দুর্বলতার

দেনা বুখারিণ তাঁর জীবন দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করেছেন, শোধ হয়ত হয় নি আজও, নইলে আজও স্টালিন হত্যার পর হত্যা, বর্বরতার পর বর্বরতা বেপরোয়া ভাবে করে চলেছে কি করে? ১৯৩০ সালে আমি যখন আবার মস্কোয় যাই তখন বুখারিণের কথা জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে তিনি আর স্টালিনের নেক নজরে নেই। স্টালিন তাঁকে দিয়ে ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে লড়াইটা চালিয়ে নিয়ে যেই ট্রট্স্কিকে হারিয়ে দিল অমনি তখন বুখারিণকে কি করে সরানো যায় তার জন্য ষড়যন্ত্র সুরু ক'রে দিল। স্টালিন যে কত ভোঁতা কত নীচুদরের লোক এটা যারা বছরের পর বছর তার সঙ্গে ওঠা-বসা করে জেনেছে তারা বেঁচে থাকতে তার নগণ্য অতীতের উপর স্টালিন চিরকালের মত ঢাকনা দিয়ে দেয় কি করে? কি করেই বা এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বড়লোক এসেছেন তাঁদের সকলের চেয়ে জ্ঞানে, প্রতিভায়, শৌর্যে, বীর্যে, নিজেকে বড় বলে চালিয়ে দেয় স্টালিন? স্টালিনের মত লোকেরও তো নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে।"

* * *

এই দেশের কয়েক জন নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি রুশ-রুবুল-বাক্যিণ্যে সে দেশ দেখিয়া আসিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন: লৌহ-পরদা বলিয়া সেখানে কিছুই নাই, সর্বত্রই খোলামাঠ। অথচ সৌম্যেন্দ্র-নাথ বলিতেছেন:

"পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যে সব কমিউনিস্টরা সোভিয়েট রাশিয়ায় যান তাঁদের উপর কমিনটার্নের নজর থাকে খুবই কড়া। কমিনটার্নের ফরমাসি আধগজি দাঁড়ে বাঁধা বুলির ছোলা চিবিয়েই তাঁদের দিন গুজরান করতে হয়।"

প্রতিবাদে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ডক্টর সৈফুদ্দীন কিচলু কি বলেন, শুনিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব আছি।

সৌম্যেন্দ্রনাথের মতে রুশ দেশে প্রোপাগাণ্ডা শিল্প ও সাহিত্যকে ধ্বংস করিতেছে। তিনি বলসই থিয়েটারে একদিন 'ক্রাসনিই মাক' লাল আফিংফুল) নামক একটি ব্যালে দৃষ্টে মন্তব্য করিতেছেন:

"প্রোপাগাণ্ডার কচুরিপানায় কলার লীলাস্রোত ঢাকা পড়ে গেল এই প্রোপাগাণ্ডাই কিন্তু পেল দর্শকদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন। ব্যালের স্রোতে যেখানে যেখানে প্রোপাগাণ্ডার কচুরিপানার অকারণ আবির্ভাব সেখানেই নেমে এল দর্শকদের করতালির ঘনবর্ষণ।"

হে সঞ্জয়, কোন্‌টা সত্য—দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে তাহা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া দাও।

—

রবির কিরণ মোরে ছুঁয়ে গেল কি,
  নব বরষের তরুণ প্রভাত-বেলা,
পথে যেতে আজ ওঠে কেন ঝলকি
  মনে অকারণ পুলক-খুশির মেলা!
মানুষের মন আপনি থামিতে চায়,
  থেমে পুনরায় চলিতে সে বাসে ভালো,
দু-একটি দিন তাই তার কামনায়
  উৎসব-দিন হয়ে পথে দেয় আলো।
প্রতি দিবসের হিসাবের খতিয়ান
  বন্ধ করিয়া খুশি হয়ে উঠে মন,
যেতে যেতে থেমে মেলে পথ-সন্ধান,
  তাই প্রয়োজন পরবের ইন্ধন।
হোক ইংরেজী, হোক সে মুসলমানী—
  কিছু মানুষের মনের হরষ লেগে
নিখিল জনের নন্দিত হয় প্রাণী,
  নবীন হরষে পুরাতন ওঠে জেগে।

—

পরিণামে কর, চিত্ত, পরম-আত্মার উপাসনা,
স্রষ্টা কারুশিল্পী নন, তুলি-রঙে আঁকেন না ছবি,
মৃতে জড়ে মৃত্তিকায় বুলাইয়া চিন্ময় ব্যঞ্জনা
এ বিশ্বের মহাকাব্য রচনা করেন মহাকবি।

সনাতনী প্রকৃতির অর্বাচীন জড়ত্ববিকারে
করেন বিচিত্রলীলা, সে অখণ্ড খণ্ড খণ্ড করি আপনারে ॥

জড়ত্ব বস্তুর ধর্ম ; ছায় বিশ্ব জড়ত্বের স্তূপে
সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা এ ধরণী মৃতের পঞ্জর—
কি অজ্ঞাত স্পর্শ লেগে শিহরায় জীবন-স্বরূপে
প্রাণ-পদ্মে ভরি উঠে মৃত স্তব্ধ বস্তুর সাগর।
সে রহস্য বুঝি না যে. হেরি প্রাণতন্ত্রের লীলা
পাষাণে উদ্ভিদে জীবে—একধারা, কভু স্ফূর্ত, কভু অন্তঃশীলা

কোথা তিনি বহ্নিমান্ কোটি কোটি আলোর কণিকা,
শূন্য হতে মহাশূন্যে বহে নিত্য তরঙ্গমালায়,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গরূপে এক মহাজ্যোতির্ময় শিখা
জড়ের অন্তরে পশি প্রাণরূপে তাহারে চালায়।
তুমি আমি সবই সেই একেরই অসংখ্য পরকাশ
জড়তার বিশ্বমাঝে বিশ্বাতীত নিত্যসত্য চিন্ময়ের শ্বাস ॥

বিশ্বব্যাপী এই অগ্নি, মূর্তি তার স্বতই ভীষণ
অনুভবে অনুমেয়, চোখে কেহ দেখিতে না পায়,
নিত্য আত্ম-বলিদানে অনির্বাণ হোম-হুতাশন
জড়েরে করিয়া ধ্বংস জীবনের জয়গান গায়।
ওরে ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত, ওরে শ্রান্ত, কান পেতে শোন্,
খণ্ডেরে অভয় দিতে সর্বব্যাপী অখণ্ডের সেই আবেদন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

অদ্বিতীয়
লিভার টনিক
"কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। "কুমারেশ" একটি অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।
কুমারেশ
লিভারকে সুস্থ ও সতেজ রাখে—
QUMARESH
ও, আর, সি, এল, লিঃ
সালকিয়া – হাওড়া

রসুই
দিয়ে রান্না করুন
রসুই
দিয়ে রান্না করুন
রসুই
দিয়ে রান্না করুন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ : দাম আট আ

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস

May-June : Price As. Eigh

সূচী

'শনিবারের চিঠি'র নূতন নিয়মাবলী

বার্ষিক ৬৲ ও ষাণ্মাসিক ৩৲ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৬।৵০ ও ৩।৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ১০॥০ ও ৫।০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ৷৷১০ ; ভি. পি.তে ৸৵০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়। পাকিস্তানে ভি. পি. করিয়া পাঠানো হয় না ; চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হয়

ব ন ল তা সে ন

ব না ন ন্দ দা শ

আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনানন্দ দাশ। বনলতা সেন এই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলন। আদি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র বারোটি কবিতা নিয়ে। সুরসঙ্গতি রক্ষা করে আরো আঠারোটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে এই সিগনেট সংস্করণে। একেবারে নতুন এই আঠারোটি কবিতা, গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সিগনেট বুকশপ, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

‘এসিয়া’ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয়:—আমি কেন কম্যুনিষ্ট নই?

পুরস্কার:—প্রথম ১০০৲, দ্বিতীয় ৫০৲, তৃতীয় ২৫৲ টাকা

১২০০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধটি লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধ পাঠানোর শেষ তারিখ: ২১শে জুন ১৯৫৩ ইং

বিশিষ্ট বিচারকগণ প্রবন্ধটি বিচার করিবেন এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই পুরস্কার ঘোষণা করা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার জন্য ‘এসিয়া’তে অনুসন্ধান করুন

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—শুধু ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা ১

সম্পাদক, ‘এসিয়া’

সার্থক
সৌন্দর্য্য
সাধনায়
কমনীয় মসৃণ তনু, স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল বর্ণগরিমা, ঘন চিকন রেশমী কেশগুচ্ছ, সুরভিসম্পৃক্ত বেশবাস ও মধুময় পরিবেশ, সৌন্দর্য সাধনার সুষমা পরিকল্পন। ক্যাল-কেমিকোর অনুপম প্রসাধনীই সৌন্দর্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
মলয় চন্দন সাবান
ক্যাষ্টরল সুরভিত কেশতৈল
সিল্কট্রেস তরল শ্যাম্পু
রেণুকা ফেস পাউডার
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার
য়ুডিকোলন
দি ক্যালকাটা
কেমিক্যাল
কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥•

সুকুমাররঞ্জন দাশ
হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥•

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ
শ্রীকালীচরণ সাহা
খাদ্যবিশ্লেষণ ॥•

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।•

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
ভাইটামিন ॥০
শারীরবৃত্ত ॥০

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
তেল আর ঘি ॥০
রসাঞ্জন ॥০

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ২।০
অভিব্যক্তি ॥০

শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগির
বেতার ॥•

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
গণিতের রাজ্য ॥০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
নক্ষত্রপরিচয় ॥০
নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥০

শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
সৌরজগৎ ॥০

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥০

সুশোভন দত্ত
বিশ্বের ইতিকথা ॥০

শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার
নভোরশ্মি ॥০

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
রমনের আবিষ্কার ॥০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিশ্বের উপাদান ॥০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৶
জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥০
ব্যাধির পরাজয় ১॥•

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
ভারতের বনজ ॥০

শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
ভারতের বনৌষধি ॥•

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
রঞ্জনদ্রব্য ॥•

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার
রসায়নের ব্যবহার ॥০

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস
ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥০

বিশ্বভারতী • ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

ঝক্‌ঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক
ও সুন্দর ডিজাইন
টেলিফোন বি, বি, ৬০১
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
৭০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিগত ২১ বৎসরে ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কস পুরাদমে কাষ করিয়া ১,০০০,০০০ এর অধিক পাখা তৈয়ারী করিয়াছেন। এই সমস্ত পাখা এখন ভারতে ও ভারতের বাহিরে বাড়ীতে ও অফিসে, কারখানা, রেলওয়ে, হোটেল, হাসপাতাল, ক্লাব, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ২১ বৎসরে প্রত্যেকটি আই-ই-ডব্লিউ পাখা উৎকর্ষতা ও অনন্যসাধারণ কার্য্যক্ষমতার গুণে পাখা ব্যবহারকারী প্রত্যেকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই প্রশংসা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজকাল প্রত্যেক পাখা ব্যবহারকারীই আই-ই-ডব্লিউ পাখা পছন্দ করিয়া থাকেন।
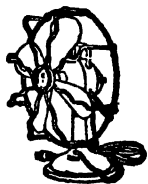
দি ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রীক ওয়ার্কস লিঃ

অফিস এবং কারখানা :

—প্রকাশিত হইল—

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মুস্কিল আসান

ছায়াচিত্রে রূপায়িত রস-মধুর উপন্যাস।

দাম—২॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

কলরব

জীবনের বিভিন্ন দিকে যে লজ্জা, যে অপমান এবং যে গ্লানি অলক্ষ্যে আবিল হইয়া উঠিয়া সকলের কণ্ঠ রোধ করিয়াছে—তাহারই কলঙ্কময় ইতিহাস।

নূতন চতুর্থ সংস্করণ। দাম—২৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

বিচারক দস্যু

রোমহর্ষক গোয়েন্দা উপন্যাস—রহস্যময় পরিবেশ।

নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম—২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ব্যোমকেশের রহস্যময় কাহিনীমূলক চারিখানি গ্রন্থ

ব্যোমকেশের কাহিনী ২॥০

ব্যোমকেশের ডায়েরী ২॥০

ব্যোমকেশের গল্প ২৲

দুর্গরহস্য ৩॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

PERMANENT
BLUE-BLACK
A HIGH CLASS
FOUNTAIN PEN
INK
Sulekha
SULEKHA WORKS LTD
CALCUTTA

কল্পনা!
কল্পনাই জগৎ শাসন করে, এই কথা বলেছিলেন নেপোলিঁও। এর অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, জাগতিক সব ঘটনার মূলে আছে মানুষের কল্পনা শক্তি। সেই কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে
KAVIRAJ N.N.SENS
keshranjan
oil
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশ তৈল
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং লিঃ।
কলিকাতা-১
K-I-53

ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিনীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে। দিনরজনীর বিচিত্র পরিবেশে সুরসৃষ্টির আবেদনটি এই রূপায়নে মূর্ত হয়ে আছে।

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, বল দিয়েছে, দিয়েছে নব নব প্রেরণা।

ললিত

প্রভাতের একটি সুললিত রাগিনী। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। দিবা ও রাত্রির চির-বিরহমধুর সন্ধিক্ষণটি ললিতের মূর্চ্ছনায় মূর্ত হয়ে আছে।

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

শনিবারের চিঠি
[illegible]শে বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

লাভবান কে ?

আমাদের একটি ছোটখাট লাইব্রেরি আছে। 'শনিবারের চিঠি'র বিনিময়ে, বিনিময়ের আশায় ও সমালোচনার্থ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা আসে, স্থানাভাবে সেগুলিকে লাইব্রেরির মেঝেতে জড়ো করিয়া রাখা হয়, বৎসরান্তে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটিকে বাছিয়া বাঁধাইয়া লই,—বাকিগুলি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াই থাকে এবং কিছুকাল পরে যখন এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে লাইব্রেরি-ঘরের এ-মোড় হইতে ও-মোড় আর সহজে চলাফেরা করা যায় না, সমস্ত ঘরের মেঝেটাই দুর্গম, এমন কি দুরারোহ হইয়া পড়ে, বায়ু-চলাচল রুদ্ধ হইয়া আসে, তখন অগত্যা "গৃহস্থদে"র নিত্য অনুযোগ কানে তুলিতে হয়, উপরি-লোভীদের প্ররোচনায় "শিশিবোতল-কাগজ-বিক্রি"র ডাক পড়ে এবং 'বলাকা'র "হে বিরাট নদী" মনে মনে আওড়াইতে আওড়াইতে কণ্টকে-নৈব কণ্টকম্ নীতির অনুসরণ করি। অর্থাৎ দরজার মাথায় কাঁটা লটকাইয়া পাল্লার ওজনের হিসাব লিখিতে লিখিতে ঘরের কাঁটা সাফ করি। ইহারই মধ্যে ওজন-তৎপর হিসাবী পরিজনদের নজর এড়াইয়া তড়িৎগতিতে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাগুলি সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। সব যে বাছিয়া লইতে পারি তাহা নয়, তবুও পুনঃসঞ্চয়ের পরিমাণ মন্দ দাঁড়ায় না। সম্প্রতি লাইব্রেরির কিঞ্চিৎ অদল-বদল সাধনের ব্যাপারে সেই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাগুলির কয়েকটি বাণ্ডিল হাতে আসিল। "সঞ্চয়ের অচল বিকার" এমন বিচিত্র হইতে পারে, এই পত্র-পত্রিকাগুলি এই ভাবে একত্র না দেখিলে তাহা অনুভব করিতে পারিতাম না।

এই অসম্পূর্ণ সংগ্রহ লইয়া নানাভাবে গবেষণা চলিতে পারে। শুধু পত্রিকার নাম, সম্পাদকের নাম, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যটুকু উদ্ধৃত করিয়া একটি তালিকা প্রকাশ করিলে ভবিষ্যৎ ব্রজেন্দ্রনাথদের অনেক দুঃখ-কষ্টের লাঘব করা যাইত; প্রশান্তচন্দ্রের সাংখ্যমতেও বহু চটকদার গবেষণার অবকাশ ছিল,

যেমন নামের সহিত পৃষ্ঠা-সংখ্যার অনুপাত, নামের সহিত আয়ুকালের সম্পর্ক, বর্ণভেদে লেখকদের সংখ্যা, ঋতুভেদে গদ্য-কবিতা ও পদ্য-কবিতার পরিমাণভেদ, গল্পের নায়কের যক্ষ্মা ও আত্মহত্যার শতকরা হার, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু গবেষণায় মতি হইল না। কেমন যেন একটা অসহায় বেদনা বোধ করিলাম। পত্রিকাগুলির মোট সংখ্যা ১৪৩, হিসাব করিয়া দেখিলাম তন্মধ্যে মাত্র সাতখানি কোনক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া টিকিয়া আছে, বাকি ১৩৬ খানি নিঃশেষে মৃত। ইতিমধ্যেই ইহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব চুকিয়া না গেলেও বিশ্বসংসারের অন্য সকলের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে। পত্র-পত্রিকার অকালমৃত্যু প্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়া থাকেন শুনি—বাংলা দেশ শিশুমৃত্যুর দেশ। আমরাও তাহাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিতাম—

> "জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
> জানি হে জানি তাও হয় নি হারা···"
> "ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত,
> তারা আজ কেঁদে শুধায়, সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
> ওগো, কও ফুটল কত।···"

কিন্তু সেই অনুতাপ অনুশোচনা ও সান্ত্বনার পথে মন গেল না। আমরা হিসাব খতাইতে বসিলাম, এই বিপুল জন্মাধিক্য ও ততোধিক মহামারীর দ্বারা লাভবান হইল কে বা কাহারা? লেখকরা কি? ১৪৩টি পত্রিকা ঘাঁটিয়া লেখকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিলাম। নামকরা অথবা পরিচিত লেখক কয়েকজন আছেন, তাঁহাদের লেখাগুলি পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিলাম, প্রায় সমস্তই বাঁ হাতের লেখা, বাজে লেখা। এই সব রচনা প্রকাশিত না হইলেই লেখকদের পক্ষে ভাল ছিল। বুঝিতে পারিলাম, অনুরোধ-উপরোধের দায় এড়াইতে না পারিয়া অথবা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে ইঁহারা পরিত্যক্ত লেখার দপ্তর ঘাঁটিয়া এগুলিকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, মনে মনে ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, পত্রিকার অকালমৃত্যু তাঁহাদিগকে

লজ্জার দায় হইতে রেহাই দিবে। দিয়াছেও। পত্রিকা-প্রকাশের অনেক পূর্ব হইতেই ইঁহারা খ্যাতনামা ছিলেন, সুতরাং খ্যাতির দিক দিয়া ইঁহাদের লোকসান হইয়াছে বই লাভ হয় নাই। আর্থিক লাভও এত সামান্য যে, গণনীয় নহে। বাকি অধিকাংশ লেখক-সম্প্রদায় সেদিনও যেমন অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিলেন, আজও ঠিক তাই। অর্থাৎ পত্রিকা-প্রকাশের পরিশ্রম ও ব্যয় তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, একমাত্র ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার আনন্দ ছাড়া ইঁহাদের কিছুই লাভ হয় নাই।

পত্রিকার অর্থকরী দিকটার ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন তাঁহারা যে লাভবান হন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। লাভ হইলে পত্রিকা বন্ধ হইত না। বহু কষ্টে কড়ি জোগাইয়া কয়েক সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইঁহারা জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এবং সাধু ও সজ্জন হইলে সম্ভবত এখনও খেসারৎ দিতেছেন।

প্রকাশক ও পরিচালকেরা সাধু ও সজ্জন হইলে সাদা কাগজের দোকানদার ছাপাখানা ও দপ্তরীরা ব্যবসায়ে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কানাঘুষায় শুনিতে পাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। নগদ-কারবারী হইলে অবশ্য ইঁহারা নিরাপদ, কিন্তু যে উৎসাহ ও আগ্রহ লইয়া তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায় পত্রিকা-প্রকাশরূপ গুরুতর দেশহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে আসেন— তাহাতে আত্মবলিদানের এমন মর্মান্তিক চেহারা ফুটিয়া উঠে যে, একাদশী বৈরাগীরাও দুর্বল হইয়া পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হন। এইরূপ সাবধানী কয়েকজন কাগজওয়ালা ও ছাপাখানাওয়ালাকে পরে বুক চাপড়াইতে দেখিয়াছি। দপ্তরীরা খুব মার খান বলিয়া মনে হয় না, কারণ অবিক্রীত কাগজের স্টক তাঁহাদের কাছে থাকে, তাঁহারা সেগুলি ওজনদরে বেচিয়া হয়তো প্রাপ্যের অধিক পাইয়া থাকেন।

অতএব চুলচেরা হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে, লেখক-প্রকাশক-পরিচালক-কাগজওয়ালা-ছাপাখানা-দপ্তরী—ইঁহারা কেহই বিশেষ লাভবান হন না, অনেকের ভাগ্যে লোকসানই ঘটিয়া থাকে। লাভবান কে হয়, আমাদের সাদা সহজ হিসাবে আগে তাহা ধরিতে পারি নাই।

কলিকাতার একজন খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকার সম্রাট-হকার এ বিষয়ে আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন। লাভবান হন একমাত্র তাঁহারা। তাঁহার স্পষ্টোক্তি এখনও আমাদের মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া আছে। তিনি বলিলেন, বাবু, আপনাদের চালু কাগজ বেচিয়া আমাদের লাভ সামান্যই থাকে, যাহারা পথেঘাটে হাঁকিয়া কাগজ বেচে তাহাদিগকে কমিশন দিতেই আমাদের লাভের অংশ চলিয়া যায়, নিজেদের দোকানে যে কয়খানা নগদ বেচি, তাহার পুরা কমিশনই আমাদের লাভ। টাকা মারিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীর সংখ্যাও বড় কম নয়। তাল করিয়া খতাইতে গেলে আমাদের কৃতজ্ঞ হইবার কারণ নাই। তবে হাঁ, আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন নতুন বাবুরা। তাঁহারা একা বা দল বাঁধিয়া কাগজ বাহির করিয়া দুশো পাঁচশো হাজার আমাদের কাছে জমা রাখিয়া যান। এক সংখ্যা—দুই সংখ্যা—তিন সংখ্যা। তাঁহারা তাগাদা করিতে আসেন, আমরা দুই-দশখানার দাম মিটাইয়া দিয়া বলি, দাঁড়ান বাবু, পাঁচ সাত মাস চলিয়া কাগজ চালু হউক তবে তো! আপনাদের কাগজ সব হকারদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছি, তাহাদের নিকট আদায়ে কিছু বিলম্ব হয়। বাবুরা খুশি মনে চলিয়া যান। হয়তো আরও এক মাস, তারপর আর আসেন না। নগদ বেচিয়া যাহা পাই তাহা সামান্যই, কিন্তু পুরানো কাগজ বেচিয়া আমাদের লাভ প্রচুর—বিনা মূলধনে লাভ। এই দেখুন না, ঠোঙাওয়ালারা আসিয়াছে, মুদীর দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে। ইহারা না থাকিলেও কাগজের মিলের সঙ্গে কনট্রাক্ট আছে। তা আপনাদের কৃপায় প্রত্যেক মাসেই দশ-পনেরটা এই ধরনের কাগজ আমরা পাই। তাহাতেই আমাদের চলিয়া যায়।

এই কথাটা নূতন কাগজের উদ্যোগীদের শুনাইতে চাই। যাঁহারা জন্মলেখক অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির তাগিদ আছে, বাজে পত্রিকায় তাঁহাদের লেখা বাহির হউক বা না হউক, তাঁহাদিগকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ হইতে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। ছোট কাগজের লেখা পড়িয়া বড় কাগজ লেখক নির্বাচন করে না। একেবারে মাঝ-বয়সে লেখা প্রকাশ করিয়া নাম করিতেও বহু লেখককে

দেখিয়াছি। সুতরাং বাজে পত্রপত্রিকার খেলার মাঠ হইতে ভাল খেলোয়াড়ের রিক্রুট বিশেষ হয় না। ফুটবল ক্রিকেট নাট্যাভিনয়ের পক্ষে যাহা সত্য, সাহিত্যের পক্ষে তাহা সত্য নহে। বালক রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেনামী লেখা ছাপিয়াছিলেন—এটা বড় কথা নয়, তিনি যৌবন-প্রারম্ভেই 'ভারতী'তে ভাল লেখা লিখিয়াছিলেন—এইটাই বড় কথা। শরৎচন্দ্র লেখক হিসাবে বড় হইবার পর তাঁহার বাল্যকালের সাহিত্যের মক্‌শখেলার দিকে আমাদের নজর গিয়াছে। আরও একটি কথা স্মরণীয় এই যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য 'সংবাদ-প্রভাকরে'র কবিতালেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কোনই যোগ নাই; রমেশচন্দ্র প্রবীণ হইবার পূর্বে এক লাইনও বাংলা লেখেন নাই। যাঁহারা বলেন, এই সকল স্বল্পজীবী পত্রপত্রিকার দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের লেখক সৃষ্টি হয়, তাঁহারা ভুল বলেন। ইহার দ্বারা জাতীয় অর্থ ও জাতীয় শক্তির নিছক অপব্যয় হয়। যে কালে সাধারণ ভাবে রুটিনমাফিক লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিলে বাঙালীর ছেলে নিখিল-ভারত-প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িত না, এই সকল পত্রিকার হুজুক সেই কালে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে—ইহাই আমাদের সুচিন্তিত অভিমত।

হাতে-লেখা পত্রিকার প্রসঙ্গও এখন দেশের পক্ষে কম গুরুতর নয়। এইগুলিও দেশের যুবশক্তির প্রচুর অপচয় ঘটাইতেছে। বারান্তরে এই প্রসঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আমার সাহিত্য-জীবন

১৩

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের খবর। ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার যে কয় বৎসরের কথা লিখেছি এই সময়ের মধ্যে। 'রাইকমল' ও 'ছলনাময়ী' নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে পত্রালাপ হয় তার অব্যবহিত পরেই একদিন তাঁর কাছ থেকে আহ্বান এল—দেখা কর।

মাসটা চৈত্র মাস, সে আমার মনে রয়েছে। 'প্রবাসী'তে "অগ্রদানী" গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

আমি গেলাম, কিন্তু গেঁয়োর মতই তাঁকে কোন কথা জানিয়ে গেলাম না। বিকেল পাঁচটার সময় শান্তিনিকেতনে হাজির হলাম। কোথায় যাব? সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের উঠনে গিয়ে হাজির হব তীর্থযাত্রীর মত? তাও ভরসা পেলাম না। স্বর্গত কালীমোহনবাবু আমাকে স্নেহ করতেন, কিন্তু তিনি শ্রীনিকেতনে থাকেন ধারণায় সে অভিপ্রায় ছেড়ে গেস্ট হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। নূতন তারাশঙ্করের আবির্ভাবে তখনও নামের আগে শ্রী ছাড়ি নি বটে, তবে দেহশ্রী আমাকে জেলের মধ্যেই ছেড়েছে। পরিচ্ছদেও মূল্য-গৌরব ছিল না। গেস্ট হাউসে থাকবার অভিপ্রায় জানাবা মাত্র আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি অভিপ্রায়ে এসেছি?

বললাম, কবির দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ওখানকার অধ্যক্ষ বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেখা তো হবে না।

বললাম, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে নেব।

কিন্তু গেস্ট হাউসে তো জায়গা হবে না। রাত্রে কলকাতা থেকে বিশিষ্ট লোকেরা আসবেন।

তা হ'লে?—প্রশ্নটা ক'রেই ভাবলাম, যাই তা হ'লে শ্রীনিকেতন অথবা বোলপুর।

এর উত্তরে অধ্যক্ষ আমার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়েই বললেন, তা হ'লে এক কাজ করতে পারেন। রাস্তার ওপাশে পান্থশালা নামে একটি জায়গা আছে থাকবার, সেখানে থাকতে পারেন।

সেই পান্থশালাতেই আস্তানা পাতলাম। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। তিনখানা ছোট ঘর নিয়ে পান্থশালা। মাঝের ঘরখানা ওরই মধ্যে বড়। বাকি দুখানায় দুজন—খুব জোর তিনজনের ঠাঁই হয়। আমি একখানা ছোট ঘরেই বিছানা রেখে চায়ের দোকানের খোঁজে বের হলাম। দেখা করব কাল সকালে। খানিকটা মুশকিলেও পড়েছি। খবর দিয়ে আসি নি এবং দেখা করবার হুকুমনামাও আনতে ভুলেছি।

ভাবছি, কি ক'রে খবর পাঠাই ? চা খেয়ে ফিরে এসে দেখি, পান্থশালা গুলজার। বহরমপুর থেকে বরাবর বাইসিক্লে চারটি দুঃসাহসী ছেলে এসে হাজির হয়েছে। বাসা পেয়েছে মাঝের বড় ঘরটায়। তারা হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ করলে। বড় ভাল লাগল ছেলে কটিকে। বললে, কবির সঙ্গে দেখা করবে। সে যে ক'রেই হোক—চেঁচামেচি করবে, না খেয়ে প'ড়ে থাকবে। পরিশেষে বললে, শেষ পর্যন্ত গাছের ডালে উঠে ঝাঁপ খেয়ে পড়বার ভয় দেখাবে। সন্ধ্যেবেলা থেকে সুরে বেসুরে তালে বেতালে গান ক'রে তারা এমন জমিয়ে ফেললে যে, আমিও তাদের ছেড়ে বের হতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়বার সময় চিন্তিত হলাম তাদের জন্তে। বেচারাদের চারটি ছোট বালিশ মাত্র সম্বল, আর চাদর একখানা ক'রে গায়েই আছে। প্রশ্ন করলাম, রাত কাটবে কি ক'রে ? মশারি আনেন নি ! তারা হেসেই সারা।

মশা ? মশাই, সারাদিন বাইসিক্ল ঠেঙিয়েছি। পড়ব আর ঘুমোব। একজন বললে, নাসিকাগর্জনের শব্দে বেটারা বিশ ক্রোশ দূরে পালাবে।

অগত্যা আমি গিয়ে শুলাম। শুয়েও ঘুম এল না। গরম তো বটেই, তবে মনের উত্তেজনাই প্রধান কারণ। মনে মনে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে কি করব কি বলব তারই মক্শ করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হ'ল, ছেলেরা ও-ঘরে মারপিট শুরু করেছে। চটাপট—চড়-চাপড়ের শব্দ উঠছে। কিন্তু কই, বাদানুবাদ কই ! কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনলাম, উঃ ! উঃ ! এই মেরেছি।

বুঝলাম মশা।

আধ ঘণ্টা পরেই শুনলাম একজন প্রস্তাব করলে, চল্, বাইরে যাই।

হুড়মুড় ক'রে বেচারারা বাইরে চ'লে গেল।

আবার কিছুক্ষণ পর ফিরল। আবার সেই চড় চাপড়।

আর থাকা গেল না। ডেকে বললাম, আসুন আমার মশারির-মধ্যে কোন রকমে পাঁচজনের ব'সে রাত কাটানো তো চলবে !

বেচারীরা বাঁচল। মুখেও তাই বললে, বাঁচালেন।

তারপর বলে, গল্প বলুন মশায়।

বললাম, দোহাই! সহ্য হবে না। গল্প জানিও না আর আমি মশায় গল্পের ওপর হাড়েচটা। রাত বারোটা বেজে গেছে, এখন চুপচাপ ব'সে ঢুলতে ঢুলতে যতটা পারেন ঘুমিয়ে নিন।

রাত্রি চারটে বাজতেই ওরা বললে, আর না। এইবার আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ব। অনেক জ্বালিয়েছি আপনাকে।

তাই বেরিয়ে পড়ল। কোন বাধা-নিষেধ শুনলে না।

সকালে কালীমোহনবাবুর খোঁজে বের হলাম। কবির কাছে সংবাদটা পাঠাব। দেখা হ'ল আমাদের জেলার সুধীন ঘোষের সঙ্গে। তিনি তখন কবির খাসমহলের কলমনবিস।

তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কখন?

বললাম বিবরণ। তিনি তিরস্কার ক'রে বললেন, দেখুন তো কাণ্ড! গুরুদেব শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন। আমাদের তো বাকি থাকবেই না। আপনিও বাদ যাবেন না।

আমি বললাম, কালকের কালাটা যখন ভূত কালে পরিণত হয়েছে তখন কাজ কি আজ তার জের টেনে? আজ থেকেই পালা শুরু হোক না। এখন দেখা করবার ব্যবস্থা ক'রে দিন।

বললেন, আমি এখনই চললাম। আপনি পান্থশালাতেই থাকবেন।

তিনি চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ এই সময় দেখা হ'ল অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সব শুনে বললেন, দেখুন তো মশায়! আমি যে পাশেই রয়েছি। আসুন, চা খাবেন আসুন।

আমি বললাম, স্থানত্যাগে নিষেধ আছে।

তিনি বললেন, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

পান্থনিবাসে কি ব'লে এলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অতঃপর না গিয়ে উপায় রইল না। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে শুনলাম, সুধীনবাবু আমার খোঁজে এসে ফিরে গেছেন। আমি আবার বেকুব ব'নে গেলাম।

উত্তরায়ণ পল্লীর ফটকের কাছে দাঁড়ালাম। দেখলাম, শান্তিদেব প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত-যন্ত্র হাতে ঢুকছেন। শুনলাম কিসের যেন রিহারশ্যাল হবে।

হঠাৎ দেখা হ'ল কালীমোহনবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন, আরে, আপনি?

নিবেদন করলাম সব। তিনি সস্নেহে তিরস্কার ক'রে বললেন, আমি শ্রীনিকেতনে বাস করি—কে বললে আপনাকে? আসুন এখন। এখন এখানে গানের পালা বসছে। এখন দেখা হবার সময় নয়।

ওঁর বাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে পান্থনিবাসে ফিরলাম। শুনলাম, সুধীনবাবু আরও দুবার খুঁজে গেছেন। আমার আর আপসোসের বাকি রইল না। চুপ ক'রে ব'সে আছি। আবার এলেন সুধীনবাবু। বললেন, কি লোক আপনি মশায়! গুরুদেব দুবার পাঠালেন আমাকে। বললেন—সে গেল কোথায়? উঠেছে কোথায়? আমি বলেছি, গেস্ট হাউসে উঠেছেন। গেলেন কোথায় কি ক'রে বলি? বললেন—খোঁজ কর। দেখ, কোথায় আটকে গেল! যাক। ব'লে দিলেন—দুপুরবেলা তাকে নিয়ে এসো। আর যেন কোথাও না যায়।

সেই চৈত্রের দুপুর; বীরভূমের উত্তাপ। আমি পান্থনিবাসের উত্তর দিকের ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে পথের পানে চেয়ে রয়েছি। দেখলাম, একখানা গামছা মাথায় দিয়ে সুধীনবাবু আসছেন।

কবি তখন 'পুনশ্চ' ব'লে বাড়িখানিতে থাকেন। ঘরের দরজায় এসেই বুক গুরগুর ক'রে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন, আসুন।

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, প্রশান্ত সৌম্য স্বর্ণকান্তি দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে আমি। কবির সামনে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপ ফুল, কবির ওপাশে খোলা জানলার ওধারে বিস্তীর্ণ মুক্ত লালমাটির প্রান্তর। আমি তাঁকে ভাল ক'রে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুঠে উঠেছে। বললেন, এ কি? তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কোথায় দেখেছি তোমাকে?

এবার আমি নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, আমার বাড়ি তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুর স্টেশনে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েক বার আপনাকে দেখেছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বোলপুর স্টেশনে ঠিক এমনি দৃষ্টি দেখেছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চোখে। এমনি স্মৃতিমন্থন-করা প্রশ্ন-ভরা সন্ধানী দৃষ্টি।

আমার কথায় তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, না না। তোমাকে যেন আমি আমার সামনে ব'সে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে আমার মনে প'ড়ে গেল। বছর পাঁচেক আগে, ১৯৩৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন কবি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণের কথার স্মৃতি তাঁর মনে আছে?

আমি সসঙ্কোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তার পর বললেন, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে। ব'স, তুমি ব'স।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হ'ল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

কি কর?

বললাম, করার মত কিছুতে মন লাগে নি। চাকরিতেও না, বিষয়-কাজেও না; কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

জেল খেটেছ?

হ্যাঁ।

ও-পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ ?

জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

সেইটে সত্যি হোক। তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি ক'রে ?

কিছুদিন সমাজ-সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারি আছে। ওই দুই উপলক্ষ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে মিশেছি, কারবার করেছি।

সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি বিশেষ পড়ি নি।

তারপরই হেসে বললেন, তবে এ কথার শুরু প্রথম আমিই করেছি। আমি যখন বাংলা দেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি, তখন বাংলা-সাহিত্যে রাজপুতনার রাজত্ব চলছে।

আবার বললেন, তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি। তোমরা আমাকে দেখতে দাও নি। আমাদের পতিত ক'রে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট ক'রে রইলাম।

আবার বললেন, দেখবে, দু চোখ ভ'রে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে ব'সে তাদের একজন হয়ে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার আছে।

এবার আমি বললাম, "পোস্টমাস্টারে"র পোস্টমাস্টার আর রতন, "ছুটি"র ফটিক, ছিদাম রুই দুখীরাম রুই, এদের কথা—

ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে ব'সে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।

এর পরই কথা উঠল লাভপুরের।

সেখান থেকে কেমন ক'রে কি জানি কথাটার মোড় ঘুরে গেল সাহিত্য-সমালোচনার কথার দিকে। আমার কলমের স্থলতার

সেই অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভ'রে উঠল। বললেন, ও দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে, তত তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন, মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি কি জান তারাশঙ্কর, বলি—ভগবান, পুনর্জন্ম যদি থাকেই, তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। বিবেচনা করলাম না কাকে বলছি, কি বলছি, ব'লে উঠলাম, না না, এ কথা আপনি বলবেন না। না না।

হাসলেন তিনি এবার। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাকে—বাঁচিয়ে রাখতে পার।

আর কথা হ'ল, তখনকার লীগ রাজত্বে, বাংলা-ভাষাকে যে আরবী ফারসী শব্দবহুল করবার চেষ্টা হচ্ছিল তাই নিয়ে। বললেন, তাই তো ভাবি, যা ক'রে গেলাম, তা কি এর পর শিলালিপির ভাষার মত গবেষণার সামগ্রী হয়ে তাকে তোলা থাকবে। অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে উত্তর দিকের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের পানে চেয়ে রইলেন।

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, তোমার "ডাইনীর বাঁশী"র চিলটার কথা মনে পড়ছে। ওটা খুব ভাল লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

তিনি কথায় জের টেনে বললেন, কলকাতায় একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক গল্পটার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কি বললেন জান?

আমি মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কবি বললেন, তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, উইচক্র্যাফ্‌ট নিয়ে বাংলা গল্প? এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প প'ড়ে লিখেছে।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারে গ্রাম্য লোকের মতই ব'লে উঠলাম, না না। স্বর্ণ

ডাইনী আমাদের পাড়ায় থাকত। এখনও আছে। আমাদেরই কাছারি-বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশান কোণে তার বাড়ি। আর—

এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম, আমি তো ইংরিজী ভাল জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও তো পাই না আমার দেশে। কোথায় পাব? ওদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়ি নি।

কবি হেসে বললেন, আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। এ কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝাবার জন্তে। ডাইনী মানে ওদের কাছে উইচক্র্যাফ্‌ট। উইচক্র্যাফ্‌ট হ'লেই সে ইউরোপ ছাড়া এ দেশে কি ক'রে হবে? আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাদের বললুম—উঁহু, উঁহু। এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি, গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় ব'সে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা ধুকধুক করছে, আর নিজের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণডাইনী ব'সে আছে আচ্ছন্নের মত। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল; গল্পটা মনে প'ড়ে গেল।

কবি পরিশেষে বললেন, এবার একটা কাজের কথা বলি। কলকাতা থেকে মধ্যে আমার কাছে এসেছিলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভাল নাটক পাচ্ছেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমার তো এখন রঙ্গমঞ্চকে দেবার মত তৈরি কিছু নেই। কি দেব? তবে তুমি তারাশঙ্করের 'রাইকমল' নাটক ক'রে নিয়ে দেখতে পার। আমার ভাল লেগেছে। বাংলার খাঁটি মাটির জিনিস। সত্যিকারের রস আছে। তাঁকে বইখানাও পড়িয়েছি এবং তোমাকে তাঁর কাছে পাঠাবার কথাও দিয়েছি। তুমি কলকাতা গিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা কর। তিনি তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী! রঙ্গমঞ্চে যাঁর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের নারায়ণ নারদের বীণার ঝঙ্কারে গঙ্গার মত বিগলিত হয়ে যায়! বাংলার তথা ভারতবর্ষের মনোহারিণী যাঁর প্রতিভা, তিনি আমার 'রাইকমল' অভিনয় করবেন! মনে পড়ল 'মারাঠা-তর্পণে'র লাঞ্ছনার কথা। কবিগুরু অন্তর্যামীর মত আমার অন্তরের অন্তরে লুকানো বেদনার সন্ধান জেনে সেই বেদনাই উপশম করার ব্যবস্থা করেছেন আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই! শিশিরকুমার তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর বইয়ের জন্যে, তিনি আমার বই অভিনয় করতে বলেছেন!

তখনকার আমার মত একজন সামান্য লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায় বাংলার রঙ্গমঞ্চে নূতন ভগীরথ, নবসঞ্জীবনের ব্রহ্মার মত স্রষ্টা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন!

আমার জীবনের পাত্র থেকে সৌভাগ্যের দান উথলে যেন প'ড়ে গেল চারিপাশে।

ওদিকে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে।

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বললেন, এখানে এসো। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চ'লে এসো। দরজা খোলা রইল।

আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পান্থনিবাসে।

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। আমার আর ঠাঁই নেই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চ'লে এলাম লাভপুর।

চিঠি পেলাম—এমন ক'রে চ'লে এলাম কেন?

ওই কথাই লিখলাম, আর আমার নেবার জায়গা ছিল না। আমি যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তারই মধ্যেই চ'লে এসেছি। কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডানা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অমরেশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি : তাঁর মনে হ'ল, লোকটির প্রতি সুবিচার করেন নি তিনি। তাঁকে কখনও অবজ্ঞাভরে, কখনও অনুকম্পা সহকারে তিনি যেন দয়া ক'রে, সহ্য ক'রে এসেছেন, তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের আলোকে কখনও তাঁকে বিচার করবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর মনে হ'ল, চেষ্টা করলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। অসুরের মত বলিষ্ঠ, শিশুর মত কৌতূহলী, ঋষির মত জ্ঞানবৃদ্ধ, রাজার মত ধনী, অগ্নির মত পবিত্র এই লোকটির অনন্যতায় তাঁর অন্তত মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কবি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু। মুগ্ধই হয়েছেন তিনি মনে মনে, কিন্তু বাইরে ভান করছেন ঠিক উলটোটা! কি দরকার এ চাতুরির? আত্মসম্মানের মুখোশটা বজায় রাখার জন্য? চিঠিখানার কথা মনে পড়ল হঠাৎ; পকেট থেকে বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আনন্দমোহনবাবু,

একটা দোয়েলপাখী আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আরও খানকয়েক বই পাঠাচ্ছি। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয় এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়? এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে। আমাদের রেডিওর এরিয়েলটা এখানকার একটি দোয়েল-গায়কের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর ব'সে, কত গানই শোনায় ও! সম্ভবত প্রেয়সীকেই শোনায়, কিন্তু মাঝ থেকে আমরাও লাভবান হই। কি বলেন? একজন ইংরেজ লেখক—ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাখীরা নাকি তাদের প্রেয়সীদের ভোলাবার

জন্যে গান গায় না। ময়ূর নাকি ময়ূরীকে মুগ্ধ করবার জন্যে পেখম মেলে নৃত্য করে না। ওরা যা করে, সবই নাকি অকারণ পুলকে করে। কার্যকারণের যোগাযোগ মানতে চান না ভদ্রলোক। অকারণ পুলকে যে পাখীরা গান করে না তা নয়, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, এই দোয়েলই অহেতুক আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু ওর অধিকাংশ গানের লক্ষ্য যে ওর প্রিয়া—এ কথা অস্বীকার করা শক্ত। লরেন্স বলেছেন, সৌন্দর্য ব্যাপারটা রহস্যজনক। ওর কোনও হেতু নেই। বিজ্ঞান জোর ক'রে একটা হেতু বার করবার চেষ্টা করেছে, কারণ বিজ্ঞানীদের একটা হেতু-বাতিক আছে। আছে তা মানছি। কিন্তু ওই লরেন্সই ওই প্রবন্ধেই বলছেন যে, জীবন্ত যৌবনই সৌন্দর্য। অর্থাৎ তিনিও রূপের প্রকাশকে যৌন অভিব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে পারেন নি। বিজ্ঞানকে গাল দিতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যাক ও-কথা, এখন দোয়েলের কথা শুনুন।

পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা সিন্ধু, কচ্ছ প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র দোয়েল স্থায়ী বাসিন্দা। পার্বত্য প্রদেশেও আছে; চার হাজার ফুট, কখনও কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়েও এক হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বাসা এবং ডিম পাওয়া গেছে। এদের চালচলন লক্ষ্য করেছেন কি কিছু? নিশ্চয়ই করেছেন। দোয়েল পাখীর সম্বন্ধে অমন সুন্দর কবিতা যখন লিখেছেন, তখন দেখছেন নিশ্চয় ওদের ভাল ক'রে। কিংবা কি জানি, না দেখেও হয়তো ভাল কাব্য রচনা করতে পারেন আপনারা, এর অজস্র প্রমাণ তো বিশ্ব-সাহিত্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী অথবা শেক্‌স্‌পীয়ার মিডসামার নাইটস্ ড্রীম দেখেন নি নিশ্চয়। যাক, আবার বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করছি আপনার। দোয়েলের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। দোয়েল হচ্ছেন—ইংরেজী গ্রন্থকারের ভাষায়—"A bird of groves and delights to move about

on the ground in the mixed chequer of sunshine and shade"—এর সংক্ষেপে বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমাদের দোয়েল হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী, (নিকুঞ্জবিহারী বললেও ক্ষতি নেই) কাননের আলো-ছায়ার ঝিলিমিলিতে বিহার করতে ভালবাসেন। একজন বিদেশী গ্রন্থকার লিখেছেন যে, দোয়েল ঘন ঝোপের ভিতর ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে না (thick undergrowth it dislikes) কিন্তু আমি দু-তিনবার একে ঘন ঝোপে দেখেছি। অবশ্য শীতের সময়। সে সময় বেচারারা একটু মন-মরা হয়েই থাকে। গলা দিয়ে সুর পর্যন্ত বেরোয় না ভাল ক'রে। তবে ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন জায়গাই বেশি পছন্দ করে এরা। আমাদের বাড়ির সেই ছোট্ট জায়গাটুকু ভারি ভাল লাগে ওদের—সেই যেখানে আমরা বসিয়েছিলাম, মনে আছে নিশ্চয় আপনার। এখানকার বাগানেও দোয়েল আছে একটা—সে তো আমার গিন্নির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ক'রে ফেলেছে। গাছের তলায় তলায় তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাফেরা করে আহারের খোঁজে, তারপর উড়ে হয়তো একটা ডালে বা বাগানের দেয়ালের ওপর বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল কোনও গাছের তলায় কোনও পোকামাকড় নড়ছে কি না, দেখতে পাওয়া মাত্রই বোঁ ক'রে নেবে সেটি সংগ্রহ ক'রে গলাধঃকরণ করা হ'ল, তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসা হ'ল সেই ডালে বা দেওয়ালের ওপর। ফুল তুলতে তুলতে আমার গিন্নি হয়তো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন, দোয়েলের ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং তার চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—ও আপনি! খাবার সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি আমি। আপনার ওই ফুলগাছগুলোকে যে সব পোকামাকড় নষ্ট করছে তাদেরই সাবাড় করছি! এই ধরণের বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। তারপর হঠাৎ উড়ে গিয়ে এরিয়েলের ডগায় ব'সে গান ধ'রে দিলে একখানা, মনে হ'ল আমাদের বাগানে আমরা যে ওকে থাকতে দিয়েছি

তারই কৃতজ্ঞতায় ও যেন উচ্ছ্বসিত। এবং সেইটেই যেন ওর গানের মুখ্য প্রেরণা। দোয়েলের গানের যে কত মূর্ছনা, কত উত্থান-পতন, কত লালিত্য, কত বৈচিত্র্য তা তো আপনি রোজই শুনছেন। দিন কয়েক চেষ্টা ক'রে আমাদের এখানকার দোয়েলের গানের ধরনটা আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই হয় নি অবশ্য, কারণ গানের সুরটাই আসল, তা লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর থেকে ধরনটা হয়তো একটু বোঝা যাবে। কিছুটা টুকে পাঠাচ্ছি।

ও পি পি পি পি পি—চিঃ—··· (দু মিনিট)
ও আ—গো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শিগ্‌গির—(সঙ্গে সঙ্গে উড়ল)
পিঁ—কেরেঃ পিঁ—কেরেঃ পিঁ কেরেঃ··· (৫ মিনিট)
পি পি পি—কই তুমি—কই তুমি—কই তুমি—কি কি কি
(তিন মিনিট)
প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—য়া—প্রি—য়া··· (দু মিনিট)
পি ই ই ইঃ পি ই ই ইঃ (মিনিট খানেক)
পি—ক্রি—ক্রি—ক্রি—ক্রি—ক্রি—চি—চি—চি
[ডাকতে ডাকতে উড়ল]

কি যে—কি যে—কি যে কি যে—কি এ কি এ কি এ—ক্রিকিক্ ক্রিকিক্··· [মিনিট খানেক]

পি পি পি—কি করছ যে—কি করছ যে—দুত্তোর—দুত্তোর—
[দু মিনিট প্রায়]

এ—কি রেঃ এ কি রেঃ—এ কি রেঃ—চোখ গেল—চোখ গেল···
[তিন মিনিট]

এ ছাড়া আরও কত রকম যে ডাক আছে তা আমাদের অক্ষর দিয়ে লেখাও শক্ত। আমার ইচ্ছে আছে, দোয়েল পাখীর জীবনের খুঁটিনাটি দিয়ে একটি ছোট বই লিখব। ডেভিড ল্যাকের (David Lack) 'দি লাইফ অব দি রবিন' বইখানা দেখেছেন কি? ওখানে

আমার শেল্‌ফে আছে, ইচ্ছে করেন তো দেখতে পারেন। ওই ধরনের বই একটা লেখবার ইচ্ছে আছে। হয়ে উঠবে কি না জানি না। এ দেশে নানা বাধা। একটা বাধা হচ্ছে জনসমাগম। বহু বেকার লোকের বাস এ দেশে, তাদের কোনও কাজ নেই। লোকের বাড় বাড়ি ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। যখন তখন হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, দূর ক'রে দেওয়া যায় না, প্রাণ খুলে আপ্যায়িত করাও যায় না। অসময়ের বৃষ্টি বা ঝড়ের মত। মহা বিরক্তিকর। তবু একটু একটু ক'রে লিখছি। ওই ডেভিড ল্যাকের বইয়ে আর একটা কথাও দেখবেন এবং সম্ভব হ'লে মিলিয়ে দেখবেন—যা তিনি রবিন রেডব্রেস্টের সম্বন্ধে লিখেছেন তা দোয়েলের সম্বন্ধে খাটে কি না। আমার মনে হচ্ছে খাটে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পাখীরা সব সময়ে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই যে গান গায় তা নয়। ডেভিড ল্যাক লক্ষ্য করেছেন যে, কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্টের নিজস্ব এলাকায় যদি অন্য কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্ট এসে পড়ে তা হ'লে আগন্তুক পাখীকে লক্ষ্য ক'রে এলাকার মালিক গানের তুফান তোলে। অর্থাৎ ঝঙ্কারের মাধ্যমেই তাকে হুঙ্কার দেয়। মানুষের সঙ্গে ওইখানেই ওদের তফাত। এলাকার স্বত্বে কেউ যদি অবাঞ্ছিত দাবী করে—আমরা গালাগালি দিই, মোকদ্দমা করি ; কিন্তু পাখীরা গান গেয়ে ওঠে। এবং সেই গানের মর্যাদাও রক্ষা করে ট্রেস্‌পাসার পাখীটি। ও, এটা যে আপনার এলাকা বুঝতে পারি নি ঠিক, সো সরি—মুখের এই রকম একটা কাঁচুমাচু ভাব ক'রে স'রে পড়ে সে। সব পাখী অবশ্য এতটা বিনীত নয়, দু-একজনকে মারধোর ক'রেও তাড়াতে হয়। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এদের নিজস্ব এলাকার মালিকানা কে ঠিক ক'রে দেয় ? এরা নিজেরাই ঠিক ক'রে। কোনও অনধিকৃত এলাকা যে আগে দখল করতে পারে সে এলাকা তারই হয়—পক্ষী জগতে এই নিয়ম মেনে নিয়েছে সবাই। একাধিক দোয়েলের পায়ে বিভিন্ন রঙের 'রিং' পরিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আপনারাও লক্ষ্য

করতে পারেন, ডেভিড ল্যাক যেমন করেছেন। দোয়েলের বিষয় আরও কয়েকটা কথা জানিয়ে দিয়ে পত্র শেষ করি। দোয়েলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়। ওদের যদি খাঁচায় পুষতে চান তা হ'লে ছোলা ছাতু বা ফল খাওয়ালে চলবে না,—ওরা টিয়া-চন্দনার মত বৈষ্ণব-প্রকৃতির নয়, রীতিমত শাক্ত। সেই জন্যেই বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বুলি ওদের শেখানো যায় না। এদের প্রকৃতিতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার আছে। এরা ছাতারের মত দল বেঁধে থাকতে পারে না। এমন কি নিজের প্রিয়ার সঙ্গেও এদের খুব যে একটা মাখামাখি আছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে এরা গানের ঝরনা বইয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিনরাত প্রিয়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে রাজী নয় এরা। মেজাজটাও এদের একটু ঝাঁঝালো রকমের, ইংরেজীতে যাকে বলে pugnacious। অর্থাৎ এদের ধরন-ধারণ চাল-চলন সবই প্রকৃত আর্টিস্টের মত। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গেই গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে চায় না। ফিন্ সাহেব লিখেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রস আইলাণ্ডে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল পাখী দেখা যায় এবং তারা মানুষ দেখলে নাকি পালায় না। বড় দোয়েলকে ধ'রে খাঁচায় পোষা বেশ শক্ত, সহজে পোষ মানে না, ম'রে যায়। এর একটা কারণ বোধ হয়, যে পোকামাকড় ওদের খাদ্য তা প্রত্যহ জোটানো শক্ত। একজন সাহেব কিন্তু খাঁচায় দোয়েল-দম্পতিকে পুষেছিলেন, খাঁচায় তারা নাকি ডিম পেড়ে বাচ্চাও লালন করেছিল—ফিন্ সাহেব লিখেছেন। ওদের লেখা বই যখনই পড়ি, একটা কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওদের কি অদম্য কৌতূহল! অগাধ বিদ্যা আর শিশুসুলভ কৌতূহলের মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে ওদের প্রতিভায়। আমাদের দেশে কত ফুল, কত পাখী, কত রকমের গাছ; কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহলই নেই। দু-চারটে পাখী বা গাছের নাম অনেকে অবশ্য জানেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে

যা কিছু তা সব 'জংলি' বা 'কি জানি'র পর্যায়ে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা আরও অজ্ঞ। একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু সে চেষ্টাই কারও নেই। সবাই চাকরি কিংবা ব্যবসা ছাড়া আর যা কিছু করেন তা অতিশয় নিম্নস্তরের পরচর্চা। ভাবলে দুঃখ হয়। কি আশ্চর্য দেখুন, কথায় কথায় আমিও বেশ পরচর্চায় মেতে উঠেছি! এটা বোধ হয় আমাদের মজ্জাগত দোষ! চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। পাখীর বিষয়ে নতুন কি কবিতা লিখলেন? পাঠাবেন? পাখী আকর্ষণ করবার জন্যে আপনারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে কোনও পাখী আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানাতে বলবেন শ্রীমতী ডানাকে। আমার ছোট চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আশা করি সুস্থ আছে। যদি কাউকে অসুস্থ দেখেন ছেড়ে দেবেন। প্যাঁচাটা কেমন আছে? ও খুব মাংসাশী লোক। মালিটাকে ব'লে এসেছি ইঁদুর ধ'রে দিতে। ইঁদুর যদি রোজ না পাওয়া যায় বাজার থেকে মাংসের কিমা কিনে দেবেন। এখানকার ব্যাপার মিটিয়ে ফিরে যেতে আমার বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম চালাবার জন্যে আপনাকে একটা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি পাঠালাম এই সঙ্গে। রত্নপ্রভা এই সঙ্গে আপনাকে হাজার টাকার ক্রসড চেকও পাঠাচ্ছে। সে বলছে, এটা পারিশ্রমিক নয়—প্রণামী। শ্রীমতী ডানার চেকটা কাল বা পরশু পাঠাবে সে।

আপনারা আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। সব খবর দিয়ে উত্তর দেবেন। ইতি—

আপনাদের

অমরেশ

কবি চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তাঁর। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ডানার টেবিলে চিঠি-লেখার যে প্যাডখানা ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে তিনি লিখলেন—

কবির তপস্যা-লোকে এসেছে অপ্সরী
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি'।
কখনও সে মদিরাক্ষী টলমল-পান-পাত্র হাতে
যৌবন-হিল্লোলে দুলি' আসিয়াছে জ্যোৎস্না-নীল রাতে ;
কভু চুপে চুপে
এসেছে ভক্তের রূপে :
প্রশংসার বাণী-রূপে কভু এসেছে সে
উচ্ছ্বসিত রসিকের বেশে ;
জনতার রূপ ধরি করিয়াছে কভু অভিষেক,
আদেশ করেছে কভু, কখনও সে 'চেক'।
বারম্বার তার কাছে পরাভব করেছি স্বীকার
তবু আমি কবি নির্বিকার
গুটি-কারাগার-মাঝে কিছুদিন থাকি শূন্য-পতি
তারপর একদিন উড়ে যাই মুক্ত প্রজাপতি।

কবিতাটির দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে কবি চেকটি মনি-ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ঠিক পর-মুহূর্তেই ডানা এসে ঘরে ঢুকল।

ও, আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমি আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। তালগাছে যে বাক্সটা আমরা টাঙিয়েছি, তাতে এক জোড়া শালিক বাসা বাঁধছে। ও কি, কবিতা লিখলেন বুঝি ?

কবি কবিতাটা প'ড়ে শোনালেন।

হঠাৎ এ ভাব মনে এল যে আপনার ?

এল।

চলুন, শালিকের বাসাটা দেখবেন।

চল। ফিরে এসে চা খাব কিন্তু।

বেশ।

দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

কবি অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে-ফিরে বাসাটা দেখলেন। সত্যিই এক শালিকদম্পতি খড়কুটো মুখে নিয়ে নিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

দেখেছেন? ভারি মজা লাগছে আমার।

আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।

কেন?

মানাচ্ছে না একটুও। মনে হচ্ছে যেন এক সাঁওতাল-দম্পতিকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে কলকাতা শহরের দোতলা ফ্ল্যাটে। মনে হচ্ছে—ওটা যেন ফাঁদ, বাসা নয়।

কি যে আপনার আজগুবি কল্পনা! চলুন, চা ক'রে দিই আপনাকে।

ডানা হেসে কথাটা বললে বটে, কিন্তু কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন তার মনে গেঁথে গেল।

তাই চল।

দুজনে আবার বাসার দিকে ফিরলেন।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

(ক্রমশ)

"বনফুল"

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

[বদ্ধ-পাগল অবস্থায় রচিত]

নরায়ন

(মিশর, উত্তর-পূর্ব মেরুপ্রদেশ, প্রাগৈতিহাসিক ব্রহ্মদেশ, খ্রীষ্টপূর্ব দাক্ষিণাত্য, রামায়ণী লঙ্কা প্রভৃতি সমস্ত দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক ভুগোল ও ভৌগোলিক ইতিহাসের মূল-তত্ত্বের ব্যর্থ অনুকরণে)

দিগন্তে বারোটা বেজে গেল:

ঢং ঢং ঢং ঢং······ঢং ঢং ঢং ঢং······ঢং ঢং ঢং ঢং !!!

নিরালায় মহাকালের বাঁশী এলোমেলো,
তার মহাসুরের মহাপাত্র কানায় কানায় ভরে এলো
নিঃসীম শূন্যতার মধ্যপ্রান্ত থেকে
ধ্বনিত হলো আদিম অকৃত্রিম প্রশ্নমালিকা :
"কে সে ? কেন সে ? কোথায় সে ? কখন সে ?… !!…!!!…"
এলো না উত্তর।
যন্ত্রের তখনো জন্ম হয় নি,
সবে মাত্র জন্মাবো জন্মাবো ভাবতে সুরু করেছে।
বিশ্ব-গাইয়ে তখনো ধরেন নি তোম্-তা-না-না-না-না-না,
বিশ্ব-তবলচী বিশ্ব-তবলায় মারেন নি চাঁটি।
শুধু আকাশ চিৎপাৎ হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে,
তার সারা গায়ে ভরা অগুন্তি তারার বসন্ত।

পেছনে অনন্ত অতীত আর সামে অনন্ত ভবিষ্যৎ,
মাঝখানে সরু বর্তমান চিড়ে-চ্যাপ্টা
ছুটছে……ছুটছে……ছুটছে…… !!!
বিরাম নেই, জিরমি খাবার ফুরসৎ নেই।
রোগা বর্ত্তমান ছুটছে মোটা ভবিষ্যৎকে ঠেলে ঠেলে,
আর রোগা বর্ত্তমানকে ঠেলে এগোতে চাচ্ছে মোটা অতীত।
ত্রিকালের ক্যাবলামি দেখে হাসছে মহাকাল,
সে হাসির সুর ঝিক্‌মিক্ করছে তারায় তারায়।

এরও আগের ইতিহাস…
সহসা অন্ধকারের ঢেউয়ের বুক ভেঙে ভেঙে
ভেসে এলো আলোর ফেনা,
বিবর্ণ অন্ধকারের বুকে সুবর্ণের জ্যোতি!
প্রকাশিত হলো কত গ্রহ, উপগ্রহ, উপ-উপগ্রহ, উপ-উপ-উপগ্রহ
…উপ-উপ-উপ-উপ-উপ-উপ……উপগ্রহ !!!!

আলো কেঁদে বললে "হে মহাচেতন !
আমি তো এলাম, কিন্তু আমায় দেখবে কে ?
তোমার মহা-দর্শন তোমার অনন্ত চক্ষু দিয়ে,
সেই মহা-দেখায় তো হৃদয় ভরে না।
তৃষ্ণা মেটে না মহাসমুদ্রের অনন্ত জলে— !!

ব্যাস, আর বলতে হ'ল না।
মহাচেতন হা বলতেই হাওড়া বুঝে নিলেন।
ফলে গ্রহে গ্রহান্তরে জীবনের ফুলকি,
ফুলকি থেকে ফুলকি, তা থেকে আবার ফুলকি ;
এম্নি করে যুগ থেকে যুগান্তরের ধারা
বাঁধা হয়ে গেল।
অগুণ্‌তি চোখে লাগ্‌লো আলো,
সেই আলোয় চোখে চোখে প্রতিবিম্বিত হ'ল
চোখের বাইরের রূপ (আর অরূপ) { আর অপরূপ !!! }
ঐ যাঃ, সূর্য্যের কথাই বলা হয় নি। ছি ছি ছি !!!
আলোর আদিম পিণ্ডি, অসহ্য গরমে বোঝাই।
আলোর মহাজন সে, তারি থেকে আলো ধার করে চাঁদ !
শুধু আলো। নিস্তাপ আলো।
সূর্য্য থেকে খসে পড়া এক পিণ্ডি
ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে পৃথিবী হলো,
যার গোপন বক্ষে এখনো আগুন জল্‌ছে।

এরি বুকে বানর
কবে প্রথম ল্যাজ খসিয়ে নর হলো
কোনো ব্যাটা লেখে।ন তার খাঁটি ইতিহাস।
তবু জানি, কোমর বেঁধে জেদ্ করে জানি,
বিশ্ব-জগতের সেরা জীব আম্‌রা—নর।

কিন্তু নরের বাঁয়ে 'বা' বসিয়ে দিলেই পূর্ব্বপুরুষের নাম,
(ডারুইন সায়েব যদি ধাপ্পা না মেরে থাকে)
সে এক মহা বে-ইজ্জতী ব্যাপার,
তাই আমরা—মানুষ।
মানুষের গান একখানা শোনাই শোনো :
"মানুষ আমরা, দুনিয়ার সেরা প্রাণী,
এই আমাদের বড়াই।
পশুতে পশুতে দল বেঁধে কভু লড়াই হয় না জানি,
(মোরা) দল বেঁধে করি লড়াই।
পশুর চাইতে উঁচু মোরা সর্ব্বথা,
যুগে যুগে গড়ি নব নব সভ্যতা,
কৃষ্টি কর্ম্মে দৃষ্টি ধর্ম্মে ঠোকাঠুকি লেগে
পাইকারী হারে মানুষী রক্ত ঝরাই।
পশুর চাইতে বহু উঁচু মোরা, এই আমাদের বড়াই।
প্রকৃতির বুকে যত রহস্য গোপনে লুকানো আছে
কান মলে মলে একে একে করি আদায়।
মোদের ভৃত্য বিজ্ঞান, সে কি হার মানে কারো কাছে ?
পরোয়া করে না হাজারো বা লাখো বাধায়।
আলো ফেলে ফেলে হটায়ে অন্ধকার
তালা ভেঙে ভেঙে খোলে সে বন্ধ দ্বার।
তারে দিয়ে মোরা জীবনের তূণ
মরণের বাণে ভরাই।
মহা ভীষণের বিষাণ বাজাই—
এই আমাদের বড়াই।"
আমরা যুগে যুগে করি চুলোচুলি ঝুলোঝুলি,
আর মাঝে মাঝে কোথা থেকে

আবির্ভূত হন মহাপুরুষ, বলেন হেঁকে
"তোমরা সব ভাই ভাই, করো কোলাকুলি।
লুকোচুরি ভুলে করো হৃদয়-খোলাখুলি।
হিংসা ভুলে বাস ভালো।
ঘৃণার আঁধার হটিয়ে দিয়ে জ্বালাও প্রেমের আলো।"
আর মনে মনে বলেন "ভাগ্যিস্ তোরা ভাই ভাই ঝগ্‌ড়া করিস।
নইলে আম্‌রা মেটাতাম কি?
আর মাঝে মাঝে তোদের গুঁতো খেয়ে শহীদ হতাম কি করে?
দোহাই তোদের, আমাদের বেকার করে ভাতে মারিস্ নে
যুগে যুগে তোরা ভায়ে ভায়ে এম্নি ঝগ্‌ড়া কর,
আর আম্‌রা মেটাতে আসি।
দুনিয়ায় সব ব্যাটা যদি পাপ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে,
তবে ত্রাণকর্ত্তারা কাকে ত্রাণ কর্‌তে আবির্ভূত হবে?"
অলক্ষ্যে মহাবিধাতার মহা-দম আট্‌কে আসে মহা-অট্টহাসিতে
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ···হিঃ হিঃ···
············!'!·············!!!!!!·············!!!!!!!!
কে জানে?
হয়তো মহাবিধাতারই মহাবিধানে
পৃথিবীর বুকে মানুষের আজ মোটামুটি দুটী শিবির
সাদা আর লাল; লালে ও সাদায় প্রণয়টা নয় নিবিড়।
সাদা বলে "ওরে লাল, তুই ব্যাটা শান্তির পথে কাঁটা।"
লাল বলে "শুধু সাদার জ্বালায় দায় হলো পথে হাঁটা।"
সাদা সাহিত্যে লালের কেচ্ছা, লাল সাহিত্যে সাদার।
দুয়ের ভেতরে ভাব যেন ঠিক কাঁচ্‌কলা আর আদার।
সাদার শ্রাদ্ধ-ফর্দ্দ ভেবে লালের ঘামে মাথা
(আর) লালের অপকীর্ত্তি-কথায় ভরে সাদার খাতা।
চুণকালি দিতে এ ওর গালে
ব্যস্ত দুজনা নানান চালে।

পরস্পরের শয়তানী আর কেলেংকারীর চর্চায়
আদা নুন খেয়ে লেগে থাকে দোঁহে, পরোয়া করে না খরচায়
বেড়ে বেড়ে চলে পারস্পরিক হুমকি, দোষানো নালিশ—
মানে নাকো কোন সালিশ।
আতংকে আঁতকে থাকে সাধারণ মানুষের দুনিয়া :
"এই ঠাণ্ডা লড়াই শেষ পর্য্যন্ত যদি গরম হয়ে ওঠে,
প্রলয় সুরু করে আগুনে পাহাড়,
তা হলে তার ধ্বংসলীলায় পটল তুলবে কি পৃথিবী?
নিঃশেষে খরচা হয়ে যাবে
এতদিনের জমে ওঠা সভ্যতা ?
হায় হায় হায় হায় রে! হায় রে হায় রে হায়!"
শুনে নেপথ্যে বিধাতা আপন গোপন গর্ভে বসে
নতুন তথ্যে ভরাট্ বিরাট অট্টহাসি হাসেন :
হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ…!!!…!!!!…
সে হাসি নীরবে ঘোরাফেরা করে
দিগন্ত থেকে দিকে, আর দিক থেকে দিগন্তে,
দিকে দিগন্তে ; হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ… !!…!!!!!!!!!
অট্টহাসি থামিয়ে মৃদু হেসে ভবিষ্যদ্‌-বাণী করলেন বিধাতা :
"অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, ঘুরে যাবে চাকা। হেঃ হেঃ হেঃ
নিজের চোখে দেখে নাও, খুলে দিচ্ছি ভাবীকালের দরজা।
চিচিং ফাঁক!…চিচিং ফাঁক!…চিচিং…!"
সঙ্গে সঙ্গে…এ কী !!…!!!…!!!!…!!!!!
লালের কাগজে সাদা-প্রশস্তি "ধন্য রে ভাই সাদা!"
লাল-সাহিত্যে পাতায় পাতায়
সাদা-মাহাত্ম্য পরাণ মাতায়
সাদা আর লাল, মাটি আর জল দোঁহে মিলে এক কাদা।
আর ওদিকে সাদার কাগজে কাগজে, সাদার সাহিত্যে,

সাদার রঙ্গমঞ্চে, রূপালী পর্দায়, বেতারে,
আসরে, বৈঠকে, এখানে সেখানে,
লালের যা কিছু ভালো তারি সপ্রশংস ফিরিস্তি।
লাল আর সাদা দুটী যেন পরম হংস,
এ ওর গুণের সন্ধান করছে, খুঁজছে না ছ্যাদা।
কোনো লাল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলে
কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ দাওয়াই,
সাদা উচ্ছ্বসিত পুলকে বলছে "সাবাস্ ভাই, সাবাস্।"
সাদার কাগজে কাগজে তার সচিত্র জীবনী ফলাও হচ্ছে;
কোনো সাদা সাহিত্যিকের বেরোলে সেরা সৃষ্টি,
লাল আনন্দে নেচে বলছে "কেয়া বাৎ! কেয়া বাৎ!"
মানুষের আনন্দময় এগিয়ে চলার পথ
এক সাথে হাতে হাতে বাঁধিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে—
লাল আর সাদা, সাদা আর লাল।
তারা বলছে "ভূগোলে আমরা আলাদা, এর কোনো চারা নেই;
কিন্তু ভাই, ইতিহাসে আমরা মিলবো।"
লালের চোখে পড়লে সাদার কোনো ভুল,
কিম্বা ত্রুটি, কিম্বা দোষ
লাল বলছে "ভাই রে, এটা তুই শুধরে নে।"
সাদা বলছে "তাই তো। তুই ভাই ভালো বলেছিস্।"
আর শুধরে নিচ্ছে, লালের ওপর খুশি হয়ে।
সাদা যদি দেখছে লাল ধরেছে কোনো ভুল রাস্তা,
কিম্বা গলি,
বলছে ভালোবাসার হুঁশিয়ারি দিয়ে:
"ও পথে চলিস্ নে রে ভাই। ফিরে আয়, ফিরে আয়।"
লাল অমনি হুঁশিয়ার হয়ে ফিরে আসছে
আর বলছে "ভাই তুই ঠিক বলেছিস্।"
খুশী হচ্ছে সাদার ওপর।

অবারিত দ্বার
লাল সাদা দুই এলাকার।
কোনো এলাকায় কারো গুপ্তচর নেই,
সবাই প্রকাশ্যে চরে চরে গুণ খুঁজে বেড়াচ্ছে।
সাদা আর লাল দিনরাত ভাবছে
কে কার কত ভালো করতে পারে,
কে কার থেকে কত ভালো নিতে পারে,
কত নিখুঁত করে কে কার সঙ্গে সুর মেলাতে পারে
বিশ্ব-মানব-সংগীতের পরম ঐক্যতানে।
হঠাৎ…একি ?… !!! … ??? …!!!!!
ভবিষ্যতের সামনে ঝপাং করে নেমে গেল কালো পর্দা।
আবার দেখা গেল
লাল আর সাদা, সাদা আর লাল, দু-জনা বচন-মন-দেহে
এ উহার তরে অস্ত্র শানায়, আড়চোখে দেখে সন্দেহে।
এ বলে "আমার শান্তি-প্রয়াসে
তুই বাধা দিস্, ওরে শয়তান ভণ্ড!"
ও বলিছে "তুই বাগড়া না দিলে
বিশ্বশান্তি ঠিক যেতো মিলে
ওরে রে ভীম পাষণ্ড!"
এ ওর দিকে তাকিয়ে এক একবার আস্তিন গুটিয়ে,
ফের আস্তিন ছড়ায়।
বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব শান্তির পাঁয়তাড়া
বিশ্ব-অশান্তির চূড়ান্ত মহড়া যেন।
আবার দিগন্তের আড়াল থেকে জাগ্‌লো প্রশ্ন :
"হে বিধাতা, এতক্ষণ ধরে যে দেখালে
চিচিংফাঁকী স্বপ্ন, তাকি স্রেফ ধাপ্পা ?
অথবা এ কি তোমার এক অট্ট ঠাট্টা ?

তোমার ভবিষ্যবাণী কি সত্য হবে না কোনো দিন
মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ?
মানুষের দানব-লাজানো শক্তি আর দেবতা-লাজানো প্রতিভা
মানুষের ধ্বংস-সাধনায় না মেতে
পাগল হয়ে মাত্‌বে না কি কোনোদিন
শুধু মানুষের কল্যাণ-সাধনে ?
বলো বিধাতা ! বলো বিধাতা ! বিধাতা ! বিধাতা ! বি···"
সে প্রশ্নে মুখরিত হয়ে উঠলো দিক্ দিগন্ত ।
কিন্তু ধীরে ধীরে সে প্রশ্ন
মিলিয়ে গেল অন্তহীন প্রশ্নের ভাণ্ডারে তলিয়ে—
এলো না উত্তর ।
শুধু নেপথ্যের অন্ধকারে, অথবা অন্ধকারের নেপথ্যে,
একটা অর্থ-দুর্বোধ্য অট্টহাসি শোনা গেল :
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ··· !!! ··· !!!!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ··· !!!!!! ··· !! ··· !!!!!!!

বিশ্ব-দর্শন

মহা সন্ধ্যায় বৃক্ষশাখায় কে তুমি গো রাশ্‌ভারি
দূর দিগন্তে তাকায়ে তাকায়ে করিতেছ পায়চারী ?
অন্তরে তব কিসের পিপাসা ?
দু চোখে স্বপ্ন, মুখে নাই ভাষা ।
মাথা হতে তব ঝরেছে কি চুল, মুখে কেন নাই দাড়ি ?
বুল্‌বুলি হায় বুলি ভুলে গিয়ে হয়ে গেল রাম-প্যাঁচা ।
বুকের সর্দি বলে "চুপ থাক্", পরাণ বলিছে "চ্যাচা ।"
যন্ত্রী রে, এ কি ভোলা মন তোর ?
কোথা ভুলে ফেলে এলি যন্তোর ?
রথ দেখা হায় কস্‌কাল তোর, হ'ল না তো কলা-বেচা

দম্‌কল ডেকে যম্‌কালে ওরে আগুন নিভিত যদি
লাটে কি উঠিত পাটের গুদাম, অথবা চটের গদি ?
ভয়া মৌচাকে মৌমাছি কাঁদে,
তপনের আলো ধরা পড়ে চাঁদে,
দূর সাগরের স্বপন দেখিয়া কাঁদিছে শীর্ণ নদী।
হিমেল্ পাহাড়ে কে যেন আহা রে খুঁজিতেছে বালুচর
স্বপন ভাঙিয়া গোপনে কাঁদিছে নিরালায় নির্ঝর।
নর্মদা-স্রোত ফুলে ফুলে উঠে
দুই তটে তার পড়িতেছে লুটে,
হাঁকিতেছে "দেখ্ যমুনা গঙ্গা, আমি কী যে সুন্দর !"
কোথা বাঁশঝাড়ে ঝাঁঝিঁঝিঁ কারে ডেকে ডেকে হ'ল সারা ?
কত মহিষীরে কাঁদায়ে কত যে মহিষ পড়িছে মারা !
রোগা রোগা আহা কত আচার্য
করিছেন কত মহতী কার্য,
বরষার মত ঝরায়ে ঝরায়ে বহু বচনের ধারা।
বিশ্ব-বাঁশরী বাজায়ে বাজায়ে শ্রান্ত বিধাতা কাঁদে
পঞ্চ-ফোড়নে কোন্ সে রাঁধুনী অনন্ত রাঁধা রাঁধে ?
কত জালে পড়ে কত জালিয়াৎ
কত চালে ফাঁসে কত চালিয়াৎ,
অমা-রজনীর কালো ঢেউ এসে লাগে যে পূর্ণ চাঁদে
নিখিল গগন ভেল্‌কি-মগন, তবুও কালের চাকা
ঘুরে ঘুরে চলে আপনার ছন্দে, শোনে না তো পিছু ডাকা
নিজের বিশ্ব নিজ হাতে গড়ি
খেলা ছলে আমি তারি পিঠে চড়ি,
নিঃশেষে তারে ফুঁকে দিয়ে শেষে আমি হয়ে যাবো ফাঁকা॥

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

মহাস্থবির জাতক

সাত

সত্যি কথা বলতে কি, টাকা সম্পূর্ণ শোধ হ'য়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমাদের চলবে কি ক'রে সে কথাটা আমরা ভাবিই নি। এতদিন পরে একটা কিছু যে জুটল, সেই আনন্দেই একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া আমাদের মুরুব্বী সত্যদাও যখন প্রকাশ করলেন যে, তোমাদের বরাত খুবই ভাল, নইলে গায়ে পড়ে লোকটা ব্যবসা করতে চাইবে কেন! তখন এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনও গলদ থাকতে পারে তা ধারণাই করতে পারি নি।

কিন্তু সত্যদাকে যখন আমরা ব্যাপারটা খুলে বললুম, তখন তিনিও হাঁ হয়ে গেলেন এবং বললেন, আজই গিয়ে লোকটার সঙ্গে একটা ফয়সাল্লা ক'রে ফেলছি।

ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িওয়ালা শেঠ একদিন ডেকে বললেন, তোমরা যদি ব্যবসা করতে চাও তো আমি একটা প্রস্তাব তোমাদের দিতে পারি, তোমরা ভেবে-চিন্তে দেখ।

তিনি বললেন, দিল্লিতে তাঁর একটা বড় বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত দশটা মোজা ও দশটা গেঞ্জির কল বসানো যাক। এর জন্য মূলধন যা লাগে তা তিনি দেবেন। লাভের শতকরা পঞ্চাশ টাকা তিনি নেবেন আর শতকরা পঞ্চাশ টাকা আমরা পাব। পরে ব্যবসা ভাল চলতে থাকলে তিনি আরও টাকা ফেলবেন। এই ভাবে তিনি লক্ষ টাকা ফেলবেন। এর মধ্যে যদি ব্যবসা উঠে যায় কিংবা বিক্রি করতে হয়, তবে দেনা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত টাকা ওই ভাবে ভাগ ক'রে নেওয়া হবে। আর বরাবর আমাদের তিন জনকে খাবার ও অন্যান্য খরচের জন্য একত্রে মাসে একশো টাকা ক'রে দিয়ে যাবেন। ভদ্রলোক বললেন, আপনারা ভেবে-চিন্তে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে দেখুন।

হাতে চাঁদ পাওয়া আর কাকে বলে! এই প্রস্তাব শুনে তো আমরা একেবারে লাফিয়ে উঠলুম। আমাদের এত দিনকার পাথর-

চাপা বরাত যে এবার পাপড়ি বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল যে, আমাদের আশ্রয়দাতা শেঠের প্রস্তাবের কথা সত্যদাকে এখন আর ব'লে কাজ নেই। আগেকার প্রস্তাবটার ফলাফল কি হয় তাই দেখা যাক। আনন্দের আতিশয্যে সে রাত্রে এক দোকান থেকে কিছু রান্না-মাংস কিনে আনা গেল। কিন্তু একসঙ্গে অত সুখ সহ্য হ'ল না, কারণ ঝালের চোটে সে মাংস মুখে তুলতে পারলুম না। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে ব'লে রাখি যে, ঝাল খাওয়া সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের লোকের বৃথাই বদনাম হয়েছে—দিল্লি, আগ্রা ও পাঞ্জাবের লোকেরা যা ঝাল খায় তার কাছে চট্টগ্রামের লস্করদেরও শিশু বলা চলতে পারে।

যা হোক, মাংসের হাঁড়ি আবার কোঁচায় লুকিয়ে বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় ফেলে আসতে হ'ল।

পরের দিন সত্যদার ওখানে যেতেই তিনি বললেন, কাল তোমাদের শেঠের ওখানে গিয়েছিলুম। লোকটাকে যত সিধে মনে হয়েছিল মোটেই তা নয়। তোমাদের কথা তুলতেই বললে, এখন ও-সব থাক্, পরে হবে। ব্যাটা ছ্যাঙ্গে খেলাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

দিন দুই পরে সত্যদা আবার বললে, না হে, লোকটাকে যত খারাপ মনে করেছিলুম সে তা নয়। কাল এসে সে বললে—আমি ভেবে দেখলুম, যতদিন না আমাদের কারবারে লাভ হচ্ছে ততদিন বাবুদের জন্যে একটা মাসোহারা ঠিক ক'রে না দিলে তাদের দিন চলবে কি ক'রে! আমাকেও তোমাদের এই কারবারে টানবার চেষ্টায় আছে—আজ আমার এক বন্ধু উকিলের কাছে যাব পরামর্শ করতে।

ওদিকে আমাদের বাড়িওয়ালা শেঠ ডেকে বললেন, আমাদের এস্টেটের উকিলকে ব্যবসা সম্বন্ধে লেখাপড়ার একটা খসড়া তৈরি করতে বলেছি। খসড়া তৈরি হ'লে সেটা তোমাদের উকিলকে দেখিয়ে একটা পরামর্শ ক'রে লেখাপড়ার তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলা যাবে।

সব দেখে শুনে আমরা তো আনন্দে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলুম।

জনার্দন আনন্দের চোটে মাতৃভাষায় কথা বলাই ছেড়ে দিলে। সে বলতে লাগল—এবার বরাতসে পাথর হট্ গিয়ে ভেকিনিটুলি বরাত খুল্ গিয়া।

আমাদের পাথর-চাপা বরাত যে সত্যই খুলে গিয়েছে সে সম্বন্ধে সেদিন আমাদের তো কোন সন্দেহই ছিল না, সত্যদা, যিনি সব প্রস্তাবকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাঁরও ছিল না। এই জাতক যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মনে এ সম্বন্ধে যদি কোনও সন্দেহ জেগে থাকে—এবার তবে তারই নিরাকরণ করি।

কাশী প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য আরও অনেক শহরের মতন আগ্রা শহরেও বাঁদরের উৎপাত অত্যন্ত বেশি। সমস্ত দিনই পালে পালে বাঁদর ছাতে ছাতে ঘুরছে। ছাতে কিছু রাখবার জো নেই। চাল, ডাল, কাপড়, বড়ি, আচার বা জিনিসপত্র যাই কিছু রাখা হোক না কেন, সেখানে লাঠি হাতে কোনও পুরুষ যদি না থাকে তা হ'লে বাঁদরে তা নষ্ট ক'রে ফেলবেই। মজা এই যে তারা একজন স্ত্রীলোক বা দু-চারজন বালক-বালিকাকে গ্রাহ্যই করে না, বিশেষ যদি তাদের হাতে লাঠি না থাকে। আমাদের ঘরের সংলগ্ন একটু ছোট ছাত ছিল, কিন্তু বাঁদরের অত্যাচারে সেখানে কিছু রাখবার জো ছিল না। সুকান্ত বাঁদর দেখলেই তাড়া করত—একদিন বাগে পেয়ে সে একটা বাঁদরকে লাঠি দিয়ে এমন মেরেছিল যে বাঁদরটা দোতলা থেকে রাস্তায় প'ড়ে গিয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হয়েছিল। ভাগ্যে কেউ দেখে নি। পাড়ার লোকেরা কিছুক্ষণ হৈ-চৈ ক'রে সকলে বাঁদরের পরিচর্যায় মন দিলে। এত অত্যাচার করা সত্ত্বেও বাঁদরকে মারবার উপায় ছিল না। ওখানকার লোকেরা বলত যে, বাঁদর তো বাঁদরামি করবেই।

একদিন সুকান্ত ভুলক্রমে ঘরের বাইরে জুতো রাখায় এক পাটি জুতো বাঁদরে তুলে নিয়ে দিলে চম্পট। কি আর করা যাবে—একটুক্ষণ দেখে বাঁদরের হাত থেকে জুতো উদ্ধার করা অসম্ভব বুঝে সুকান্তর জন্য সদলবলে জুতো কিনতে বেরুনো গেল।

আগ্রায় জুতো জামা তখন কলকাতার তুলনায় অসম্ভব রকমের সস্তায় পাওয়া যেত। পাঁচ সিকে দেড় টাকায় যে জুতো পাওয়া যেত কলকাতায় তার দাম ছিল অন্তত সাড়ে তিন টাকা। সে কথা যাক, আমরা একটা বড় দোকানে ঢুকে নানা রকমের জুতো দেখছি, দর করছি—দোকানে আরও দু-তিনজন খদ্দের এখানে-ওখানে ব'সে জুতো পরছে। আমাদের পাশেই মাথায় গোল টুপি পরা এক ভদ্রলোক জুতো পরীক্ষা করছিল, এমন সময় আমাদের মুখে বাংলা কথা শুনে ফিরে দেখেই ছাড়লে—কেডা রে, ছোট্‌কা নাকি! তুই এখানে কি করশ?

সুকান্ত একমনে জুতো দেখছিল, সে মুখ ফিরিয়ে বললে, কে বাবা, রাশনাম ধ'রে ডাক ছাড়লে!

লোকটি মাথার গোল টুপিটা খুলে বললে, কি রে আমারে চেনশ না!

সুকান্ত তখনও তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে দেখে সে বললে, আমি তোর দাদা সন্তোষের বন্ধু রণদা;

সুকান্ত বললে, ও, এবার বুঝতে পেরেছি।

লোকটা আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। সুকান্ত [illegible] ফিসফিস ক'রে বললে, তার দূরসম্পর্কের এক পিসতুতো ভাইয়ের বন্ধু সে। রণদার কথায়বার্তায় জানতে পারা গেল যে, বার তিনেক বি. এস-সি. ফেল মেরে এবার তিনি আগ্রা কলেজের মুখোজ্জ্বল করতে এসেছেন।

আমাদের জুতো কেনা হ'য়ে গেলে রণদাও আমাদের সঙ্গে চলল। কথায়বার্তায় তাকে বেশ মাইডিয়ার লোক ব'লে মনে হ'ল। সে বলতে লাগল, ভাই, কলকাতা ছেড়ে এই নির্বান্ধব পুরীতে এসে যে কি মুশকিলেই পড়েছি তা আর কি বলব! এমন একটা লোক পাই না যে মাতৃভাষায় দুটো প্রাণের কথা কই। তোমাদের দেখে বড় ভাল লাগল। এখানে কি করতে এসেছ?

সুকান্ত বললে, আমরা বেড়াতে এসেছি। দিন দশেক পরে দিল্লি যাব। সেখানে যা দেখবার তা দেখে কলকাতায় ফিরব।

কথা বলতে বলতে রণদা একেবারে আমাদের বাড়িতে এল। সে খুব আত্মীয়তা দেখিয়ে বলতে লাগল, যে কটা দিন এখানে আছিস মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব।

তারপর কিছুক্ষণ ব'সে কলকাতার সব খবরাখবর নিয়ে সেদিনের মতন সে বিদায় নিলে। পরদিন বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরুবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় রণদা এসে হাজির। সে বললে, ওরে ছোট্কা, কাল এখান থেকে ফেরবার পথে আমি সন্তোষকে তার করেছিলুম, ছোট্কারা এখানে রয়েছে, কি করব? আজ সকালে সে টেলিগ্রামের সাথে এসেছে। ব'লে, একখানা টেলিগ্রাম আমাদের দিলে। তাতে লেখা আছে, ওদের গ্রেপ্তার কর, আমরা আজই দিল্লি এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছি, পরশু এগারোটায় আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছব, স্টেশনে এসো।

টেলিগ্রামখানি পাঠ ক'রে একেবারে গ্র্যাণ্ড্ হ'য়ে যাওয়া গেল। প্রথম থেকেই এই রণদা লোকটিকে আমার পছন্দ হয় নি, তার গায়ে-পড়া ভাব দেখে। তার এই সব কাণ্ড দেখে আমার এত রাগ হ'য়ে গেল যে, আমি আর থাকতে না পেরে ব'লে ফেললাম, আপনি আবার ওস্তাদি ক'রে কলকাতায় তার করতে গেলেন কেন?

নির্লজ্জের মতন হাসতে হাসতে রণদা বললে, তার করব না। তোমরা পলায়ন করার পর থেকে সেখানে কি শুরু হয়েছে জান! মারপিট খুনোখুনি চলেছে প্রত্যহ—কাগজে কাগজে আলোচনা ঝগড়ার আর শেষ নেই। সকলেই বলছে—তোমাদের ছেলেধরায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়েছে। এই সব ব্যাপার আমি আগেই কাগজে পড়েছিলুম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই আমি জানতুম যে তোমরা বাড়ি থেকে লম্বা দিয়েছ। যা হোক, যা হবার তা তো হ'য়েই গিয়েছে, এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও সুড়সুড় ক'রে।

রণদা আমাদের ওখানে ব'সে প্রায় রাত্রি আটটা অবধি আড্ডা দিলে। যাবার সময় বললে, দেখ, কাল বেলা এগারোটার গাড়িতে ওরা আসছে। আমি এই বেলা দশটা নাগাদ এখানে এসে স্টেশনে নিয়ে যাব তোমাদের। ওরা বোধ হয় জন তিনেক আসছে, তোমাদের এখানে এসেই উঠবে। আগ্রায় আসছে, অন্তত সপ্তাহ খানেক ওদের ধ'রে রাখতে হবে, কি বল ?

আমরা বললাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে !

সুকান্ত বললে, কাল তা হ'লে আপনিও আমাদের এইখানেই খাবেন। অত বেলায় আর কোথায় যাবেন—

রণদা বললে, বেশ বেশ, সে ভালই হবে। দেখ, আগ্রা শহরে খুব চমৎকার বালুসাহী (টিক্‌রি) হয়, কিছু আনিয়ে রেখো তো !

বললাম, বেশ, আমাদের চেনা দোকান আছে, সেখানে খুব ভাল বালুসাই তৈরি করে।

রণদা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড় পেরোতে না পেরোতে সুকান্ত উঠে কম্বলটা পাট করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

—কি হচ্ছে ?

—এই বালুসাহীর অর্ডার দিচ্ছি।

তখনকার মতন তাকে থামিয়ে পরামর্শ করা গেল, আগে স্টেশনে গিয়ে দেখা যাক, সুবিধামত ভাগবার ট্রেন কখন আছে। তখুনি দরজায় তালা দিয়ে স্টেশনে গিয়ে জানলুম, ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেন ছাড়বে ভরতপুরের দিকে। ঠিক করা গেল, ঐ ট্রেনেই স'রে পড়া যাবে।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে বাড়িওয়ালা শেঠকে বলা গেল, বিশেষ একটা গোপনীয় কথা আপনাকে বলব, কিন্তু কারুকে বলবেন না।

বাড়িওয়ালা বললেন, সে কি কথা ! গোপনীয় কথা যখন তখন প্রাণ গেলেও কারুকে বলব না।

বললুম, কলকাতা থেকে আমাদের কাছে এই মাত্র খবর এল যে, আমরা অবিলম্বেই যেন আগ্রা থেকে স'রে পড়ি।

আমাদের কথা শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। বললুম, উপস্থিত আমরা এলাহাবাদে যাচ্ছি; কিন্তু কোনও লোক, সে পুলিসের হোক আর যেই হোক, যদি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তো বলবেন, তারা দিল্লি হয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাবে ব'লে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, কোন ফিকির করবেন না, তাই ব'লে দেব।

একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি আর ফিরবেন না?

—নিশ্চয় ফিরব। কিন্তু কবে ফিরব তা এখন ঠিক ক'রে বলতে পারছি না। কাল বেলা দশটার গাড়িতে আমরা যাব, ফেরবার সময় হ'লেই আপনাকে জানাব।

দুঃসময়ে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে শেঠজীর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। সেই রাত্রেই একবার পরেশদার খোঁজ নিতে যাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে, এখনও পর্যন্ত তার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। পরেশদার বাড়িওয়ালা বললেন যে, তিনি পুরো এক বছর দেখে তারপর যা হয় করবেন। আবার একবার তাঁকে পরামর্শ দিলুম—যা করবার এখুনি তা ক'রে ফেলতে পারেন, এক বছর অপেক্ষা করবার কিছু দরকার নেই।

সত্যদার কাছে বিদায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা হ'তে লাগল। ভদ্রলোক বিনা স্বার্থে আমাদের জন্য অনেক করেছেন। কিন্তু তাঁকে জানাতে গেলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে ভেবে সেদিকে আর অগ্রসর হলুম না। সে রাত্রে আর রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা নেই। বাজার থেকে খাবার খেয়ে বাড়িতে এসে যখন গা এলিয়ে দেওয়া গেল, তখন বারোটা বেজে গিয়েছে।

সারারাত্রি আধ-ঘুম ও জাগরণেই কাটল। তখন বোধ হয় রাত্রি চারটে, চারিদিক ঘোর অন্ধকার। শেষ রাত্রের শীতে আগ্রা নগরী তখনও সুষুপ্তির কোলে প'ড়ে স্বপ্ন দেখছে, চারিদিক ঘন কুয়াশায়

জালে আচ্ছন্ন—সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা তিনজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

সেখান থেকে ইস্টিশান অনেক দূরের পাল্লা। জামা, কাপড়, বালিশ, শতরঞ্চি ইত্যাদি নিয়ে তিনটি বোঁচকা তিন জনের কাঁধে ঝুলছে। বোঝার ভারে হেলে-দুলে সরু সরু গলিপথ দিয়ে আমরা চলেছি কখনও আস্তে, কখনও জোরে, কখনও দৌড়ে—চল্—চল্, পালা—পালা—পূর্বজন্মের কোন্ খাতক কোথায় আত্মগোপন ক'রে আছে, তার কাছ থেকে যতখানি আদায় ক'রে নিতে পারা যায়! কোন্ জন্মের কোন্ মাতৃঋণে বাঁধা আছি কোন্ নারীর সঙ্গে—কোন্ ভাই, কোন্ দাদা, কোন্ বোন্ কে কোথায় জড়িয়ে আছে কে জানে, সে বন্ধন অক্ষয়! দৌড়—দৌড়—দৌড়—কোথায় কোন্ সন্তান-শোক-বিধুরা জননী গভীর নিশীথে ব'সে অশ্রুমোচন করছে তার সঙ্গে অশ্রু মেলাতে হবে, চল্—চল্—এরই মধ্যে ধরা পড়লে চলে! জানি, নিশ্চয় জানি, আমার ভাগ্যাকাশে আজ যে মেঘসঞ্চার হয়েছে সৌভাগ্যের অরুণোদয়ে কালই তা অপসারিত হবে। কণ্টকময় অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পন্থ বালারুণরশ্মিপাতে আবার ঝলমল ক'রে উঠবে, ভবিষ্যতের আকাশে দিক্‌বধূরা রামধনুর রঙের ওড়না উড়িয়ে আবার হোরিখেলায় মেতে উঠবে, আবার অতর্কিতে যতদিন না অশনি এসে পড়ে। পালা—পালা—দৌড়—দৌড়। অন্ধকারে কখনও মনে হয়, পুলিসে তাড়া করেছে—দূরে কোন গৃহস্থের ঘরে মিটিমিটি প্রদীপ—আমাদেরই মনের আশার মতন কখনও জলছে, কখনও নিভছে—এমনি করতে করতে স্টেশনে এসে দেখলুম, আমাদের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে আমাদেরই মতন ধুঁকছে—টিকিট করবার আর অবসর নেই—একখানা খালি কামরায় ঢুকে যা হবার তাই হবে ব'লে এলিয়ে পড়া গেল।

• • •

ভরতপুর স্টেশনে গিয়ে যখন নামলুম, তখনও সূর্যাস্ত হতে প্রায়

ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী নেমে স্টেশনের দরজা পার হ'য়ে চ'লে গেল। কিন্তু আমাদের কাছে টিকিট নেই ব'লে সেদিকে না গিয়ে অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরুতে পারা যায় কি না তারই খোঁৎ-খাঁৎ খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু বৃথাই আমরা ভয় পেয়েছিলুম, কারণ একটু পরেই বুঝতে পারলুম যে, টিকিট-চেকার ব'লে কোনও লোক সেখানে উপস্থিত নেই। সেই আমাদের প্রথম পাপ ব'লে এত ভয় পেয়েছিলুম। কিছুদিন পরেই জানতে পারলুম, আমরা যাকে পাপ মনে করেছিলুম, সে পাপের প্রচলন ও-অঞ্চলে খুবই বেশি। সে যুগে ও-সব জায়গায় বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত করাকে বিশেষ অন্যায় ব'লে মনে করা হ'ত না। সরকার তার প্রজাদের জন্য রেল তৈরি ক'রে দিয়েছে, তাতে চ'ড়ে যাতায়াত করব, তার আবার পয়সা দেব কি—এই রকম একটা মনোভাব সাধারণ অশিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কত লোক যে সে সময় বিনা-টিকিটে রেলে যাতায়াত করত তার আর ঠিকানা নেই। অনেক বিনা-টিকিটের যাত্রীকে রেলের কর্মচারীরা যখন ধরত তখন তাদের মুখ দেখে মনেই হ'ত না যে, টিকিট-কাটার মতন কোন অন্যায় ও অসঙ্গত বিধান সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞান আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই রেলের লোকেরা বিনা-টিকিটের যাত্রীদের তখনকার মতন কিছুক্ষণ আটকে রেখে শেষে ছেড়ে দিত। সাধু-সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাদের অঙ্গে গেরুয়া-বসন অথবা হাতে কমণ্ডলু থাকত, তারা তো খোলাখুলিভাবে জোর ক'রে বিনা টিকিটে যাতায়াত করত। রেলকর্মচারীরা তাদের কাছে টিকিট চাইত না, আর যাত্রীরাও তাদের খাতির ক'রে বসবার এমন কি শোবার জায়গা পর্যন্ত ক'রে দিত।

আমরা তো বিনা বাধায় স্টেশনের ফটক পার হ'য়ে এলুম। সুকান্ত বললে, যা হোক, এতদিনে রেলভাড়া সমস্যার একটা সমাধান হ'ল।

সকাল থেকে আহারাদি কিছুই হয় নি। স্টেশনের হাতার মধ্যেই এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বগি-থালার মত বড় আর পাতলা

চাপাটি এক পয়সায় একটা ক'রে আর এক পয়সায় মহাশের মাছের ইয়া বড় দাগা ও তৎসহ ঝোল কিনে পেট ভ'রে খাওয়া হ'ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি মৎস্য-মুখ করা হয় নি। খেতে খেতে জনার্দন বললে, ওরা বোধ হয় এতক্ষণ বালুসাহী খেয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছে।

জনার্দনের কথায় অনেকক্ষণ পরে প্রাণ ভ'রে হাসা গেল। যা হোক, অনেক কাল পরে পেট ভ'রে স্ব-খাদ্য ও সুখাদ্য খেয়ে পা বাড়ানো গেল অজানার পথে।

শহরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সমস্ত জায়গাটা যেন থমথম করছে—নির্জীব, প্রাণহীন—শীতে যেন সব কুঁকড়ে গেছে। পথে অত্যন্ত ধুলো, লোকজন যা দু-একটা চলছে তাদের মাথা থেকে পা অবধি ধুলায় ধূসরিত। লোকগুলো বেশ লম্বা-চওড়া, দেখলেই মনে হয় শক্তিমান। প্রায় সকলেই মাথা মুখ পেঁচিয়ে থুতনি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে সাদা কাপড়ের পাগড়ি বেঁধেছে—অবিশ্যি পাগড়ীর কাপড় সাদা কোনকালে ছিল, এখন ধূলি-মলিন। কারুর পায়ে ছেঁড়া জুতো, এত ছেঁড়া যে তাকে আর জুতো বলা চলে না। বাড়িগুলোও সব ধুলোয় আচ্ছন্ন, উঁচু বাড়ি নেই বললেই হয়, বাড়িগুলোর অবস্থাও খারাপ। বাড়িগুলোর ওপরে এমন ধুলোর প্রলেপ পড়েছে যে, সেগুলো ইঁটের না পাথরের তৈরি তা বোঝাই মুশকিল। বড় বড় আকাশচুম্বী গাছ, তাদেরও ঐ দুর্দশা—পাতাগুলো সব শুকনো ধুলোমাখা, ডালগুলোর অবস্থাও তাই। পথে দু-চারটে ছাগল দেখতে পাওয়া গেল, আকারে ও প্রকারে তারা আমাদের দেশের ছাগলের চেয়ে বড়, দুধও বোধ হয় দেয় বেশি, কিন্তু দেহ তাদের ধুলায় ধূসরিত। আগেই বলেছি, চলতে চলতে মনে হ'তে লাগল জায়গাটা যেন ধুলো মেখে কুঁকড়ি-মুঁকড়ি মেরে প'ড়ে রয়েছে। বেলা তখন সাড়ে তিনটে কি চারটে হবে, কিন্তু তখনই মনে হ'ল যে পুরবাসীরা দোরতাড়া লাগিয়ে সব শুয়ে পড়েছে। ধর্মশালার খোঁজে খা নিকটা ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু খুঁজে পেলুম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা

ক'রেও কিছু সন্ধান করতে পারলুম না। তারা কি যে বললে, কোন্ ভাষায় বললে তাও বোধগম্য হ'ল না। মনে হ'তে লাগল, আচ্ছা জায়গায় এসে পড়েছি যা হোক।

এদিকে বোঁ-বোঁ ক'রে বেলা প'ড়ে আসতে লাগল, তখনও মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করতে পারলুম না, ওদিকে বোঁচকা বইতে বইতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম।

এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় শহরের প্রান্তে এসে পড়া গেল। এক জায়গায় দেখলুম, একটা বড় ভাঙা একতলা বাড়ির সামনে গোটা তিন-চার দড়ির খাটিয়া প'ড়ে আছে। গোটা পাঁচ-ছয় কুকুর তাদের অসংখ্য বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কাছেই শুয়েছিল, আমাদের দেখে তারা চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কুকুরগুলোর কিছু দূরেই একটা লোক সেই রকম পাগড়িতে মাথা-মুখ ঢেকে কতকগুলো ছাগলের বাচ্চাকে ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। তারই অদূরে দেখলুম, আর একটা লোক একটা বড় ছাগলের দুধ দুইছে—আর এক পাশে কয়েকটা ধাড়ী ছাগল মিলে এক আঁটি শুকনো ঘাস নিয়ে টানাটানি করছে।

আমাদের দেখে কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠতেই যে লোকটা ছাগলের বাচ্চাগুলোকে ধ'রে ছিল, সে সচকিত হ'য়ে ফিরে কটমট ক'রে আমাদের দেখতে লাগল। আমরা দাঁড়িয়ে ভাঙা বাড়িটা দেখছি—প্রকাণ্ড দরজা, তার পেছনে বিরাট ধ্বংসস্তূপ প'ড়ে রয়েছে একেবারে পাহাড়ের মতন উঁচু—ইতিমধ্যে যে লোকটা দুধ দুইছিল সে উঠে দাঁড়াতেই এ লোকটা বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলে। এবারে বুঝতে পারা গেল, যে ছাগল দুইছিল সে স্ত্রীলোক। দুধের পাত্রটা নিয়ে সে সম্মুখের সেই প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে ভেতরে গেল, আর এ লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশ কোথায়?

—আগ্রা শহরে।

কিছুক্ষণ আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কি চাই?

বললুম, আমরা এখানে নতুন এসেছি, ধর্মশালা খুঁজে বেড়াচ্ছি। ধর্মশালা কোথায় বলতে পার?

লোকটা আবার একবার বেশ ক'রে আমাদের দেখে বললে, এই তো ধর্মশালা—এইখানে থাকতে পার।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই ধর্মশালার মালিক কি তুমি?

সে বললে, হ্যাঁ।

—তোমার নাম কি?

—রামসিং।

বললুম, কোথায়, ঘর দেখাও তো।

সে আমাদের ডেকে সামনের সেই প্রকাণ্ড ভাঙা ঘরে নিয়ে গেল। মাঠের মতন বড় ঘর। দেড়শো দুশো বছর আগে সেখানে হয়তো কোনও রাজদপ্তর ছিল, কারণ বাস করবার জন্য মানুষ অত বড় ঘর কখনও বানায় না। ঘরের দেওয়ালের মাঝে মাঝে গর্ত। কোনও গর্ত পাথর, কাঠ, পাতা ইত্যাদি দিয়ে ভরাট করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কোনও গর্ত এমনিই হাঁ হ'য়ে আছে। শেয়াল, বাঘ, নেকড়ে, গরু, মোষ ও যে হাতী হস্তীমূর্খ নয় সেও কায়দা ক'রে অনায়াসে সে গর্ত দিয়ে ঘরে বাইরে যাতায়াত করতে পারে। ঘরের এক দিকে দুটো দড়ির খাটিয়া, তার ওপর কতকগুলো ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া প'ড়ে আছে। এদিক ওদিক হাঁড়ি-পাতিলের মতও কিছু কিছু জিনিস ছড়ানো রয়েছে। বোঝা গেল এগুলি সব রামসিং-দম্পতির সম্পত্তি। কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের ধুলোর ওপর কি ক'রে শোওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করায় রামসিং বললে, খাটিয়া দিতে পারি, রোজ এক পয়সা ক'রে ভাড়া লাগবে। অর্থাৎ ধর্মশালার জন্য এক পয়সা, খাটিয়ার জন্য এক পয়সা, একুনে তিন জনে ছ-পয়সা। আমরা বললুম, ধর্মশালার জন্য ভাড়া দেব না, খাটিয়ার জন্য তিনজনে দৈনিক তিন পয়সা দিতে পারি। দেখ, রাজী থাক তো বল?

লোকটা সোজা ব'লে দিলে, না, হবে না।

আমরা চ'লে আসছি দেখে রামসিংহিনী রুখে উঠল, কোথায় যাচ্ছ ?

—দেখি, অন্য কোথাও জায়গা পাওয়া যায় কি না !

সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা কত বলছ ?

—আমরা বলছি খাটিয়া সমেত জনপ্রতি রোজ এক পয়সা ক'রে দেব।

—বেশ, তাই দিও। ব'লে সে বাইরে গিয়ে দুই হাতে দুখানা রৌদ্রতপ্ত খাটিয়া তুলে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে এক জায়গায় রেখে বললে, শুয়ে পড়।

এরই মধ্যে শুয়ে পড়ব কি ! তবু যা হোক বোঁচকাগুলো নামিয়ে একটু হালকা হওয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একখানা খাট এসে পড়ল। কিন্তু সেগুলোতে কি ধুলো রে বাবা ! যত ঝাড়ি তত পড়ে। শেষকালে আর চেষ্টা না ক'রে তিনখানা খাট ঠেকাঠেকি ক'রে তার ওপরে শতরঞ্চি বিছানো গেল। এক-একটা ধুতি পেতে চাদর করা গেল। রামসিংকে বললুম, আমরা বাইরে চললুম, খেয়ে দেয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই আসব।

রামসিং কোনও কথা বললে না। তার গিন্নী বললে, রাত্তিরে রাস্তা দেখতে পাবে না, হারিয়ে যাবে। খেয়ে দেয়ে অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসো।

সেখান থেকে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে শহরটাকে ভাল ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলুম। আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনার তুলনায় ভরতপুরকে শহরই বলা চলে না। এর অনেক দিন পরে আর একবার ভরতপুরে যাবার সুযোগ হয়েছিল। আগের চেয়ে শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে দেখলুম বটে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে অন্যান্য শহরেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, কাজেই তুলনায় তার মাপ সমানই আছে।

একটু ঘোরাফেরা করতে না করতেই অন্ধকার হ'য়ে আসতে লাগল আর সেই সঙ্গে শীত পড়তে লাগল দারুণ। আমাদের অঙ্গে

পরেশদার দেওয়া সেই খোশা ছিল। আগ্রায় কোনও রকমে তার দ্বারা শীত নিবারণ হ'ত, কিন্তু এখানে সন্ধ্যেবেলাতেই সেই খোশা ভেদ ক'রে ঠাণ্ডা যেন গায়ে বিঁধতে লাগল। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা দেখতে পেলুম না, তাই সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই এক রকম ছুটে আমাদের সেই ডেরায় ফিরে এলুম। জায়গাটা একেই নির্জন ছিল, সে সময় একেবারে যেন খাঁ-খাঁ করছিল। বাইরে কুকুর ছাগল কিছুই নেই, দরজায় একটা চটের পর্দা ঝুলছে, কারণ কবাটের বালাই নেই। কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া গেল।

ঘরের মধ্যে সেই প্রায়ান্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তার মধ্যেই দেখতে পেলুম যে সেখানে ছোটখাট একটি চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছে। এক দিকে সিংহ ও সিংহিনী দুটো খাটে প'ড়ে রয়েছে, তাদের আপাদমস্তক শতছিন্ন ময়লা কাপড়ে ঢাকা। বোধ হয় গোটা পঁচিশেক কুকুর স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ধাড়ি ছাগলগুলো বড় বড় পাথরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা, বাচ্চাগুলোকেও একটু দূরে তেমনই ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধাড়ি বাচ্চা সবাই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। আমরাও পা টিপে টিপে খাটের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। দেওয়ালের বড় বড় গর্ত দিয়ে দেখতে লাগলুম বাইরে তখনও স্বল্প আলো আছে। তার ভেতর দিয়ে সেই বিরাট উঁচু-নীচু ধ্বংসস্তূপ দেখা যেতে লাগল। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে বড় গাছ লতা জন্মেছে। ক্রমে সেই নিস্তব্ধ বনস্থল ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠতে লাগল। ঝিঁঝিঁ পোকা ও অন্য কি সব রাতপাখির অদ্ভুত চীৎকারে সমস্ত জায়গাটা ভয়াবহ হ'য়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ধীরে ধীরে বাইরের আলোটুকু নিভে গেল।

আগের দিন রাত্রে ঘুম না হ'লেও সেদিন ট্রেনে প্রায় সব সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলুম। তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোনো কোনদিনই অভ্যেস নেই। তার ওপর সেই অজানা শহর, অদ্ভুত আশ্রয় ও বিচিত্র পরিবেশ, এর মধ্যে নিদ্রাদেবীর মতন বেপরোয়া ব্যক্তিও প্রবেশ

করতে ভরসা পান না। কাজেই সেই অন্ধকারে চোখ চেয়ে প'ড়ে প'ড়ে ভাবতে লাগলুম হাজার রকমের ভাবনা। কিন্তু প্রাণ খুলে যে চিন্তা করব তারই জো আছে কি! অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে শীত বাড়তে লাগল। এমন সাংঘাতিক শীত আগ্রাতে একদিনও ভোগ করতে হয় নি। তার ওপরে দেওয়ালের সেই বড় বড় ফুটো দিয়ে হো-হো ক'রে বাতাস ঢুকতে লাগল ঘরের মধ্যে। শীতে খালি এ-পাশ ও-পাশ ক'রে গরম হবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি, সৃষ্টিকর্তা যদি পশুপক্ষীদের মতন মানুষের অঙ্গেও শীতাতপ থেকে বাঁচবার জন্য কোনও আবরণ দিতেন তা হ'লে এই কষ্টভোগ আর করতে হ'ত না। এমন সময়ে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে জনার্দনের কণ্ঠ থেকে খবত রাগে বেসুরো প্রস্রবণ ছুটল—"আমায় কোথায় আনিলে—আনিয়ে, তরঙ্গমাঝে তরী ডোবালে!"

জনার্দনের গান শুনে হাসব কি কাঁদব তাই ভাবছি, এমন সময় সুকান্ত বললে, বৎস জনার্দন, ধৈর্য ধর, তরী তরঙ্গ মাঝারে পড়েছে মাত্র, ডুবতে এখনও দেরি আছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জনার্দন এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আবার ষাড়-চ্যাচানি চেঁচাতে আরম্ভ করলে, "কোথা রইল পিতা মাতা, কোথা রইল বন্ধু ভ্রাতা—আমার প্রাণপ্রিয়ে রইল কোথা বন্ধু সকলে"—ব'লে এমন এক তান ছাড়লে যে কুকুরগুলো জেগে উঠে ধমকের সুরে চোপ্ চোপ্ চুপ রহো ক'রে চেঁচাতে লাগল—ছাগলগুলো শুরু করলে ব্যা-ব্যা, ওদিক থেকে মৃদু সিংহনাদও শোনা যেতে লাগল।

চারিদিক থেকে ঐ রকম প্রতিবাদ হ'তে থাকায় জনার্দন চুপ করল বটে, কিন্তু শীত তো আর সহ্য হয় না। শীতের চোটে শুয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। আগ্রায় রাতে আমরা মোমবাতি জ্বালাতুম, কয়েকটা মোমবাতি সঙ্গেও ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে বসলুম। জনার্দন তো শীতের

চোটে সশব্দে হি-হি করতে লাগল। শেষকালে সেই কম্পিত গলায় আবার সে গান ধরলে। তখুনি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দেওয়া গেল। জনার্দন্ বলতে লাগল, ভাই, শীতের চোটে তো মারা গেলুম—তোরা দুজনে আমাকে জড়িয়ে ধর্।

সুকান্ত বললে, উনি আবার তিব্বতে যেতে চাইছিলেন!

এমনি ক'রে হাসাহাসি করতে করতে এবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, একবার ঘুম ভেঙে যেতে দেখলুম, দূরে রামসিংয়ের খাটের কাছে একটু ছোট্ট আলো জ্বলছে। দেখলুম, রামসিংয়ের বউ দুটো ভাঙা হাঁড়িতে দুটো আগুন ক'রে তাতে বাতাস দিচ্ছে। কিসের আগুন তা বুঝতে পারলুম না, তবে সিংহিনীর হস্তভাড়িত বাতাস লাগার ফলে সেই ভাঙা হাঁড়ির গহ্বরদেশ লাল হ'য়ে উঠতে লাগল ও সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটা ধোঁয়ায় ভ'রে যেতে লাগল। খানিক পরে আগুন বেশ লাল হ'য়ে উঠলে সিংহিনী একটা সিংহের খাটের নীচে ও একটা নিজের খাটের নীচে রেখে কোনও কথা না ব'লে আলোটা নিভিয়ে দিলে। অন্ধকারে সেই ভাঙা হাঁড়ির আগুন জ্বলতে নিভতে লাগল আর আমি শুয়ে শুয়ে গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সেই ব্রাহ্মণের মতন চোখ দিয়ে আগুন পোয়াতে লাগলুম।

পরদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল, আমাদের সবারই মুখগুলো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—শুধু তাই নয়, হাত পা ফেটে একেবারে চৌচির অবস্থা। দেশশুদ্ধ লোক মাথা-মুখ ঢেকে থাকে কেন, এতক্ষণে তার একটা হদিস পাওয়া গেল। আমরা আর কালবিলম্ব না ক'রে বিছানা থেকে ধুতি তুলে নিয়ে বেশ ক'রে মাথা-মুখ পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললুম।

সকাল হ'তেই দেখা গেল, দলে দলে স্ত্রী পুরুষ নানা আকারের পাত্র নিয়ে রামসিংয়ের দরজায় হাজির হ'তে লাগল। দেখলুম, কর্তা গিন্নী উভয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একজন দুধ দোয় আর

একজন মেপে মেপে দেয়। শুনলুম, সেখানে ছাগলের দুধ ও মোষের দুধের একই দর, ছ পয়সা সের। যাদের ছেলেপিলের ঘর তারা ছাগলের দুধই নেয়।

কিছুক্ষণ এই সব ব্যাপার দেখে আমরা চরা করতে বেরুলুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে মনে হ'ল, কাল জায়গাটাকে যত দুঃখী মনে করেছিলুম আসলে সেটা তত নয়। সেখানে ভাল রাস্তা, ভাল বাড়ি-ঘর যে একেবারেই নেই তা নয়। সেখানে একটি কেল্লা আছে, জবরদস্ত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকর্মচারী সবই আছে, তবে বেশির ভাগ লোকের অবস্থাই আমাদের মতন।

শহরে ঘুরতে ঘুরতে অনেক জায়গাতেই দেখা গেল ছাগলের দুধ বিক্রি হচ্ছে। আমাদের জনার্দনের নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান মাথায় গজাত। সে থেকে থেকে বললে, এখানে থেকে ছাগলের দুধের ব্যবসা করা যাক।

জনার্দন নানা রকম প্ল্যান বাতলাতে লাগল, ছাগল থেকে গরু, গরু থেকে মোষ, বাচ্চা যা হবে তার মদ্দাগুলো বেচে ফেলা হবে। তারপরে দুধ থেকে মাখন, পনির ইত্যাদিও হ'তে পারবে—স্লাথ্‌ স্লাথ্‌ ক'রে ব্যবসা ফলাও হ'য়ে পড়বে।

জনার্দনের প্ল্যানটা আমাদের নেহাত মন্দ লাগল না। আশা-কুহকিনী আবার কানের কাছে গুঞ্জন শুরু ক'রে দিলে।

"মহাস্থবির"

গোধূলির পাখি

গোধূলির পাখি, মেলো নাকো ডানা
নীল আকাশের গায়
তুমি কি পাও নি ঝড়ের পূর্বাভাস ?
ছোট দুটি ডানা গুটাইয়া নাও
ফিরে এস নিজ নীড়ে,

সোনার স্বপনে যে নীড় বাঁধিলে
তারে কি ফেলিয়া যাবে ?

গোধূলির পাখি, দেখ চেয়ে দেখ—
দূর দিগন্তে কালো মেঘ দেখা যায়,
ছোট আঁখি দুটি মেলি দিগন্তে
চেয়ে দেখ আরবার,
কালো মেঘ চিরে আলোর ঝলক
মাঝে মাঝে দেখা যায়,
গোধূলির পাখি, কোন্ নিরাশায়
নীড় ফেলে চ'লে যাও ?

গোধূলির পাখি, উড়ো না আকাশে উড়ো না,
নীল আকাশের মায়ায় ভুলো না তুমি,
চাঁদ যদি হেসে ডাক দিয়ে যায়
গ্রহতারকার দেশে,
ক্লান্ত অবশ ডানা মেলে তুমি
যেও না নিরুদ্দেশে।

চাঁদ ডুবে যাবে, তারা মুছে যাবে,
নীল আকাশের রঙ মুছে যাবে,
তোমার কোমল হৃদয়ে জাগিবে
অমাবস্যার রাতি ;
তাই বলি পাখি, গোধূলির পাখি,
পিছন ফিরিয়া চাও—
দূর দিগন্তে মেলো না তোমার ডানা,
সোনার স্বপনে যে নীড় রচিলে
তাহারে যেও না ফেলি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গ্লানি

আশ্চর্য হলাম

এত সাধারণ, অথচ এতদিন চোখেই পড়ে নি লেখাগুলো। আজ কেমন ক'রে যেন এই অল্প সময়ের অবসরে চোখ দুটো হঠাৎই আবিষ্কার করল!

আবার পড়তে লাগলাম,—

17 Prize Medals Antwerp

Diploma of Honour 1885

Highest Award

Brussels 1897

কোথায় ছিল এতদিন চোখের দৃষ্টি! অন্ধের মত শুধু প্যাকেট খুলে সিগারেটই টেনে নিয়েছি, তারপর সিগারেট ফুরোলে তুচ্ছ প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিংবা জানলা গলিয়ে রাস্তায়।

আশ্চর্য! আবার চোখে পড়ল—

Every genuine···bears the name······

চোখ তুলে নিলাম। বুঝলাম, এও এক নার্ভাস্‌নেস।

মানুষের মন যখন বেসামাল হয়ে ওঠে দুর্বলতায়, তখনই এমনই এক-একটা অতি সাধারণ জিনিস এত বড় হয়ে ধরা পড়ে চোখে।

বড় সাহেবের ঘরে চিঠিপত্র সই করাতে যেতে হয় দিনে অনেক বারই। কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে যখন মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াতে হয় বড় টেবিলটার ধারে, তখন সামান্য পিনকুশনের পারিপাট্যও হঠাৎ চোখে ধরা পড়ে এমনই নতুন বিস্ময়ে।

কিন্তু আজকের নার্ভাস্‌নেস আমার কোন এক বড় সাহেবের সান্নিধ্যে হ'লেও, কৈফিয়ৎ এর জন্যে নয়।—পুরনো বন্ধুর কাছে দীর্ঘকাল পর পুনরাবির্ভাব মাত্র।

যোগেন—যোগেন বিশ্বাস। এই আপিসেই একদিন পাশাপাশি

ব'সে কাজ ক'রে গেছি। আমার সিগারেটের আগুনে ও ধরিয়েছে সিগারেট। কাপের চা ডিসে ঢেলে ভাগাভাগি ক'রে খেয়েছি কত দিন! সে সব আজ কতকাল আগের কথা!

চাকরি ছেড়ে দিলাম। সামান্য মাইনে টাইপিস্টের। কিন্তু প্রয়োজন সামান্য ছিল না। তা ছাড়া বয়স ছিল কাঁচা। বুকে ছিল বেপরোয়া প্রাণের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস। ভাবলাম মনে মনে, কি হবে এই পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় প'ড়ে থেকে? তার চেয়ে শর্টহ্যাণ্ড শিখে চ'লে যাই অন্য কোথাও। উন্নতি হবেই।

উন্নতি অবশ্য হ'ল।

পঞ্চাশ থেকে এক শো পঁচাত্তর! মন্দ কি! মনে মনে খুশি হলাম। বুঝলাম, রিস্‌ক্ না নিলে কখনও জীবনে উন্নতি করা যায় না।

চোখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ো গাঙ্গুলীর মুখ। সারা জীবনটা একই জায়গায় ব'সে দশটা-পাঁচটা ক'রে যখন নির্ধারিত গ্রেডের সীমান্তে এসে পৌঁছলেন, তখন পরমায়ুও সীমাবর্তী। সর্বসাকুল্যে তখন যা পাচ্ছেন, তার অনেকগুণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অবহেলায় ত্যাগ ক'রে এসেছেন ভদ্রলোক অনেক পেছনে, নাগালের বাইরে।

পুরনো আপিস ছাড়বার সময় যোগেন বিশ্বাস হাসলে। বললে, চললি তা হ'লে? যা, উৎসাহ রয়েছে তোর, এনাবুদ্ধি রয়েছে—উন্নতি করবি নিশ্চয়ই। দেখিস, ভুলিস না তখন।

ভুলি নি সত্যিই।

তাই এই দীর্ঘ দিন পর যখন হঠাৎ শুনলাম, যোগেন বিশ্বাস আজ তার আপিসেরই একজন উঁচুদরের অফিসার, তখন যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। তাই নিজেই ছুটে এলাম। স্বচক্ষে দেখতে এলাম যোগেন বিশ্বাসকে।

অনেক দিন পর ঢুকলাম আমার পুরনো আপিসে। বুড়ো দরোয়ান কিন্তু ভোলে নি। ঢুকে পড়ছিলাম অন্যমনস্ক ভাবেই। দরোয়ান হঠাৎ হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে, সেলাম বাবু!

একটু থেমে মৃদু হেসে বললাম, ভাল তো ?

জি হাঁ।

পুরনো সিঁড়ি। এককালে এই সিঁড়ি দিয়ে কত ওঠা-নামা করেছি। কিন্তু সে ওঠা-নামায় সেদিন জড়তা ছিল না। আর আজ সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অকারণ কত জড়তা, কত লজ্জা!

প্রথমে গেলাম আমার সেই পুরনো জায়গাটিতে, যেখানে ব'সে টাইপ করেছি কত দিন। আর যেখান থেকে দেখা যেত যোগেন বিশ্বাসের হাতলওলা চেয়ারটা একটা ফাইল-বোঝাই টেবিলের গা ঘেঁষে।

নতুন টাইপিস্ট আজ কাজ করছে। ইচ্ছে ক'রেই আর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম না।

যোগেন বিশ্বাসের চেয়ার খালি নেই। সেখানে অপরিচিত আর একজন।

হঠাৎ নজর পড়ল ওপাশে দেওয়ালের দিকে। খাতার ওপর মুখ গুঁজে একমনে এক ভদ্রলোক কি লিখে যাচ্ছেন, অনেকটা আমাদের দত্তগুপ্তের মত।

একটু এগোতেই সন্দেহ ঘুচল। পিঠের ওপর মৃদু আঘাত করতেই ভদ্রলোক লেজার থেকে মুখ তুলে তাকালেন এবং পরক্ষণেই চমকে উঠলেন, সরকার না ?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

দেখলাম দত্তগুপ্তকে ভাল ক'রে। এই বারো বছরে শুধু বয়সটাই বাড়ে নি, বেড়েছে চশমার পাওয়ার, বেড়েছে লেজার-বইয়ের সংখ্যা, আর বেড়েছে নিশ্চয়ই কিছু মাইনে—পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা।

সেই টিপিক্যাল দত্তগুপ্ত। খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে প্রত্যেক দিনের হিসেব অখণ্ড মনোযোগে সম্পূর্ণ ক'রে যান। চেয়ারের পেছনে ঝোলানো তাঁর সেই সুতির ডোরা-ডোরা কোট। সমস্ত ঋতুগুলোই পার ক'রে যেন এই কোটের ওপর দিয়ে। পৌষ মাসের শীতে শুধু এরই ওপর জড়িয়ে আসেন খদ্দরের একটা চাদর।

দত্তগুপ্ত ক্ষীণ হাসলেন, কি খবর, এতকাল পর? কোথায় আছ? তারপর ভারু দৃষ্টিতে এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে বললেন, ব'স না চেয়ারটায়।

বসতে হ'ল। দত্তগুপ্তকে বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে নয়, পুরনো দিনের পরিবর্তনের একটু হদিস পাবার জন্যে।

দত্তগুপ্ত জিজ্ঞেস করলে, অফিস নেই?

বললাম, ডুব মারলাম একদিন আবার কি! নইলে তো দেখা হয় না আপনাদের সঙ্গে।

দত্তগুপ্ত হাসলেন। ম্লান হাসি।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম যোগেন বিশ্বাসের কথা।

কি ব্যাপার বলুন দেখি! বাইরে থেকে তো অনেক কথাই শুনি।

দত্তগুপ্ত হাত দিয়ে একবার কপাল স্পর্শ ক'রে হাসলেন। তারপর খুব নীচু গলায় বললেন, এখন ওঁকে নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো আমার চাকরিই চ'লে যাবে।

একটু থেমে আবার বললেন, সবই কপাল—বুঝলে সরকার! আর তারই সঙ্গে ব্যাকিং। অবশ্য ক্যাপাসিটিও আছে ছোকরার। টকাটক গোটা কতক পরীক্ষা দিয়ে দিন কতক বাইরে থেকে ঘুরে এল অফিসের খরচায়। কে একজন দিলেন রেকমেণ্ড ক'রে। তারপরই এই প্রমোশন। শুধু প্রমোশনই নয়—এক রকম দণ্ডমুণ্ডেরও কর্তা। নিজে কিছু করতে না পারলেও করবার ক্ষমতা আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বসে?

বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে দত্তগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কেন? দেখা করবে না কি!

বললাম, এসেছি যখন, দেখা ক'রেই যাই একবার।

দত্তগুপ্ত আবার কলম নিয়ে খাতার ঝুঁকে পড়লেন। বিড়বিড় ক'রে শুধু বললেন, যাও না, ওই তো চেম্বার। তারপর চোখ তুলে বললেন, চিনতে পারবে তো তোমাকে?

চিনতে দেরি হয় নি যোগেনের।

কিন্তু প্রস্তুত না থাকলে সত্যিই দেরি হ'ত আমার—এই লম্বাচওড়া স্মার্ট ভদ্রলোকটির ভেতর পুরনো যোগেন বিশ্বাসকে উদ্ধার করা।

পরনে দামী স্যুট, চোখে ক্রুক্স্ গ্লাসের চশমা। স্বতন্ত্র একটি চেম্বারে ব'সে নোট দিচ্ছিলেন পার্শ্ববর্তী স্টেনোগ্রাফারকে।

এমন সময় হঠাৎ আবির্ভাব। এক মিনিট কাল তাকিয়ে রইল যোগেন আমার মুখের দিকে। আমিও তাকিয়ে রয়েছি। কোনও কথা বলি নি, শুধু একটা লাজুক হাসি ফুটে উঠেছিল নিঃশব্দে।

যোগেন হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে কাছে এগিয়ে এল। আমার হাতে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে হেসে বললে, বসন্ত না?

আশ্বস্ত হলাম।

ভয় ছিল, হয়তো বা আজকের অফিসার মিঃ বিশ্বাস গত যুগের বসন্ত সরকারকে চিনতেই পারবে না, এবং চিনলেও অন্তত সে দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে নিজের মর্যাদা লঘু করবে না।

বললাম, যাক, চিনতে পেরেছ তা হ'লে! কথা বলতে গিয়ে স্বরটা কেমন মিইয়ে গেল।

যোগেন বললে, বাঃ, চিনতে পারব না তোকে! বলিস কি? যোগেন হেসে ফের বললে, শরীরটা তো ভাল হয় নি তোর। কোথায় আছিস এখন? কি করছিস? ব'স্ ব'স্।

গলাটা অকারণেই কেমন যেন ব'সে যাচ্ছিল। পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলি, তোমার কথা অনেক দিনই শুনেছি। কিন্তু দেখা করব করব ক'রেও দেখা করতে পারি নি।

স্টেনোগ্রাফার বিনীতভাবে বললে এই সময়, আমি এখন যাব স্যার?

যোগেন একবার রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা। পনেরো মিনিট পরে আসবেন।

যোগেন চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটু হাসল আমার পানে তাকিয়ে। আমার চোখ দুটো আপনা থেকেই নীচু হয়ে গেল।

যোগেন বললে, তারপর কি খবর? কেমন আছিস বল।

কপালটা ফ্যানের তলায় ব'সেও ঘেমে উঠেছিল। রুমাল দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করতে করতে বললাম, এই এক রকম।

বিয়ে-থা করেছিস যেন শুনেছিলাম।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম অপরাধীর মত।

ছেলেপিলে কটি?

মাথা নীচু ক'রে হাসলাম লজ্জায়। বললাম, একটি।

আই সি। তা হ'লে তুই তো এখন পুরো সংসারী, অ্যাঁ!

অথচ আশ্চর্য এই, পারলাম না জিজ্ঞেস করতে যোগেনের কথা। মনে অদম্য কৌতূহল। সেই যোগেন আজ এত বড় হয়েছে সত্যি, কিন্তু এককালে মেয়েদের ব্যাপারে কি আগ্রহই না ছিল! আজ সে কি আর বিয়ে না করেছে? আর যদি বিয়ে ক'রেই থাকে, নিশ্চয়ই সে মেয়ে আভিজাত্যে অনেক উঁচুতে। দেখতে প্রলোভন হয়, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই যে জিব সরে না।

মনে মনে ভাবি, এ দুর্বলতা কেন?

অনেক কষ্টে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে তাকাই যোগেনের দিকে।

কিন্তু এই সময় বেয়ারা এল কতকগুলো কাগজপত্তর নিয়ে। বেয়ারার হাত থেকে কয়েকটা কাগজ নিয়ে চটপট চোখ বুলিয়ে নিলে যোগেন।

হঠাৎ এক জায়গায় যোগেনের দৃষ্টি যেন আটকে গেল। ভুরু কুঁচকে উঠল। কাগজটা এপিঠ ওপিঠ দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলে টেবিলের এক পাশে। সঙ্গে সঙ্গে বেল-পুসে চাপ দিলে পা দিয়ে।

বাইরে বেল বেজে উঠল। বেয়ারা ছুটে এল।

যোগেন কর্কশ স্বরে বললে, দত্তবাবুকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই ভীরু সঙ্কুচিত পদক্ষেপে দত্তগুপ্ত এসে দাঁড়ালেন।

যোগেন কাগজখানা দত্তগুপ্তের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এই কি স্টেটমেণ্ট হয়েছে? যত বয়েস বাড়ছে, তত দেখছি

ইন্‌এফিসিয়েন্ট হয়ে পড়ছেন। সাবধানে কাজ করবেন, এ ভাবে চলবে না।

কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বিনাবাক্যে দত্তগুপ্ত চ'লে গেলেন।

যোগেন স্বগত বললে, হোপ্‌লেস।

এতক্ষণ আমি কারও মুখের দিকে তাকাই নি। আপন মনে নখ খুঁটছিলাম আর সবার অলক্ষ্যে পরীক্ষা করছিলাম আমার ইস্ত্রি।

যোগেন বললে, একটু ব'স্‌, আমি আসছি। ভারি বুটের শব্দ ক'রে যোগেন বেরিয়ে গেল। আমি ব'সে রইলাম একা।

কতক্ষণ কেটে গেল।

একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। অফিসারের চেম্বার। সত্যিই ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালের এক দিকে জওহরলালের বড় একটা ছবি; ওপাশে সুইচবোর্ডে একটা সুশ্রী মুখচ্ছবির তলায় বিলিতী কোম্পানির দিনপঞ্জী। আর চেম্বারের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একালের পৃথিবীর একটা মানচিত্র।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এত উন্নতি একটা সামান্য ছেলের! আর উন্নতি করব ব'লে আমিও তো বেরিয়েছিলাম একদিন এই অফিস ছেড়ে!

আজ সেই যোগেন সাত শো পঞ্চাশ টাকার সম্মান শুধু আপিসেই পায় না, নিশ্চয়ই তার সংসারে এই সম্মানের যোগ্য সঙ্গিনীও আছে, বিলাসকাতরা রূপসী তন্বী।

একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

ঠোঁটের ওপর একটা ক্ষোভের হাসি জাগল। মিথ্যে কথা বলেছি যোগেনকে। সন্তান একটি নয়—দুটি। আরও একটি আসছেন। কালাজ্বরক্লিষ্টা স্ত্রী এবার একসঙ্গে দুটি মাদুলি নিয়েছেন। একটি ব্যাধিনিরাময়ের আর একটি জন্মনিবারণের। হাসি পেল আবার।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মাত্র দুটি অবশিষ্ট। ভাবলাম, ও আসুক। একটা ওকে অফার করা উচিত। বন্ধু তো।

টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে দিলাম। মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, মন যেন খোঁচাচ্ছে; যেন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে ঠিক আলাপ করতে পারছি না। যোগেন কেমন স্বচ্ছন্দে জড়িয়ে ধরল আমার হাত, কেমন স্বচ্ছন্দে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে হাসল হা-হা ক'রে! আর আমি?

বুঝতে পারি না, কেন এ দুর্বলতা!

রিস্টওয়াচটার ওপর চুড়িদার পাঞ্জাবির হাতাটা ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি হাতাটা সরিয়ে নিলাম। চক্ চক্ ক'রে উঠল স্টেন্‌লেস কেসটা। বিয়ের সময় শ্বশুর মশাই দিয়েছিলেন।

জুতোটা একবার পরীক্ষা করলাম এই সময়। মনে হ'ল, ঠিক এ ঘরের উপযুক্ত হয় নি কান্‌কো-ওল্‌টানো কাবুলী শু-টা। কেমন যেন লাগছে! ছি ছি!

পরক্ষণেই মনে মনে ভাবি, এ কী দুর্বলতা! আমি তো অফিসারের কাছে অফিসার সেজে আসি নি। আমি যে বন্ধু। আপিস-ফেরত দুই বন্ধুতে একদিন যে এক মেয়ের উদ্দেশে শিস দিয়ে গানও করেছিলাম। তার কাছেও আজ কেতাদুরস্ত অভিনয় করতে হবে না কি!

সর্বাঙ্গ আবার ঘেমে উঠল।

সামনে প'ড়ে রয়েছে সিগারেটের প্যাকেট। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, প্যাকেটের গায়ে কতকগুলো লেখা—

17 Prize medals Antwerp...

জুতোর শব্দ শোনা গেল। ভারী পায়ের মেজাজী আত্মপ্রকাশ। বুঝলাম, যোগেন আসছে না—আসছেন উচ্চপদস্থ এক অফিসার।

তাড়াতাড়ি নিজের অজ্ঞাতসারেই সোজা হয়ে বসি। আর লুকিয়ে ফেলি সিগারেটের প্যাকেটটা। এখানে এ সিগারেট অচল।

যোগেন ঢুকেই পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললে, এ কি, সিটিং

আইডল্! সামনে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'টা তো প'ড়ে ছিল, পাতা ওলটাও নি কেন?

আমি কিছু বলতে পারলাম না। বন্ধুবর কেমন একটা সূক্ষ্ম হাসি হাসলে।

এবার নিজেকে অনেকটা সংকোচমুক্ত ক'রে একটু হেসে রসিকতা করলাম, এ বাজারে সবাই রোগা হচ্ছে, আর তুমি দেখছি ফুটবল হচ্ছ!

আবার 'তুমি'! কিছুতেই 'তুই' বেরুল না।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল যোগেন বিশ্বাস। বললে, শরীরটা আরও ভাল হয়েছিল। তারপর এই ক মাস এত কাজের প্রেসার বেড়েছে যে, শরীর টিকছে না। জান, এই ক মাসে প্রায় আট পাউণ্ড ওজন ক'মে গেছে।

ঠাট্টা করতে গেলাম, তা হ'লে ছুটি নিয়ে কিছুকাল চেঞ্জে যাও না?

যাব তো ভাবছি; কিন্তু ছুটি নিই কি ক'রে! যে দারুণ রেসপন্‌সিবিলিটি কাঁধে রয়েছে!

একটু থেমে যোগেন বললে, সত্যি, আপসোস হয় ভাবতে—কত সুখী ছিলাম আগে! ছুটির একটা দরখাস্ত ক'রে দিলেই হ'ল। তখন ছুটি চাইতে লজ্জাও ছিল না, সংকোচও ছিল না।

কথা শেষ ক'রে যোগেন জোরে হেসে উঠল। বললে, আরও সত্যি কথা এই যে, তখন কাজের দায়িত্ববোধ ছিল না, ছিল ফাঁকি দেবার লো মেন্‌টালিটি।

যোগেন তার দামি সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলে। আঘাত সামলে আমি তাড়াতাড়ি এবং নিঃসঙ্কোচে একটা তুলে নিলাম।

কিন্তু বিবেক আবার দংশাল।

স্মার্ট হতে গিয়ে যেন হাতটা আমার লোভীর মত সিগারেটের টিনের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। মাথা নীচু হয়ে গেল আবার আত্ম-নিপীড়নে।

পনেরো মিনিটের জায়গায় কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। দরজার আড়ালে স্টেনোগ্রাফার উঁকি মারছে।

আসব স্যার?

যোগেন বললে, আমি ডাকব।

আমার কান পর্যন্ত গরম হয়ে গেল। তাই তো, যোগেনের বহুমূল্য সময়ের অনেকখানি নষ্ট করেছি। আর উচিত নয়।

চ'লে আসবার সময় যোগেন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। হাত দুটো ধ'রে আকর্ষণ ক'রে বললে, আসিস মাঝে মাঝে। খুব খুশি হব।

যোগেন বললে, আর এই নে, আমার বাড়ির ঠিকানা। সামনের রবিবারে তোর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আসিস আমার ওখানে। বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলে বন্ধুত্বের অপমান করা হয়। যোগেন জোরে হেসে উঠল।

আমি কার্ডটা পকেটে পুরে নিঃশব্দে হাসলাম।

চলি।

রবিবারে আসিস কিন্তু সকলেই। আমরা অপেক্ষা করব।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম, আচ্ছা।

চ'লে এলাম।

একটার পর একটা সিঁড়ি কখন অতিক্রম ক'রে গেছি হুঁশ নেই।

বুড়ো দরোয়ান খটাস ক'রে অ্যাটেন্‌শন হয়ে হাত তুললে, সেলাম সাব্‌।

মনে মনে আতঙ্ক হ'ল—এই বুঝি কিছু চেয়ে বসল। সেলামে সায় না দিয়েই পথে এসে দাঁড়ালাম।

ট্রাম দেখা যাচ্ছে না। মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল। কেমন একটা অস্বস্তি সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরীসৃপের মত। অধৈর্য হয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। পকেটে ছিল যোগেনের কার্ডখানা—সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন কার্ড।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর নয়। যোগেশের বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, ওর আফিসেও দেখা করব না।

কেন? জানি না।

কার্ডখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মনকে বোঝালাম, যেখানে সত্যিই কোনদিন যাব না, ঠিকানার জঞ্জাল জমিয়ে কি লাভ?

কিন্তু বিবেক বললে, যাবার কথা দিয়েছিলে যে?

ক্ষতবিক্ষত মন হেসে কৈফিয়ৎ দিলে, কথার খেলাপে কেরানীর কৌলিন্য কলুষিত হয় না।

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

হিমালয় অভিযান

গৌরীশৃঙ্গ বেয়ে নামে মত্ত গ্লেসিয়ার।
কত নীচে একাকার ঘন কুয়াশায়
পাহাড়তলীর গ্রাম। কী দীপ্ত আশায়
পায়ে পায়ে যাত্রীদল ওঠে দু শিয়ার:
সম্মুখে কঠিন পথ—খাদের আঁধার
তুমুল করকা-বৃষ্টি, থরঃথরথায়
পথের নিশানা-রেখা কেবলি ভাসায়।
চিহ্নহীন তবু জ্বলে চূড়ার তুষার!

কোথায় রহস্যলোক—শেষের শিখরে
আদিম বিস্ময় কত আজো স্পন্দমান—
খুলে দেবে চাবি তার অতন্দ্র সন্ধান!

চড়াই-উৎরাই ভেঙে সার্থক প্রহরে
আঁকিবে জয়ের লিপি কালের পাথরে:
অবিরাম মানুষের তাই অভিযান!

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

সমুদ্র-দর্শনে

হে সমুদ্র, হে স্বয়ম্ভু, হে মোহন, ভীষণ সুন্দর,
দাঁড়ায়ে তোমার উপকূলে
হেরিতেছি মুগ্ধ চোখে ও অনিন্দ্য রূপ মনোহর
সংসারের সব কথা ভুলে।
রসিক দাদুর মত ঊর্মি-বাহু বিস্তারি আদরে
অকৃত্রিম আলিঙ্গনে বারংবার কাছে টানো মোরে
দিয়ে তব সস্নেহ সখ্যতা ;
তোমার রক্তের কণা ফিরে ফিরে দুর্নিবার টানে
রক্তে মোর ক'য়ে ওঠে কথা।
ঊর্ধ্বে নীলাকাশ, নিম্নে সীমাহীন বালুবেলাভূমি,
মাঝখানে তব সিংহাসন,
অদূরে বালুর চরে তোমার চরণপ্রান্ত চুমি
সংসারের উৎসব-প্রাঙ্গণ।
দু দিনের খেলাঘরে হার-জিত নিয়ে মাতামাতি,
কাল যে কে রবে বেঁচে ভোর হ'লে আজিকার রাতি
কেউ তা জানে না ভাল ক'রে,
তবু চলে মহানন্দে নিত্য নব মহাদুরাশার
অভিনয় প্রতি ঘরে ঘরে।
আমরা এ ধরিত্রীর স্তন্যপায়ী সন্তানের দল,
সংসারের রঙ্গমঞ্চ 'পরে
ব্যর্থ আস্ফালন ক'রে দু দণ্ডের আনন্দে চঞ্চল
দৃষ্টির বাহিরে যাব স'রে।
নূতন সন্তান এলে মাতা তারে কোলে নিয়ে তুলে
আমাদের হারানোর দুঃখ যাবে একেবারে ভুলে
বিচ্ছেদের নিশি ভোর হ'লে ;
যেখানে যা ছিল, রবে, চিরতরে আমরাই শুধু
ডুবে যাব বিস্মৃতির তলে

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

মোক্ষধন ও যক্ষধন

এ মহানগর
সারাদিন রেডিওর সঙ্গীতে মুখর।
চারিধারে ভিত্তিগাত্রে রূপসীর চিত্র অগণন
চারিপাশে সিনেমার আকর্ষণ নয়নলোভন।
আমোদ-উৎসবময়ী এ সৌধনগরী—
ট্রামে বাসে ঘুরিতেছে শত শত নাগরী সুন্দরী।
মাঠে মাঠে ক্রীড়াসমারোহ
লক্ষ লক্ষ দর্শকের চিত্ত ভরি সঞ্চারিছে মোহ।
বাটে বাটে ভোজন-আগার
রুচিকর লুব্ধ গন্ধে ঘটাতেছে চিত্তের বিকার।
এ সবের মধ্যে রহি কে তুমি তাপস,
কে তুমি তদগতচিত্ত শান্ত নিরালস,
বিকার হেতুর মাঝে আছ তুমি তবু নির্বিকার,
তুমি ধীর তপোবীর নমস্য সবার?
কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কোন দিকে নাই তব কান,
কিছুতেই বিচলিত নয় তব প্রাণ,
কোন্ তপস্যায় তুমি রয়েছ মগন?
বুঝি তব লক্ষ্য 'মোক্ষধন'।

তাপস কহিল ধীরে মৃদু হাসি জুড়ি দুই হাত,
"ম-এর পরে যে বর্ণ সেই বর্ণ একটু তফাত—
লক্ষ্য মোর 'যক্ষধন,' মোক্ষধন নয়।
ব্যাঙ্কের খাতায় মোর সাধনার হতেছে সঞ্চয়।"

হায় মোরা হেরি শুধু সাধনার ক্রম,
সাধ্য কি যে না খুঁজিয়া নিত্য মোরা করিতেছি ভ্রম।
কুবের হয় না কভু ভোলানাথ, ভোলানাথও কভু
কুবের সাজে না ভুলে, আমাদেরই ভুল হয় তবু।
কৈলাসে দুইয়েরই বাস, তাই ব'লে মোরা যক্ষনাথে
ভক্তি নিবেদন করি শিব ভাবি অন্ধ প্রণিপাতে।

শ্রীকালিদাস রায়

কবি

স্থূল দেহে পূর্ণ মানি আত্মারে যে করিয়াছে হেলা,
ভূমারে সে জানে নাই, অন্নের গণ্ডিতে তার সীমা,
দেহস্পর্শগত রস গ্লানি হয়ে ওঠে শেষ বেলা—
অসীম দূরত্বে রহি অপরূপ আকাশনীলিমা।
মনের মাধুরী দিয়ে আমি যারে না রচিতে পারি,
সে কেন আমার হবে, নিত্য বস্তুবদ্ধ থাকে যদি;
জড়ে যে গলায় পরে জড়তায় মৃত্যু হবে তারি
বস্তুর জগতে চলে অবস্তুর লীলা নিরবধি।

* * *

বস্তু আছে জানি তাহা, চিন্ময়ের উপলক্ষ্য সে যে,
সেইটুকু মূল্য তার—তার বেশি দিও না তাহারে;
ক্ষণস্থায়ী স্থায়ী হয় নিলে তারে কল্পনায় মেজে
সান্তের অনন্ত রূপ কবিদের স্বপ্নের বাহারে।
সামান্য গোষ্পদে যারা দেখে মহাসাগর বিস্তার,
সীমা ও অসীম মাঝে করে যারা সেতু বিরচন,
তারাই খণ্ডিত করে মৃত্যুর অবাধ অধিকার—
মর্ত্যেরে অমৃত করে ধ্যানলব্ধ তাদের বচন।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

"গল্প বল"

বুড়ুর ছোট বোন রত্না। বুড়ু এখন বড় হয়েছে, তার বোন রত্নাই পাঁচ বছর পার হয়ে ছয়ে পা দিয়েছে।

কদিন ধ'রে রত্নার বড্ড জ্বর চলছে। জ্বর ১০৪।৫ পর্যন্ত ওঠে, ১০২এর নীচে নামে না। ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন—টাইফয়েড, এবং সেইমত চিকিৎসাও চলছে।

রত্না বড্ড শান্ত মেয়ে। লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসে। ছবি আঁকার অভ্যাস তার তিন বছর বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কলেজ থেকে আমি যে সব খড়ি এনে দিতাম, তাই দিয়ে প্রথম প্রথম মেঝের ওপরে নানা রকম দাগ কাটত, তার কোনটা পাখি, কোনটা মেয়েদের নাচ; কোন্‌টে যে কি, তা ছবি আঁকার পর নিজেই গল্প ক'রে ব'লে দিত। আজকাল ছবি আর একটু ভাল আঁকতে পারে, মহাদেবের ছবি, মা কালী খাঁড়া ধ'রে আছেন তার ছবি, ঘরবাড়ি বাগানের ছবি—নানা ধরনের ছবি আঁকে। দেখে অন্তত না ব'লে দিলেও বোঝা যায়। রত্নার ছবিকে যদি কেউ নিন্দা করে তা হ'লে তার বড্ড দুঃখ হয়, আমার কাছে এসে অভিমান ক'রে কেঁদে ফেলে। পড়াশোনার মাঝখানে কথা বললে যদি বিরক্ত হয়ে কোনদিন বকি, তা হ'লে মেয়ের সে দুঃখ ভুলতে পাঁচ-সাত দিন সময় লেগে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প শোনার জন্য যখন আমার কাছে শুয়ে থাকে তখন পুরনো কথার উল্লেখ ক'রে এক-একদিন কান্না হয়, কেন তাকে সেদিন বকেছি, না ব'কে বললেই তো হ'ত—আমি এখন পড়ছি, একটু স'রে যাও। এমনি ক'রে রত্নার মান-অভিমানের পালা চলে।

রত্নার বোনেরা গান গাইতে পারে, রত্নারও গান গাইতে ইচ্ছা হয়। 'ছোটদের পড়া'য় সত্যেন দত্তের "পাল্কীর গান" তার বড় ভাল লেগেছে। "জনগণমন-অধিনায়ক" গানটিও তার ভাল লাগে, কিন্তু

লম্বা লম্বা কথাগুলির সব তার মনে থাকে না, কেবল মনে করিয়ে দিতে হয়।

সেদিন জ্বর যখন খুব বেশি হয়ে এসেছে, তখন থেকে তার কেবল খেলনা নিয়ে খেলার ইচ্ছা বেড়ে গেছে। জ্বরের তাপে ফরসা কচি মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, মাথার চুল ছোট্ট ক'রে কাটা, তাতে ক্রমাগত জলপটি চলছে। কিন্তু শুয়ে শুয়েও তার খেলার ইচ্ছার বিরাম নেই। আজকাল প্লাস্টিকের নানা রকম খেলনা বিক্রি হয়। তাই দিয়ে বাগানওলা বাড়ি, কুকুর পাহারা দিচ্ছে, সামনে ঘোরানো চেয়ারে ছোট্ট পুতুল ব'সে আছে—এমনই ক'রে সব সাজিয়ে দিতে হ'ল। তার সামনে মাঠের মাঝখানে উনুন পাতা হ'ল, তার ওপরে কড়ায় ছোট্ট হাতা দিয়ে দুধ জ্বাল হতে লাগল। সামনে চাকি বেলুন, ভাতের থালা, তাতে মিছিমিছি সব পরিবেশন করতে হ'ল। এ সব নিজে সে সাজাতে পারছে না ব'লে তার ফরমাশ মত আমাকে সাজিয়ে দিতে হ'ল। টুলের ওপরে যেখানে সব সাজানো হয়েছে, সেখানে একটু জায়গা বাকি ছিল, প্লাস্টিকের ছোট্ট গ্রামোফোনটিকে সেখানে বসিয়ে দিতে হ'ল। রত্না গুনগুন ক'রে গান ধরলে—

পাল্কী চলে, পাল্কী চলে গগনতলে আগুন জ্বলে।
স্তব্ধ গাঁয়ে আদুড় গায়ে যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা।
পাল্কী চলে, পাল্কী চলে, দুলকি চালে নৃত্য তালে।

যারা বাড়ির সামনে বাগানে রান্না সেরে খাবার আয়োজন করছে তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে রত্না এই গানের আয়োজনটুকু ক'রে একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়ল। চোখ বুজে আমাকে বললে, তুমি পুতুলের গল্প বল। আমি পুতুলের ঘর বাড়ি তৈরি থেকে চড়ুইভাতি পর্যন্ত সব গল্প বললাম। রত্না চোখ বুজে শুনতে শুনতে জ্বরের তাড়সে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কদিন ধ'রে যতক্ষণ জ্বর বেশি থাকে ততক্ষণ সকাল সন্ধ্যা, যখনই কলেজের কাজের সময় বাদ দিয়ে তার কাছে বসি তার এক দাবি—

'গল্প বল' 'গল্প বল'। গল্প শুনতে শুনতে, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই রত্না ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জ্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে হয়তো চমকে ওঠে। গল্প শোনার ইচ্ছার তার বিরাম নেই। নিজে বিছানায় সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে আছে, রোগা হাত-পাগুলিকে ধ'রে পাশ ফিরিয়ে না দিলে ফেরাতে পারে না; শরীরের সকল কষ্ট, সকল দুর্বলতাকে কল্পনার সহায়তায়, গল্পের যাদুমন্ত্রবলে মনের সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, তার মন বর্তমানের দুঃখকে কল্পনালোকে আশ্রয়ের দ্বারা পরাস্ত করতে চায়।

রত্নার জ্বর দিনের পর দিন একটানা চলেছে। মেয়েটা রোগা কাঠির মত হয়ে গেছে, আমারও দুশ্চিন্তার অবধি নেই। রোগে ছটফট করা বা শরীরের কষ্টের জন্য রাগ বা বিরক্তি, কিছুই তার নেই। শান্ত সবুজ দূর্বাঘাসের মত যেন মাটিতে মিশে আছে। কেবল মনের রাজ্যে তার কত কি ছবি যেন ভেসে ভেসে যায়। সেইখানে খোরাক দিতে পারলেই তার আর কোনও অভাব থাকে না।

* * *

ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম, দেওয়ালের কোন কোন জায়গা জুড়ে এক-একখানি বাঁধানো ছবি টাঙানো রয়েছে। মা অন্নপূর্ণা ভিখারী মহাদেবকে ভিক্ষাদান করছেন, শ্রীমতী রাধা অভিসারিকাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোন ঘরে বা সুইটজারল্যাণ্ডের বরফাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গের ছবি আঁকা রয়েছে, নীচে হরিদ্বর্ণ উপত্যকাভূমিতে ধবলকায় ধেনুরা বিহার করছে। মনে হ'ল, সাদা দেওয়াল যেন আমাদের মনকে পীড়া দেয়, তাই আমাদের মনও রত্নার মত নিজের অন্তরে কল্পনার আবরণ সৃষ্টি করার জন্য বারংবার যেন বলছে—'গল্প বল' 'গল্প বল'। 'এই রঙবিহীন দেওয়াল আমি সহ্য করতে পারছি না, গল্পের আবরণে আমার চারিদিক আবৃত ক'রে দাও।'

বাইরে এলাম। চারিদিকে মানুষের দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। আজ বৈশাখ মাস। প্রখর রৌদ্রতাপে সমস্ত শহর যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে, ফুটপাথের উপরে, একখানি বাড়ির স্বল্পকায় ছায়াকে আশ্রয় ক'রে অস্থিচর্মসার, প্রায় নগ্নদেহ, গৃহহারা মধ্য-বয়সী একজন মানুষ নিদ্রাগত হয়ে আছে। তার পাশে নগ্নদেহ এক শিশুও ঘুমিয়ে রয়েছে। পূর্ববঙ্গে যে ভয়াবহ অবস্থা চলেছে, হয়তো তা থেকে মুক্তি পাবার জন্তে, একটু অন্ন এবং ততোধিক স্বল্প আশ্রয়ের আশায় মানুষটি হয়তো মহানগরীর পথকে আশ্রয় করেছে। অন্ন তার মেলে নি, ভালবাসা সে পায় নি। এই অবহেলা এবং অনাদরের মধ্যে পথের পাশে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের স্তূপের নিকটে একজন অস্থিচর্মসার মানুষ এবং একটি ক্ষীয়মাণ শিশু কতটুকুই বা সান্ত্বনা পেতে পারে, নিদ্রা তাদের দুঃখকে কতক্ষণই বা ঠেকিয়ে রাখতে পারে। অনাহার এবং অবহেলার কষ্ট অথবা মৃত্যুর যে করাল ছায়া ক্ষণে ক্ষণে এদের মনের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, মহানগরীর এক কল্পিত রূপকে আশ্রয় ক'রেই তারা সেই ভয় থেকে বাঁচতে চায়। শামুক যেমন আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের চারিপাশে কঠিন বর্ম রচনা করে, মানুষও তেমনই বাস্তবের আক্রমণ থেকে নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্ত কল্পনা ও গল্পের বর্মের দ্বারা নিজের দৃষ্টিকে আবৃত ক'রে রাখতে চায়।

মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচার জন্তই যেন মানুষের চিত্ত যুগের পর যুগ কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে চলেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের সম্মুখে নিজের সত্যকার রূপকে প্রকাশিত করলেন, তখন অর্জুন যে রূপ দেখতে পেলেন সে রূপ ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর, অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥

—হে বিষ্ণো, তোমার দেহ গগনস্পর্শী এবং দীপ্তিমান, তোমার বর্ণ অনেক প্রকার, তুমি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছ; তোমার নেত্র অতি

বিস্তৃত ও দীপ্তিময়, তোমাকে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথা পাইতেছে। আমি ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

—তোমার মুখসমূহ দংষ্ট্রারাজি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মুখসকল যেন প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছে। ঐ সকল মুখ দেখিয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, আমি কিছুতেই সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।

ইহাই সত্য রূপ। কিন্তু অর্জুনের মন সত্যের বিভীষিকাকে পুরতঃ পশ্চাৎ সর্বদিক হতে প্রণাম ক'রে শ্রীভগবানকে বললেন, আমি তোমার এ রূপ সহ্য করতে পারছি না। তুমি সখার মত, বন্ধুর মত, ঐশ্বর্যযুক্ত কিন্তু প্রসন্নরূপে আমার সামনে আবির্ভূত হও। আমার প্রার্থনায় নিজের সত্য স্বরূপকে সংবরণ কর, আমার মন যে রূপে তোমাকে চায়, সেই রূপেই তুমি পুনরায় আবির্ভূত হও। কল্পনালোকের জয় হোক, নতুবা আমার দৃষ্টি হুতাশনে প্রজ্বলিত হয়ে যাবে।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্, ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন, সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥

—আমি তোমাকে সেই প্রকারে পূর্বের ন্যায় কিরীটভূষিত, গদাধারী এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; হে বিশ্বমূর্তে, হে সহস্রবাহো, তুমি আবার পূর্বের ন্যায় সেই নিজ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

এই মানুষের চিরন্তন প্রার্থনা। সেই ইচ্ছারই জয় হোক। ইচ্ছার তরণীই সত্যের অকূল পারাবারের মধ্যে আমাদের আশ্রয়স্বরূপ বহন ক'রে নিয়ে চলুক।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

প্রসঙ্গ কথা

কলা

মর্তমান কলা নয়, যা খেয়ে আদি দম্পতি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ছিটকে প'ড়ে আমাদের এত দুর্ভোগে ফেলেছেন আর কলাকেও দেবভোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেকলাও নয়, যার ষোলটি এক এক ক'রে চাঁদের মাঝে উঠছে আর ডুবছে। এ হচ্ছে সেই কলা, যার দল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল পর্যন্ত চৌষট্টিতে পূর্ণ ছিল, কিন্তু সর্বভুক্ কাল যাকে খেয়ে এখন দ্বাদশটিতে দাঁড় করিয়েছে। কেউ হয়তো বলবেন, তাতে ক্ষতিই বা কি হয়েছে? কলা না হ'লে কি চলে না? ভাত জুটছে না, তো কলা! হ্যাঃ!

কিন্তু কলা নাছোড়বান্দা। বলে, আমি মহেঞ্জোদাড়োর আমল থেকে চেপে ব'সে আছি—দখল ছাড়ব না। আমাকে শুকিয়ে শুকিয়ে খোলাসার করতে পার, কিন্তু জেনে রেখো—আমার শিকড় অমর। যতই তুলে তুলে ফেলে দাও, আমি কোথাও না কোথাও এঁটে ব'সে যাব।

তাই রাজার দরবার, জমিদারের মজলিস, ধনীর বৈঠকখানা আর পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সে আজ আশ্রয় নিয়েছে রঙ্গমঞ্চে, সিনেমায়, রেডিওতে আর মাসিক-পত্রিকায়। কলা এখন চিত্তাকর্ষিণী যত হোক না হোক, বিত্তাকর্ষিণী। কলার গলা টিপে তাকে নিছক ব্যবসাদারিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কবি, তাকে প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে; যে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উপন্যাস লেখে, তাকে হাত খাটিয়ে সিনেমার সিনারিও লিখতে হচ্ছে; যে খেয়াল গায়, তাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে হচ্ছে; যে কীর্তন গায়, তাকে গাজির গান গাইতে হচ্ছে; ইত্যাদি। গায়ক যদি বলেন, সন্ধ্যাবেলায় ভৈরবী ঠিক হবে না, কর্মকর্তা বলবেন, নেন মশাই, ওসব আজকাল কে বোঝে? কাজেই গায়ক বলেন, তথাস্তু। অর্থাৎ পনেরো টাকার জন্যে পৃথিবী ঘোরে তো ঘুরুক।

এই হ'ল বর্তমান কলার সাধারণ অবস্থা। কলার মধ্যে যে কয়টা বড়, তাদের দু-চারটের বিশেষ অবস্থা একটু বর্ণনা করব। সব জিনিসেরই ভাল-মন্দ দুই-ই আছে—আধুনিক কলারও আছে; তবে আমি ভাল অপেক্ষা মন্দটাই বেশি বলব, কারণ আজকাল নিজের ভিন্ন অন্তের স্তব শোনবার ধৈর্য কারুরই নেই। জনশ্রুতি এই যে, গালাগালি না দিলে কেউ কর্ণপাতই করবে না। তবে, এটাও ঠিক যে, আধুনিক কলা অনেক সময় গলা পেরোয় না, তাই দু-চার কথা বলা ছাড়া উপায়ও নেই।

কাব্য

আজকাল কাব্য বলতে কিছুই নেই,—সবই কবিতা। অন্য দেশেও তাই। কবি-প্রতিভার যে কিছু অভাব হয়েছে তা নয়,—বড় কাব্যে রুচিরই অভাব। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী যে একখানা মহাকাব্য লিখে যেতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু তিনি বুঝে-সুঝেই সে চেষ্টা করেন নি, করলে বেনা-বনে মুক্তো ছড়ানো হ'ত। আধুনিক সাহিত্য পুরাতন ইতিবৃত্তকে না টেনে সমসাময়িক কাহিনী বা জীবনের ছন্দ থেকে উপাদান নিয়ে পুষ্ট হতে চায়। এ উপাদান দিয়ে কাব্য হয় না ব'লে অনেকের বিশ্বাস। তাঁরা বলবেন, এখন যদি কেউ কোরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে কাব্য লেখেন, তা হ'লে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কথাটা হয়তো খুবই সত্য; কিন্তু কেউ তো একবার চেষ্টা ক'রে দেখছেন না—শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়! স্কটের 'লেডি অব দি লেকে'র যদি এখনও আদর থাকে, তা হ'লে ভারতের গণ-আন্দোলন ও স্বাধীনতা-লাভ নিয়ে কাব্য অশ্রাব্য হবে কেন? একজন কবি এই রকম একটা বিষয় নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখুনই না কেন? বাজারে রাবিশ বইও তো হাজার হাজার রয়েছে। আগে নাট্য-সাহিত্যে কিছু কিছু কাব্য থাকত,—রবীন্দ্রনাথও সেটা অল্প কিছু বজায় রেখে গেছেন,—কিন্তু এখন নাটকে কবিতা অচল।

হয়তো আজকাল কাব্য অস্বাভাবিক ব'লে বর্জিত হচ্ছে। কিন্তু সে

হিসাবে কবিতাও তো অস্বাভাবিক, কারণ আমরা কবিতাতে কথা বলি না। যদি কাব্য বিনা দুনিয়া অচল না হয়, তা হ'লে কবিতা বিনাও ঠিক চ'লে যাবে। পকেটে টাকা আর দোকানে মালটা বজায় থাকলেই হ'ল।

আধুনিক কবিতা:—কবিতার ধারাকে কাহিনী-প্রাধান্য থেকে মুক্ত ক'রে ভাব-প্রাধান্যে আনলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সে ধারাকে তিনি চরম উৎকর্ষে তুলে গেলেন। রবীন্দ্র-কবিতার আদর্শ অনুকরণ ক'রে উদ্ভূত হয় একপ্রকার আধুনিক কবিতা, কিন্তু অনুকরণটা অনেক ক্ষেত্রেই সেই আনাড়ীর জাল ফেলার মতই হয়ে দাঁড়াল। সে প্রতিভা কোথায়? কোন কোন আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের রহস্যাচ্ছাদন দিয়ে কবিতাকে ঢাকতে গেলেন, কিন্তু বাক্য আর অলঙ্কারের বোঝায় কবিতা আচ্ছাদন জড়িয়েই তলিয়ে গেল, যথা:—

"আদি প্রাণ-সিন্ধুর তরঙ্গ-পঙ্কে
অর্বুদ বুদ্বুদ অঙ্কে
অসীমের কন্যা
কণিকা বিপন্না
কেঁপেছিল অজানিত সুখে বা আতঙ্কে,
মনে নেই শুধু সেই কাঁপনে
মৃৎকারাগর্ভের কাল নিশি যাপনে
সেই সে কলঙ্কিনী আয়ণী অহল্যায়
নিশাচর বাসুকীর গর্জনে হল্লায়
যান্ত্রিক প্রয়োজনে মূর্ত
মানবের আদি পিতা ধূর্ত..."

এরূপ কবিতার একটা অর্থ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু কবি এটা বোধ হয় ভাবেন না যে, কবিতা হেঁয়ালি নয়। পূজার মন্ত্রও নয় যে, অর্থ না বুঝে আবৃত্তি ক'রে গেলেও পরমার্থ লাভ হবে। কবির মস্তিষ্ক হয়তো অসাধারণ, কিন্তু সকলের মস্তিষ্ক তো তা নয়। যাদের জন্য

কবিতা লেখা তারাই যদি মানে বুঝতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে গেল—যদিও অনেক পাঠক সেটা স্বীকার করবেন না—তা হ'লে সে হ'ল কবিতার অত্যাচার। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজম্ ভোরের আলোয় ফুলবাগানে প্রজাপতির সন্ধান, আর এ যেন অন্ধকার গর্ভগৃহে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পাষাণ-দেবতার ভিতর প্রাণের সন্ধান। কিন্তু অনেক সময় কবি অনন্যোপায়, কারণ এ রকম অবোধ্য কিংবা দুর্বোধ্য কবিতা ভিন্ন সম্পাদক মহাশয় নেবেন না।

ক্রমশ এক প্রকারের আধুনিক কবিতা ছন্দ ও মাত্রার বন্ধন থেকেও মুক্ত হ'ল। যতি হ'ল বিষমমাত্রিক—কোথাও কোথাও অর্থানুগামী, আবার কোথাও কোথাও খামখেয়ালানুগামী। মাভৈঃ, একেবারে সাম্যবাদ! নর-নারী যখন সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন গদ্য-পদ্য সমান হবে না কেন? গদ্যের কথাগুলোকে কতকটা পদ্যের ধরনে সাজিয়ে, অসম খণ্ডে কেটে নিয়ে এক খণ্ডের নীচে আর এক খণ্ড এঁটে দিলেই পদ্য; যথা :—

> "কোন এক যুবকের চোখে দেখেছি
> প্রমিথুসের আগুন, নূতন পৃথিবী গড়বার
> সে তখন তর্ক তুলেছে সমান জীবনের দাবীতে।
> তার পর শুনতে পাই
> বিহারের কোন এক নির্জন সহরে…"

সঙ্গে সঙ্গে সে কবিতা দাঁড়াল কিম্ভূতকিমাকারের পর্যায়ে,—অর্থাৎ কবিতার উপযুক্ত ভাব, ভাষা, ছন্দ, যতি, অলঙ্কার, ঝঙ্কার কোন কিছুরই বালাই নেই। একেবারে কাটখোট্টা,—যেন যাত্রার আসরে গোঁফ কামিয়ে অবতীর্ণা থান-পরা বঙ্গবিধবা! যথা :—

> "দেখিয়েছিলুম বাজি
> একটা লম্বা চোঙার এক প্রান্তে রেখেছিলুম
> খানিকটা তুলো ইথরে ভিজিয়ে,
> আর এক প্রান্তে রেখেছিলুম জেলে একটা মোমবাতি…"

আবার কোথাও কোথাও ছন্দের মিলও আছে, কিন্তু সে মিল গরমিলের চেয়েও ভয়ঙ্কর, যথা :—

"রুক্ষ অমুর্বর চাঁদ ঝলচে
সমুদ্রের সবটা চলচে
দুরূহ লাগে চোখে
শব্দ আলো বুকে ঢোকে
সারারাত্রি তবু আজ আবরণ
নেভাই লণ্ঠন..."

[টিপ্পনী :-চাঁদ যদি অমুর্বর, তা হ'লে চাঁদের কবিরা কি খেয়ে বেঁচে থাকে? শুধু সুধা খেয়ে? উঁহু। তার চেয়ে 'বর্বর' কথাটা দিলে ভাল হ'ত, কারণ চাঁদ কাপড় পরে না।]

চতুর্দশপদী পয়ার ইত্যাদির মত প্রতি ছত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক অক্ষর দিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তা বলছি না, কিন্তু (গদ্য-কবিতা ভিন্ন) কবিতার প্রতি ছত্রে যে গানের তালের মত দমক (accent) ও ফাঁক থাকবে এবং তদুপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাস করতে হবে, তা অগ্রাহ্য করলে চলবে কেন? এই বর্ণবিন্যাসেই পদ্য ও গদ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের পরিচায়ক। বর্ণের সংখ্যা কোন বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তী না হ'লেও খামখেয়ালী হবে না। পদ্যছন্দে মাত্রার সমতা থাকবে। ১১ অক্ষর কিংবা ৭ অক্ষরের ছত্রে সে সমতা স্বচ্ছন্দে আসে না। তা ছাড়া শুধু অক্ষরের মোট সংখ্যা নয়, কোন্ গ্রুপ ছত্রের মধ্যে কোথায় বসাতে হবে তার উপরেও ছন্দ নির্ভর করে। উপযুক্তরূপ বর্ণবিন্যাস না থাকলে সে রচনা শুধু ভাবের জোরে কবিতার পর্যায়ে পড়ে না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেরূপ ভাবেরও অভাব দেখা যায়।

কিছুকাল থেকে বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-কবিতা ব'লে একটা ধার-করা ধারা চলছে। কবিতার এমনই দুর্দিন উপস্থিত, যেন তার সঙ্গে গদ্য না মেশালে তার আস্বাদন পাওয়া যাবে না। যেন প্রাক্তন কবিরা এমন চুমুক দিয়ে কাব্যরস উজাড় ক'রে গিয়েছেন যে, রস-পাত্রে ইঁটের

কুচি ফেলে দিয়ে সেই রস লেহন করতে হবে! যেন বাংলা-কবিতার প্রকার এত অল্পসংখ্যক যে তার সঙ্গে একটা বেয়াড়া প্রকার না জুড়লেই নয়! যাঁরা গদ্য-কবিতা লিখছেন, তাঁরা তার বদলে কবিতা-গদ্য লেখেন না কেন? বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথও তা লিখেছেন। সেটা বাঙালীর ধাতে সইবে ভাল। ইংরেজী ভাষায় গদ্য-কবিতা যে ভাল শোনায় তার প্রধান কারণ, সে ভাষার ক্রিয়াপদের ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য দেশে এ রকম কবিতার আবশ্যকতাও এসেছে। সেখানে জীবনের ধারাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে উৎকট গদ্য, তাই সে সব দেশের লোক বোধ হয় নিছক পদ্য আর সহ্য করতে পারে না। বাঙালীর জীবনে এখনও পুরোপুরি গদ্যের যুগ আসে নি। এখনও তার ভাবপ্রবণতা, তার রক্ষণশীলতা প্রবল। এখনও সে বঙ্গবধূকে শাড়ি ছাড়িয়ে ব্রীচেস্ পরাতে নারাজ। তাই গদ্য-কবিতা আমাদের তেমন আকর্ষণ করে না। মনে হয়, সে না এদিক, না ওদিক। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই এর অবসান হ'লেই ভাল হ'ত। রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সে কিছু কিছু গদ্য-কবিতা লিখে গেছেন। হয়তো নূতনের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। তবে, তা অপরূপ; তাতে আর্ট আছে, সে রচনা সরস, সতেজ, সাবলীল। যথা :—

> "বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীমকালে
> যখন ভেবেছি
> সৃষ্টির আলোক-তীর্থে
> সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
> যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
> সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
> আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
> এই জাগরণের আনন্দে।"

আর উল্লিখিত সব কবিতায় যে রস পাওয়া যায় তার কথা না বলাই ভাল।

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভাবতে হবে যে, বাংলা-সাহিত্যে তার একটা মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা (Psychological urge) আছে কি না। যদি নিজের মনের নিরপেক্ষ বিচারে ভাল না লাগে, তা হ'লে শুধু প্রগতিপ্রিয়তা জাহির করবার জন্য নিজেকে ফাঁকি দিয়ে ভালবাসার কোন সার্থকতা নেই। যদি বাস্তবিক চাহিদা না থাকে (অবশ্য কম্পোজিটারের কাছে ছাড়া, কারণ গদ্য হ'লেই তাঁর খাটনি কম), তা হ'লে এ রকম একটা বেখাপ্পা দ্রব্যকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া ক'রে খাপ খাওয়াবার অপচেষ্টার আবশ্যকতাই বা কি? পরিশ্রম বড় কম হয় না, কারণ 'স্ট্রেন' ক'রে কবিতাকে কবিতাত্ব থেকে বাঁচাতে হবে এবং গদ্যকে গদ্যত্ব থেকেও বাঁচাতে হবে। যদি সে পরিশ্রমটি অন্যত্র দেওয়া যায়,—বাংলার বাণীমন্দিরে সে উপকরণের অভাবও নেই—তা হ'লে অনেক কাজ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে,—

> "উপকরণের স্তূপে রচিও না অভ্রভেদী ফাঁকি
> অমৃতের স্থান রোধি, নির্মম নেশায় যদি মাত
> সৃষ্টি হবে গুরুভার তার মাঝে লীলা রবে না তো।"

আমি অনেক কষ্টে মাসিকপত্রিকা-সমুদ্র মন্থন ক'রে উল্লিখিত কবিতা কয়টি সংগ্রহ করি নি, সবগুলিই একখানি বার্ষিক পত্রিকাতে পেয়েছি। সাংঘাতিক অবস্থা! তবে লোকও এখন উদাসীন, রেশনের চাল আর মিলের কাপড় ভিন্ন আর কিছুতেই তার আস্থা নেই, আপত্তিও নেই। কবি হয়তো বলবেন, প্রগতি। অবশ্য প্রগতি বললেই সাত খুন মাপ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলাও 'ক্যাপিটাল অফেন্স'। প্রগতি শিরোধার্য; কিন্তু সে গতি যদি ফুল-বাগানের ফোয়ারা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেছো-বাজারের ড্রেনের জল দেখায়, তা হ'লে সেটা প্রগতি নয়—দুর্গতি, হয়তো এই দুর্গতির ফলেই অনেক আধুনিক কবিকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হচ্ছে। তবে, সুখের বিষয়, যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা কেউ বড় একটা এই ধরনের কবিতা লেখেন না।

উপন্যাস—ছোটগল্প

এখন উপন্যাস ও গল্পের বন্যা। উন্নতি অনেক হয়েছে, বলবার কিছুই নেই, দুই-এক কথা ছাড়া। উপন্যাসের কলেবর বাড়ছে, গল্প বাড়ছে, রসও বাড়ছে, কিন্তু ভাষাটা অনেক ক্ষেত্রে বড়ই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাব গভীর হোক, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য হবে কেন? তা ছাড়া উপন্যাসে সে বঙ্কিমী বা শরৎচন্দ্রী আস্বাদনটি নেই। তার একটা কারণ, দু-চারটি সম্মানার্হ ব্যতিক্রম ছাড়া উপন্যাস ও গল্প-লেখক মৌলিকত্ব হারাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে চর্বিতচর্বণ, এবং অনেক ক্ষেত্রে ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত বিদেশীয় কাহিনী এ-দেশীয় ছাঁচে ঢালা, বিশেষ ক'রে ছোটগল্পে। একটু তলিয়ে দেখলেই অনেক গল্পে বিদেশীয় হলমার্ক পাওয়া যাবে, যথা, ডাক্তার (চিকিৎসক) হাণ্টার উঁচিয়ে মারতে ছুটছে, তরুণী একাই কফি-হাউসে (চায়ের দোকানে নয়) ঢুকছেন, স্ত্রী স্বামীর মুখে থুতু ছুঁড়ছেন, ইত্যাদি। বাস্তবিকই যদি প্রতি বৎসর হাজার হাজার গল্প আর উপন্যাস বার করতে হয়, তা হ'লে এত মৌলিক কাহিনীই বা মিলবে কেমন ক'রে? তাতে আবার বাঙালীর জীবনে থ্রিলের অভাব। সভ্যজীবনের থ্রিল কেবল চায়ের টেবিলে বাক্যবর্ষণ, না হয় সিনেমায় স্কন্ধঘর্ষণ, আর পাড়াগাঁয়ে গাছতলায় ব'সে দলাদলি, না হয় কলিয়ারির কুলীপাড়ায় এ ওর বউ নিয়ে পালাপালি, না হয় বাউরীপাড়ায় মেয়ে-পুরুষে মদ খেয়ে ঢলাঢলি। এ অবস্থায় একেবারে বিদেশী বর্জন করতে বলছি না, সাহিত্যকে কূপমণ্ডূক হতে বলছি না,—তবে অনুবাদ বরং ভাল, তাতে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, অথচ সামাজিক আদর্শ বিকৃত হয় না। কিন্তু বিদেশীকে স্বদেশীর অনিপুণ ছদ্মবেশে অবারিতভাবে ঢুকতে দেওয়ায় রুচি ও আদর্শ উভয়েরই বিকৃতি হচ্ছে। আজকাল সিনেমার 'নূতন' কাহিনীও এই পর্যায়েই পড়ে।

উপন্যাস ও গল্পে প্রকট আদিরসের প্রকোপ বেশ বেড়েছে। "কানু ছাড়া গীত নাই" সেটা সত্য, কিন্তু বর্বর যুগের চণ্ডীদাসও

'রিয়ালিস্টিকে'র দোহাই দিয়ে কাহুর মনের মাহুষকে এমন উলঙ্গ ক'রে দাঁড় করান নি। কেউ কেউ বলেন—শরৎচন্দ্র এর পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। শরৎচন্দ্র নারীর সতীত্বের গোঁড়ামি একটু ভেঙে দিয়ে গেছেন বটে, অর্থাৎ তিনি কয়েক ক্ষেত্রে সতীত্বের মাপকাঠি নিয়ে নারীত্বের পরিমাপ করেন নি; কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও যৌনচিত্রের নগ্ন বা কদর্য অভিব্যক্তি নেই। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি নিজেই ব'লে গেছেন যে, যে সমস্ত লেখক "অর্থলোভে কিংবা cheap popularity বা notorietyর জন্য রসসৃষ্টির নামে নানা কদর্য জিনিসের অবতারণা করে, তাদের রচনাকে সাহিত্য ব'লে মানতে পারি নে।" মানা উচিতও নয়। তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন নামজাদা লেখকও এরূপ পপুলারিটির আকর্ষণ এড়াতে পারেন নি; যথা :—"ছেলেদের ভিজে ভ্যাপসা রবারের বলের মত তার দুটি স্তনের চাপে আগুনধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল" ইত্যাদি (উল্লিখিত পুস্তক হইতে এই উদাহরণটিও সংগৃহীত)। এর চেয়ে কুৎসিত দৃষ্টান্ত অনেক আছে, কিন্তু সে সব উদ্ধৃত করতে পারা যায় না। কোন কোন মাসিকপত্রিকার সম্পাদক নিজেরা সাধু সেজে এইরূপ কদর্য রচনা উদ্ধৃত ক'রেই আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। তাঁরা হয়তো ভাবেন যে, তাঁরা ছাড়া দুনিয়ায় আর সবাই বোকা। আধুনিক সাহিত্যে এরূপ নগ্ন বাস্তবতা অনাবশ্যক, কারণ আজকাল বারো বছরের ছেলেমেয়েও ইঙ্গিতে সবই বোঝে। তার জন্য তাদের হ্যাভলক এলিসের যৌনমনস্তত্ত্ব বোঝাবার দরকার হয় না। লেখকরাও তা জানেন; তবে তাঁরা হয়তো বলবেন যে, প্রগতি। তার জবাব আগেই দিয়েছি। না হয় বলবেন, আজকাল বিদেশী সাহিত্যেও এই ধারা চলছে। তারও জবাব কিছুটা দিয়েছি। কিন্তু কৈফিয়ৎ যাই হোক, তাঁদের লক্ষ্য সহজেই অনুমেয়। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ চরমে উঠেছেন ও মাঝে মাঝে পুলিসের শুভদৃষ্টিতে পড়েন।

তাঁদের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁরা যদি এরূপ নোংরা অখাদ্য ছুঁড়ে দিয়ে কতকগুলো হ্যাংলা বাচ্চাকে আকর্ষণ করা ছাড়া অন্নবস্ত্রসংস্থানের অন্য উপায় খুঁজে না পান, তা হ'লে পলিটিক্সে লেগে যান না কেন? সেখানে দালালি করলেও দিন চ'লে যাবে, অথচ পিনাল-কোডের ২৯২ ধারার ভয়টা থাকবে না।

নাটক

নাটকের নাভিশ্বাস হচ্ছে, খান কতক অমর নাটক মাঝে মাঝে পাবলিক ও প্রাইভেট রঙ্গমঞ্চে উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু বাকিগুলোকে নিয়ে গঙ্গাতীরে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। তবে রেডিও হয়তো তাদের কঙ্কালগুলোর ওপর দাবি ছাড়বে না, কারণ সেগুলো পেলেই তাদের একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে স্টুডিওতে নাটকের সাপ্তাহিক পুতুল-নাচটা চালিয়ে নেবে। আজকাল থিয়েটার ও সিনেমার ডিরেক্টররা নাটক (অর্থাৎ বই) লিখছেন। সাহিত্যিক যদি ডিরেক্টর হন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ডিরেক্টর সাহিত্যিক হ'লেই সাংঘাতিক; তখন বার্নার্ড শও সেখানে পাত্তা পাবেন না। যেখানে এ অযাত্রা নেই, সেখানেই বা নাট্যকারের যথোপযুক্ত সুযোগ কই? সকলেই বলছেন, বাংলায় আজকাল ভাল নাটক হচ্ছে না। কিন্তু হ'লেই বা সে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে?

যদি নাটককে রঙ্গমঞ্চ-সিনেমা-রেডিওর দাসত্ব থেকে উদ্ধার ক'রে এনে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনর্বাসন করানো না যায়, তা হ'লে তার বিলোপ অনিবার্য। সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে গেলে নাটকের রূপও বিশেষ ভাবে পরিবর্তন করতে হবে। প্রাক্তন পদ্ধতি অনুসারে কেবল রোমাঞ্চকর ঘটনা, অস্বাভাবিক যোগাযোগ ও উচ্ছ্বাসের সমাবেশে অ্যাকশন সৃষ্টি ক'রে মনকে চাবুক মেরে উত্তেজিত না রেখে, 'অ্যাকশনে'র সঙ্গে 'থট' ও স্বাভাবিকতা মেশাতে হবে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিন্তাশীলতার আদর বেড়েছে, এবং বাস্তবিক পক্ষে এই চিন্তাশীলতাই আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ থেকে যে ফিল্ম ফেডারেশন

সম্প্রতি আমেরিকা গিয়েছেন, তাঁর প্রেসিডেণ্ট হলিউডে বলেছেন,—"Your country has made wonderful progress, but why is everybody in such a hurry? India could use some of America's creative drive, but America I think needs something of India's happy, contented and spiritual mode of life."

কিন্তু এ সব করবে কে? কোন সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধু সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাটক লিখতে অগ্রসর হবেন ব'লে মনে হয় না,—কারণ লোকে নাটক দেখে, পড়ে না। কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরিগুলো খুঁজলে কোনওটাতে দু-চারখানার বেশি নাটক পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় নাটকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, যদি সাহিত্য-তরণীর কর্ণধারগণ নিজেদের কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার ক'রেও নাটকের জন্য একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা না করেন। মাসিক-পত্রিকায় যেমন উপন্যাস ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তেমনই নাটকের জন্যও একটা নির্দিষ্ট স্থান রেখে দিলে এবং কেবলমাত্র লঘু ও হাস্যোদ্দীপক নাটিকা প্রকাশ না ক'রে 'সিরিয়াস' নাটকও ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করলে নাটকপাঠে ক্রমশ লোকের রুচি জন্মাবে, ভাল নাটকেরও সৃষ্টি হবে। কারণ নাট্যকারকে ম্যানেজারদের রুচির ওপর নির্ভর করতে হবে না,—বরং ম্যানেজাররাই ভাল ভাল নাটককে অভিনয়োপযোগী ক'রে নিতে সচেষ্ট হবেন। যে রকম সংক্ষেপের যুগ এসেছে, ভাল নাটক শীঘ্রই বৃহদাকার উপন্যাসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উপন্যাস ও নাটক-লেখকদিগের নিকট নিবেদন—তাঁরা যেন মোটামুটি একটু আইন প'ড়ে নেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের একখানা নাটকে দেখলাম, কয়েকটি 'টেকনিক্যাল' ভুল আছে। এ রকম ভুল-ভ্রান্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

[ক্রমশ]

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম

"Flower of the clove!
All the Latin, I construe, is 'amo' I love."
—Browning.

সব কীর্তি, ওগো বন্ধু, শোভা পায় কীর্তিনাশা-জলে,
মরণের বেদীমূলে ঝরে দেখ, প্রতিভা-শোণিত।
ধরণীর কোষে কোষে অতি ব্যগ্র জনম-ইঙ্গিত ;
তাহারি আভাস ভাসে দেহীজন-মানসের তলে।
আমারি শোণিত একা, যুগে যুগে করেছে বহন
মৃত্যুর ভঙ্গুর পাত্রে অপ্রমেয় প্রাণের ইন্ধন !
অমৃত ধরার ওষ্ঠে বার বার করিয়া নিঃশেষ
জ্যোতিষ্কের মত জ্বলে শুধু এই তুচ্ছ অম্ললেশ !
জীবনের জড়পাত্র বার বার করেছে অমর
কে জন বৈদেহী শক্তি ? কলুষিত বাসনা-কাতর
অক্ষম ইন্দ্রিয় যার অবশেষে নিয়েছে শরণ,
প্রতিটি মুহূর্তে নিত্য সেই শক্তি আনে উন্মাদন।
আজো আমি নিষ্ফলা তো—চেতনার সুশুভ্র মর্মরে
শেহলা বিছায় দল ; জীবনের বেদিকা-উপরে
নির্বীর্য ঘৃতের দীপ আশঙ্কার বায়ুতে শিহরে ;
তবু শুনি, তবু শুনি পদধ্বনি হৃদয়-মর্মরে।
শৈশবের চেতনায় যেই স্বপ্ন হয়েছে উদ্ভূত,
যৌবনের কাণ্ডে কাণ্ডে দেখ তার ফুলের বিস্তার ;
গর্বিত হৃদয় মম ভিক্ষু কর করেছে প্রসার
কেবল তাহারি কাছে—মহাজন একা সে আমার।
যদিও পাই নি আজো—তবু আমি করিব স্বীকার,
প্রেম শুধু একমাত্র এ জীবনে ঈপ্সিত আমার।

তুচ্ছ এই মৃৎপাত্র, তুচ্ছ এই দেহের আধার ;
তুমি শুধু দিতে পার—জেলে দাও, জেলে দাও শিখা ;

ভঙ্গুর দেহের ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-শিখা,
তোমার আলোক দিয়ে, ওগো প্রেম, পড়ি একবার।
মাটি দেহ মাটি রবে, তুমি যদি না কর স্পর্শন,
আসঙ্গবিলাস হবে ক্রূর সর্প পাকের প্রমাদ ;
চুম্বন যে বিষ হয়, আলিঙ্গন পাতে মৃত্যু-ফাঁদ,
যদি না দেহেতে হয় বৈদেহী সে প্রেম-রসায়ন।
চিতার আগুনে যেই তনুদেহ কভু ভস্মশেষ
সে তো পুষ্পধনু নয়—শুধু তুমি দিয়েছ গৌরব,
জীর্ণকন্থা ভিখারীকে বিলায়েছ সম্রাট-বৈভব,
বিদ্যুতে জেলেছ তুমি তমসার চুম্বন-আশ্লেষ।
প্রতি পদক্ষেপে তাই মনে হয় আমারি অন্তরে
চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে, ওগো প্রেম, দিলে ধন্য ক'রে।

মরণে স্বীকার করি—তাই করি তোমাকে স্বীকার,
তোমারি বক্ষেতে মম অনির্বাণ জীবন-পিপাসা,
প্রেমিকের নয়নেতে সঞ্জীবনী লভিবার আশা,
বাঁচিবার আশা—তাই তুমি প্রেম, শরেণ্য আমার।
আমার সকল সত্তা বেজে ওঠে বীণার মতন,
সেও তো তোমারি সুরে—তুমি ভাষা করেছ প্রদান ;
সামান্য আমার মধ্যে অসামান্য প্রয়োগ যাহার,
চেতনার স্তরে স্তরে ক'রে যায় স্বপন-সঞ্চার।
এই যে মেঘের বুকে ক্ষণে ক্ষণে দেহহীন আমি,
চন্দ্রসূর্য বিম্বে বিম্বে আপনার দেখেছি আরতি ;
বিবর্ণ দিবসে যার ফাল্গুনের বসন্ত-প্রণতি ;
নিমেষে নিমেষে যার ক্ষণকাল যুগান্তসমান।
নক্ষত্রে স্বপনযাত্রা ধূলা থেকে কত বার বার
প্রেমের কুহক-মন্ত্রে !—তাই প্রেম শরেণ্য আমার।

এ জীবনে আজো প্রেম জীবনের দর্শন-বিজ্ঞান ;
সকল জিজ্ঞাসা শুধু এক পলে পায় অবসান ;
অচেতন প্রাণ যার ক্ষণস্পর্শে চির উজ্জীবন ;
মন, আহা, দেহ হয়—মরশীল দেহ হয় মন ;
সকল গতির শেষে যার কাছে নিঃশব্দ চরণ ;
স্তিমিত প্রেমের দৃষ্টি, মুখরিত বাণীর মরণ ;
সমস্ত নিঃশেষে দিয়ে যার কাছে আত্মসমর্পণ ;
অমৃতের পুত্র, লও সে অমৃত প্রেমের শরণ।

পারি নে বাসিতে ভাল—ব'লে যাব তবু উচ্চ স্বরে
নিষ্ফলা হৃদয় এই উষরিত মরুর ক্রন্দন,
বন্ধ্যা এ মনকে মম ঘৃণা করি আমি অহর্নিশ।
যে চাতক মেঘচ্ছায়ে পিপাসায় কাঁদে দিবাযামী,
মাধুরীর পারাবারে যে মাধবে করে নি গ্রহণ,
সে জন অনেক দীন, দীনতর হ'তে নিঃস্বজন ;
তাহার বেদনা হায়, সুধাভাণ্ডে মিলাল যে বিষ।
সবচেয়ে হতভাগ্য, প্রেমশূন্য সেইজন আমি।
তবু, তবু মর্মমূলে বিষঘাতে অমৃতের স্বাদ
কখনো বিক্ষুব্ধ করে জন্মান্তের ক্রূর অভিশাপ।

শ্রীমতী বাণী রায়

মাঠ

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় জামসেদপুর এয়ার ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি যে, পল্লব তার ছোট প্লেনটির পাশে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, হতভাগা গাধা, এত দেরি করলি কেন ? আর মিনিট খানেক দেরি হ'লে আমি উড়ে পড়তুম। নে, নে, উঠে পড়, শিগগির।

ছোট গোল অ্যালুমিনিয়মের দরজা খুলে প্লেনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমি। ঢুকে পাইলটের সীটের পাশের আসনটিতে ব'সে পড়ি। পল্লব আমার পেছনে পেছনে এসে ঢুকল, বিমান-চালকের আসনটিতে তার বিপুল বপুটিকে স্থাপন ক'রে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, আর সোয়া এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ব্যারাকপুরে পৌঁছতে হবে। কি ক'রে ম্যানেজ করব ভেবে পাচ্ছি নে।

ব'লে আমার মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি হেনে সে প্লেনটির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। সুমুখের প্রপেলারটা বাতাসের মধ্যে খানিকটা গোল জায়গা জুড়ে জলীয় রঙের একটা আবর্ত রচনা ক'রে ঘুরতে থাকে। তার প্রচণ্ড গর্জন নির্জন ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের নৈঃশব্দ্যের বুকে যেন স্টীম রোলার চালিয়ে দেয়।

জয়েস স্টিকের ওপর হাত রেখে প্লেনটি চালিয়ে দেয় পল্লব। রানওয়ের কালো পীচের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে প্লেনটা চলতে থাকে।

রানওয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে প্লেনটি পৌঁছে যেতেই সে একজোড়া প্যাড্‌লের ওপর সামান্য চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটি শূন্যে ওঠে।

আকাশে খানিকটা ওঠার পর পল্লব বললে, আর উঠে কাজ নেই, কি বলিস? ব'লে সে প্যাড্‌লটি ছেড়ে দিলে। তারপর ঈষৎ হেসে সে বললে, একটু নীচু দিয়ে ফ্লাই করলে অনেক ভাল ভাল দৃশ্য দেখতে পাবি, বুঝেছিস!

বেশ তো।—আমি বললাম।

নীচে সমস্ত জামসেদপুর প্রকাণ্ড একটা মানচিত্রের মত প'ড়ে আছে। মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। বাড়িগুলো সব যেন এক-একটি ছোট ছোট খেলনা-বাড়ি, রাস্তাগুলি সরু নীল ফিতের মত। অদূরে খড়খাই নদী এঁকেবেঁকে দিগন্তের কোলে নীলিমার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। সমুখে বহুদূরে নীলাভ দলমা পাহাড়। তার চারদিকে শালগাছে-ছাওয়া ঢেউ-খেলানো মাঠ।

পল্লব কম্পাস ও ম্যাপের দিকে চেয়ে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে, নাঃ, বজ্ঞ হাওয়া দিচ্ছে! প্লেনটাকে তার রুটের ওপর রাখা যাচ্ছে না।

ম্যাপের ওপর জামসেদপুর থেকে কলকাতা অবধি লাল একটি রেখা টানা—বোধ হয় প্লেনের গতিপথ—সেদিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সে আবার কম্পাসের দিকে তাকায়। তার মুখের পানে চেয়ে ঈষৎ ভীতস্বরে বললুম, কি রে, ম্যানেজ করতে পারছিস না?

ম্যানেজ করতে পারব না মানে? ঝাঁঝালো স্বরে পল্লব জবাব দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাঁ-হাত-দিয়ে-ধরা জয়েস্ স্টিকটি একটু হেলিয়ে দিয়ে প্লেনটার গতিপথ বদলে দিলে।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে আবার সে ব'লে ওঠে, হোপলেস! বজ্জো হাওয়া!

আমি সত্যিই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। এই প্রথম স্বাধীনভাবে প্লেন চালাচ্ছে ছোকরা, কোন অঘটন না ঘটিয়ে বসে!

কয়েক মুহূর্ত বাদে পল্লব আমার কাঁধে হাত রেখে উত্তেজিতস্বরে ব'লে উঠল, ওরে, নীচে ঐ বাড়ির ছাতের দিকে চেয়ে দেখ্।

আমার দৃষ্টি নিম্নগামী হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। জামসেদপুরের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে গেছি প্রায়। পল্লবের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলুম, একটি বাড়ির ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে একটি তরুণী মাথা উঁচু ক'রে আমাদের প্লেনের দিকে চেয়ে আছে।

দেখবি, একটু মজা করব? বলতে বলতে পল্লব তার পায়ের তলার প্যাড্লটির ওপর চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত গতিতে বাড়িটির ছাত লক্ষ্য ক'রে প্লেনটি নেমে আসে চিলের ছোঁ-মারার ভঙ্গীতে। মেয়েটি সভয়ে ভীত হরিণীর মত ত্রস্ত গতিতে ছুটে ছাতের একধারে একটি ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করল। হো-হো ক'রে হেসে উঠে পল্লব প্যাড্লের উলটো দিকে চাপ দিল, প্লেনটি আবার ওপরে উঠতে শুরু করল।

তারপর আমার ভয়ে বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, ভয় পেয়ে গিয়েছিস ?

খুবই স্বাভাবিক।—গম্ভীর মুখে বললাম। এ রকম তামাশার কোন মানে হয় না। মেয়েটিকে ও-রকম ভয় পাইয়ে দেওয়া—

ধীরে বন্ধু, ধীরে।—আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পল্লব বললে, এ হচ্ছে এক প্রকার নির্দোষ আমোদ। আমাদের ফ্লাইং ক্লাবের কোড অনুযায়ী এতে অন্যায় কিছু হয় নি।

রেখে দে তোর ফ্লাইং ক্লাবের কোড :—রুষ্টস্বরে আমি বললুম, নিজের প্রাণটি বেঘোরে দিয়ে ফেলতে চাস তো দিয়ে ফেল্। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ?

যমের বাড়ি একসঙ্গে যাব ব'লে—অম্লানবদনে জবাব দেয় পল্লব।

ব'লেই সে আবার প্যাড্‌লে চাপ দিলে, প্লেনটি আবার তীরের বেগে নীচের দিকে এগিয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লবের সোল্লাস চিৎকার যেন প্রপেলারের গর্জনকে ছাড়িয়ে যায়, হাউ বিউটিফুল! হাউ নাইস!

নীচে একটি নালার মধ্যে কয়েকটি সাঁওতাল-মেয়ে স্নান করছিল। প্লেনটাকে দেখে তারা চিৎকার ক'রে স্খলিতবসনে ছুটে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। পাশবিক উল্লাসে হাসতে হাসতে প্যাড্‌লের উলটো দিকে চাপ দেয় পল্লব। প্লেন আবার উঠতে থাকে।

যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললুম, খড়গপুরে পৌঁছেই সেখানে আমাকে নামিয়ে দিবি, বুঝেছিস ? আর যাব না তোর সঙ্গে।

নির্লিপ্তস্বরে পল্লব বললে, পাগল আর কি!

আমি ঘুষি তুলে বললাম, নামিয়ে দিতেই হবে—নইলে মাথা ভেঙে ফেলব তোর।

ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে পল্লবের ঠোঁটের কোণে। শ্লেষ-মাখানো স্বরে সে বললে, নামিয়ে যদি না দিই আমার মাথা ভেঙে ফেললে কি তুই নেমে যেতে পারবি ? তার চেয়ে একটা কাজ কর্। লাফ দিয়ে প'ড়ে যা—সামনে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে, ওইটি তাক্ ক'রে।

আহত দৃষ্টিতে আমি পল্লবের মুখের পানে তাকালাম। সুমুখের দিকে চেয়ে সে বললে, অত ভয় খাস কেন? আমি নিতান্ত কাঁচা পাইলট নই।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার সে বললে, মাভৈঃ, এখন থেকে আমি একেবারে স্মুথ ফ্লাইট দেব—কোন ভয় নেই তোর। বার বার ও-রকম ওঠা-নামা করলে ইঞ্জিন বিগ্‌ড়ে যাবার ভয় আছে।

বলতে না বলতে আবার সে প্যাড্‌লে চাপ দিলে। প্লেনটি তীরবেগে নামতে শুরু ক'রে আবার। নীচে ছোট একটি শহর—বোধ হয় গিড্‌নি, তার এক ধারে কয়েকজন বাঙালী তরুণ-তরুণী মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অলস মন্থর গতিতে। প্লেনের গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে মাথা তুলেই তারা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলে।

দেখছিস কি রকম দৌড়চ্ছে? দেখবার মত দৃশ্য।—ব'লে পল্লব প্লেনটিকে আবার ওপরের দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল।

কথা বলবার শক্তি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে আমার। সীটের হাতার ওপর চাপ দিয়ে আমি অসহায় দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে পল্লব বললে, এবার থেকে এবসোলিউট্‌ স্মুথ ফ্লাইট। কথা দিচ্ছি তোকে।

আমি বললুম, কথা আর তোকে দিতে হবে না, একেবারে ডাইভ্‌ দিয়ে প্লেনটাকে মাটির ওপর আছড়ে ভাঙ্‌। একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে শিস দিয়ে ওঠে পল্লব। তারপর আপন মনে গুন গুন ক'রে গাইতে থাকে—রো রো রো দি বোট ডাউন্‌ ডাউন্‌ দি স্ট্রীম্‌।

পল্লব সত্যিই তার কথা রাখলে। একে একে ঝাড়গ্রাম খড়্গপুর পেরিয়ে এলাম, কিন্তু প্লেনটার সরলগতি অব্যাহতই রইল।

খড়্গপুর পেরিয়ে আসতে মাটির রুক্ষ চেহারা ক্রমশ বদলে যায়। শালবন ও তার ফাঁকে ফাঁকে গেরুয়া রঙের ছোপের পরিবর্তে শুধু

নিরবচ্ছিন্ন সবুজের সমারোহ, শুধু সজল ধানক্ষেতের মেলা। মাঝে মাঝে কচুরিপানায় ছাওয়া ডোবা। নারকেল তাল আম কাঁঠাল গাছ দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলি যেন ধানক্ষেতের সমুদ্রের মধ্যে এক-একটি ছোট দ্বীপ।

খড়্গপুর পেরিয়ে মিনিট পনেরো ওড়ার পর হঠাৎ প্লেনের গতি অনেকটা ক'মে গেল এবং প্লেনটি ধীরে ধীরে ক্রমশ নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

পল্লবের মুখের পানে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আমি বললুম, ও কি! আবার শুরু ক'রে দিয়েছিস?

প্লেনের অ্যাক্সিলেটারটা সুমুখের দিকে চাপ দিতে দিতে পল্লব বললে, আমি তো কিছু করি নি, প্লেনটা আপনি নেবে যাচ্ছে। স্পীডটাও ক'মে আসছে ক্রমশ। এই দেখ্ না, ফুল থ্রটল, মানে ফুল স্পীডে চালাচ্ছি, কিন্তু তবু স্পীড ক'মে আসছে।

তার মানে?—আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম।

সুমুখের দিকে চেয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে পল্লব বললে, মানে প্লেনটি বিগড়ে গেছে, ফোর্স‌ড্ ল্যাণ্ডিং করতে হবে। নইলে—

ব'লে সে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে কপালের ঘাম মুছলে।

নইলে কি হবে?—কম্পিত স্বরে আমি বললুম।

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে পল্লব বললে, হবে আবার কি? প্লেন ক্র্যাশ। কালকের বা পরশুর খবরের কাগজে বেরুবে, প্লেন ক্র্যাশ্ড্ নিয়ার দেউলটি—টু চারড্ বডিজ—

ওরে হতভাগা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই থাম্। তাড়াতাড়ি প্লেনটাকে ল্যাণ্ড করা।

ল্যাণ্ড করাব কোথায় ঘোড়ার ডিম? একটা ভদ্রগোছের মাঠও দেখছি না, খালি ধানক্ষেত আর ডোবা। বাংলা দেশটা অতি উঁছা জায়গা, বুঝেছিস? খালি ডোবা আর জলা দিয়ে বোঝাই। একেই কিনা কবিরা বলেন, সোনার বাংলা? ফুঃ! পশ্চিমের যে কোন

প্রভিন্স্ হ'লে কখন ল্যাণ্ড ক'রে যেতুম! বাংলা দেশের ওপর দিয়ে উড়ছি ব'লেই মরতে চলেছি, বুঝেছিস গোপাল?

আমার আত্মারাম ততক্ষণে খাঁচাছাড়া। সর্বাঙ্গ কাঁপছে বাঁশপাতার মত। চোখ বুজে অপেক্ষা করছি শেষ চরম মুহূর্তের জন্যে। প্লেনটা ক্রমশ যে দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে তা আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছিলাম। এক মুহূর্তে আমার সমস্ত অতীত, আমার মা-ভাই-বোন সকলের মুখ আমার মনের পটে ফুটে উঠল। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো ক'রে কোনক্রমে ভাঙা গলায় বললাম, ওরে পল্লব, ধানক্ষেতের ওপরই নেমে পড়্।

অসম্ভব।—সঙ্গে সঙ্গে পল্লবের জবাব আসে, তার গলার স্বরে ভয়ের লেশমাত্র আভাসও নেই, বলে, প্লেনটাকে নষ্ট করতে পারি না। প্লেনটাকে নষ্ট ক'রে আমি বাঁচতে চাই না, এ যে কত বড় ডিস্গ্রেস্—

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল হতভাগার টুঁটি টিপে ধরি। প্লেনের গর্জন চিরে আমার গলা-ফাটা চিৎকার বেরিয়ে এল, ওরে শুয়ার, শিগগির নামা।

আমার চিৎকারে কর্ণপাত না ক'রে পল্লব তার পূর্বকথার জের টেনে ব'লে চলে, তা হ'লে আমার লাইসেন্স ক্যানসেল্ড্ হবে, জীবনে আর প্লেন চালাতে পারব না। আজ আমার নিজের দোষেই প্লেন বিগড়েছে, এতবার ওঠা-নামা করেছি, এঞ্জিনের ওপর দিয়ে খুব স্ট্রেন গেছে।

তার এক-একটি কথা যেন তপ্ত শলাকার মত আমার কানে গিয়ে ঢুকছিল। আমার চৈতন্য প্রায় লোপ পেতে বসল।

আমার কাঁধে একটা খোঁচা মেরে পল্লব বললে, আমাদের আসন্ন মৃত্যুর জন্য বাংলা দেশ দায়ী, বুঝেছিস? তোর সো-কল্ড্ মাদারল্যাণ্ড! হতচ্ছাড়া দেশ! ফাঁকা মাঠ নেই, শুধু ডোবা, শুধু জলা, শুধু কচুরি-পানা, নারকেলগাছ আম জাম তাল—হাউ হরিব্ল্! আর দু মিনিট, বুঝেছিস? তারপর সব শেষ!

আমি তখন প্রায় ম'রেই গেছি—পল্লবের শেষদিকের কথাগুলি আর আমার কানে গেল না।

এমন সময় হঠাৎ প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে প্লেনটি থেমে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হতপ্রায় চেতনা যেন জীবনের শেষ মুহূর্তটিকে অনুভব করবার জন্যে জেগে উঠল। কিন্তু কই! কিছু তো হ'ল না! তবে কি জীবন্ত অবস্থায় সত্যিই মাটিতে নেমেছি!

চোখের পাতা দুটি যেন চোখের ওপর এঁটে গিয়েছে—চোখ মেলে তাকাবার মত শক্তিও দেহে অবশিষ্ট নেই। পা দুটি অস্বাভাবিক রকম কাঁপছে। কম্পিত ক্ষীণস্বরে ডাকলাম, পল্লব!

জবাব পেলাম না কোন। অকস্মাৎ বরফের ছুরির মত একটা আশঙ্কা বুকের মধ্যে এসে বিদ্ধ হ'ল—পল্লব বুঝি আর বেঁচে নেই!

দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে স্বরহীন আর্তনাদের মত ফিস-ফিস ক'রে আবার ডাকলাম, পল্লব!

গো টু হেল!—পাশ থেকে পল্লবের পরুষ কণ্ঠের উত্তর আবার কানে এসে প্রাণ জুড়িয়ে দিলে। সে বললে, তোর মত কাওয়ার্ড জীবনে আমি দেখি নি। চোখ মেলে চা হতভাগা—উই আর সেফ।

আমার ফুসফুসের সমস্ত হাওয়া জড়ো ক'রে একটা অতি দীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এক মুহূর্তে আমার দেহের শিরায় শিরায় মনের স্তরে স্তরে বেঁচে থাকার অনুভূতিটি পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়—আমার অন্ধকারে নিমগ্ন চেতনা যেন আলোর মধ্যে জেগে ওঠে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখি, একটি ছোট মাঠের ওপর আমাদের প্লেনটি দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটি সদ্য-লাঙল-দেওয়া জমি। চারদিকের কচি-ধানগাছে-ছাওয়া ক্ষেতের সমুদ্রের মধ্যে এই দুটি ফাঁকা জায়গা যেন একটানা সবুজের সমারোহের মধ্যে ছোট ছোট দুটি ক্ষত। অদূরে ঘন গাছপালার আড়ালে একটি গ্রামের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আশেপাশে লোকজন কেউ নেই।

একটি সিগারেট ধরিয়ে পল্লব বললে, তোর আয়ুর জোর আছে

রে হতভাগা—খুব বেঁচে গেছিস! এই এক টুকরো মাঠ ভগবান যেন জুটিয়ে দিলেন। নিজেরা বাঁচলুম, প্লেনটাও বাঁচল।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পল্লবের মুখের পানে তাকাই আমি। চরম সর্বনাশের মুখে মনের সমতা এতটুকুও হারায় নি। এই ছোট্ট এক টুকরো মাঠের মধ্যে একটি প্লেনকে নামাতে যে কি অমানুষিক দক্ষতার প্রয়োজন—ভেবে চমৎকৃত হই। বিস্মিত সম্ভ্রমে পল্লবের মুখের পানে চেয়ে থাকি।

সুমুখের দিকে চেয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পল্লব বললে, সর্বপ্রথম আমাদের একটি পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস বা রেলওয়ে স্টেশন খুঁজে বের করতে হবে। সেখান থেকে ব্যারাকপুর এয়ারপোর্টে আমাদের ইন্‌স্ট্রাক্টারকে একটি টেলিগ্রাম করব। তার পর—

ব'লে সে চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আর এক মুখ ধোঁয়া বের ক'রে দিয়ে সে বললে, তার পর রাত্রির মত একটি আস্তানা খুঁজে বের করা।

সিগারেটে শেষবারের মত একটি টান দিয়ে দগ্ধাবশেষ টুকরোটা নিবিয়ে ফেলে দিয়ে সে প্লেনের দরজাটি খুলে ফেললে। তারপর আমাকে নেমে যাবার ইঙ্গিত ক'রে নিজে নেমে পড়ল।

পল্লবের পেছনে পেছনে মাটিতে নেমে পড়ি। মাটির স্পর্শে একটা অনাস্বাদিত পুলকের প্রবাহ আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায়। আমার আজন্মপরিচিত মাটির সঙ্গে যেন নূতন ক'রে পরিচয় হ'ল। যেন নূতন জীবন পেয়ে আবার মাটির কোলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছি।

অদূরে গ্রামটি লক্ষ্য ক'রে ধানক্ষেতের আল বেয়ে আমরা হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। পল্লবের হাতঘড়িতে চারটে বেজে গেছে। সজল ধানের ক্ষেতের ওপর বিকেলের নিস্তেজ রৌদ্র এসে পড়েছে—রোদের ছোঁয়ায় কচি কচি ধানগাছগুলোর ওপর যেন রাশি রাশি সোনালী ফসল ফ'লে উঠেছে।

ধানক্ষেতের ধারে সদ্যফোটা সাদা কাশফুলের গুচ্ছ—মাঝে মাঝে ধানক্ষেতের সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে কচুরিপানার

দল—তাদের সবুজ সতেজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে ছোট ছোট বেগুনী রঙের ফুল।

নাক সিটকে পল্লব বললে, ছ্যাস্টি! খালি কচুরিপানা আর কচুরিপানা!

কেন? কচুরিপানার ফুলগুলো বেশ সুন্দর তো দেখতে!

হরিবল্‌! কচুরিপানায় ছাওয়া কোন ডোবার মধ্যে আমাদের প্লেনটি প'ড়ে গেলে তোর এক্‌স্ট্রিম্‌ রিয়েলাইজেশন হয়ে যেত—কচুরিপানার ফুলের বিউটি সম্বন্ধে।

কিছু বললাম না। নীরবে পল্লবকে অনুসরণ ক'রে হাঁটতে থাকি।

গ্রামের কাছাকাছি এসে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাদের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে সে বললে, কোথা থেকে আলেন আপনারা?

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পল্লব পাল্‌টা প্রশ্ন করে, হ্যা হে, এই গাঁয়ে কোন ভদ্দরলোক-টদ্দরলোক আছেন নাকি?

লোকটি জবাব দেয়, ভদ্দরলোক! তা অনেক আচে। গাঁয়ে ঢুকতেই বাঁ ধারে আমাদের ডাক্তারবাবু থাকেন—মহেশ ডাক্তার।

গুড। মহেশ ডাক্তার উইল ডু।—ব'লে পল্লব আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই গাঁয়ের সকলের উৎসুক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এসে আমাদের ওপর নিবদ্ধ হ'ল। তাদের একজনকে ডেকে পল্লব বললে, মহেশ ডাক্তারের বাড়ি কোথায় বলতে পার?

লোকটি পল্লবের বিচিত্র বেশভূষার দিকে ব্যাদিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তার মুখের পানে ভীরু দৃষ্টি তুলে বললে, ওই যে হোতা—আপনার সুমুখেই।

আমাদের সুমুখে কয়েকটি মাটির ঘর দিয়ে ঘেরা একটি ভাঙা দালানবাড়ির মাথা দেখা যাচ্ছিল। ওই বাড়িটির দিকে আঙুল দেখিয়ে পল্লব লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করল, ওই বাড়িটা?

এজ্ঞে।

বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে দালানের সুমুখে একটি মাটির ঘরের দরজার পাশে দেখলাম, একটি কালো রঙের নেম্‌প্লেট্‌ ঝুলছে, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে—ডাক্তার মহেশ চক্রবর্তী, টিম্বার মার্চেণ্ট।

পল্লব বললে, টিম্বার মার্চেণ্ট! ভদ্রলোক কি কাঠের চিকিচ্ছে করেন না কি? না, একেবারে সব্যসাচী? এক হাতে রুগী মারেন, অন্য হাতে—

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক খড়মের শব্দ তুলে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পল্লব তার বাক্‌বিন্যাসে ব্রেক্‌ ক'ষে তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করলে। স্মিতমুখে তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আপনি মহেশবাবু?

প্রতিনমস্কার ক'রে ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা?

পল্লব বললে, বড় বিপদে প'ড়ে আমরা এসেছি আপনার কাছে। ব্যারাকপুর ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বার আমরা। প্লেনে ক'রে কলকাতা যাচ্ছিলুম জামসেদপুর থেকে। যন্ত্র বিগ্‌ড়ে যাওয়াতে এখানকার একটি মাঠে ফোর্‌স্‌ড্‌ ল্যাণ্ডিং করেছি।

ভদ্রলোক আমাদের আপাদমস্তক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বারকয়েক লেহন ক'রে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

ভদ্রলোককে অনুসরণ ক'রে কয়েকটি পুরোনো বিবর্ণ আলমারি দিয়ে ঘেরা একটি ঘরে ঢুকলাম। আলমারিগুলোর কয়েকটির মধ্যে ওষুধপত্র রয়েছে—বাকিগুলো পুরনো পাঁজি, লাল কাপড়ের মলাট দেওয়া হিসেবের খাতা দিয়ে বোঝাই। ঘরের মাঝখানে একটি নড়বড়ে তক্তাপোশ। তাতে আমাদের বসিয়ে মহেশবাবু বললেন, আপনারা কোথায় নেমেছেন বললেন?

পল্লব জবাব দিলে, এখান থেকে আধ মাইলটাক পূবে একটি সদ্য-লাঙল-দেওয়া জমি ঘেঁষে একটা মাঠের মধ্যে।

তাই নাকি! ভদ্রলোকের উৎসুক দৃষ্টি পল্লবের মুখের ওপর এসে পড়ে—তাঁর রুগ্ন ফ্যাকাশে মুখটি নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

যে মাঠে আপনারা নেমেছেন সে আমার মাঠ।—মহেশবাবু সগর্বে বললেন, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনারা—আমার মাঠে গিয়ে কোন শালার সাহস হবে না আপনাদের প্লেন ছুঁতে।

পল্লব একটু হেসে বললে, আপনার কথা শুনে আমাদের মস্ত একটা দুশ্চিন্তা ঘুচল। এখন দয়া ক'রে আমাদের একটি উপকার যদি ক'রে দেন তো বড় বাধিত হই।

বিলক্ষণ! এ অধীন আপনাদের সেবায় লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। বলুন, কি করতে হবে?

আমি ব্যারাকপুরে একটা টেলিগ্রাম করব। কাছাকাছি যদি কোন টেলিগ্রাফ আফিস থাকে তো—

পল্লবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহেশবাবু বললেন, খুব কাছেই আছে—এখান থেকে দেড় মাইল দূরে—দেউলটিতে। আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি—কি টেলিগ্রাম করতে হবে লিখে দিন একটা কাগজে।

অনেক ধন্যবাদ।—ব'লে পল্লব পকেট থেকে কাগজ ও কলম বের ক'রে মুসাবিদা শুরু ক'রে দিলে। দু-তিনটি শব্দ লেখার পর সে বললে, আচ্ছা মহেশবাবু, এ গ্রামটির নাম কি?

জগন্নাথপুর।

দেউলটির কোন্ দিকে গ্রামটি?

পশ্চিম।

শুভ।—ব'লে খস্ খস্ ক'রে দীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম মুসাবিদা ক'রে ফেললে পল্লব। তারপর পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে নোটসমেত কাগজটি ভদ্রলোকের হাতে দিলে।

কাগজ ও টাকা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমার ভাইকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি দেউলটিতে। আপনারা একটু বসুন। এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আমি পল্লবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি টেলিগ্রাম করলে ইন্‌স্ট্রাক্টারকে?

এঞ্জিনিয়ারকে কাল সকালেই চ'লে আসতে এখানে।

প্লেনটি এখান থেকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে?

নিশ্চয়ই।

একটু ইতস্তত ক'রে আমি বললাম, তা হ'লে, তোমার ইন্‌স্ট্রাক্টার আসার পর কাল সকালে কোনও ট্রেন ধ'রে আমি বরং চ'লে যাই। থেকে আমি আর তোমাদের কি উপকার করব?

সে তোমার খুশি।—পল্লবের কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য। মনে মনে কিঞ্চিৎ আহত বোধ করি।

মহেশবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তক্তপোশের এক কোণে ব'সে প'ড়ে বললেন, পাঠিয়ে দিলুম আমার ভাইকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। খুব পাকা ছেলে। বয়স মাত্র কুড়ি, কিন্তু এরই মধ্যে আমার বিজ্‌নেসে আমার সাকরেদি শুরু করেছে। আমার বিজ্‌নেস মানে—

মহেশবাবুর প্রবহমান কথার স্রোত হঠাৎ আটকে যায়। তাঁর মুখে চোখে একটা দ্বিধাজড়িত সঙ্কোচের ভাব ফুটে উঠল। চক্ষু নামিয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে আবার তিনি শুরু করলেন, আমার বিজ্‌নেস মানে ডাক্তারি নয়। বাইরে নেমপ্লেটে দেখেছেন বোধ হয় যে, আমি কাঠের ব্যবসাদার। এ অঞ্চলে ডাক্তারি ক'রে লাভ নেই। একেবারে হতচ্ছাড়া জায়গা। ম্যালেরিয়া খুব কম। আমাশা-টামাশা হয় না বিশেষ। গত কয়েক বছরের মধ্যে কলেরা আদৌ হয় নি। গত বছর বসন্ত হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু সরকারী হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্টের জ্বালায় একটি রুগীও বাগাতে পারি নি। তাই ডাক্তারি ছেড়ে কাঠের ব্যবসা ধরেছি।

পল্লব বললে, বেশ করেছেন, দুইই চালান একসঙ্গে।

হেঁ-হেঁ, তা যা বলেছেন। যাক গে সে সব কথা। এখন যে মাঠে আপনারা নেমেছেন তার কথা না হয় বলি আপনাদের। ওই মাঠটি আমার ঠাকুরদা তার আমলের জমিদার গোবিন্দ রায়ের কাছ

থেকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছিলেন। লেখাপড়া কিছু হয় নি তখন। আমার বাবা ছিলেন পাকা বিষয়ী। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তিনি গোবিন্দ রায়ের ছেলে ইন্দ্র রায়কে ব'লে একটি দলিল তৈরী করিয়েছিলেন। সেই দলিল—

ব'লে মহেশবাবু একটি আলমারির দরজা খুলে এক তাড়া কাগজপত্র বের করলেন। তাঁর ভেতর থেকে একটি ভুলট কাগজের পাকানো মোড়ক বের ক'রে আনলেন। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে ভদ্রলোকের মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

এই দেখুন।—ব'লে মহেশবাবু কাগজটি আমাদের চোখের সামনে মেলে ধ'রে বললেন, রীতিমত লেখাপড়া করা হয়েছিল। তলায় দেখুন স্পষ্ট অক্ষরে ইন্দ্র রায়ের সই।

আমার দিকে চোখ ঠেরে ঈষৎ মুচকি হেসে পল্লব মহেশবাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, ওই মাঠটা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বুঝি? বড় পবিত্র জায়গায় নেমেছি তা হ'লে! সে যাই হোক, আমাদের বড় সৌভাগ্য যে আপনি জমিটিতে চাষ ক'রে ধান বোনেন নি। চারদিকে খালি ধানের ক্ষেত আর ডোবা, এক টুকরো ফাঁকা মাঠ কোথাও নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ওই মাঠের কাছে আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঋণী। প্রকারান্তরে আপনার কাছেই ঋণী হয়ে আছি।

ভদ্রলোক একেবারে কৃতার্থ। বিগলিত স্বরে বললেন, হেঁ-হেঁ, ও কি বলছেন? জমি আমার বটে—কোন শালার স্বত্ব ওতে নেই। তাই ব'লে—হেঁ হেঁ—কি যে বলেন!

এমন সময় বাইরের দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। মহেশবাবু কর্কশ কণ্ঠে হাঁক দিলেন, কে?

মোটা ভারী গলায় উত্তর এল আমি, আমি নরেশ নাগ।

হিংস্র দৃষ্টিতে রুদ্ধ দরজার দিকে চেয়ে মহেশবাবু বললেন, কেন? কি চাই?

কি চাই পরে বলছি, দরজা খোল আগে।

মুখ বিকৃত ক'রে বহিরাগত কণ্ঠস্বরের অনুকরণ ক'রে মহেশবাবু বললেন, পরে বলছি। এ আমার বাড়ি, এ তোর বাবার বাড়ি নয়। আগে বল্‌ কি চাই, তবে খুলব।

তবে রে শালা!—সঙ্গে সঙ্গে দরজাটির ওপর প্রচণ্ড একটি লাথি এসে পড়ল।

আমি সভয়ে বললাম, দরজা খুলে দিন না মহেশবাবু। ভদ্রলোক কি চান দেখুন!

মহেশবাবুও একটু ভয় পেয়েছেন মনে হ'ল। তিনি বিনা প্রতিবাদে উঠে গিয়ে দরজাটি খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন বেঁটে মোটা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পেছনে চারজন ষণ্ডামার্কা লোক।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনকে উদ্দেশ ক'রে বিনীতকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, এইমাত্র আমার মাঠে আপনাদের হাওয়াই জাহাজটি দেখে এলুম। বাড়ি ফেরবার পথে গাঁয়ের লোকেদের কাছে শুনলুম যে, দুজন বাঙালী ভদ্রলোক ওই হাওয়াই জাহাজে ক'রে ওখানে নেমে মহেশ ডাক্তারের বাড়ি এয়েছেন। আপনারাই বোধ হয়—

পল্লব জবাব দিলে, আজ্ঞে, আমরাই ওই প্লেনে ক'রে ওখানে নেমেছি—মানে, প্লেনটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওখানে নামতে বাধ্য হয়েছি।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ করেছেন, কিন্তু আপনারা মহেশের এখানে এয়েছেন কেন? যে জমিতে আপনারা নেমেছেন সে আমার, মহেশ চক্রবর্তীর নয়। অতএব আপনারা আইনত আমার অতিথি।

মহেশবাবু গর্জন ক'রে উঠলেন, তবে রে শালা! জমি তোর! হাকিমের রায় কি বেরিয়ে গেছে যে, জমি তোর বলছিস?

হাকিম যে আমার পক্ষে রায় দেবেন—এ তো জানা কথা রে হারামজাদা। রায় বেরুলেই জানতে পারবি।

হাকিম কি তোর ভায়রাভাই হয় নাকি রে শালা! ইন্দ্র রায়ের সই-করা এই দলিল—

রেখে দে তোর দলিল। তোর ইন্দ্র রায় চুলোয় যা'ক। হতচ্ছাড়া মাতালের হুঁশ ছিল না যে, ওর প্রায় সব জমি ওর বাপের আমলেই আমাদের কাছে বাঁধা প'ড়ে গেছে।

মিথ্যে কথা। অন্তত ঐ জমিটা বাঁধা ছিল না।

খুব তো জানিস রে হারামজাদা!—মুখ ভেঙচে নরেশ নাগ বললেন, গোবিন্দ রায়ের সই-করা বন্ধকী তমসুক রয়েছে আমার কাছে।

জাল, সব জাল।—উত্তেজনায় মহেশবাবুর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। বলেন, আদালতে আমি প্রমাণ ক'রে দেব তোর জালিয়াতি।

তাঁর তর্জন-গর্জনে কর্ণপাত না ক'রে নরেশ নাগ আমাদের বললেন, বাবু মশাইরা, এবারে আপনাদের উঠতে হয়। আমার মাঠে নেমেছেন যখন, আমার ওখানেই রাতটা আপনাদের কাটাতে হবে।

মহেশবাবুর উত্তেজনা চরমে উঠল। বললেন, কক্ষনো না, জমি আমার, কাজেই ওঁরা আমার অতিথি।

চুপ কর্ হারামজাদা।—নরেশ নাগ বাঘের মত গর্জন ক'রে ব'লে উঠলেন, আর একটা কথা বলেছিস তো তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব। নিন বাবু মশাইরা, উঠুন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আমি ও পল্লব পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম। আমি নিম্নস্বরে পল্লবকে বললাম, এ কি গেরো রে বাবা!

পল্লব নরেশবাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, দেখুন, এ পর্যন্ত যখন স্থির হয় নি জমির স্বত্ব কার, আমরা বরং আজ রাত্রিটা মহেশবাবুর এখানে কাটিয়ে যাই। কাল সকালে আপনার ওখানে যাব। অন্তত কাল দুপুর পর্যন্ত আমরা এ গাঁয়ে আছি।

তপ্ত কটাহে যেন ফুটন্ত তেল এসে পড়ল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পল্লবের মুখের পানে চেয়ে নরেশ নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তা হ'লে আপনি বলতে চান—এই জমির অর্ধেক স্বত্ব ওই হারামজাদার? কভি নেই। পুরো জমিটা আমার। আপনাদের আমার ওখানে যেতেই হবে এক্ষুনি। নইলে এখানকার লোকে ভাববে, জমিটা বুঝি এই মহেশ শালার।

মহেশবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন, আমি যেতে দেব না, জমি আমার, পুরোটাই আমার—ওঁরা যতদিন এখানে আছেন, আমার এখানেই থাকবেন।

তবে রে হারামজাদা!—ঘুষি পাকিয়ে নরেশ নাগ মহেশবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ষণ্ডামার্কা সঙ্গী চারজনও মহেশবাবুকে ঘিরে দাঁড়াল।

পল্লব তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে মহেশবাবু ও নরেশবাবুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। নরেশবাবু তাঁর উদ্যত ঘুষি নামিয়ে ফেলে হাঁপাতে লাগলেন। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। ওদিকে মহেশবাবুর মুখ ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

পল্লব নরেশবাবুর দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, আপনার ওখানে যাওয়া বা না-যাওয়া আমাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। আপনি কি ভেবেছেন যে, জোর ক'রে আপনি আমাদের নিয়ে যাবেন? তা ছাড়া, ওই মাঠটাতে আসলে আমরা নামি নি। আমাদের প্লেন প্রথমে ওই মাঠের পাশের সদ্য-লাঙল-দেওয়া জমিটিতে নেমেছিল। পরে আমি প্লেন ওই মাঠের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে এসেছি। ওই জমিটাতে নেমেছি, কাজেই ও-জমি যাঁর তাঁর বাড়িতে আমি যাব। বলুন, ও জমি কার?

নিমেষে মহেশবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি সোল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠেন, ও জমি আমার—সে ও-ও স্বীকার করবে।

নরেশবাবুর মুখ ততক্ষণে এতটুকু। তাঁর কালো মুখ আরও কালো হয়ে উঠল।

পল্লব বললে, কি নরেশবাবু, জমিটা মহেশবাবুর তো?

গম্ভীরমুখে নরেশবাবু জবাব দিলেন, হুঁ।

তা হ'লে মহেশবাবুর এখানে থাকছি আমরা?

যেমন আপনাদের অভিরুচি।—ব'লে নরেশবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিরসবদনে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

সংবাদ-সাহিত্য

পশ্চিম-বাংলার সীমানাবৃদ্ধি লইয়া বিহার আইনসভায় যে ঝড় বহিয়া গেল তাহা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। ভিত্তিহীন কথা ও যুক্তিহীন তর্কের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু এই উপলক্ষে মগধ রাজত্বের কথা, পাটলিপুত্র হইতে বাংলা দেশ শাসিত হইত ইত্যাদি কথার মধ্যে যে মনোভঙ্গির আভাস পাইতেছি, তাহাতেই বিশেষ শঙ্কা অনুভব করিতেছি। মুসলমান আধিপত্য ও মুসলমান সংস্কৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই বাঙালীরা বাংলা বিভাগ করাইয়াছে—এইরূপ গুরুতর মিথ্যা কথাও উচ্চারিত হইয়াছে। বস্তুত পাকিস্তান বা ভারত বিভাগের কথা না উঠিলে কোনও দিনই বাংলা-বিভাগের দাবি উঠিত না। অবিভক্ত ভারত থাকিলে বাংলাও অবিভক্ত থাকিত এবং সেখানে সংখ্যাধিক্যের জোরে মুসলমান-আধিপত্যও থাকিত। কিন্তু ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া বাংলা পাকিস্তানে যাইতে চাহে নাই, যতটুকু পারে ভারতবর্ষের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে—ইহাই যদি বাঙালীর অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে সে অপরাধ স্বীকার করিতেছি। এখন দেখিতেছি, কিছু লোকের কাছে তাহাই চক্ষুশূল হইয়াছে। যেমন করিয়া শ্রীহট্টকে ভারতভূমি হইতে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে তেমনই করিয়া গোটা বাংলা দেশটাকেই যদি ভারতবর্ষ হইতে বিসর্জন দেওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দী-সাম্রাজ্যের নিষ্কণ্টক প্রসারের পথে আর কোনই বাধা থাকিত না। সেই জন্যই এই গাত্রদাহ। কিন্তু বাংলায় হিন্দী বিদ্যালয় স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, সরকারী সাহায্যও মিলিতেছে। অথচ বিহারে বাঙালী ছাত্রপ্রধান বিদ্যালয়ে বাংলার প্রতি এ কৃপাদৃষ্টি সেখানকার সরকারের নাই, এবং এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাষ্ট্রদ্রোহেরই নামান্তর। যাঁহারা মুসলমান-সংস্কৃতি হইতে বাঙালীর মুক্তিলাভের চেষ্টার অপবাদ দেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মুসলমান-সংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এমন কি আজও সে কথা সত্য। এই রকম মিথ্যার ভিত্তিতে শাসকের মনোভাব লইয়া

শাসন করার চেষ্টার ফল যে কি তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাসের মূল এইরূপ মনোভঙ্গির মধ্যেই নিহিত আছে। এই রকম মনোভাবের ফলে যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছে সেই রন্ধ্রপথে বহিঃশত্রু প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে সম্মিলিত-ভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। ভারতের নেতৃবৃন্দ এখন হইতেই সাবধান হইয়া এইরূপ শাসকগন্ধী মনোভাব সংযত না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। সেই জন্য পণ্ডিত নেহরু যে ভাষাভিত্তিক কমিশনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না, কেননা সে কমিশন পশ্চিম-বাংলার দাবির কথা আদৌ বিবেচনা করিতে পারিবেন কি না সে বিষয়েই কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্তৃপক্ষের আশু কর্তব্য।

• • •

পক্ষান্তরে এদিকেও একটা কথা বলিবার আছে। পশ্চিম-বঙ্গের দাবি অত্যন্ত ন্যায্য দাবি; তাহা উপেক্ষিত হইতে দেখিলে ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক, আমরাও সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটা কথা বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। স্বাধীনতার মূল্য আমরা প্রকৃতভাবে জানি না। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে কতখানি আন্দোলন করিতে হয় এবং কোন্‌খানে থামিতে হয়—এই মাত্রাজ্ঞান আমাদের হয় নাই। দল বা পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আন্দোলন করিতে করিতে আমরা কোন্ সীমারেখা ছাড়াইয়া গেলে সকল দলের উপরে দেশের যে বৃহৎ স্বার্থ বিরাজমান সেই বৃহৎ স্বার্থে আঘাত লাগিবে, সে বিষয়ে চিন্তা করি না। সিরাজ-উদ্দৌলাকে তাড়াইতে আমরা এতই ব্যস্ত হইয়াছিলাম যে, তাহার জন্য ইংরেজকে ডাকিয়া আনিতে আমাদের কুণ্ঠাবোধ হয় নাই। এই সাংঘাতিক অভ্যাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে। নিজের নাক কাটিয়া দিয়া তাহার বদলে একখানা নিজের গলা

কাটিবার অস্ত্র পাইয়াও মনের আনন্দে টাকডুমাডুম্ বাজনা বাজাইবার অভ্যাস আমাদের এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। সেই জন্য কংগ্রেস-সরকারের গাফিলতি ও গড়িমসির সুযোগ লইয়া যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হইতেছে, সেই বিক্ষোভের সুবিধা লইয়া কি ঘটিতে পারে বা কি ঘটানো যাইতে পারে তাহার সূচনা শ্রীরামলুর মৃত্যুর পর যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হইয়াছিল তাহাতেই দেখিতে পাইয়াছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করিতে গিয়া সকল দলের উপর দেশের যে বৃহৎ স্বার্থ বিরাজমান, সেই স্বার্থে আঘাত করিলে দেশই বিপন্ন হইবে। স্বাধীনতা-লাভের পর এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে, কেননা শুধু যে আমাদের মাত্রাজ্ঞান এখনও হয় নাই তাহাই নহে, এই সব সুযোগ লইয়া দেশের স্বার্থে আঘাত হানিতে প্ররোচিত করিবার মত দলের অভাবও ভারতবর্ষে নাই—এ কথা দুঃখের সহিত হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে। ১৭৫৭ সনে বাঙালী দক্ষিণ দিকের দরজা খুলিয়া দিয়া ইংরেজকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। আজ দুই শত বৎসর পরে ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া অন্য কোনও দিকের দরজা খুলিয়া দিয়া আমরা অন্য কাহাকেও আবার ডাকিয়া না বসি, সে বিষয়ে বাঙালী ও ভারতবাসীর সাবধান হওয়া কর্তব্য। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সাহস করিয়া বাঙালীর এই ন্যায্য দাবি মিটাইয়া দিলেই সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

—

জগৎ পরিবর্তনশীল। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা—শাক্ত বাঙালী এককালে খুব ধুমধামের সহিত করিত। পরে একদিকে রামমোহন ও অন্যদিকে রামকৃষ্ণপূজা পূর্বের পূজাগুলিকে অনেকখানি দুর্বল ও নিষ্প্রভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ-মিশন-বহির্ভূত আনন্দ-মহারাজ-দিগের পূজাও উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিয়াছে। পরে শ্রীঅরবিন্দ আসিয়াছেন। এইগুলি সমাজের কিঞ্চিৎ গভীর স্তরের ব্যাপার, অভিভাবকশ্রেণীর গৃহস্থদের আধ্যাত্মিক পরমার্থলাভের প্রয়াস। লঘু

ব্যবস্থাও আছে। অগভীর স্তরে তরুণেরা পূজার নামে যাত্রা-থিয়েটার আসর-মজলিস লাউডস্পীকার-শোভাযাত্রা মাইফেল-পিকনিক প্রভৃতি আনন্দোল্লাস করিয়া থাকেন। আগে বিশ্বকর্মা ও কার্তিকপূজা ছিল। সরস্বতীপূজা সেই স্থান অধিকার করিল। এখন রবীন্দ্র-পূজা সরস্বতী-পূজাকে হটাইবার তালে আছে। কবি টেনিসনের কথায়, নূতনকে স্থান দিয়া পুরাতন ব্যবস্থা বিদায় লাভ করে, ঈশ্বর আপনাকে নানা ভাবে সার্থক করেন। ভালও পচে এবং পচায়। তিনি পরিবর্তনের দ্বারা এই পচন নিবারণ করেন।

যাহা হউক, বুঝা যাইতেছে, সমাজের কল্যাণের জন্যই রবীন্দ্র-পূজা সরস্বতী-পূজাকে স্থানচ্যুত করিতে চলিয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, এই ব্যাপক পূজার মধ্যে অশ্রদ্ধার আমেজ পাইয়া কেহ কেহ চটিয়াছেন। একজন বলিতেছেন :

"রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরাই সব চাইতে বেশি অপমানিত করছি। তা-ই স্বাভাবিক। জোরালো অপমান আত্মীয় ছাড়া যেমন আর কেউ বেশি করতে পারে না তেমি জাতীয় মাহাত্ম্যকেও ধুলোকাদা না মাখিয়ে দিতে পারলে অপমানিত জাতির সত্তা আত্যন্তিক আনন্দ লাভ করে না।"

আমরা এতখানি মনে করি না। দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয়ের যদি অপমান না হইয়া থাকে, বাগ্দেবী বীণাপাণি বাণী যদি এত দিনেও ধুলাকাদায় কলঙ্কিত না হইয়া থাকেন, বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ আশঙ্কা নাই। একটু গান, একটু নাচ, একটু কথকতা, একটু অভিনয়, কিঞ্চিৎ দাদূ, কিঞ্চিৎ উপনিষদ্ যদি আমরা এতকাল বরদাস্ত করিয়া থাকি, লাউড-স্পীকার এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্যের বিশ্লেষণও আমাদের সহিবে। আমাদের ভরসা এই, রবীন্দ্র-পূজাকেও একদিন রবীন্দ্রেতর পূজার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে।

• • •

কিন্তু এত শীঘ্র? এখনও যে এক যুগ পার হয় নাই! এইখানেই আমাদের দুঃখ। এবারেই দেখিলাম, কোথাও কোথাও ব্র্যাকেটে রবীন্দ্র-

পূজা হইয়াছে। এক স্থলে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে ও অন্য এক স্থলে কাজী নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জোয়ালে জুতিয়া স্মরণ-গরুরগাড়ি হাঁক'নো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো পার্টনারশিপে খুশিই হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের বড় ব্যথা বাজিয়াছে। দ্বিচক্রযানের সমান চাকা দেখিতেই আমরা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত। আমরা জানি, অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী এই পঞ্চ কন্যাও প্রাতঃস্মরণীয়া; কিন্তু রসিক ভক্তেরা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী সতী অরুন্ধতীর সঙ্গে ইঁহাদের একত্র স্মরণ করেন না। জাত আলাদা যে! বুঝিতে পারিতেছি, রসের কুঞ্জে অধুনা যাঁহারা চাষ দিতেছেন তাঁহারা সাম্যের পক্ষপাতী, ইঁহাদের মার্জিত চক্ষে "কোনও ভেদাভেদ নাই।" কিন্তু আমাদের পুরাতন চক্ষু ইহাতেই টাটাইতে থাকে এবং জলে ভরিয়া যায়। আসলে আমাদেরই দোষ।

—

সারা গাঁয়ে যদি একটিমাত্র দা'ঠাকুর থাকেন, তাঁহার অনেক ফ্যাসাদ। গাঙ্গুলীপাড়ায় সাড়ে বাহান্ন হাত খুঁড়িয়াও ইঁদারায় জল বাহির হয় নাই, ডাক্ দা'ঠাকুরকে; উদরী হইয়া বুঁচির মার এখন-তখন অবস্থা, ডাক্ দা'ঠাকুরকে; হারান কলুর বুধি গাইকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, ডাক্ দা'ঠাকুরকে; সিধুর বাম অঙ্গে টিকটিকি পড়িয়াছে, ডাক্ দা'ঠাকুরকে। তাঁহার ছোটাছুটি-হয়রানির অন্ত নাই। গাঁ কলিকাতায় আমাদের দা'ঠাকুরের সমান দুরবস্থা। কবে কাহারা কাব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছু সদুত্তর পাইয়াছিল, এখন তাহারই জের টানিতে টানিতে তাঁহার প্রাণান্ত হইতেছে। বাউণ্ডারি কমিশন, অ্যাডাল্ট এডুকেশন, টারমিনোলজি, রবীন্দ্র-পুরস্কার—সকল ব্যাপারেই তাঁহাকে লইয়া টানাটানি চলিয়াছে। সেদিন দেখিলাম, নাটোরের বস্তিপাড়ার পলাতকা বনলতা সেনের উদ্ধারকার্যেও তাঁহাকে ধাওয়া করিতে হইয়াছে। আমাদের অসহায়তা ও তাঁহার মুহুর্মুহু বিপদ—দুই কারণেই দুঃখ হয়।

ভাষার শুচিতা লইয়া কথা বলিলে এ-যুগে প্রাচীনপন্থী-প্রতিক্রিয়াশীল-অপবাদদুষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। আমাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতেছেন স্বয়ং 'চলন্তিকা'-চালক পরমবৃদ্ধ শ্রীরাজশেখর বসু। যাহা বীরবল-প্রমথ চৌধুরী পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ পারেন নাই, আধুনিক লেখকেরা সমবেতভাবে পারেন নাই—রাজশেখর বসু মহাশয় তাহা কেমন করিয়া পারিবেন, বাংলাভাষা-রাজত্বে তাহা মেকিয়াভেলি-নীতির সাফল্যের একটি চরম দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি সাময়িক-পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধে কৌশলে এই কথাটাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, তথাকথিত চল্‌তি ভাষাই ভবিষ্যৎ বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র ভাষা হইবে। তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করি :

"সাধুভাষা ক্রমশ অচল হয়ে আসছে, ভবিষ্যতে কেবল চলিত ভাষাতেই বাংলা সাহিত্যের সকল প্রয়োজন মিটবে।…সাধুভাষায় সাহিত্য-রচনা একদিন বন্ধ হবে, খবরের কাগজও চলিত ভাষায় লেখা হবে, কিন্তু গত দেড়শ বৎসরে সাধুভাষায় যে বিশাল বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার একটা বড় অংশ চিরায়ত বা ক্লাসিক হয়ে থাকবে। এই কারণে সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে গেলেও তার চর্চা লোপ পাবে না।"

অর্থাৎ, লোকে আজ যেমন লাটিন গ্রীক সংস্কৃত শেখে, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে পড়িবার জন্য ভবিষ্যতের বাঙালী তেমনই সাধু বাংলা শিখিবে। আমাদের সুচিন্তিত বিশ্বাস, এই মত ভ্রান্ত এবং বাংলা-সাধুভাষা কোনদিনই তাকে-তোলা হইয়া থাকিবে না। রাজশেখরবাবুর আর একটি ভ্রান্ত মত এই যে, "চলিত ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা নয়, সাধুভাষারই কালক্রমিক সংস্করণ।" বাংলা-ভাষার বিশেষত্ব এই যে, চল্‌তি রীতি ও সাধু রীতি বরাবরই চলিয়া আসিতেছে, প্রাচীনতম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হইতে আধুনিকতম রাজশেখর বসু পর্যন্ত সকলেই দুই রীতিরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কাব্যে তো 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বা চর্যাপদগুলি হইতেই চল্‌তি ঢঙ চল আছে এবং বাংলা-ভাষার শেষ দিন পর্যন্ত চল্‌তি সাধু দুই ঢঙই চালু থাকিবে।

বসু মহাশয় যদি কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন, দুই রীতির সমান প্রয়োগ ছাড়া বাংলা কবিতা হয় না, আমাদিগকে চিরকালই

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান"

লিখিতেই হইবে, লিখিতে হইবে—

"এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধন-মান।"

কাব্যে এই গুরুচণ্ডালী সংমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথকে প্রমথ চৌধুরীর সহিত গলাগলির পরও বজায় রাখিতে হইয়াছে। সুতরাং বাংলা-ভাষা যতই অসাধু হউক, কবিতার ছন্দমিলের জন্য সাধুর সেবা চিরদিনই করিতে হইবে। গদ্যেও ভাল হিউমার সৃষ্টি করিতে হইলে সাধুরীতি ছাড়া উপায় নাই, 'ব্যঙ্গকৌতুক' চলতি ভাষায় লেখা যায় না। রাজশেখরবাবুর পৌনঃপুনিক প্রচারসত্ত্বেও সাধুভাষা একদিন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা ত্যাগ করিলেও সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান ও বাহন হইয়া চিরদিনই থাকিবে।

* * *

ভাষার শুচিতা লইয়া প্রসঙ্গ শুরু করিয়াছিলাম। গায়ের জোরে ভাষাকে যাবনীমিশাল করিবার চেষ্টা সুফলপ্রদ হয় নাই, স্বভাবত যে সকল শব্দ আসিয়াছে তাহারা তো ভাষার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, বাংলা-কবিতায় বেমক্কা গাজুরী "খুনে"র আধিক্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথেরও খুন চাপিয়াছিল। ইদানীং দুই-একজন সক্ষম বাঙালী লেখক ভাষায় কতদূর চ্যাংড়ামি ও বাঁদরামি চলে তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারাও বসু মহাশয়ের মুক্তকচ্ছ প্রশংসা পাইতেছেন। এই কারণেই আমরা ভয় পাইয়াছি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়কে বাদ দিলে ভাষার দিক দিয়া বাংলা-সাহিত্যের মুরুব্বি বলিতে এখন তিনি। "রুচি-সংসদে"র লেখক যদি হঠাৎ রাশ আলগা করিয়া রুচিসংসদী ভাষার তারিফ শুরু করেন, তাহা হইলেই বিপদ।

বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনও পর্যন্ত কয়েকটি মানুষের হৃদয়ঘটিত মামলাই আমাদের প্রধান উপজীব্য ছিল, অবশ্য পরিবেশ বাংলা দেশের সজলস্নিগ্ধ গ্রাম হইতে রাজপুতানার দগ্ধ মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ তক ধাওয়া করিয়াছেন। ওপারেও কেহ কেহ পাড়ি দিয়াছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু সেই সনাতন—দ্বিভুজ, ত্রিভুজ অথবা চতুর্ভুজের মানসাঙ্ক। সম্প্রতি কয়েকজন শক্তিশালী বাঙালী লেখক বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তারাশঙ্কর, বনফুল, মানিক, সুবোধ (ঘোষ), সতীনাথের নাম বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। বনফুল 'স্থাবরে' প্রাক্‌মানবীয় সভ্যতার পটভূমিতে সমগ্র আদিম মনুষ্যসমাজকে লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে তারাশঙ্কর বাংলা দেশের দুটি বিচিত্র জাতিকে সমগ্রভাবে কাহিনীর বিষয়বস্তু করিয়াছেন, 'ঢোঁড়াই-চরিত-মানসে' সতীনাথ উত্তর-বিহারের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ধরন-ধারণ একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গ্রথিত করিয়াছেন। সুবোধ ঘোষের দুই-একটি নামকরা কাহিনী রাজনৈতিক দলাদলিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি'দের জীবনযাত্রা মানিককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বিষয়বস্তুর এই প্রসার ও বিস্তার সাহিত্যের পক্ষে শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতন' পড়িলাম, বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া বোধ হইল। বনফুল 'তৃণখণ্ড' 'বৈতরণী-তীরে' 'নির্মোক' এবং "টাইফয়েড" নামক বড় গল্পে রোগী ও চিকিৎসকের বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন রোগীর মত চিকিৎসকেরাও সমান অসহায়, তাঁহারাও মানুষ। তাঁহার রচনায় প্রশ্ন আছে, কিন্তু আশ্বাস নাই। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতনে'র নায়ক পুরাতনপন্থী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, নাড়ীজ্ঞানই তাঁহার প্রধান

অবলম্বন; কিন্তু তাঁহার নাড়ীজ্ঞানই আমাদিগকে দিব্যজ্ঞানের সন্ধান দিয়াছে। তারাশঙ্কর নিজে 'বনফুলে'র মত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নন, কিন্তু তিনি যে মানুষটিকে নায়ক হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাঁহাকে অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতির জোরে পাঠ্যপুস্তকের মত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই উপন্যাসের নায়ক হইতেছে গোড়ার দিকে রোগসঙ্কুল মানুষের দেহ, এই দেহই শেষ পর্যন্ত দেহাতীতকে স্পর্শ করিয়াছে, আমাদের মনে আনিয়া দিয়াছে পরম আশ্বাস। এই পুস্তকে তথাকথিত ঔপন্যাসিক-প্রেম শুরুতেই শেষ হইয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে চিরন্তন মানবীয় প্রেম। জীবন ডাক্তার অনেক মানুষকে দেখিয়াছেন। তাঁহার দেখা রামহরিকে আমরা দেখিলাম। প্রথম জীবনে সে ছিল ছিঁচকে চোর। পরে হইয়াছিল পাকা ধান-চোর। বার দুয়েক জেল খাটিয়া কপালে ফোঁটা তিলক ও গলায় কণ্ঠি ধারণ করিল। বাহিরে গৃহস্থ-বাড়িতে তরিতরকারির সরবরাহের ব্যবসায়, কিন্তু আসলে মদ চোলাই ও বোতলে ভরিয়া তরকারির ঝুড়িতে সাজাইয়া বিক্রির কারবার।

"বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার আপনার মনে রামহরির কথা ভাবছিলেন। এমনটা কি ক'রে হ'ল? কেমন ক'রে হয়? জ্ঞানগঙ্গা যেতে চায় রামহরি? বিনা ভাবনায় বিনা কামনায় বৈরাগ্য-যোগ—মুক্তি-পিপাসা কি জাগে? আমি মরব এই কথা ভেবে প্রসন্ন মনে সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে অভিসারে চলার মত চলতে পারে? দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যুবতী বধূর স্বামীসন্দর্শনে যাওয়ার কালে বাপের ঘরের উঠানে পাতা খেলাঘর ফেলে যাওয়ার মত যেতে পারে?"

পারে। সেই খবরটাই 'আরোগ্য-নিকেতনে' আছে। আর আছে এই খবর যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু সীমাহীন, তাহার শেষ নাই। কলমের মুন্সিয়ানার সঙ্গে হৃদয়ের প্রেম মিশিলে সাধারণ বস্তুই অনির্বচনীয় হইয়া উঠিতে পারে। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

ব্রজেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার কৃত "সাহিত্য-সাধক-

চরিতমালা"র শেষ দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ৯৩নং 'ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' ও ৯৪নং 'প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী'—দুইখানি গ্রন্থের উপকরণ সাবধানে ও সযত্নে সংগৃহীত, রচনার নিদর্শনগুলিও সুনির্বাচিত। 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, সুবৃহৎ, ডবলক্রাউন সাইজের ৬৩১ পৃষ্ঠা, বলেন্দ্রনাথের একটি চিত্র-সম্বলিত। বলেন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি বাংলা-ভাষায় বিচিত্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় সার্থক সমষ্টি, প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের কৃত। বলেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানে'র বিবিধ রূপ ও বিন্যাস আমরা দেখিয়াছি। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইহার প্রথম খণ্ডিত প্রকাশ। ঠিক কুড়ি বছর পরে একসঙ্গে ইহার পরিপূর্ণ প্রকাশ; স্বরলিপিপঞ্জী, সংযোজন ও সংশোধন, বিষয়সূচী, প্রথম ছত্রের সূচী এবং গ্রন্থশেষে বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয় ও অনেকগুলি চিত্রসন্নিবিষ্ট করিয়া ইহাকে পরিপূর্ণতর করা হইয়াছে। উপহার দিবার এমন চমৎকার গ্রন্থ সারা পৃথিবী ঢুঁড়িলেও মিলিবে না। খণ্ডের অনেক অসুবিধা ছিল, অখণ্ড শুধু দৃশ্যত নয়—কার্যতও নির্দোষ হইয়াছে। 'স্বরবিতান'ও স্থাণু হইয়া নাই—২৫, ২৬, ২৭, ২৮ খণ্ড পর্যন্ত বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর যাহারা শুনিতে পাইবে না, তাহারা এই সকল স্বরলিপির সাহায্যে তাঁহার গানের সুরকে নিখুঁতভাবে ধরিতে পারিবে। তাহাও কম লাভ নয়। ২৫, ২৬, ২৭ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি স্থান পাইয়াছে, ২৮ খণ্ডে 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জন' ও 'বশীকরণে'র গান।

'Bethune School and College Centenary Volume 1849-1949' পুস্তকের প্রধান অংশ বেথুন স্কুল ও কলেজের ইতিহাস রচনায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল যে অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সম্প্রতি-প্রকাশিত তাঁহার 'History of the Indian

Association 1876-1951' নামক সুবৃহৎ পুস্তকে বিষয়ান্তরে তাঁহার সমান কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায়গুলি উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া যোগেশবাবু ভবিষ্যৎ বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। যাঁহারা আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস জানিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে অনিবার্যভাবে যোগেশবাবুর এই বই দুইখানির সাহায্য লইতে হইবে।

তামিল হইতে শ্রী পি. শেষাদ্রি কর্তৃক ভাষান্তরিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ' শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচায়ক। শুধু উপদেশগুলি আমরা অনেকবার পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু এই পুস্তকের সহজ সরল ব্যাখ্যানে সেগুলি যেরূপ মর্মস্পর্শী হইয়াছে, উপদেশগুলি শুধু পাঠে বা শ্রবণে তেমন হয় না। বইখানি সত্যসত্যই উপনিষৎ নামের উপযুক্ত। প্রকাশক উদ্বোধন কার্যালয়।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র সংস্করণটি গীতা-পাঠার্থীর নির্ভরশীল বন্ধু ও সহায়ের কাজ করিবে। এমন স্বল্পপরিসরে সুচিন্তিত প্রণালীতে অল্পসংস্কৃতজ্ঞানীর পক্ষে গীতা আয়ত্ত করিবার উপায় নির্ণয় ও প্রকাশ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহৎ কীর্তি রাখিয়া গেলেন। তাঁহার প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী গীতা অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সার্থক হইল। এই প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত গীতাখানির মূল্য—"গীতা পাঠে শ্রদ্ধা"। মাত্র ডাকখরচ বারো আনা দিলে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা ১৮, এলগিন রোড, কলিকাতা ২০—এই ঠিকানায় শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাইবেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'উপনিষদ্‌ জড় ও জীবতত্ত্ব' তাঁহার মৃত্যুর এতদিন পরেও যে প্রকাশিত হইল, এই জন্য আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট কৃতজ্ঞ। দত্ত মহাশয়ের সারা জীবনের অধীত বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এই আলোচনা-গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ইহা প্রকাশ

করিয়াছেন। হীরেন্দ্রনাথের বহুখ্যাত 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' পুস্তকখানিও দ্বিতীয় সংস্করণের পর দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল। কনকেন্দ্রনাথ (১৩৯ বি কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) সম্প্রতি সেটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া পিতৃকৃত্য করিয়াছেন। প্রকাশক তিনি স্বয়ং।

শ্রীঅরবিন্দ-পাঠমন্দির (১৫ কলেজ স্কোয়ার) ত্রয়োদশ বর্ষের 'বর্তিকা'র ১ম ও ২য় সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের "যোগসমন্বয়" ও "কেনোপনিষদ" ও অনির্বাণ-কৃত 'দিব্যজীবনে'র অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। ২য় সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের "ঋগ্বেদ" ও "সাবিত্রী"র কাব্যানুবাদ আছে।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী) নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য একটি অভিধান। নানা দৃষ্টান্ত দিয়া সুষ্ঠু প্রয়োগ-প্রদর্শন তন্মধ্যে একটি। বাংলা দেশে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত বহু শব্দ আমরা প্রচলিত অভিধানগুলিতে পাই না অথচ বাঙালীর ঘরে দীর্ঘকাল ব্যবহারের দ্বারা সেগুলি মূলত বৈদেশিক শব্দ হইলেও আজ তাহাদের বাংলা হইয়া যাওয়ার কথা। তাঁহার 'শব্দ-কোষে' স্থান দিয়া ওদুদ সাহেব এতদিনে তাহাদিগকে জাতে তুলিলেন। সাহিত্যিকদের ব্যবহারের পক্ষে 'শব্দকোষ'খানি যে কাজের হইয়াছে আমরা তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি।

এ. টি. দেবের 'Student's Favourite Dictionary Eng. to Beng.'-এর সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ আর একখানি কাজের বই। ইংরেজীর দরবারী মেয়াদ এখনও দশ বৎসর; সুতরাং আরও দশ বৎসর 'Favourite' ফেভারিট ও চালু থাকুক—ইহাই কামনা করি।

'আর্ট ও আহিতাগ্নি'র মত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স) হইয়াছে, ইহা সুখবর। স্বর্গীয় যামিনীকান্ত সেন মহাশয় শিল্পকলা বিষয়ে দীর্ঘকাল বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করিয়াছিলেন। বিষয় কঠিন এবং বাংলা ভাষায় নূতন সুষ্ঠু পরিভাষাও সর্বত্র গড়িয়া উঠে

নাই, তাই সেন মহাশয়ের আলোচনা সর্বত্র প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য হয় নাই। তথাপি 'আর্ট ও আহিতাগ্নি'ই এই দুরূহ বিষয়ে একমাত্র ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। বইটির বহুলপ্রচার হইলে বিষয়টিও ধীরে ধীরে আয়ত্ত হইবে। ছাপাই, বাঁধাই ও ছবি সুন্দর।

ডাক্তার অমূল্যরতন চক্রবর্তী বেঙ্গল ইমিউনিটির খ্যাতনামা 'ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথের জীবন-কথা' লিখিয়া এক দিকে যেমন বন্ধুকৃত্য করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই ব্যবসায়ে সফলকাম দেশপ্রেমিক একনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত একজন বাঙালীর জীবন আদর্শস্বরূপ সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বইটি সুলিখিত এবং বন্ধুপ্রীতি ও সহৃদয়তার দ্বারা অভিষিক্ত বলিয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বইটিতে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল কমিটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিপুল বিচিত্র কলিকাতায় যদি অজানা হইয়া হারাইয়া যাইতে না চান এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেডের 'Calcutta Guide & Directory' এক খণ্ড অবশ্যই সংগ্রহ করুন, সব রাস্তার হদিস পাইবেন।

'উপনিষদের উক্তি' (শ্রীগুরু লাইব্রেরি) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহের দেশহিতব্রতের আর একটি নিদর্শন। গীতা, মহাভারত, ঋগ্বেদের মত উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলিও তিনি আমাদের মত স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিদের আয়ত্তের বিষয় করিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীকৃত সচিত্র 'যোগবলে রোগ-আরোগ্য' পুস্তকখানি এত উপকারী হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থের ইহা এক খণ্ড সংগ্রহ করা উচিত। আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি ও যৌগিক আসনের সাহায্যে যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসার নির্দেশ সহজ ভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

আদর্শ
লিভার টনিক
"কুমারেশ" লিভার
ও পেটের পীড়া নিশ্চিত-
রূপে আরোগ্য করে।
অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন,
খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতি-
রোধ প্রভৃতি লিভারের
দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা
করে।
ORCLI
QUMARESH
কুমারেশ
ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

শনিবারের চিঠি
আষাঢ় ১৩৬০ : দাম আট আনা
পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস
June-July : Price As. Eight

বাংলা পুস্তক বিক্রয়-ক্ষেত্রে আপনারা যে নূতন নীতির অবতারণা করিয়াছেন তজ্জন্য আপনারা বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।...প্রমথনাথ বিশী, ২৬এ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা ২৯।

সিগনেট বুকশপ—বই কেনার উপযুক্ত জায়গা বটে। ব্যবসায়ী মনোভাবের চেয়ে এখানে সুরুচিকর ও কৃষ্টিসম্পন্ন আবহাওয়াই চোখে পড়ে। সিগনেট বুকশপ দেশে যুগান্তর এনেছে সন্দেহ নেই।...অনাথবন্ধু চৌধুরী, হার্ডিঞ্জ হোস্টেল, কলকাতা ৭।

আপনাদের বুকশপে গিয়ে আশ্চর্য হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি তারও বেশি রুচির বৈশিষ্ট্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখে।...অনুপম দাশগুপ্ত, জলি মেডিক্যাল হোস্টেল, কলকাতা ৭।

বিভিন্ন লোকের কাছে সিগনেট বুকশপের এত প্রশংসা শুনেছি যে এবার কলকাতা গেলে আমার প্রথম দ্রষ্টব্য হবে আপনাদের দোকান।...সলিল ঘোষ, বোম্বাই।

আপনাদের দোকানে গিয়ে দেখেছি পাঠকক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার এমন সম্পর্ক তা শুধু গ্রন্থের মূল্যপরিশোধেই সমাপ্ত নয়, দুর্মূল্য।...ভাস্কর বসু, ১০ সাউথ কুলিয়া রোড, কলকাতা ১০।

সূচী

আষাঢ়—১৩৬০

বুদ্ধদেব বসু

লাল মেঘ

কবি, রম্যরচনাকার, কথা ও কাহিনীর সার্থক শিল্পী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি ল্যানড্ মার্ক। অনবদ্য আঙ্গিকে অপরূপ কাহিনী—লাল মেঘ—তিন টাকা।

৭ই জুন বেরিয়েছে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীর ও প্রান্তর

নারী যতক্ষণ পুরুষের, ততক্ষণ সে কারাকক্ষের প্রাচীর ; কিন্তু যখন সে সন্তানের তখন সে প্রান্তহীন প্রান্তর। পুরুষে সে সার্থক, সন্তানে সে সম্পূর্ণ। নারী সেই সূর্য-মন্দিরের তীর্থযাত্রী। প্রাচীর ও প্রান্তর ৩৲

সম্প্রতি

প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ

প্রাণতোষ ঘটক—আকাশ-পাতাল ৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র—আগামী কাল ২॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল—অঙ্গার ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—ডবল ডেকার ৩৲

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

টেলিগ্রাম "কাল্‌চার" টেলিফোন এভিনিউ ২৩৪১

সজনীকান্ত দাসের

ভাব ও ছন্দ ২॥০

অমলা দেবীর

শেষ অধ্যায় ২৲

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারত-মঙ্গল ১৷০

অমলকুমার রায়ের

মনুসংহিতায় বিবাহ ১॥০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মোগল-পাঠান ২॥০

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের

হর্ষচরিত ১০৲

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৩॥০

—নতুন সংস্করণ—

তারাশঙ্করের

রসকলি ২॥০

বনফুলের

অগ্নি ২৲

মহাস্থবিরের

মহাস্থবির জাতক

১ম পর্ব ৫৲ ২য় পর্ব ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর গ্রন্থমালা

১ম ২৷০, ২য় ২৷০, ৩য় ৩৲, কথামালা ৩৲

অমলা দেবীর

সরোজিনী ৪৲

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

স্বর্গের চাবি ৩৲

সজনীকান্ত দাসের

রাজহংস ৩৲

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

'সাহিত্যের খবর' বেরুচ্ছে। সাহিত্যামোদীরা নাম-ঠিকানা পাঠান

প্রশ্ন ও উত্তর

১। অধুনাতন লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কে?

* ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলী নিঃসন্দেহ। 'পঞ্চতন্ত্রে'র (৩৷৷৹) চারটে সংস্করণ নয় মাসে খতম হয়ে এখন পঞ্চম সংস্করণ চলছে। নব-প্রকাশিত 'ময়ূরকণ্ঠী'র দুটো সংস্করণ দু-মাসে নিঃশেষিত হয়ে এখন তৃতীয় সংস্করণ চলছে।

২। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার সর্বপ্রথম কোন্ লেখক পেয়েছেন? কোন্ বইয়ের উপর? তাঁর অন্য কি কি বই আছে?

* সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (৫ম সং—৪৲) সতীনাথের অন্যান্য বই—'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' (৩৷৷৹), 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১ম চরণ—৫৲), ঢোঁড়াই চরিত মানস (২য় চরণ—৩৷৷৹), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (২৲), 'গণনায়ক' (২৷৷৹)

৩। রঞ্জনের সর্বাধুনিক বই কোনটা? 'শীতে উপেক্ষিতা'র এখন কোন্ সংস্করণ চলছে?

* রঞ্জনের সর্বশেষ বই 'অসংলগ্ন' (উপন্যাস—৩৷৷৹)। আগেকার সব বই থেকে এর ধরন আলাদা। 'শীতে উপেক্ষিতা'র (৩৷৹) অষ্টম সংস্করণ চলছে।

৪। ইদানীং 'ভুলি নাই'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যায় না; এখনো কি তেমনি বিক্রি হয়? আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস কি? মনোজ বসুর নতুন কি বই বেরুচ্ছে?

* 'ভুলি নাই'-এর এখনো বিপুল জনপ্রিয়তা, ২৩শ সংস্করণ চলছে। আধুনিক কালের কোন উপন্যাস এত বেশি চলে নি। চীন বেড়িয়ে এসে মনোজ বসু 'মাসিক বসুমতী'তে 'চীন দেখে এলাম' নামে রসমধুর ভ্রমণ-কথা লিখছেন। বইটার প্রথম পর্ব শ্রাবণ মাসে বেরুবে।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র পুরস্কার কোন্ কোন্ বই পেয়েছে?

* তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (৩য় সং—৭৲) এবং বনফুলের 'স্থাবর' (২য় সং—৭৲)।

৬। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্করের সর্বশেষ উপন্যাস কি? কারা ছেপেছেন? 'দুয়ার হতে অদূরে'র মতো স্বল্পব্যাপ্ত ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী আর কোন বইয়ে আছে?

* বিভূতিভূষণের 'উত্তরায়ণ' (৩৷৹) ও তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতন' (৬৲) এই সেদিন মাত্র বেরিয়েছে। আমরাই ছেপে ধন্য হয়েছি। 'আরোগ্য-নিকেতন' সম্পর্কে গত সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র আলোচনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'দুয়ার হতে অদূরে' জাতীয় অন্য কোন বই আমাদের জানা নেই। বিভূতিভূষণই আর একখানা লিখছেন 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'। শীঘ্র বই হয়ে বেরুবে।

শ্রেষ্ঠ গল্প

আরম্ভ-সময়ে এত দূর সাফল্য আমাদের দূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—দুই মহোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে পেয়েছি শ্রেষ্ঠ গল্প পর্যায়ে। তা ছাড়া আছেন তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার। যাঁদের অনন্ত-সাধনায় সাহিত্য-ভাণ্ডার দিনে দিনে সমৃদ্ধতর হচ্ছে, তাঁরা প্রায় সকলেই আছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ গল্প পর্যায়ে। মোট বারোখানা—মোটামুটি একই আয়তনের। প্রত্যেকখানির দাম পাঁচ টাকা।

শ্রেষ্ঠ লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২

ঝকঝকে ছাপা পরিষ্কার ব্লক
ও সুন্দর ডিজাইন
টেলিফোন
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনী

"রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থকার একটি বৃহৎ দেশ ও কালের ইতিহাস লিখিতেছেন। ইহা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার এই কীর্তি বাঙালী পাঠকের হাতে উপযুক্ত মূল্যই পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

"...গ্রন্থখানি যেমন বৃহদাকার তেমনি কবির বহুমুখী এবং আপাত পরস্পর-বিরোধী কর্মজীবনকে একটি ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার মহৎ প্রয়াস। এই প্রায়-অসাধ্য সাধনপথে জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা জীবনী-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"...লেখক রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও ভাবজীবন, স্বদেশ-কেন্দ্রিকজীবন ও বিশ্বমানবকেন্দ্রিকজীবন, বাস্তব কর্মের জীবন ও স্বপ্ন দেখার জীবন, একই সঙ্গে একটি অখণ্ড জীবনের বিভিন্ন প্রকাশরূপে দেখাইয়া সত্য জীবনটিকেই দেখাইতেছেন।

"রবীন্দ্রনাথকে এমন সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ প্রভাতকুমারই প্রথম দিলেন। এ গ্রন্থ দীর্ঘ হইয়াও যথেষ্ট দীর্ঘ নহে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই কবি-জীবনের সমস্তগুলি মুহূর্ত—এমন কি যেসব মুহূর্ত কর্মহীনতার ভ্রান্তি জাগাইয়াছে তাহাও সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়া এমন স্পন্দিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।...

"পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে থামিয়া যাইতে হয়, মনে হয় কবি যত সহজে সহস্র রকম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, পাঠকরূপে আমরা তাহা পারিতেছি না, অনুসরণপথে হাঁপাইয়া পড়িতেছি। বর্ণনা এমনই সুন্দর যে, বিবরণের হ্রস্বতা কোথাও ধাক্কা মারে না, দীর্ঘতা কোথাও দীর্ঘ বোধ হয় না। রবীন্দ্র-কর্মজীবনের ও স্বপ্নজীবনের এই চিত্র পটভূমিরূপে পাঠ করা প্রত্যেক রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করি।" —যুগান্তর

প্রথম খণ্ড ॥ ১২৬৮—১৩০৮ ॥ ১৮৬১—১৯০১ ॥ মূল্য সাড়ে আট টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩০৮—১৩২৫ ॥ ১৯০১—১৯১৮ ॥ মূল্য দশ টাকা

তৃতীয় খণ্ড ॥ ১৩২৫—১৩৪১ ॥ ১৯১৯—১৯৩৪ ॥ মূল্য দশ টাকা

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
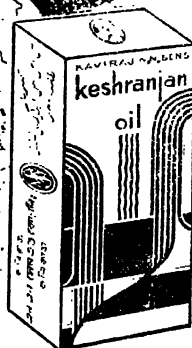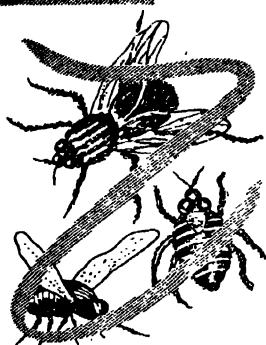
পোকামাকড়
মারুন
এরা অনেক রকম
রোগ ছড়ায়
মারকিট
মার্কা
ডিডিটি তরল ও গুঁড়া
আরসোলা, ছারপোকা, মশা,
মাছি প্রভৃতির নির্ঘাত প্রাণ ঘাতক
MARKIT
বেঙ্গল কেমিক্যাল

ক করে

মি

ালো

র্লি

চনবো?

বল শস্য ভালো হলেই যে বার্লি ভালো
ব তা নয়। এ জন্য চাই ভালো পেষাই।
মি সব সময় 'পিউরিটি' বার্লির ব্যবস্থা
রে থাকি। আমি জানি 'পিউরিটি'
র্লি তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো
রের পেষাইয়ের অভিজ্ঞতা।

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আজকের বাংলা-সাহিত্য রীতিমত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের এই অগ্রগতির মূলে রবীন্দ্রপরবর্তী সৃষ্টিধরদের মধ্যে তারাশঙ্কর বৃহত্তম অংশ নিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন অতীব নিষ্ঠা সহকারে। এর পুরস্কার তিনি পেয়েছেন সম্মানিত প্রতিষ্ঠায়। শুদ্ধ ও সুন্দর সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে সমধর্মী সকলের শীর্ষে তাঁর আসন। অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ ক'রে তোলবার, নগণ্য মানুষের কাহিনীকে মহত্তম রূপ দেবার ক্ষমতা তারাশঙ্করের যথেষ্ট। তাঁর অনুভূতির তীব্রতায় ও অপরিসীম সহানুভূতির গুণে প্রত্যেকটি কাহিনী হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের ভাষা অনাড়ম্বর, বর্ণনা নিখুঁত এবং রচনা বিষয়বস্তু-প্রধান। তাঁর কল্পনা ও শিল্পবুদ্ধি বিষয়বস্তুর অনুসরণ ক'রে চলে, অযথা রচনাচাতুর্য দেখানোর প্রয়াস তাঁর নেই—তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

'ধাত্রী দেবতা' তারাশঙ্করের সর্বোত্তম সুবৃহৎ উপন্যাস। দেশের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প এবং উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তরুণ শিবনাথের ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের কথা। শিবনাথের বিচিত্র মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুমহৎ কাহিনী, তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'রাইকমল' উপন্যাসটি এক প্রেমিক বৈষ্ণবীর প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত। দুঃখ ও বেদনাময় সে কাহিনী পড়তে পড়তে মন নিজের অজ্ঞাতসারে চ'লে যায় অজয়ের তীরবর্তী রাঢ়ের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। 'জলসাঘর' গল্পসংগ্রহখানিকে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প-পুস্তক বলা চলে। তারাশঙ্করকে জানতে হ'লে এই ছোটগল্পগুলি আগে পড়া দরকার। 'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘর' গল্পে বংশপরম্পরায় রায়েদের যে উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা যেমন করুণ তেমনই মধুর। প্রবলপরাক্রমশালী রায়েদের শেষ বংশধরের পরিণতি সহানুভূতি জাগায়, মন কাহিনী-বৈচিত্র্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। 'রসকলি' আর একখানি গল্পসংগ্রহ—এটিও রসিকমাত্রেরই পড়া উচিত। তারাশঙ্করের প্রথম গল্প রসকলি। 'রসকলি'র গল্পগুলি অবাস্তব নয়—লেখকের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা। '১৩৫০' গল্প-সংগ্রহে মন্বন্তরের ভয়াবহতা ও বাস্তবতার ওপর রচিত কয়েকটি গল্প আছে। তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। চলচ্চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে এর অভাবনীয় সাফল্য সর্বজনবিদিত।

ধাত্রী দেবতা ৪॥০ রাইকমল ২৲ জলসাঘর ৪৲
রসকলি ২॥০ ১৩৫০ ২॥০ দুই পুরুষ ২৲

পাতালে এক ঋতু
"স্মরণে যদি ভুল না থাকে তবে কোনো এক সময়ে আমার
জীবনটা ছিল মহা এক ভোজনোৎসব,—সেখানে সকল
প্রাণই খুলতো, সকল সুরাই বইতো।"—র‍্যাঁবো
অসাধারণ মুন্সিয়ানার ইঙ্গিত দিয়েছেন তরুণ কথাশিল্পী
দীপক চৌধুরী এই 'ফিউচারিষ্টিক' উপন্যাস—এ
রীডার্স কর্ণার

শনিবারের চিঠি
২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬০

শ্রীযুক্ত বিনোভার ভূদানযজ্ঞ

ভূমিকা

আজ দেশের বহু ক্ষেত্রে এবং বিদেশেও কোথাও কোথাও শ্রীযুক্ত বিনোভার ভূদানযজ্ঞ লইয়া যথেষ্ট কৌতূহল এবং উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বহুদিন আগে হইতেই, ভূমিসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন—ইহা অনেকেই মনে করিতেন। রুশদেশে চাষীগণকে শোষণমুক্ত করিয়া সমবায়প্রথার দ্বারা যে সব উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহার সংবাদ অল্পে অল্পে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অথচ ১৯৪৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস-গভর্মেণ্ট জমিসংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায়, ভারতের স্বাধীনতা-লাভকে যাঁহারা আর্থিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সূচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে কিছু অসহিষ্ণু হওয়া বোধ হয় স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে চীনদেশে যে সকল ভূমিসংস্কার সম্প্রতি ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের দেশেও অনুরূপ সংস্কারের তাগিদ যেন কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এরূপ অবস্থার মধ্যে বিনোভার ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের দিবার মত জমি আছে, তাহাদের দানের সহায়তায় দেশের ভূমিহীন চাষীশ্রেণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রামে চাষ এবং কুটিরশিল্পের বহুলপ্রসারের দ্বারা তিনি যে নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে বিপ্লবের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন বহু কর্মীই আকৃষ্ট হইয়াছেন। বিনোভার কথাবার্তার মধ্যে সত্যাগ্রহের সম্ভাবনার বিষয়ও মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। ইহাতে আকর্ষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইতেছে যে, আজ পর্যন্ত ভাবরাজ্যে যে পরিমাণ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, মানুষের বিচারবুদ্ধি সে পরিমাণে ভূদানযজ্ঞের ব্যাপারে

প্রযুক্ত হয় নাই। অথচ, যদি আমরা বিচার এবং জ্ঞানের দিক দিয়া ভূদানযজ্ঞকে সার্থক বা প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া বিবেচনা করিতে না পারি [তবে শেষ পর্যন্ত তাহা ধোপে টি ঁকিবে না। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

সমস্যা

ভারতবর্ষে আগে যত লোক বাস করিত, আজ লোকসংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। যে সকল জমি পূর্বে অনাবাদী ছিল, অথবা গোচর বা গ্রামের বনভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহার অনেকাংশ চাষের ক্ষেতে রূপান্তরিত হইয়াছে। বহু শিল্পী শিল্পব্যবসায় ছাড়িয়া লাঙল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্বে যাহাদের সামান্য পরিমাণ জমি ছিল, অবাধ কেনাবেচার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ধনীর কাছে জমি বেচিয়া নিজে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হইতেছে। ইহাই বাংলা দেশ এবং নিকটবর্তী প্রদেশগুলির মধ্যে পরিবর্তনের ধারা। অন্যত্র এরূপ পরিবর্তনের মাত্রা কোথাও বা কম, কোথাও বেশি।

সে ক্ষেত্রে ভিক্ষালব্ধ কিছু ভূমি ইতস্তত লাভ করিয়া তাহার সমবণ্টন এবং গ্রামশিল্পের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের আর্থিক সমস্যা কতদূর পর্যন্ত মিটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি বিনোভার কর্মচেষ্টাকে সমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, 'বাংলা দেশের ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এ উপায়ে হইবে না মানি। কিন্তু বিনোভা নূতন যে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিষয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, সে প্রচারও তো কম কথা নহে।' যদি এরূপ প্রচারের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তবু প্রশ্ন ওঠে, ভূদানযজ্ঞের ব্যাপারে আমরা কি সেরূপ আন্দোলন সৃষ্টির সত্য সত্যই কোনও আভাস পাইতেছি? যদি তাহার সূচনা থাকে, তবে ভাল কথা। আর যদি না থাকে, তবে কোন্ পথে ভূদানযজ্ঞের

মোড় ফিরাইলে ভবিষ্যতে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে তাহাও তো ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিপ্লব বলিবামাত্র আমি হট্টগোলের কথা ভাবিতেছি না। বেশি আওয়াজ না করিয়াও বিপ্লব সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আসল কথা হইল, পূর্ব হইতে পরের সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং সমাজের মধ্যে শক্তির উৎসকেন্দ্রের যদি আমূল পরিবর্তন ঘটে, তবে সে পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সেইরূপ পরিবর্তনের কোনও পূর্বাভাস ভূদানযজ্ঞে দেখা দিতেছে কি না—ইহাই হইল মূল প্রশ্ন।

বিনোভার কর্মধারা

দেশে ধনী আছে, দরিদ্র আছে। বিনোভা বলিতেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন যে রাখে, সে অন্যায় করে। এই অন্যায়ের অবসান শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ঘটাইবার জন্ম বিনোভা বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার নৈতিক প্রতিষ্ঠা অসামান্য। এবং ভূদানযজ্ঞে আজ তাঁহার সমপর্যায়ের অথবা নিম্নপর্যায়ের নৈতিক-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বহু কর্মী ধনীদের নিকটে গিয়া বিনোভার ভিক্ষার সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতেছেন। মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। যাহারা পারে, তাহারা জমি দিতেছে। যে পরিমাণ ভূমি সংগৃহীত হইতেছে তাহা বিস্ময়কর। এবং সেই পরিমাণের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শান্তিপথের পথিকগণ বিস্মিত নয়নে ভূদানযজ্ঞের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই পরিবর্তনের উপায় বা সাধন কি? চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, এখন পর্যন্ত অনেকগুলি নৈতিক-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ একটি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ইহাও

বলিতেছেন, যদি নৈতিক দাবির বশে অবনত মস্তকে তোমরা উদ্বৃত্ত জমি দান না কর, তবে এমন দিন আসিবে যখন রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা তোমাদের সকল সম্পত্তির অবসান ঘটিবে। সে সম্ভাবনা এড়াইতে হইলে মানে মানে যাহা পার তাহা দিয়া দাও। অনেকে দিতেওছে। কেহ বৈপ্লবিক পরিবর্তন পছন্দ করে বলিয়া দিতেছে, কেহবা দানের নেশায় দিয়া কিছু আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের অবশিষ্ট জীবন যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতেছে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, পরিবর্তন আনিতেছেন বিনোভা অথবা তাঁহার অনুরূপ সিদ্ধ বা অল্পসিদ্ধ নৈতিক-আদর্শবিশিষ্ট নেতা। জনসাধারণ, অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক বা অল্পভূমিসম্পন্ন কৃষকের পক্ষে আত্তকরণীয় বিশেষ কিছু নাই। তাহারা বর্তমান যজ্ঞে সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপারে মুখ্য অথবা গৌণ অস্ত্ররূপে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে নাই। সে সম্ভাবনাও তাহাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না।

গান্ধীজীর বিশেষত্ব ছিল, তিনিও পরিবর্তন চাহিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন চাহিতেন। কিন্তু সেই পরিবর্তন-সাধনের ব্যাপারে তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে নিজের সহকর্মীতে রূপান্তরিত করিতেন। তিনি যখন ধরসানা অভিযান করেন তখন জনসমূহের উপরে নির্দেশ ছিল, তাহারাও যেন স্বীয় শক্তি ও সংগঠন অনুসারে ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে আইন অমান্য করে—মদের দোকানে পিকেটিং করে, নিষিদ্ধ স্থানে আইন ভঙ্গ করিয়া মিটিঙের আয়োজন করে, ইত্যাদি। এইভাবে কোথাও চড়া পর্দায়, কোথাও নরম পর্দায় আইন-অমান্য-আন্দোলন-পরিচালনের দ্বারা দেশের সর্বত্র গান্ধীজী শক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ অহিংস উপায়ে শক্তি অর্জন করিয়া উৎসাহিত হইত। তাহারা উৎসাহের আতিশয্যে পূর্ব-সংস্কারবশে, অথবা গভর্মেণ্টের নিষ্ঠুর আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় শাসনভ্রষ্ট অবস্থায় হিংসার পন্থা অবলম্বন করিলে গান্ধীজী তাহাদিগকে অসহযোগ আন্দোলন হইতে সাময়িকভাবে নিরস্ত করিতেন। শাসনের

প্রয়োজন হইলে নিজে অনশনব্রত অবলম্বন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্বদা লক্ষ্য থাকিত জনসাধারণের অহিংস শক্তিকে জাগ্রত, সংগঠিত এবং পরিশুদ্ধ করিয়া সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিংসার পন্থা অবলম্বন করিলে সমাজে শক্তির কেন্দ্র অল্প দিনের মধ্যে অস্ত্রধারী শ্রেণীবিশেষের হাতে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে এবং জনসমূহের শক্তিতে ভাটার টান পড়িবে। সেইজন্য অনশন, শাসন প্রভৃতি নানা উপায়ের দ্বারা তিনি জাগ্রত জনশক্তিকে অবিচলভাবে অহিংসার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস করিতেন।

এমন কি তিনি জনৈক পত্রদাতার প্রশ্নের উত্তরে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—

> I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to *him*. Will he gain something by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?
>
> Then you will find your doubts and your self melting away.

—"তোমাকে একটি মন্ত্রপূত কবচ দিব। যখনই কোন সন্দেহ দেখা দিবে অথবা নিজের আত্মভাব যদি বেশি বৃদ্ধি পায়, তখন এই ঔষধটি প্রয়োগ করিও। নিজের দেখা সকলের চেয়ে দরিদ্র এবং অসহায় কোনও মানুষের কথা স্মরণ করিও। ভাবিয়া দেখ, আজ যাহা তুমি করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছ, তাহাতে সেই ব্যক্তির কোন উপকার

হইবে কি না। সে কি স্বীয় জীবন বা ভাগ্যের পরিবর্তন ব্যাপারে আরও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে? অর্থাৎ তোমার কাজের দ্বারা দেশের ক্ষুধার্ত অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন দরিদ্রতম ব্যক্তিও কি স্বরাজ লাভের পথে আরও অগ্রসর হইতে পারিবে?

এইরূপ চিন্তার ফলে তোমার সকল সংশয় এবং অহমিকার ভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে।"

উপরোক্ত কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আমরা বিনোভার ভূদান-যজ্ঞের মধ্যে সাধারণের শক্তিসঞ্চয়ের কোনও সম্ভাবনা স্পষ্টত দেখিতে পাইতেছি না। কারণ তাঁহার কল্পিত বিপ্লবের প্রধান সাধন হইল জনতার সংগঠিত অহিংস শক্তি নয়, পরন্তু উত্তম নৈতিক-আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, আজ যদিও বিনোভা প্রধানত একটি অস্ত্রকেই ব্যবহার করিতেছেন, তবু পরে প্রয়োজন হইলে তিনি জনশক্তিকেও তো সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে পারেন? মানিয়া লইলাম, ইহা তাঁহার অপ্রকাশিত অভিপ্রায় হইতে পারে। কিন্তু তাহার জন্যও তো সংগঠনের প্রয়োজন আছে। সে সংগঠনের লক্ষণও তো বিশেষ দেখা যাইতেছে না। সেইজন্য মনে হইতেছে, বিনোভার বক্তৃতার মধ্যে কখনও কখনও সত্যাগ্রহের উল্লেখ থাকিলেও সে সত্যাগ্রহ ধনীশ্রেণীর হৃদয় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনতার পক্ষ হইতে কোনও অহিংস অসহযোগের আকার ধারণ না করিয়া বরং বিনোভা অথবা তাহা অপেক্ষা নিম্নকোটির নৈতিকবলসম্পন্ন নেতার প্রায়োপবেশনে পর্যবসিত হইবে। বিশেষত আজ স্বদেশী গভর্মেণ্ট যখন অর্থাভাব এবং অন্তবিধ দুর্বলতার বশে নানাদিক দিয়া বিপন্ন, তখন যে জন-আন্দোলন তাহাদিগকে ভবিষ্যতে বিব্রত করিতে পারে, অথবা যাহা বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির কাজে ইন্ধন যোগাইতে পারে, বিনোভা সে পথ পরিহার করিয়া সত্যাগ্রহকে হয়ত ব্যক্তিগত প্রায়োপবেশনেই পরিণত করিবেন।

গান্ধীজীও প্রায়োপবেশন করিতেন। কিন্তু তাঁহার দাবি ছিল, জনসাধারণ হিংসার পথ পরিহার করিয়া একান্তভাবে অহিংসাকেই আশ্রয় করুক। জনসমূহ আরও পরিশুদ্ধ হোক। নিজে পুরোভাগে অবস্থান করিলেও গান্ধীজী যজমানকে স্বীয় দায়িত্ববোধে এবং আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস অবিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেন। সেই লক্ষণ এখন পর্যন্ত বিনোভার ভূদানযজ্ঞের সম্পর্কে দেখা যাইতেছে না।

মানভূম জেলায় বিনোভা অসুস্থ হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে লোক-সেবক-সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহার কর্মীগণ গান্ধীজীর আদর্শসম্মত বিপ্লবে বিশ্বাসী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইঁহারা সদর মহাকুমায় ৩৩০০ গ্রাম-পঞ্চায়ৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মাধ্যমে গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে ধান্যসংগ্রহ এবং তৎপরে গ্রামের ভূমি বা অপর বিষয় সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া গান্ধীজীর আদর্শের এক অত্যাশ্চর্য পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ইঁহাদিগকে এই গঠনকর্মে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ধান্য-সংগ্রহ, কেরোসিন প্রভৃতির বণ্টনের ভার পঞ্চায়তের উপরে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিহারের অধিবাসী ছিলেন। দুই বৎসর কাজ চলার পর জেলার সদরে অবস্থিত উকিল এবং ব্যবসায়ীগণ প্রমাদ গনিলেন, কেন না মামলা-মোকদ্দমা অত্যধিক কমিয়া গেল এবং ধানের কারবার বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ক্রমে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্থানান্তরিত হইলেন, সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পঞ্চায়ৎগুলির বিভিন্ন দায়িত্ব অপসারিত করিয়া সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাতে ধান্য সংগ্রহ, কেরোসিন বণ্টন প্রভৃতির ভার তুলিয়া দিতে লাগিলেন, এবং পঞ্চায়ৎগুলির শক্তিতে ভাটা পড়িতে লাগিল। বিহার কংগ্রেসের উচ্চতম কোটিতে আপীল করিয়াও গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী বিকেন্দ্রীকরণের এই পরীক্ষাটির বিষয়ে কোনও সহায়তা

পাওয়া গেল না। আজিকার দিনে রাষ্ট্রের শক্তি পিছনে প্রয়োগ না করিলে বিকেন্দ্রীকরণও সম্ভব হয় না। গান্ধীজী ইহা জানিতেন বলিয়া সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে বিদেশীশাসনমুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করিয়া দেশে বিকেন্দ্রীকরণের এক ব্যাপক পরীক্ষা করা হইবে। মানভূম সদরে তাঁহার আদর্শের এক উজ্জ্বল উদাহরণ রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা বিনা ক্রমশ স্তিমিত হইয়া পড়িল।

সেই মানভূমে যখন বিনোভা অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লোক-সেবক-সংঘের কর্মীগণ তাঁহার নিকট নানা প্রস্তাবের মধ্যে এক প্রস্তাব করেন, 'আপনি বিহার গভর্মেণ্টকে বলিয়া আমাদের পঞ্চায়ৎগুলির অধিকার আবার ফিরাইয়া দিন; তাহা হইলেই পঞ্চায়ৎগুলি আবার জাগিয়া উঠিবে। এবং এই পঞ্চায়ৎগুলির উপরে আপনি প্রতি গ্রামে ভূমি সংগ্রহ ও ভূমি পুনর্বণ্টনের ভার অর্পণ করুন। যে বিকেন্দ্রীকরণ গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন, জাগ্রত মানভূমে সেই নীতিকে আশ্রয় করিয়া ভূদানযজ্ঞের রূপান্তর ঘটুক। অন্যত্র যখন সংগঠন সম্পূর্ণ হইবে, তখন অপরেও একই ভাবে ভূদানযজ্ঞ পরিচালিত করিতে পারেন। আপনি মানভূমের ক্ষেত্রে জনসংঘের উপরে ইহার দায়িত্ব অর্পণ করুন এবং তদনুযায়ী গভর্মেণ্টের মারফত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়া দিন।' যতদূর জানি, বিনোভা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই।

মনে হইতেছে, ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে যাঁহারা জনশক্তিজাগরণের সম্ভাবনা দেখিতেছেন, তাঁহাদের আশা সফল হইবে না। জন কয়েক ভাল মানুষ উপবাসাদির দ্বারা আরও ভাল হইবেন, কিছু খয়রাতি জমি সংগৃহীত হইবে; ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

ভবিষ্যতের কর্তব্য

তবে কি ভূদানযজ্ঞের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়? যে সকল কংগ্রেসকর্মী উৎসাহভরে এই কাজে সহায়তা

করিতেছেন, তাঁহারা সামনে অস্পষ্টতা বা অন্ধকার দেখিয়া কি ফিরিয়া যাইবেন?

আমার মনে হয়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। মোড় ফিরাইলে যদি এই আন্দোলনকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা যায় তবে সে দায়িত্ব আমাদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সে কথাই এবার বলি।

ইস্কুলে অনেক ছেলে পড়ে। তাহার মধ্যে কেহ সুস্থকায়, কেহবা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এবং ক্ষীণকায়। কেহ ধনীর সন্তান—প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে, কাহারও বা পরিপূর্ণ আহার জোটে না। কোনও উৎসাহী ব্যায়ামবীর যদি স্থির করেন, প্লীহাগ্রস্ত বা অনাহার-ক্লিষ্ট ছেলেদের প্রথমে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইয়া তাহাদের স্তাণ্ডোতে পরিণত করিবেন, তাহাতে বলিবার কিছু নাই। তিনি যদি ধনী ছাত্রদের উদ্বৃত্ত আহার দরিদ্র সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে দান করাইয়া দরিদ্রদের সুস্থ করিয়া তোলেন, তাহাতেই বা বলিবার কি আছে? আমাদের কথা হইল, স্তাণ্ডো যদি গড়িতেই হয় তবে প্রথমে সুস্থদেহ মাঝখানের ছেলেগুলিকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে দোষ কি? তেমনই আজ কর্মীগণ যদি ভূমিহীনদের ছাড়িয়া যাহাদের কিছু ভূমি আছে, তাহাদের মধ্যে সংগঠনের চেষ্টা করেন, তাহাতে ক্ষতি কি? ভূমির সম্পর্কে সমবায় না করিয়াও অন্তত উন্নত বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ, জলসেচন, গোপালন বা গ্রামে বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে যদি অনেককে সমবায়বদ্ধ করিয়া ইহার সুফল দেখানো যায় তবে অবশিষ্ট গ্রামবাসীর মনে ইহার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

নূতন জীবনযাত্রার বীজ এই ভাবে বপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকর্মী যদি ভূদানযজ্ঞের ব্যাপারে ওই সমবায়বদ্ধ চাষীদের উৎসাহিত করিতে পারেন, তাহাই বা মন্দ কি? ওই চাষীগণ ধনী-শ্রেণীর চাষীদের বলিবে, 'তুমি উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের জন্য অথবা ভূমির

সম্যক পুনর্বণ্টনের জন্য দান কর। আমরা নিজেদের মধ্যে নূতন নিয়ম গড়িয়া নূতনভাবে চলিব। যে চাষ ভালভাবে করিবে না, তাহার ভূমিতে অধিকার থাকিবে না। আর চাষের সম্পদ চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও ফসলের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিক্রয়, গোপালন, জলসেচন প্রভৃতি বহু ব্যাপারে আমরা সমবায়বদ্ধ হইয়া কাজ করিব। তাই জমি চাই। তুমি উদ্বৃত্ত দিয়া দাও। নয়ত আমাদের কেহই তোমার চাষে সহযোগিতা করিবে না। আমাদের মত একজন হও, সুখে থাকিবে। আর আজ অবারিত লাভের যে পথে চলিয়াছ তাহার ফলে কেহ ধনী হইতেছে, কেহ গরিব হইতেছে। ইহা ভাল নয়। আমরা একদিকে সংগঠন, অপর দিকে অহিংস অসহযোগের দ্বারা আমাদের আদর্শ সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি।'

এই ভাবে কংগ্রেসকর্মীগণ যদি ভূদানযজ্ঞকে নূতন পথে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্মচেষ্টা সার্থক হইয়া উঠিবে। আশা করা যায়, আমরা বর্তমান যজ্ঞকে বিপ্লবের পথে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইব।

নির্মলকুমার বসু

ডানা

২

পরের দিন সকালে উঠেই ডানার সর্বপ্রথম মনে পড়ল শালিকের বাসার কথাটা। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তালগাছটার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল তাতে চমকে উঠল সে। বাসা থেকে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। পাখী দুটো কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দেখতেই পেল না। মহা মুশকিল হ'ল তো! ওদের বাসায় সাপ ঢুকেছে না কি! তাড়াতাড়ি গিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে এল। চাকরটা খানিকক্ষণ উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বললে, ঢিল ছুঁড়ে দেখব?

ঢিল ছুঁড়বি? যদি ওরা ভেতরে ডিম পেড়ে থাকে! তুই গাছে উঠতে পারবি না?

না।

তা-হ'লে উপায়?

চাকরটা তালগাছটার তলায় গিয়ে গাছটাকে নাড়া দিতে চেষ্টা করল। গাছ নড়ল না একটুও।

মই জোগাড় করতে পারিস কোথাও থেকে?

মই নিয়ে কি হবে?

মই লাগিয়ে তুই উঠতে পারিস?

সে আমার দ্বারা হবে না। ওখানে উঠে প্রাণ দেব না কি? সত্যিই যদি সাপ থাকে আর সে যদি তাড়া ক'রে আসে, ওরে বাবা, সে আমি পারব না মাইজি—

ডানার মনে হ'ল, সাপের খোলসটা দুলছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল তার। দিনের আলোয় তার চোখের সামনে এত বড় একটা সর্বনাশ হতে থাকবে আর সে কিছুই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি! না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

তুই একটা মই জোগাড় ক'রে আন্ তো। তুই উঠতে না চাস আমি উঠব।

মই বা আমি কোথায় পাব?

আমি অমরবাবুকে একটা চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটা নিয়ে তুই ছুটে চ'লে যা। তিনি নিশ্চয়ই একটা মই জোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। চট ক'রে যাবি আর আসবি।

ডানা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কবিকে একটা চিঠি লিখল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহা মুশকিলে পড়েছি। তালগাছে শালিক পাখীর বাসায় সাপ ঢুকেছে। একটা মই চাই। একটা লোকও যদি পাঠাতে পারেন

ভাল হয়। আপনাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না, একটা মই পেলে আমিই সব ঠিক ক'রে নেব। আপনি আসবেন না কিন্তু। এলে খুব রাগ করব। বিপদে পড়লে পুরুষদের সাহায্য ছাড়াও যে আমরা সামলে নিতে পারি, দোহাই আপনার, সেটা যাচাই করবার সুযোগ দিন। ইতি

ভানা

আগের দিন ছিমছাম কৃত্রিম মানুষের তৈরি বাসায় শালিক-দম্পতিকে দেখে কবির মনে যে বেসুর বেজেছিল, সেইটেই তাঁকে পরদিন প্রভাতে একটি কবিতা রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করল। উপলক্ষ্য হ'ল একটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকটি তাঁর বাড়ির সামনের একটি ডালে ব'সে তারস্বরে চিৎকার করছিল। মন্দাকিনী থাকলে তার ওই শ্রুতিকঠোর খা-খা-খা শব্দ কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না, কাকটাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। কবি কিন্তু উদ্‌বুদ্ধ হলেন এবং ছন্দে গেঁথে দাঁড়কাককে খামখা উপদেশ দিতে ব'সে গেলেন। প্রথম দু লাইন লিখেই তাঁর মনে হ'ল, ভাবটি যেই জ'মে আসবে অমনি ঠিক খুনের মামলার নথিপত্র নিয়ে কুঁজো গণেশ গোমস্তা হাজির হবে এসে। সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। রাগও হ'ল। মনে হ'ল, এলেই দূর ক'রে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে, মনের সুরটাও কেটে যাবে তা হ'লে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও বিদায় নেবে। কিন্তু উপায়ই বা কি! গণেশকে কি ক'রে ঠেকাবেন তিনি, সত্যিই যদি এসে পড়ে সে! হঠাৎ মনে পড়ল, একটা উপায় আছে। ঠাকুরকে ডাকলেন। চন্দনচর্চিত মৈথিলী ঠাকুরটি দ্বারপ্রান্তে এসে নিজস্ব বাংলায় সসম্ভ্রমে বললে, আমাকে ডাকিয়েসেন বাবু?

দেখ, কেউ যদি এখন আসে ব'লো যে, বাবুর শরীরটা ভাল নেই, এখন দেখা করবেন না কারও সঙ্গে।

বেশ। ভাত তো রেন্না করিয়েসি, দু-চারঠো রোটি কি বানাব? শরীর যেখন খারাব—

দরকার নেই, ভাতই খাব।

ঠাকুর চ'লে গেল। জানলা দিয়ে কবি চাইলেন বাইরের দিকে। দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছিল। কবি তাকে উদ্দেশ ক'রে লিখলেন—

বলিষ্ঠ দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
বুলবুলি হবি কোন্ দুঃখে
শুনে লেগে যায় তাক
তোর ওই হাঁকডাক
রূপ দেয় রুষ্টে ও রুক্ষে।

মনে আছে কবি এক দিয়েছিল তোরে গাল
ময়ূরের পেখমেতে হয়েছিলি নাজেহাল।

দেখিস খবরদার
করিস না যেন ধার
অভাব কিসের তোর বচ্ছ
কুচকুচে কালো গায়
আলো যে পিছলে যায়
কুচকুচে চোখ তোর স্বচ্ছ

শৌখিন পাখীদের মিহি সুর ছাপিয়ে
গলা ছেড়ে হাঁক দে রে চারিদিক কাঁপিয়ে
ন্যাকামিকে তাড়িয়ে
সা রে গা মা ছাড়িয়ে
ছোটা তোর বেসুরের অশ্ব
রে হাবসি-সম্রাট
তোর ঠাট তোর বাট
একেবারে তোর যে নিজস্ব

ওরে ওরে দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্‌
কালো-কোলো বোম্বেটে পক্ষী
বুলবুলি দোয়েলের
টুনটুনি কোয়েলের
হ'স না নকল যেন লক্ষ্মি।

ডানার চাকর অমরবাবুর বৈঠকখানায় এসে কড়া নাড়তেই ঠাকুর গিয়ে হাজির হ'ল। সে যেন ওৎ পেতে ব'সে ছিল।

বাবুর তবিয়ত খারাপ। মুলাকাত হোবে না।

মাইজি আমাকে একটা মই নিয়ে যেতে বলেছেন।

মই? মানে সিঁড়ি?

হ্যাঁ।

সিঁড়ি তো হামাদের নাই।

কাদের আছে?

রূপচন্দবাবুর বাসায় খুব লম্বা সিঁড়ি দিখিয়েছি একটা। সিথায় গেলে মিলতে পারে।

ও আচ্ছা—

রূপচাঁদবাবু আপিসে চ'লে গিয়েছিলেন।

যথারীতি চণ্ডী এসেছিল বকুলবালার কাছে। সে একটি দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছিল। অনেক চেষ্টা করেও গণশা এবার নাকি হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ এই হলদে পাখীর বাসা আবিষ্কারের উপর চণ্ডীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করছিল। বকুলবালা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে হলদে পাখীর বাচ্চা এনে দিতে পারে তা হ'লে তাকে 'এয়ার-গান' কিনে দেবেন একটা। চণ্ডীকে অবশ্য তিন-সত্যি করতে হয়েছিল যে, সে এয়ার-গান দিয়ে কাক ছাড়া আর কোনও পাখী মারতে পারবে না। বেরাল, নেউল, শেয়াল,

ক্ষ্যাপা কুকুর এসব মারতে পারে, কিন্তু কাঠবেড়ালী, ছাগলছানা বা গরু-বাছুরকে কিছু বলতে পাবে না। চণ্ডী এসব শর্তে রাজী ছিল, কিন্তু গণশা যা বললে তাতে তো এ বছর এয়ার-গান পাবার আশা সুদূরপরাহত।

বকুলবালা একটা ধনুকে ছিলে পরাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য দুর্বৃত্ত কাককুলকে শাসন করা। বকুলবালা একটু আরাম ক'রে বারান্দায় তোলা-উনুনটি নিয়ে রাঁধতে চান, (গরমে ওই ঘুপসি রান্নাঘরে টেকা যায় নাকি!) কিন্তু কাকের দৌরাত্ম্যে তা হয়ে উঠছে না। একটু নড়বার জো নেই, কখনও মাছভাজাটা নিয়ে পালাচ্ছে, কখনও দুধে মুখ দিচ্ছে—! জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই আজ ঠিক করেছেন তীর-ধনুক দিয়ে কাক তাড়িয়ে তবে রাঁধতে বসবেন। তীর-ধনুকটা পাশেই থাকবে, তা হ'লে মুখপোড়ারা ভয়ে আর আসবে না।

চণ্ডীর মুখ থেকে দুঃসংবাদটি শুনে তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু। ভাবটা—তুমি যে একটি অপদার্থ তা আমি বরাবরই জানি।

মুখে বললেন, ছিলেটা পরা তো, আমি বাঁকারিটা ভাল ক'রে বাঁকিয়ে ধরছি। খুব কস্-কসিয়ে বাঁধবি।

চণ্ডী যথাসাধ্য শক্ত ক'রে দড়িটা বেঁধে ফেললে।

এইবার একটা তীর ছোঁড়্ দিকি। ওই কাকটাকে মার্। মুখপোড়া সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে আমাকে।

তীর কোথায়?

ওই যে। সকাল থেকে তো তীরই বানাচ্ছিলাম। একা হাতে বাঁশ চিরে তৈরি করেছি। তুমি তো এই এতক্ষণে এলে—

চণ্ডী ধনুকে তীর যোজনা ক'রে লক্ষ্য করতেই কাকটা স'রে পড়ল। আশেপাশে আরও যা দু-একটা ছিল, তারাও উড়ে গেল।

এই হচ্ছে ওদের ওষুধ।

বকুলবালার চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

দেখি, দেখি, আমাকে দে তো—

একটা কাক অনেক দূরে মিত্তিরদের চিলেকোঠার ছাদে এসে ব'সে ছিল আবার। বকুলবালা তীর-ধনুক আঁচল দিয়ে ঢেকে গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন সে দিকে।

এইবার মারুন।—ফিসফিস ক'রে চণ্ডী বললে।

বেশ বাগিয়ে তীর ছুঁড়লেন বকুলবালা। আর একটু হ'লেই লাগত, একবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কাকটা কা-কা ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলল।

তীরটা খুঁজে নিয়ে আয়।

একছুটে বেরিয়ে গেল চণ্ডী এবং একটু পরেই তীরটা নিয়ে এল। এ সব ব্যাপারে সে ওস্তাদ একজন।

রেখে দে ঠিক জায়গায়। গুছিয়ে রাখ্।

চণ্ডী বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল।

বকুলবালা এবার হলদে পাখীর প্রসঙ্গে এলেন।

গণশা এবার হলদে পাখীর বাসা দেখতেই পায় নি?

অমরবাবুর আম-বাগানে গণশা গেল বছর হলদে পাখীর বাসা দেখেছিল। এ বছর সে বাগানে হলদে পাখীই নাকি দেখা যাচ্ছে না। গণশা বলছিল, অমরবাবুর লোকেরা নানা রকম ফাঁদ পেতে, জাল ফেলে, বন্দুক আওয়াজ ক'রে সব পাখীদের ভড়কে দিয়েছে, এ বছর ওরা হয়তো এ অঞ্চলে বাসা বাঁধবে না।

হুৎ, তা কি কখনও হতে পারে? এখানকার পাখী কি বাসা বাঁধবার জন্যে দিল্লী মক্কা চ'লে যাবে! গণশাটা বোকা, কিছু জানে না। তুই নিজে খুঁজিস একটু—

আমি যে হলদে পাখীর বাসা চিনিই না।

পাখীর বাসা চেনা আর শক্ত কি! পাখীর বাসা দেখিস নি কখনও?

আমাদের ঘরের আলসেতে একবার শালিক বাসা বেঁধেছিল। কাকের বাসাও দেখেছি। বাবুই পাখীর বাসাও দেখেছি। কিন্তু

প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রকম যে। হলদে পাখীর বাসা দেখি নি কক্খনও কিনা!

গণশা তো দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করিস না।

আচ্ছা।

এমন সময় বাইরের দুয়ারে ডাক শোনা গেল, বাবু বাড়ি আছেন?

দেখ্ তো কে এল এমন অসময়ে!

চণ্ডী বেরিয়ে গেল। ডানার চাকরকে সে চিনত। অমরবাবুকে লেখা ডানার চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এল সে।

অমরবাবুর বাগান-বাড়িতে যে মেয়েটি আছেন তিনি একটা সিঁড়ি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন অমরবাবুকে। অমরবাবু এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিটা পড়্ তো।

ডানার সম্বন্ধে দু-একটা কথা রূপচাঁদের মুখে বকুলবালা শুনেছিলেন। মেয়েটি নাকি বেশ লেখাপড়া জানা, অমরবাবু দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছেন নাকি ওকে। ডানার সম্বন্ধে বকুলবালার বেশ একটা কৌতূহল ছিল। চিঠিটা শুনে তা আরও বেড়ে উঠল। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেশ লিখেছে তো চিঠিখানা। নিশ্চয়, পুরুষদের সাহায্য নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কল্পনানেত্রে তিনি যেন শালিক পাখীর বাসায় প্রবিষ্ট সাপটাকে দেখতে পেলেন। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় একবার এ ধরনের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁদের পায়রার খোপে সাপ ঢুকেছিল। সহসা তাঁর সমস্ত শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

বললেন, চণ্ডী, তুই তীর-ধনুকটা সঙ্গে নে। চাকরটাকে ডাক্, ইটা সঙ্গে নিয়ে চলুক, আমরাও যাই চল্—

(ক্রমশ)

"বনফুল"

আমার সাহিত্য-জীবন

১৪

মহাকবির সঙ্গে এই দেখা হয়েছিল—১৯৩৫ সালে চৈত্র মাসে। তার পর আর অনেক দিন যেতে ভরসা করি নি। পত্রাদিও লিখি নি। কেবল নিজের অযোগ্যতার কথা, সম্বলহীনতার কথা ভাবতাম। কি নিয়ে যাব? কোন্ কথা বলব? কলকাতা যাওয়া-আসার পথে বোলপুর স্টেশনে নেমে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে মাথায় নিয়ে দূর থেকে প্রণাম জানাতাম। দ্বিতীয় বার তাঁর দর্শন লাভ করি প্রায় দেড় বছর পর। তখন ওই বউবাজারের বিচিত্র আস্তানাতে থাকি—যার ছাদে কাঠের খুপরিতে থাকে ম্যাগী-বুড়ী, ক্রশ্চান মেয়ে লিলি কি কেটী, যার নিচের তলায় চামড়ার গুদাম, কাঠের কারখানা, আর বাকি তলাগুলির এক দিকে মেসে থাকে দলবদ্ধ কেরানীর দল, এক দিকে থাকে পশ্চিমদেশীয়া বাইজীরা। এর কিছুদিন আগেই আমার 'জলসাঘর' বেরিয়েছে। বইখানির সমাদর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা এলেন তাঁর নৃত্যনাট্যের সম্প্রদায় নিয়ে। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে দিনকয়েকই আসর বসবে। আমি সাহস করে বইখানি হাতে নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হবার সংকল্প করলাম।

থাক্। তার আগে আর একটি কথা ব'লে নিই। আর একজন বড়মানুষের কথা। পিছিয়ে যেতে হবে। ওই প্রথম দেখা হওয়ার ঠিক পরের সময়ে পিছিয়ে যাব। আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়ের কথা বলব। কবি আমাকে 'রাইকমল' অভিনয়ের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি কলকাতায় এলাম এবং এসে হাজির হলাম স্টার থিয়েটারের দরজায়। তখন ওই স্টার মঞ্চেই তাঁর আসর চলছে। তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানি না।

একে কলকাতা, তায় থিয়েটারের কাণ্ডকারখানা। সকলেই অপরিচিত এবং সকলকে দেখেই ভয় করে। এঁরা বিচিত্র জগতের মানুষ ব'লে মনে হ'ত। কথাবার্তার ঢঙে ভঙ্গিতে শঙ্কিত হতে হ'ত, এবং সেই 'মারাঠা-তর্পণে'র স্মৃতি থেকে আমার মনে কেমন একটা

অখণ্ড ছিল। স্টার থিয়েটারের টিকিট-আপিসে এসে সামনে দাঁড়ালাম। কাকে জিজ্ঞাসা করি? কাকে বলি? অনেক সাহস ক'রে টিকিটের ঘুলঘুলি দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, নমস্কার।

হাতের পেনসিলটা কপালে ঠেকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আমি একবার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কার সঙ্গে?—ভদ্রলোকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে।

মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখা হবে না।

আমি—

হবে না মশায়। তিনি অভিনয় করছেন। এ সময় দেখা তিনি করেন না।

দয়া ক'রে আমার নামটা—

না মশায়, না। যা নিয়ম নেই, তা পারব না।

কি করব? চ'লে এলাম। পথে আপসোস হ'ল, ওঁর বাসার ঠিকানাটা জেনে এলাম না কেন?

পরদিন আবার গেলাম।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর পেলাম—সে দেবার হুকুম নেই শায়। তাঁর শরীর ভাল নয়।

পরের দিন এলাম। সেদিন অভিনয় নেই, সব খাঁ-খাঁ করছে, ফিরে লাম। এই ভাবে দিন আষ্টেক ফেরার পর সেদিন স্টার থিয়েটার কে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে মনে সংকল্প নিচ্ছিলাম, ঃ, এ থিয়েটার-জগতের দরজা আর মাড়াব না।

ঠিক এই সময়টিতেই সাড়া পেলাম—তারাশঙ্করবাবু!

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, আবার সাড়া এল—সামনের ফুটপাথে, মি পবিত্র গাঙ্গুলী।

তখন কলকাতা এমনতর ঘন জনারণ্য হয়ে ওঠে নি, সামনের ফুটপাথের দিকে তাকাতেই পবিত্র গাঙ্গুলী মশায়কে দেখলাম। হাতের তালুতে তামাকের পাতা কচলাচ্ছেন চুন-সহযোগে।

এ পারে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, এখানে? থিয়েটার দেখতে না কি?

না ভাই, এসেছিলাম শিশিরবাবুর কাছে।

ব'লে সকল বিবরণ প্রকাশ ক'রে বললাম, তা হ'ল না। আর হয়েও কাজ নেই। এ দরজা আর মাড়াচ্ছি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের হুকুমে এসেছেন, ফিরে যাবেন কি? আসুন, দেখি আমি।

তিনি উঠে গেলেন, দোতলায়। তার পর একজন সুদর্শন ব্যক্তিকে ধ'রে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে তাঁকে ভিতরে পাঠালেন। বোধ করি মিনিট তিন-চারের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, চলুন, ভিতরে চলুন।

শিশিরকুমার বোধ হয় আলমগীর সেজে ব'সে ছিলেন, 'আলমগীর' অভিনয় হচ্ছিল। আর ব'সে ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি শিশিরকুমারের মামা।

আমরা ঢুকতেই শিশিরকুমার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পবিত্র। আর আপনি তারাশঙ্করবাবু।

আমি নমস্কার করলাম। প্রতিনমস্কার করতে করতেই তিনি বললেন, আরে মশাই, আমি আপনার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

পবিত্র হেসে বললে, কিন্তু বাইরে যে আপনার অনুচরেরা পথ বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। উনি দিন আষ্টেক ঘুরে প্রবেশ-পথ না পেয়ে 'আর আসব না' ব'লে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন মুহূর্তে আমার সঙ্গে দেখা। তাই, আমার কথাই শোনে না কি! অনেক ব'লে-ক'য়ে—

শিশিরবাবু হেসে হাত নেড়ে বললেন, ওদের দোষ নেই—ওদের দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের। মেলা দেনা হয়ে গেছে।

কে পাওনাদার, কে পাওনাদার নয়—ওরা চেনা না; কাজেই এক দ্বার থেকেই ফিরিয়ে দেয়।

এমন সুন্দর কথা বলা শুনি নি।

তার পর বললেন—আমাকেই বললেন, নইলে পবিত্র জানে, কারও ভাল লেখা পড়লে, শিশির ভাদুড়ী তাকে খুঁজে বের ক'রে আলাপ ক'রে আসত। আমার থিয়েটারে নতুন লেখকদের দ্বার ছিল অবারিত; কত আনন্দ গেছে তখন! আজ আমাকে দেখছেন, আমি আমার কঙ্কাল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তার পর বললেন, 'রাইকমল' কিনে প'ড়ে নিয়েছি। ভাল জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস। ভাল হবে। হ্যাঁ। আমি ওই বগ বাবাজীর ভূমিকাটা নেব। একটু অদল-বদল ক'রে নেব। বগের বদলে ব্যাঙ করলেই মানিয়ে যাবে। ছোট কমলের ভূমিকাটা প্রভার মেয়েকে দিয়ে চালিয়ে নেব। তারপর প্রভা। বইটা আমাকে শিগ্‌গির ক'রে দিন। খুব শিগ্‌গির। আমি প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছি।

মাস খানেকের মধ্যে বই দেব ব'লে নমস্কার ক'রে পরিপূর্ণ মন নিয়ে বিদায় নিলাম। ভারি ভাল লেগেছিল এই প্রাণ-খোলা প্রতিভাশালী মানুষটিকে। বার বার মনে পড়েছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের রচিত রামেন্দ্রসুন্দর-প্রশস্তি—তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর—

পরের দিনই বাড়ি চ'লে এলাম 'রাইকমল'কে নাট্যরূপ দেবার জন্যে। একখানা গানও রচনা ক'রে ফেলেছিলাম, প্রথম দৃশ্যটাও লিখে ফেললাম। গানটি এবং আরম্ভ—দু-ই চমৎকার হয়েছিল। ওতে করেছিলাম, রসিকদাস বাউল ঘুরতে ঘুরতে রাইকমলের গ্রামে এসে পড়ল এবং কমল রঞ্জন এদের রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে, গাঁয়ের লোকের চৈত্রসংক্রান্তির পর্ব দেখে, ওইখানে দুদিন চারদিন ক'রে থেকেই গেল। গানটার গোড়াটা ছিল—

"হায় কোন্ মহাজন পারে বলিতে!
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে।"

সে যাক। আমি তখন ভাবিও নি, শিশিরবাবু গান গাইবেন কি ক'রে? কিন্তু সব ভাবনার হঠাৎ সমাপ্তি ঘটল একদিন কাগজ প'ড়ে। দেখলাম, শিশিরকুমার স্টার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়েছেন, এবং হয়তো বা আর রঙ্গালয়ের সংস্রবেই আসবেন না।

দুঃখ খুবই হয়েছিল। তবে শিশিরকুমারের সেদিনের সহৃদয়তা, তাঁর পরিচয় আমার জীবনের সম্পদ হয়ে রইল।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের কথা বলব। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-ভবনে আছেন।

গিয়ে দাঁড়ালাম নব্য বাংলার তীর্থভূমির মত পবিত্র ঠাকুরবাড়ির সামনে। ও-বাড়ি ঠাকুরবাড়িই বটে বাংলা দেশের। সেই আমার প্রথম যাওয়া ঠাকুরবাড়ির এলাকায়। এর আগে চিৎপুরের ট্রামে যেতে বড় বড় থামওয়ালা—খুব উঁচু বড় সিঁড়িওয়ালা বাড়িটিকে দেখে ভাবতাম, এইটিই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। সেদিন ঠাকুরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে—কোথায় যাব, কোন্ দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় পুরনো বাড়ির বারান্দায় দেখলাম শান্তিদেব ঘোষ যাচ্ছেন—বিচিত্রা-ভবনের দিকে। আমি তাঁকে ডাকলাম।

শান্তিদেব আমাকে চিনতেন। তাঁর পিতার স্নেহাস্পদ ছিলাম আমি। শান্তিদেব মানুষটিও বড় স্নিগ্ধ এবং মধুর। যা দেখে ভয় পাই, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁকে ডাকলাম। তিনি নেমে এলেন। অভিপ্রায় শুনেই বললেন, দাঁড়ান, দেখি, কি করছেন!

দেখে ফিরে এসে বললেন, আসুন। একা রয়েছেন, আপনার ভাগ্য ভাল।

বিচিত্রা-ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ছোট ঘরখানিতে মহিমান্বিত কবি বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলেন। সে দিন সেই তাঁর আকাশ-দেখা দৃষ্টি দেখে আমার জন্ম ধন্য হয়েছে। আমি সেই দিন

ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, মুহূর্তে আমার মন ব'লে দিয়েছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো, এই তো সেই কবি, যে কবির মনে আকাশের, মেঘের, গোধূলির আলোর স্পর্শ সুরঝঙ্কার তুলে দেয়, ধ্যানপুলকমগ্ন কবিকণ্ঠে আপনি স্ফুরিত হয়—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হ'ল অকারণে ॥

সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল। আমি দেখলাম, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখে তার ছায়া পড়ছে। এই কবির মনেই আসতে পারে এবং আসে বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ়ের গান। আকাশে বকের পাঁতি উড়ে চ'লে যায়, নীলনভোপটে তাদের সারির শুভ্র লাবণ্য, তাদের পাখার শব্দ এই কবিচিত্তকেই আত্মহারা ক'রে দেয়, গানের ঘরের দুয়ার আপনি খুলে যায় সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যার চোখের পাতার মত।

শান্তিদেব আমার হাত ধ'রে আকর্ষণ করলেন। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন। বোধ করি মিনিট দুয়েক, কি তারও বেশি সময় পরে কবি দৃষ্টি ফেরালেন।

শান্তিদেব ঘরে ঢুকলেন, কবি নিজেই প্রশ্ন করলেন, কই তারাশঙ্কর?

শান্তিদেব বিনাবাক্যব্যয়ে স'রে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর সম্মুখীন হলাম। প্রণাম করলাম। হেসে বললেন, ব'স।

শান্তিদেব চ'লে গেলেন।

আমি বইখানি তাঁর পাশের ছোট টেবিলটার উপর রেখে দিলাম।

বললেন, বই? গল্পের? 'জলসাঘর'! জলসা দেখেছ? গান বোঝ?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

তিনি বললেন, পড়ব। সময় পেলেই পড়ব। তোমার লেখা আমার ভাল লাগে। কলকাতায় কি কাজে এসেছ? বৈষয়িক?

বললাম, বিষয় সামান্য আমাদের। আর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। এই লেখা-টেখার কাজ নিয়েই আসি যাই।

তা ভাল। যদি একেবারে আঁকড়ে ধরতে পার তো ভাল করবে। তবে তাতে দুঃখ পাবে। অনেক দুঃখ। সে দুঃখকে জয় করতে হবে।

আমি বললাম, সংকল্প আমার তাই।

দুঃখকে ভয় ক'রো না, হার হবে না।

তার পর বললেন, আমাদের নৃত্যনাট্য দেখেছ তুমি?

আজ্ঞে না।

কেন? শান্তিনিকেতন বাড়ির কাছে, এসে দেখ না কেন? এস এস। আমি ব'লে দেব তোমাকে জানাতে। কালীমোহনকে ব'লে দেব।

তার পরই বললেন, তোমাদের ওখানে তো অভিনয়ের খুব সমারোহ! দীনু দেখেছেন, গান শিখিয়েছেন। কালীমোহন দেখেছেন, খুব প্রশংসা করেন। আমিও একবার বলেছিলাম, দেখব তোমাদের অভিনয়। কিন্তু তোমরা দেখালে না আমাকে।

কথাটা সত্য। আমাদের লাভপুরের অভিনয়ের মান খুব উঁচু ছিল, সত্যিই অভিনয় ভাল হ'ত। কবির 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখে অনেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকে ভাল হয়েছিল বলেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে দল বেঁধে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কি একটি উপলক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্ম কলকাতায় বর্তমান দীপক সিনেমায়—তখনকার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে—লাভপুরের সম্প্রদায়কে অনুরোধ ক'রে অভিনয় করিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরাই আমাদের মঞ্চসজ্জা ক'রে দিয়েছিলেন। সেই অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা কবির কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি সত্যই বলেছিলেন, ওদের একবার শান্তিনিকেতনে ডাক। আমি দেখব ওদের অভিনয়।

কথা অনেক দূর এগিয়েছিল। কিন্তু কি যে হয়েছিল, কি বাধা যেন

হয়েছিল। যত দূর মনে পড়ছে, কবিরই সময়ের অভাব ঘটেছিল। সেই কথা তুলে হেসে কৌতুক ক'রে বললেন, তোমরা আমাকে দেখালে না। তার পর প্রশ্ন করলেন, তুমি? তুমি পার অভিনয় করতে?

পারি একটু আধটু।

পার? অনেক কিছু পার তুমি। স্বদেশী অভিনয় লেখা। তা হ'লে ভালই পার। নইলে আমার কাছে স্বীকার করতে না। তুমি আমাদের এই নৃত্যনাট্য দেখ। কলকাতাতেই দেখ। শান্তিদেবকে আমি ব'লে দেব। তুমি এসে একখানা প্রবেশপত্র নিয়ে যেও।

আমি অভিভূত হলাম তাঁর স্নেহের স্পর্শে।

দোরের ও-পাশে সিঁড়ির মাথায় পায়ের শব্দ উঠল। অনেকগুলি একসঙ্গে। দেখলাম, গানের মহলার জন্যই বোধ হয়, যন্ত্র হাতে শিল্পীর দল উঠে এসে বড় হলে ঢুকছেন। শান্তিদেব এসে দাঁড়ালেন।

কবি বললেন, তোমার বই আমি পড়ব। বইখানি সরিয়ে তুলে রাখলেন।

আমি প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম। দু-তিন দিন পর শান্তিদেবের কাছে গেলাম, কিন্তু দেখা হ'ল না। তিনি ছিলেন না।

আমি ছায়া মঞ্চে নৃত্যনাট্য দেখে এলাম।

সে কি দৃশ্য!

মঞ্চের বেদীর উপর আসনে কবি বসেছেন, সে যেন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। তার পরেও দেখেছি শান্তিনিকেতনের নৃত্যনাট্য। কবির আসন অপূর্ণ থাকে, তাতেই যেন সব অপূর্ণ। কবিকে নিয়ে যারা সে নাট্য দেখেছে, তাদের চোখে সব ম্লান ঠেকবে।

কবির সেই আবৃত্তি—দে দোল—দোল, প্রিয়ারে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল।

তারই সঙ্গে শান্তিদেবের নাচ। আর সেই আমার প্রথম দেখা। আমার মনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

কবি ক'দিন কলকাতায় ছিলেন, অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত ; লোকজনের সমাগমের তো কথাই নেই। তারই মধ্যে কিন্তু তিনি 'জলসাঘর' প'ড়ে শেষ করেছিলেন এবং আগন্তুক অনেক জনের কাছে বলেছিলেন। তারই দু-চার টুকরো আমার কানে আসতে লাগল।

এর পর কবি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যার ট্রেনে গেলেন। তখন ইরিসিপ্লাসের আক্রমণ শুরু হয়েছে ; বোলপুর পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে কাগজে কাগজে তাঁর অসুখের কথা প্রচারিত হ'ল।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললাম, কবিকে তুমি বাঁচাও। রক্ষা কর। শতায়ু কর। কবি সেরে উঠলেন। তার পরই শান্তিনিকেতন থেকে এক সঙ্গে শ্রীসুধীর কর ও শ্রীরথীন্দ্রবাবুর পত্র পেলাম—'জলসাঘর' বই পাঠাবার জন্য। কে যেন বইখানি নিয়ে গেছে। কবি বইখানি চান। রাগ করছেন না পেয়ে। এসব কথা আগেই লিখেছি। কবির সঙ্গে পরের দেখার কথাও লিখেছি।

এদিকে আমার জীবনের যে অস্থির গ্রহটি আমাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ক্রমাগত তাড়িত ক'রে নিয়ে ফিরছিলেন, তিনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

এমনই একটি অপবাদ আমার ঘাড়ে এসে চাপল যে, আমার পক্ষে এই মেসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই মেসটির সঙ্গে আমার মামা-শ্বশুরদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। অপবাদটা তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার অপবাদ—দিলেন যিনি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সত্যকে তিনি বিকৃত করলেন। আমাকে আঘাত দিলেন আমার মামাশ্বশুরেরা।

আমি ওই মেস ছাড়লাম। এবার এসে উঠলাম হ্যারিসন রোড মির্জাপুর স্ট্রীট জংশনে পূরবী সিনেমার সামনে শান্তিভবন বোর্ডিঙে।

সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি দুজনে সামান্য জিনিসপত্র কটা নিয়ে এসে ব'সে গেলাম শান্তিভবনে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁত

পর্দাটা সরিয়ে উমা ঘরের দিকে উঁকি দিলে। গরাদে মাথা ঠেকিয়ে দেখলে এদিক ওদিক। কেউ কোথাও নেই। বারান্দাও খালি। আশ্চর্য, এখনও রান্নাঘরে কি করছে সুলতা। মানুষ তো আড়াই জন—কর্তা গিন্নী আর ওই ছ'মাসের রক্তের ডেলা। না আছে শ্বশুর-শাশুড়ীর হাঙ্গামা, না ননদ-দেওরের ঝামেলা। রান্নার পাট তো সাড়ে নটার মধ্যেই চুকে যায়—ঘরের মানুষ চৌকাঠে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। তবে?

পর্দা ভাল ক'রে উমা সরিয়ে দিলে। চোখ দুটো কুঁচকে দেখলে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে ডাকলে, লতাদি, ও লতাদি!

বার দুয়েক। গলা চড়াবার আগেই এদিক থেকে দরজার কড়ার শব্দ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সুলতা জানলায় এসে দাঁড়াল, কি ভাই, কতক্ষণ ডাকছ? ওদিকের দরজা বন্ধ ছিল কিনা, তাই শুনতে পাই নি।

ঠিক দুপুরে দরজা বন্ধ যে?—ব'লে উমা মুখ বেঁকিয়ে হাসল। দেয়াল বাঁচিয়ে পানের পিচ ফেলে বললে, কর্তা আফিস বেরোয় নি বুঝি?

আ মরণ তোমার!—সুলতা ভুরু কুঁচকে বললে, কর্তা বাড়ি থাকতে যাবে কোন্ দুঃখে? সাত সকালে নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে গেছে।

তবে অত আগল বন্ধ করার তাড়া কেন? উমা চড়াল গলা, খাদে নামাল। বাড়ি ভর্তি মানুষ। শ্বশুরের খড়মের শব্দ সিঁড়িতে, শাশুড়ী বাথরুমে কর্পোরেশনের বাপান্ত করছেন—চৌবাচ্চার তিন আঙুল তলানিতে আড়াই মণ মাংস ধোয়া সম্ভব নয়, ফাঁকে ফাঁকে ছোট ননদের গানের কলির মিশেল। এর ওপর বউয়ের গলা চড়লে আর রক্ষে নেই। সব হাঁ-হাঁ ক'রে আসবে।

খোকনকে ঘুম পাড়াচ্ছিলুম।—ব'লে সুলতা মুচকি হাসল।

বাব্বা! দরজা-জানলা সব বন্ধ ক'রে?—বিস্ময়ে উমা চোখ দুটো বড় বড় ক'রে ফেললে।

কি করব ভাই, অন্ধকার না হ'লে কিছুতেই চোখ বন্ধ করবে না।

আর কি অসম্ভব দুরন্তই যে হয়েছে, বলবার নয়।—দামাল ছেলেকে নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে সুলতা মুখের এমনি ভঙ্গি করলে। একটু থেমে কপালের ওপর জ'মে-থাকা ঘামের ফোঁটা আঁচল দিয়ে মুছে নিলে। কি বিশ্রী গরমই পড়েছে কদিন। সেঁকা রুটির মতন মানুষের অবস্থা। প্রাণ যাবার দাখিল।

তুমি বেশ আছ ভাই।—সুলতা বললে, ছেলের ঝক্কি পোয়াতে হয় না।

পোয়াতে হয় না আবার!—উমা খাঁজ ফেললে কপালে। ভেঙে-পড়া খোঁপাটা জড়িয়ে নিলে দু হাতে, বললে, দস্যি ছেলে আর কারুর কাছে থাকবে? উনি হাতে নিয়ে পায়চারি করলেন সকালে, সে কি চিল-চেঁচানি। মীরার কোলেও থাকবে না। আশ্চর্য, বাবার কোলে কিন্তু চুপচাপ, যেন সে ছেলেই নয়।

শ্বশুরের কাশির শব্দে উমা থেমে গেল। দরজার বাইরে ভারিক্কি গলার আওয়াজ—বউমা, লোটন ঘুমিয়েছে, শুইয়ে দাও এবার।

উমা আলগোছে কাপড়টা টেনে দিলে মাথায়। কপাল বরাবর নয়, খোঁপা ঢাকা ঘোমটা। নেহাত নিয়ম রক্ষা।

যাই লতাদি, লোটনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসি। দুপুরের দিকে পারি তো যাব; অনেক কথা আছে।

অনেক কথা থাক্ না-থাক্, যাওয়া-আসার কামাই নেই দু বউয়ের।

একেবারে পাশাপাশি। মাঝখানে চার ফুট সড়ক। তেমন ভাবে হাত বাড়ালে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া যায়। কিন্তু মন ছুঁতে না পারলে তৃপ্তি হয় কখনও! ঘেঁষাঘেঁষি ব'সে সুখ দুঃখের পাঁচমিশেলি কথা। পাড়া-বেপাড়ার খবর। ঘরের মানুষের কাণ্ডকারখানা।

কাছাকাছি বয়স, ভাবের অন্ত নেই, আরও বাড়তি গিঁট পড়ল খোকন আর লোটনের ব্যাপারে। আট দিনের তফাত। লোটন আগে, তারপর খোকন।

উমা আঁতুড়ের পরে প্রথমেই সুলতার খোঁজ ক'রে বলেছিল,

লতাদি, খোকন যদি খুকী হ'ত, তা হ'লে লোটনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে ফেলতুম।

সুলতা মুচকি হেসে বলেছিল, আট দিনের ছোট-বড় যে দুজনে! মানাবে কেন?

খুব মানাবে লতাদি, খুব মানাবে। মানানো বুঝি কেবল বয়সে? মনের মিল হ'লেই সব ঠিক হয়ে যায়।

তা হয়তো যায়। এ যুগে হচ্ছে না কি! ভালবাসার বালাপোশ গায়ে জড়ালে সব খুঁত ঢাকা প'ড়ে যায়। বয়সের তফাতই নয়, জাতের তফাতও। তাই আর তর্ক করে নি সুলতা। হেসে বলেছে, আমার বরাত ভাই। অমন ঘরে পড়লে মেয়েটা খেয়ে প'রে বাঁচত।

কিন্তু উমা হাল ছাড়ে নি, বলেছিল, এবারেরটি যেন মেয়ে হয় লতাদি, আগে থেকে বলা রইল।

কপট রাগে ভুরু কুঁচকে সুলতা কিল দেখিয়েছিল। কথা বলে নি। কিন্তু মনে মনে সুলতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। বাব্বাঃ, আর দরকার নেই কিছু হয়ে। সোনার গুঁড়োই বেঁচে থাক্ বাপ-মার কোল জোড়া ক'রে। গরিব গেরস্তর ঘরে মানুষ বাড়ানো মানেই দুঃখ বাড়ানো। মেয়ের শখ সুলতা ছেলেতেই মিটিয়েছিল। সাটিনের ফ্রক, পায়ে মল, কপালে টিপ, সাজিয়ে-গুছিয়ে খোকনকে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

উমা, ও উমা, লোটনকে নিয়ে এস। আজকালকার ছেলে নিজের কনে নিজেই দেখুক।

লোটনকে কোলে ক'রে উমা এসে দাঁড়িয়েছে। লোটনের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, তোকে ঠকাচ্ছে রে লোটন। বল্, ও নকল জিনিস নিয়ে আমি কি করব? তার চেয়ে বছর দুই অপেক্ষা করব, বরং আমাকে আসল জিনিসই দিও।

বউয়েতে বউয়েতে যত, কর্তায় কর্তায় ততটা নয়। একে সময় কম, তার ওপর দুজনের কাজের ঝামেলাও দু রকম।

উমার কর্তা বাপের ব্যবসা দেখে। বাগমারিতে তেলকল। খেয়ে-দেয়ে পান চিবিয়ে বারোটা নাগাদ বেরোয়। হাত-কাটা ফতুয়া, হাঁটুর ওপর ধুতি, পায়ে পানসী প্যাটার্ন জুতো। ফ্যাশানের ধারে ঘেঁষে না। তিন পুরুষে ব্যবসাদার।

সুলতার বর জাত-কেরানী—চার পুরুষের। সওদাগরী আপিসের ফাইলবাবু। বাইরে একটু জমিজমা আছে তাই রক্ষে, নয়তো শুধু মাইনের সিঁড়িতে হেলান দিতে হ'লে, প্রাণ মান দুইয়ের কিছুই থাকত না এতদিন। মাইনে কম, ভবিষ্যৎও কিছু সোনা-চিকচিক নয়, কিন্তু ওর মধ্যেই ভদ্রলোক বেশ একটু শৌখিন। ফরসা জামা-কাপড়, বার্নিশ-চকচকে পাম্পশু, চুলের বাহারও নিন্দের নয়। যেটুকু ঘরে থাকে কেবল নিজের জামা-কাপড়ের খবরদারি। দরকার হ'লে নিজেই ছুঁচসুতো ধরে, কাপড়-কাচা সাবানও।

তা হোক, তবু গলির মোড়ে কিংবা ছাদের আলসেয় দেখা হয়ে যায় দুজনে। এদিক ওদিক ছুটকো কথাবার্তা। কিছু সংসারের, কিছু বাইরের। লোটন-খোকনের কথাও হয়। এক তরফের গুরুজনের কান বাঁচিয়ে আর এক তরফের হালকা রসিকতা।

সেদিন দুপুরের দিকে সুলতাদের বাড়িতে পা দিয়েই উমা হকচকিয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে সুলতা। উস্কখুস্ক চুলের রাশ ঘাড়ের কাছে জড়ানো। শুকনো চোখ-মুখের ভাব। অসুখ-বিসুখ নাকি ?

সুলতাই আগে কথা বললে। ভার ভার গলা—খোকনের শরীর ভাল নয়। জ্বর, পেটের অবস্থা খারাপ, সকালে দুবার দুধ খেয়েছে, কিন্তু পেটে থাকে নি, দুবারই বমি করেছে।

খোকন ঘুমিয়েছে নাকি ? উমার গলাতেও উদ্বেগের ছোঁয়াচ।

হ্যাঁ ভাই, অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে এলুম। বড্ড কান্নাকাটি করছিল—সুলতা আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের দিকে দেখালে।

পা টিপে টিপে উমা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াল। দেখলে হুমড়ি খয়ে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে খোকন—পাশ-বালিশ আঁকড়ে।

যা গরম পড়েছে!—উমা সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার চেষ্টা ক'রে ললে, আমাদেরই শরীর খারাপ হয়ে পড়ে, ও তো দুধের বাছা।

কি জানি ভাই, বুঝতে পারছি না কিছু। উনি ফেরার সময় যাগীন ডাক্তারকে সঙ্গে আনবেন—ব'লে গেছেন।

পাশাপাশি বসল দুজনে। কিন্তু ওই শুধু বসাই। একটি কথাও .য়। বাড়িতে অসুখ হ'লে এধার ওধার উড়ো কথায় কখনও মন 'য়! কলের জল আসতেই উমা উঠে পড়ল।

উঠি লতাদি, ডাক্তার কি বলে রাত্তিরের দিকে একবার খবর দিও।

রাত্রের দিকে নয়, জানলার ধারে এসে সুলতা দাঁড়াল পরের দিন কালে। উমা এদিকের ঘরেই ছিল। ছুটির দিন। কোন পক্ষেই ়ড়াহুড়োর ব্যাপার নেই। থিতিয়ে জিরিয়ে কাজ সারলেই লবে।

খোকন কেমন আছে লতাদি?—হা..র সেলাই রেখে উমা জানলার ারে এসে দাঁড়াল—কাল রাত্তে দু'বার উঁকি দিয়ে গেছি, কেউ কাথাও নেই।

ডাক্তারবাবু ..ছিলেন, বললে.. .ত ওঠবার সময় নাকি এ রকম য়—সুলতা. মুখে হাসির ঝিলিক। ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তারবাবুর াশ্বাস-বাণীর ছটা ওরও চোখে মুখে ফুটে উঠল। কাল সারাটা দিন যে ়বে কেটেছে!

দাঁত ওঠবার সময়?—জোড়াভুরু কোঁচকাল উমা—সরু ভাঁজ ়পালের মাঝখানে, দু চোখে অবিশ্বাসের ছিটে।

হ্যাঁ ভাই, তাই তো বললেন।—সুলতা গুছিয়ে জানলার ধারে সল। মন ভাল আছে। হাত পা ছড়িয়ে গল্প করতে কোন াধা নেই। ঘরের মানুষ ফিরবে বারোটার পর। ছুটির দিন যত

রাজ্যের কাজ। বন্ধু-মহলে টহল, তাসের আসর বসলে তো কথাই নেই। কাগজের বিবি হাতে এলে ঘরের বিবির কথা আর মনে থাকে না।

উমা আগে ভুরু কুঁচকেছিল, এবার নাক সিঁটকাল, বললে, আজকাল যা সব ডাক্তারের ছিরি! সকলেই সবজান্তা। ছ মাস বয়স হ'ল না ছেলের, বলে কিনা—দাঁত উঠছে!

উত্তর দিতে গিয়েই সুলতা থেমে গেল। এলোপাথাড়ি তর্ক করার কোন মানে হয় না। বলার কথা অবশ্য অনেক ছিল। এই যোগীন ডাক্তারই উমার শ্বশুরকে দু-দুবার যমের দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বছর তিনেকও হয় নি। অথচ বেমালুম ভুলে গেল উমা! দাঁত যে উঠছে—এ কথাটা সুলতার নিজেরও মনে লাগে নি। মুখের মধ্যে হাত পুরে দেখেওছে। একটু শক্ত হয়েছে মাড়ি, বাস্, তার বেশি কিছু নয়।

জানি না ভাই, ছেলেটা সেরে উঠলেই বাঁচি।—সুলতা নিশ্বাস ফেললে।

যা উৎকট গরম, অসুখ এই গরমের জন্যেই। দু-একদিনে ঠিক হয়ে যাবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে উমা নিজের মুখটাও গম্ভীর ক'রে তুললে। গিন্নীবান্নী মানুষ, অসুখ-বিসুখের রকমফের তারও কম জানা নেই—ভাবটা এমনই।

দিন দুয়েক পর।

খোকনের বাবা চৌকাঠ পার হবার সঙ্গেই সুলতা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। কোলে খোকন।

এ কোণের ঘরে কর্তার পাঞ্জাবি সেলাই করছিল উমা, সুলতার জোর গলার আওয়াজে লাফিয়ে এ দিকে এসে দাঁড়াল।

কি হ'ল লতাদি? খোকন কেমন আছে?

ভাল আছে ভাই। ডাক্তার যা ব'লে গেছেন সত্যিই তাই। এই দেখো।

বহু কষ্টে খোকনকে হাঁ করিয়ে নীচের ঠোঁটটা ফাঁক ক'রে সুলতা দেখাল। এত অন্ধকারে ঠাওর হবার কথা নয়। কিন্তু আবছা যেন দেখা গেল, লালচে মাড়ির ফাঁকে সাদার আঁচড়, দাঁতই কি না কে জানে!

দাঁত?—উমার গলার আওয়াজ বেশ নিস্তেজ। চেষ্টা ক'রেও ঠিক সহজ হতে পারল না। ভয়-ছমছম স্বর। দাঁত নয়, সুলতা বুঝি ভূতই দেখাল ওকে।

হ্যাঁ ভাই, দেখো না—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবাক কাণ্ড, ছ মাস পুরো বয়স হয় নি, এর মধ্যে—

কথা শেষ হবার আগেই উমা স'রে গেল জানলা থেকে। তাড়াহুড়ো ক'রে আলনা থেকে ব্লাউজটা পেড়ে নিলে। পরনে গোলাপী শাড়ি, ব্লাউজের রঙ সাগর-নীল, তা হোক, মিলিয়ে পোশাক পরার মতন মনের অবস্থা আছে কিনা মানুষের! কিছু বিশ্বাস নেই, কাউকে নয়, কাছে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসাই ভাল।

কাছে গিয়ে উমা অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে, খোকনকে নিজের কোলে শুইয়ে। সন্দেহ নেই। দাঁতই বটে। মাড়ির মাঝখানে সাদা ফুটকি। এর মধ্যেই কি ধার? আঙুলে লাগতেই উমা হাত বের ক'রে নিলে। কচি দাঁত দিয়ে খোকন উমার হাতই নয়, মনটাও বুঝি চিরে দিয়েছে।

এ ছেলের যে অল্পবয়সে দাঁত বেরুবে—এ যেন জানা কথা। বয়সের চেয়েও খোকন সব বিষয়ে চালাক। এখনই কথায় কথায় কি হাসি! বাপ আর মাকে আলাদা ক'রে চিনতে শিখেছে। কোল থেকে হঠাৎ নামিয়ে দিলে কি অভিমান ছেলের!—সুলতা নিজের মনেই ব'লে গেল খোকনকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে। অথচ একটি কথাও বোধ হয় উমার কানে গেল না। ঘোষালদের উঠনের নিমগাছের দিকে চেয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে রইল সে, তারপর হঠাৎ কথাটা মনে পড়েছে এমনই ভাবে বললে, চলি লতাদি, আজ আবার আমার বোনেরা আসবে দমদম থেকে। খবর পাঠিয়েছে।

৩

নিজের ঘরে ঢুকে উমা সন্তর্পণে ঘুমন্ত ছেলের পাশে বসল। এদিক ওদিক চেয়ে লোটনের মুখটা ফাঁক ক'রে আঙুল বুলোল মাড়ির চারপাশে। তুলতুল করছে মাংস। কোথাও একটু শক্ত ডেলাও নেই। সামান্য আঁট আঁট ভাবও নেই। আশ্চর্য, অথচ লোটন খোকনের চেয়ে পুরো আট দিনের বড়। লোটনকে কোলে ক'রে উমা বারান্দায় নিয়ে এল। হাঁ করিয়ে দেখতে যাবার মুখেই বাধা। শাশুড়ী এদিকে আসছিলেন, ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়ালেন—ও কি হচ্ছে বউমা, ঘুমন্ত ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

মাড়িটা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে মা, তাই দেখছি দাঁত উঠছে কি না?

আচারের বাটিটা শাশুড়ী মেঝেতেই নামিয়ে রাখলেন, একটা হাত গালে ঠেকিয়ে বললেন, আ আমার পোড়া কপাল, ছেলের এখনও ছ মাস পুরো বয়স হয় নি, এর মধ্যে দাঁত উঠবে কি বউমা?

কেন মা?—উমার গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ—ওই তো স্থলতাদির ছেলের দাঁত উঠেছে। দিব্যি করকর করছে। লোটন তো আট দিনের বড় ওর চেয়ে।

তা হোক, ওদের বাড়ন্ত গড়ন। এদের তো আর তা নয়। লোটনের বাপের দাঁত উঠেছিল ভরা আট মাসে। সে কি কষ্ট! ডাক্তার এসে মাড়ি চিরে দেয়, তবে দাঁত বেরোয় ছেলের।

রূপকথার কাহিনী শুনছে এমনই মুখ-চোখের ভাব উমার। তাই. বল। বংশের দোষ। আট মাসে দাঁত, আটাশ বছরে বোধ হয় দাড়ি-গোঁফের রেখা দেখা দেবে। সব দেরিতে। হয়তো বুদ্ধিও।

সারাটা দিন উমা আর এ দিকের জানলার ধারে কাছে ঘেঁষল না। বাক্স খুলে শাড়ি জামা বের ক'রে গোছাল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে আলমারি আর টেবিল মুছল অনেকক্ষণ ধ'রে, শেষকালে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসল। কাজের চেয়ে মেশিনের শব্দ আরও প্রকট। কতকটা যেন ইচ্ছা ক'রেই। এ জানলার কোনও আওয়াজ যেন কানে না আসে—ওর নাম ধ'রে ডাকার শব্দ।

একটু পরেই ননদ মীরা এসে দাঁড়াল দরজায়, বললে, ও বউদি, স্থলতা-বউদি যে ডাকছে তোমায়! পনেরো মিনিটের ওপর!

কাটা কাপড়ের টুকরো উমা হাত দিয়ে সরিয়ে রাখল। বিরক্তিতে ভুরু দুটো বাঁকিয়ে বললে, জ্বালাতন রে বাবা, একটু কাজ করার জো নেই! কিসের যে এত ডাকের ঘটা তা তো বুঝি না। ছেলের দাঁত উঠছে ব'লে ধরাকে একেবারে সরাজ্ঞান করছে।

এত কথা বুঝল না মীরা। এর আগে এক ডাকে হাতের জরুরী কাজ ফেলে বউদিকে জানলার ধারে ছুটে যেতে দেখেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপও শুনেছে। দরকারী কিছু নয়, এলেবেলে কথা। কিন্তু আজ আবার কি হ'ল? বললে, বলিগে—তুমি কাজ করছ, যেতে পারবে না। মীরা ঘুরে দাঁড়াতেই উমা বাধা দিলে, না-না, ও কথা বলতে হবে না। বল—বউদির শরীরটা খারাপ, বউদি শুয়ে আছে।

কথা ব'লে উমা সত্যি সত্যিই মেঝের আঁচল পেতে শুল। সারাটা দিন কম খাটুনি গিয়েছে! দেহের ক্লান্তির চেয়েও মনের ক্লান্তি যেন বেশি। কাজ খুঁজে খুঁজে কাজ করা।

শুল বটে, কিন্তু চোখ বুজল না। কান পেতে রইল সিঁড়ির দিকে। শরীর খারাপ শুনে লতাদি না এসে পারবে না। মিনিট কুড়ি। কোনও সাড়াশব্দ নেই। আস্তে আস্তে উঠে উমা এ ঘরের দরজার পাশ থেকে উঁকি দিলে। একেবারে সামনাসামনি। দেখতে কোনও অসুবিধা নেই। খোকনকে শুইয়ে দিয়ে পাশে স্থলতা উপুড় হয়ে শুয়েছে। হাতে লাল রঙের বেলুন। বেলুনটা দোলানোর তালে তালে খোকন খিলখিল ক'রে হেসে উঠছে। সোহাগ হচ্ছে ছেলের সঙ্গে, এখন কি আর পড়শীর দুঃখের কথা মনে আছে?

ঘেন্না! ঘেন্না! মুখটা বিকৃত ক'রে উমা স'রে গেল সেখান থেকে। দাঁতের গরবে আর চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না! হায় রে, আগে দাঁত ওঠা মানে, আগে দাঁত পড়া—এ সোজা কথাটা আর মনে এল না? কথাগুলো মনে মনে আওড়ালে বটে, কিন্তু পায়ে পায়ে লোটনের

কাছে গিয়ে দাঁড়াল উমা। দাঁতের ব্যাপার কিছু বলা যায় না। হঠাৎই তো ওঠে, যার ওঠে সে ছাড়া আর কেউ টেরও পায় না।

এদিক ওদিক দেখে লোটনের মাড়িতে উমা হাত ছোঁয়াল। না, কোনও সম্ভাবনা নেই। বংশছাড়া হবে নাকি ছেলে! বাপ-পিতামহের ধারা পাবে না!

সন্ধ্যার ঝোঁকে উমা এদিকের ঘরে এসে দাঁড়াল। গা ধুয়ে কাপড় বদলাতে আলনার দিকে হাত বাড়িয়েই থেমে গেল। ওদিকের জানলায় সুলতা দাঁড়িয়ে, কোলে খোকন।

কি ব্যাপার, সকাল থেকে যে তোমার পাত্তাই নেই?—সুলতা হাসল। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে উমা উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল নেই সারাটা দিন। দাঁতে কাপড় চেপে ধরায় কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাল। ঠিক হয়তো বোঝা গেল না। সুলতা বললে, আজ ভারি মজা হয়েছে ভাই।—কথা বলার আগেই গরাদ চেপে সুলতা হাসতে শুরু করলে।

উমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মজাটা শোনাই যাক না।

উনি আপিস থেকে এসে খোকনকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, অমনি খোকন ওঁর হাতটা টেনে নিয়ে কচি দাঁত দিয়ে কুটুস ক'রে—

কথা শেষ হবার আগেই উমা ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলার ওপর। এক হাত দিয়ে জানলার পাল্লা বন্ধ করতে করতে খিঁচিয়ে উঠল, আশ্চর্য লতাদি! দাঁত যেন আর কস্মিনকালে কারও বেরোয় নি। কদিন ধ'রে এমন ব্যাপার ক'রে তুলছ! কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তোমার খোকনকে কোলে ক'রে জন্ম জন্ম তোমরা সোয়ামী-স্ত্রীতে দাঁত দেখ ব'সে ব'সে। আমাদের কিছু জানাবার দরকার নেই।

সশব্দে জানলা বন্ধ ক'রে দিল উমা, কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করার আগে নিজের দাঁতের সার বের ক'রে সুলতাকে দেখাল। কুড়ি-ক্যাণ্ডেল বাতিতেও ঝকঝকে শাণিত দাঁতের সার।

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মনোবিদের দৃষ্টিতে অপরাধ ও অপরাধী

সাধারণ ভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেকের অনেক কিছু কাজই আমরা অপরাধ ব'লে গণ্য করি, এবং সচরাচর অনেককেই চলতি কথায় অপরাধী ব'লে থাকি। কিন্তু সংসারে এমন অনেক অপরাধ আছে যার জন্যে আমরা অপরাধীকে দণ্ডনীয় ব'লে মনে করি না; আবার এমন অনেক অপরাধীও আছে যাদের কাজ সব সময় আইনত অপরাধ ব'লে গণ্য হয় না। যেমন, শিশু মাতাপিতার কাছে অনেক সময় এমন সব অপরাধ করে যাতে তাকে দণ্ডনীয় ব'লে গণ্য করা হয় না, আবার মাতাপিতাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক সত্যিকার অপরাধ করলেও দণ্ড গ্রহণ করা উচিত ব'লে মনে করেন না। চাকরের পক্ষে বাজারের পয়সা চুরি করা অপরাধ, প্রেমাস্পদের কাছে প্রেম নিবেদন না করা অপরাধ, একান্নবর্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠের মত গ্রাহ্য না করা অপরাধ, আবার রাত্রে গৃহিণীর সুবিধা-অসুবিধায় কর্ণ না শুনে নাসিকা গর্জন করাও অপরাধ। কিন্তু এগুলো সাধারণভাবে দণ্ডনীয় নয়। আইনের মার-প্যাঁচে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারলে বা নানা রকম ব্যবস্থায় কালোবাজার চালাতে পারলে সকলেই সব সময় আইনত অপরাধী ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু দেখা যায় যে কোন দাগী চোর কোন ভদ্রলোকের হারিয়ে-যাওয়া পয়সাটা কুড়িয়ে দিলেও লোকে বলবে—ওর চুরি করবারই মতলব ছিল, নেহাত পারলে না, তাই ফেরত দিলে। তাই বলি, অপরাধ করলেই সব সময় অপরাধী হয় না এবং অপরাধী হ'লেই সব সময় অপরাধ করে না।

অপরাধ ও অন্যায় এই দুটোই আপেক্ষিক মাত্রা মাত্র। স্বাভাবিক ভুলও অনেক সময় আমরা অপরাধের পর্যায়ে ফেলি। ভুল আমরা তাকেই বলি, যা মনের অগোচরে হয় নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে। কিন্তু অন্যায় কাজের মধ্যে একটা ইচ্ছার আভাস থাকে। মাত্রা ও প্রকার ভেদে অন্যায় ও অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ হয়। কতকগুলো কাজকে আমরা বলি—অন্যায়, আর কতকগুলোকে বলি—অপরাধ।

এর মধ্যে কতকগুলো অপরাধ দণ্ডনীয়, কতকগুলো বা দণ্ডনীয় নয়। শিশুর পক্ষে মাতাপিতার অবাধ্যতা থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের ডাকাতি খুন জখম ইত্যাদি সবই আমরা অপরাধের পর্যায়ে ফেলি। কিন্তু তাই ব'লে এর মধ্যে সব কিছু কাজই আমরা দণ্ডনীয় ব'লে স্বীকার করি না।

এই অপরাধজনিত দণ্ডের মাত্রা ও প্রকার ভেদ আছে। আইনত যেমন ছ মাস ছ মাস বা যাবজ্জীবন জেলে দিয়ে দণ্ডের মাত্রাভেদ করা হয়, তেমনই গয়লার বাড়ির দুধের হিসাব ছিঁড়ে ফেললে হয়তো বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে অনেক অঙ্ক কষতে বা হাতের লেখা লিখতে দিয়ে দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু কোন কোম্পানির মূল কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললে বিচারালয়ে অপরাধীর শাস্তিবিধান হয়। এই ভাবে প্রকার ও মাত্রা ভেদে অপরাধ ও অপরাধীকে আমরা বিভিন্ন স্তরে ফেলি।

শিশুরা কোন অন্যায় বা অপরাধ করলে তাকে আমরা এইভাবে শিক্ষা দিতে চাই, যাতে সে ভবিষ্যতে আর ঐ রকম অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি না করে। কিন্তু একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অন্যায় কাজের জন্যে না খেতে দেওয়া, দরজা বন্ধ ক'রে রাখা, এমন কি একটু আধটু মারপিট ক'রেও শাস্তিবিধান ক'রে থাকি। আবার যখন তার চেয়ে আর একটু বয়েসে বড় হয়, তখন প্রায়ই তার ক্ষেত্রভেদে বিচারের ভার পড়ে পাড়ার বা সমাজের, এমন কি সময় সময় আত্মীয়দের ওপর। কিন্তু পূর্ণবয়স্কদের অপরাধের বিচার প্রায়ই বিচারালয়েই হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শাস্তির প্রকার ও মাত্রা ভেদে শাস্তি দেবার কর্তৃত্বও বিভিন্ন লোক সম্প্রদায় ছড়িয়ে যায়।

বিশেষ ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অপরাধেরও প্রকার ও মাত্রা ভেদ আছে। অপরাধ নানা রকমের হয়। যেমন সামাজিক অপরাধ, শ্লীলতাজনিত অপরাধ, শারীরিক অপরাধ, অর্থের ক্ষতিকর অপরাধ, হিংসামূলক অপরাধ ইত্যাদি। ইদানীং কালে সব রকমের

অপরাধ আইনত অপরাধ ব'লে গণ্য হয় না। কেবলমাত্র অপরাধের মাত্রার অতিরিক্ততা ও অন্যের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর কাজই আইনত অপরাধ ব'লে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে পুরাকালে কৌটিল্যের মতে নানা প্রকার অপরাধের বর্ণনা ও তার জন্যে মাত্রা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন দণ্ডের বিধান ছিল। মহানির্বাণতন্ত্রেও নানা প্রকার অপরাধের বর্ণনা ও শাস্তির বিধান পাওয়া যায়। ইংরেজ-শাসনযুগে ইংলণ্ডের আইনের অনুকরণে এ দেশেও অপরাধ ও দণ্ডের আইন প্রস্তুত হয়েছিল এবং এখনও তাই চলছে। হিন্দু-আমলে অসামাজিকতা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সব রকমেরই অপরাধ বা অন্যায়ের শাস্তি-বিধান ছিল। মুসলমান-যুগে তার কিছু পরিবর্তন ক'রে তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী বিচারপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়। ইংরেজ-আমলে মূলত অন্যের ক্ষতিকর কাজ ছাড়া প্রায় আর কোন অপরাধই আইনত দণ্ডনীয় হয় না। সুতরাং এখন অন্যান্য অপরাধ বা অন্যায়ের বিশেষ কোন শাস্তি-বিধান নেই। এখন সামাজিক বা শ্লীলতাজনিত অপরাধের বিচার সাধারণভাবে সমাজের ওপরই ছেড়ে দেওয়া আছে এবং অতি-আধুনিক কালে এই সমাজের বিচার ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে। এতে ভাল হচ্ছে বা খারাপ হচ্ছে, তার বিচার করা সম্ভব নয়। দেশ, কাল ও জাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে। তাই আইনত দণ্ডনীয় নয় এমন সব অপরাধ কমাতে হ'লে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা দরকার।

অশ্লীল বা অন্যায় ব্যবহার বা কথাবার্তা, অসামাজিক জীবন যাপন বা সেই রকম কাজে সাহায্য করা, অন্যের সম্বন্ধে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি ধরনের সামাজিক অপরাধ আজকাল বিশেষ-ভাবে দণ্ডনীয় ব'লে প্রায়ই গণ্য করা হয় না। একটু আধটু মারপিট বা অল্পসল্প চুরিও এই ভাবে প্রায়ই দণ্ডের আড়ালে চ'লে যায়। (কিন্তু চুরির মাত্রা রাখা দায়। তাই আজকাল কালোবাজারের কলাকৌশল ক্রমশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে।) কাউকে অপমান বা তাকে

নানা ভাবে হীনবল বা হেয় করাও দণ্ডনীয় ব'লে ধরা হয় না ; তবে একেবারে খুন ক'রে ফেললে বা প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করলে আইনের আওতায় এসে পড়ে। মোটামুটি ভাবে এই দাঁড়িয়েছে যে, আইনের বিধানের বিরুদ্ধে কাজ করলেই অপরাধ করা হয় এবং অপরাধীর সৃষ্টি হয়। প্রসিদ্ধ লেখক সুইফ্‌ট্ বলেছেন যে, কালো রঙের গরুকে সাদা রঙ ব'লে প্রমাণ করাই আইনের কাজ। কিন্তু বার্নার্ড শ বলেছেন যে, অন্যের বিষয় অগ্রাহ্য বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মনোভাব-সম্পন্ন লোকেরাই হচ্ছে স্কাউন্‌ড্রেল বা পাজী লোক।

একটু চিন্তা করলে এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অপরাধের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা বেশি কারণ হচ্ছে মূলত অসমাজপ্রবণতা। সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চলা বা সমাজের অনিষ্ট অর্থাৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা আনাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে নিকৃষ্টতম অপরাধ। শ্লীলতা, দৈহিক, আর্থিক ইত্যাদি জনিত অপরাধের প্রধান কারণ অসামাজিকতাপ্রবণ মনের বিকৃতি। এই ভাবের মনের বিকৃতি অবশ্য পাগলের পর্যায়ে পড়ে না। এটা হচ্ছে মনের সাম্যভাবের অভাব। যখনই মানুষ তার সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তখনই তার বাহ্যিক আচার-ব্যবহার এমন ভাবে প্রকাশ পায়, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজে অপরাধ ব'লে গণ্য হয়। মানুষ সামাজিক জীব-বিশেষ। সামাজিকতার ভাব মানুষের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হয়ে না উঠলে মানুষের দৈহিক বৃত্তিগুলো স্বভাবতই এমন ভাবে প্রকাশ পায় যাতে তাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ভেবে দেখুন, এই সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে শিশুকাল থেকে জীবনভোর আমরা কি প্রাণপণ চেষ্টা না ক'রে থাকি, অর্থনীতিই বলুন আর রাজনীতিই বলুন মূল উদ্দেশ্য অসামাজিকতার সহজ সমাধান। মানুষ বড় হয়ে ওঠে সমাজের আবেষ্টনে, সমাজের রসে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সমাজকে কিছু দেবার প্রত্যাশায়—আর এইটাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সমাজের চিন্তা না থাকলে মানুষ যে

কাথায় তলিয়ে যেত তা ভাবাও যায় না। মানুষ নামক জীব প্রথমত ামাজিক মানুষ না হ'লে তার পক্ষে ভগবচ্চিন্তাও সুদূরপরাহত।

অনেকেরই ধারণা যে মানুষমাত্রেই সাধারণত অপরাধপ্রবণ। :র্থাৎ সমাজের পরিবেষ্টনে জীবন পরিচালিত না হ'লে বোধ হয় ৎত্যেকেই অপরাধী হয়ে দাঁড়াত। অবশ্য এ সম্বন্ধে নানা রকম তামত আছে। সমাজের সবাপেক্ষা ছোট গণ্ডী হচ্ছে বাড়ি। াড়ির লোকদের শিক্ষার ভিতর দিয়েই শিশুর মন নিয়মিত হয়। তাই দখা যায় যে, যে-পরিবারে কলহ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার কিংবা যখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বর্তমান, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের ঀপরাধী হয়ে পড়বার আশঙ্কা খুব বেশি। আবার এও দেখা গেছে য, যেখানে ছেলে-মেয়েদের প্রতি অযত্ন ও অগ্রাহ্য করা হয় সেখানেও ঀপরাধীর সংখ্যা বাড়বার সম্ভাবনা খুব বেশি। ছন্নছাড়া বাপমায়ে-খদানো ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে।

বাড়ির বাইরেও পারিপার্শ্বিকের চাপ অগ্রাহ্য করবার মত জিনিস য়। সঙ্গ দোষ বা গুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রমশ প্রকাশ পায় নানা ভঙ্গিমায়—এটা সকলেই জানেন। অপরাধীও সুস্থ পারিপার্শ্বিকের আবেষ্টনে হয়ে পড়ে নিরপরাধ এবং নিরপরাধও দুষ্ট পারিপার্শ্বিকের চাপে হয়ে পড়ে অপরাধী। এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন দেশেই বিরল নয়। এই অপরাধপ্রবণতার আর একটি কারণ লক্ষ্য করা যায় দৈন্যতা। দৈন্যতার দুঃখে অনেকে নানা ভাবে নানা রকম অপরাধ ক'রে ফেলে। দৈহিক অক্ষমতার জন্য যে অনেকে নানা রকম অস্বাভাবিক কাজ ক'রে ফেলে তা সকলেই জানেন। কথায় বলে 'কানা খোঁড়ার একগুণ বাড়া'। দৈহিক অক্ষমতা মনকে যে ক্লেশ দেয় তা পূরণ করতে নানারকম দুষ্ট পন্থা অবলম্বন করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। খানিক কষ্ট দূর করার যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা মানুষের স্বভাব। এই রকম দৈহিক-অক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের মনের সন্তুষ্টিজনক কাজ দিলে তাকে দূষিত পন্থা ত্যাগ করানো সম্ভবপর

হয়। আসল কথা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে অসাচ্ছন্দ্যবোধ সৃষ্টি হয় সেটাকে তাড়াতে না পারলে অপরাধীর অপরাধ সহজে সারবার নয়।

আগেই বলেছি যে, অপরাধ করলেই সকলেই যে অপরাধী আমরা তা সব সময় স্বীকার করি না। সাধারণত দেখা যায় যে, আইনের লিখিত সংবিধানই অপরাধীর অপরাধ নির্ণয় করতে সাহায্য করে। কিন্তু যে সব 'বেদে' বা যাযাবর লোক সারাজীবন দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তাদের তো আর কোন লিখিত আইন নেই। তাই ব'লে কি আর তাদের মধ্যে কোন কাজই অপরাধ ব'লে গণ্য হয় না, না, তাদের মধ্যে কেউই অপরাধী হয়ে দণ্ড নেয় না? তাদের মধ্যেও তাদের হিসাবমত অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয়, এমন কি তার জন্যে দণ্ডের বিধান আছে। তাদের এমন সব চলতি নিয়ম আছে যে, সে সব থেকে বাইরে গেলেই অপরাধ করা হ'ল ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। তাদের সে সব চলতি নিয়ম তাদের সমাজের অনুকূলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সব জায়গাতেই এবং সব সময়েই সমাজ যা মানে এমন সব কাজের বিরুদ্ধাচরণ করাই অপরাধ ব'লে গণ্য হয়। মূলত সমাজের ভিত্তিতেই অপরাধ নিরপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ হয়।

কিন্তু সমাজে অপরাধীর স্থান কোথায়? কেউ জেলে গেলে বা অন্য কোনপ্রকারে একবার অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত হ'লে তাকে আমরা এমন ভাবে চিহ্নিত ক'রে রাখি যে, ভবিষ্যতে তার আর সুস্থ পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়ার মধ্যে আসবার কোন উপায়ই থাকে না। কেউ হয়তো কোন মানসিক কিংবা দৈহিক তাড়নায় হঠাৎ একবার কোন অন্যায় বা অপরাধ ক'রে ফেললে, অথচ তার পক্ষে অপরাধ করা স্বাভাবিক নয়—সুস্থ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকলে হয়তো তার ওই রকম অপরাধজনক কাজ করবার কোন কারণই ঘ'টে উঠত না। কিন্তু সমাজের পক্ষে তাকে ওই ভাবে 'দাগী' ক'রে দেওয়ার

দরুন তার আর ভাল হবার কোন উপায়ই থাকে না। মনের তীব্র গতিতে সে এক অপরাধের পর অন্য আর এক অপরাধের পথে ক্রমশ অগ্রসর হয়। ক্রমে ক্রমে সে হয়ে ওঠে সমাজের শত্রু। অপরাধী নির্ণয় করা যেমন সমাজের কাজ, অপরাধীকে ভাল করার দায়িত্বও সম্পূর্ণ সমাজের। প্রসিদ্ধ লেখক ভিক্টর হিউগোর লেখা 'লে মিজারেব্‌ল্‌'-এর প্রধান চরিত্র জাঁ ভালজাঁর কথা আশা করি সকলেই জানেন।

কি কি কারণে বা কত প্রকার অপরাধ লোক ক'রে থাকে তার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, এবং সে সব সারাবার মনঃসমীক্ষণের পন্থা সম্বন্ধেও আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে এমন অনেক অপরাধী আছে যাদের মনঃসমীক্ষণের পন্থায় অনেক সময়ে একেবারে সারানো সম্ভব হয় না। সাময়িক ভাবে বা আপাতদৃষ্টিতে তাকে সারানো হয়েছে মনে করলেও অনেক সময় ভবিষ্যতে মনের নানা গতি, তার মনের দুষ্ট ভাব আবার নানা ভঙ্গীতে ও বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ পায়। এর সম্পূর্ণ নিরাময় করতে হ'লে চাই সুস্থ পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি এবং অনুকূল সামাজিক মনোভাবের বিকাশ।

শ্রীসুহৃদচন্দ্র সিংহ

হিমালয়

সূর্যোদয়

দেবতাত্মা গিরিরাজ সম্মুখে আমার
তরঙ্গিত মহাছন্দ স্তব্ধতা গহন,
অথবা কালের স্রোত নিঃশব্দ ভীষণ
সহসা ধরেছে মূর্তি দিগন্ত-প্রসার।
পাইনের বনে বনে স্তম্ভিত আঁধার
গলিয়া ধরিছে রূপ শ্যামল শোভন—
ঘেরিয়া সুদূরে হোথা পূরব গগন
ঝলকি উঠিতে চাহে জ্যোতিঃ-পারাবার।

উদয়-বীণার তারে আলোক-ঝঙ্কারে
বাজিছে ভৈরবী সুর কালের প্রান্তরে,
ধ্যানমগ্ন মহাকাল-ললাটের 'পরে
শোভিল সিন্দূর-বিন্দু সবিতা-আকারে।
অবারিত জ্যোতিঃধারা, ভরিয়া অম্বর,
হে রুদ্র, তোমার হাসি প্রসন্ন সুন্দর।

অভিযান

উদ্ধত উন্নতশির হিমাদ্রি ভীষণ,
অজানিত যে রহস্য রেখেছিলে হরি'
সবলে আপন বক্ষে এতকাল ধরি,
মানবের দৃষ্টি হতে করিয়া গোপন,
শিখরে শিখরে তব যে-রূপ মোহন
যে-অশ্রুত গীত-ধারা অপূর্ব বাঁশরী
তুষারের শুভ্রগানে নিত্য ঝরি ঝরি
ভরিয়াছে মানবের জাগ্রত স্বপন,
উদ্‌ঘাটিত সে রহস্য—বল এইবার
যে-মূরতি ঝলকিল স্বচ্ছ বুকে তব
তাহার রহস্য-কথা, কীর্তি অভিনব
করিতে পারিলে ভেদ অগম অপার ?
তোমার সে দুর্জয়তা প্রকৃতির দান,
তাহারে করিয়া জয় মানব মহান।

টেনসিং

১

প্রভাতে সন্ধ্যায় কত জীবনে আমার
দুর্লঙ্ঘ্য শিখর তব, হিমাদ্রি ভীষণ
ভৈরব আহ্বান তার করেছে প্রেরণ,
হেরিয়াছি মুগ্ধনেত্রে পুঞ্জিত তুষার।

শিশুকাল হতে দেখিনু যে বার বার
তোমারে জিনিতে কত দুঃসাধ্য সাধন
মুহুঃসহ কি প্রচেষ্টা, কত প্রাণ পণ!
গেছে তারা চিরতরে ফিরে নাই আর।

তোমার সে দুর্জয়তা প্রবল নিষ্ঠুর
ফিরাতে পারে নি মোরে আকর্ষণ তব
জাগায়েছে চিত্ত ভরি চেষ্টা নব নব,
স্বপ্নে মোর বাজায়েছে সুমধুর সুর।
তোমারে করিব জয় করিয়াছি পণ।
বিসর্জিব তারি লাগি সর্বস্ব আপন।

২

উত্তরিনু অবশেষে, ঐশ্বর্য তোমার
অবারিত দৃষ্টিপথে। বর্ণিব কেমনে
হেরিতেছি সত্য, মায়া অথবা স্বপনে
জীবন-আরাধ্য মূর্তি, দেবতা আমার!
ত্র্যম্বকের অট্টহাস্য শুভ্রতা অপার
ফাটিয়া পড়িল বুঝি সমগ্র ভুবনে,
অথবা হেরিনু আমি নির্বাণ গহনে
পুঞ্জীভূত শুভ্র জ্যোতি মানব আত্মার?

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহ'—অনির্বচনীয় সেই মহাজ্যোতিঃ
লভিলাম—তার পরে পরম বিরতি—
মুহূর্তেই জন্মান্তর ঘটিল সহসা।
দৃষ্টি হতে স'রে গেল কুহেলিকা-জাল
হেরিলাম ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ মহাকাল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

মহাস্থবির জাতক

আট

আমরা স্টেশনে যে দোকানে রোজ খেতে যেতুম সেই দোকানে চা বিক্রি হ'ত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কোথা থেকে দুধ কেন?

সে বললে, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে শহরের এক জায়গা থেকে।

—আচ্ছা, আমরা যদি রোজ তোমায় এখানে দুধ দিয়ে যাই, তবে আমাদের কাছ থেকে নেবে?

লোকটা বললে, চায়ের জন্যে আমরা ছাগলের দুধ নিই—ওজন্যে ছাগলের দুধই ভাল। আমাদের সারা দিন-রাতে পাঁচ সেরেরও বেশি দুধের দরকার হয়।

আমরা বললুম, তাই দেব, কিন্তু নগদ দাম দিতে হবে।

লোকটা রাজী হয়ে গেল। সে বললে, তোমাদের আরও খদ্দের যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

লোকটার কথা শুনে আমরা খুব উৎসাহিত হলুম। ভাবলুম, সত্যিই ছাগলের দুধের ব্যবসা করলে তো মন্দ হয় না। আমরা ব'সে ব'সে তার সঙ্গে এই সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করতে লাগলুম। কোথায় ভাল ছাগল পাওয়া যায়—কোথাও ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি না, ইত্যাদি আরও অনেক কথা হ'ল।

দিন দুয়েক আলোচনা ক'রে এই দোকানদারের কাছ থেকে অনেক সন্ধান পাওয়া গেল। সে বললে, স্টেশনের কাছেই একটা খোলার বাড়ি খালি ছিল, সেটা পেলে তোমাদের ছাগল রাখাও চলবে, থাকাও চলবে। অনেকখানি খোলা জায়গাও আছে সেখানে। সেটা এখনও খালি আছে কি না তার খোঁজ করতে হবে।

আবার উৎসাহ ও আশায় বুক দশ হাত হয়ে উঠল। আমরা 'সে থাকবার ছেলে নয়—মোজা-গেঞ্জির কারবার ফেল হয়ে গেছে

ব'লে কি জীবনে হতাশ হয়ে ব'সে থাকতে হবে। দুধের কারবার ক'রে বড়লোক হয়েছি শুনলে হয়তো অনেকে নাক সিঁটকোবে—তা সিঁটকোক্‌গে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। ব্যবসায়ে ছোট বড় নেই, এই ক'রেই তো বাঙালী জাতটা গেল।

সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরে রামসিংহের স্ত্রীকে বললুম, দেখ, রাত্রে তো শীতের চোটে ঘুমুতে পারি না; আমাদের জন্যে একটা ক'রে আঙ্গেঠি জ্বালিয়ে দিতে পার?

সে বললে, একটা তো সারারাত্র জ্বলবে না—তোমাদের একটা ক'রে দিচ্ছি, রাত্রে যখন শীত অসহ্য হবে তখন উঠে জ্বালিয়ে নিও।

সে তিনটে ভাঙা হাঁড়িতে শুকনো ছাগলের নাদি ভ'রে দিলে। দেখলুম, ঘরের এক দিকে পাহাড়ের সমান উঁচু ছাগলের নাদি জমা ক'রে রাখা হয়েছে—একটি নাদি তারা নষ্ট হতে দেয় না। সারা বছর ধ'রে নাদি জমা হয়।

এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার নাম কি?

সে বললে, সুরয।

জিজ্ঞাসা করলুম, সুরয কি? তোমায় কি ব'লে ডাকব? সুরযবাই?

সে একটু লজ্জিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, ওই নামেই ডেকো—সুরযবাই।

একটু পরে সুরযবাই বললে, আঙ্গেঠির জন্যে একটা ক'রে পয়সা দিতে হবে।

শীতের ঠেলায় পয়সা দিতে রাজী হতে হ'ল। সেই হরে-দরে দৈনিক ছ-পয়সা ক'রেই লাগতে লাগল।

স্টেশনের সেই দোকানদার খবর দিলে, সেই বাড়ির বাড়িওয়ালা এখানে নেই, দিনকতক পরে আসবে—তবে বাড়িটা এখনও খালি আছে।

যা হোক, আমরা অন্য বাড়িও দেখতে লাগলুম। ছাগলও দু-চারটে দেখা গেল, দরদস্তুরও চলতে লাগল। স্টেশনের কাছের

বাড়িটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। কারণ স্টেশনের একজন হকারের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে, সে কিছু কমিশন নিয়ে যাত্রীদের গরম দুধ বিক্রি করবে। যাত্রীদের দুধ বিক্রি করতে পারলে খুব লাভ হয়। কারণ এক সের দুধে এক সের জল মিশিয়ে রঙটা শুধু সাদা রাখলেই হয়। দুধটা এমন গরম করতে হবে যে, স্টেশনে যতক্ষণ গাড়ি থাকবে ততক্ষণ গরমের চোটে খদ্দের তা মুখে দিতে পারবে না। তারপরে গাড়ি ছেড়ে দিলে আর কি! ছাগল ও বাড়ি দেখার সঙ্গে এই সব ব্যবসার মারপ্যাঁচও শেখা চলতে লাগল।

রামসিং ও তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু একটু ক'রে ভাব হতে লাগল। অতি দরিদ্র তারা, কিন্তু এক সময়ে নাকি তাদের পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিল। একদিন এখানে তাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদেরই অবশিষ্ট একমাত্র এই ভাঙা ঘরে রাজবংশের শেষ স্ত্রীপুরুষ বাস করছে। তাদের এখনও কিছু জায়গা-জমি আছে, কিন্তু অর্থ ও লোকের অভাবে সে জমি নিজে চাষ করতে পারে না। অন্য লোকে চাষ ক'রে তাদের দয়া ক'রে যা দেয় তাই নিতে হয়। তারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খেটে এই দুধের ব্যবসা করে। তাও যদি ছাগলগুলোকে ভাল ক'রে খেতে দিতে পারত তো দুধ কিছু বেশি পাওয়া যেত। কিন্তু তারা নিজেরাই পেট ভ'রে খেতে পায় না। সকালবেলা এক-একজনে থান-থোলো ক'রে মোটা রুটি নুন দিয়ে খায়, তার সঙ্গে একটা কি দুটো পিঁয়াজ জুটল তো ভুরি-ভোজন হয়ে গেল। বিকেলেও তাই, তবে কোন কোন দিন ওরই মধ্যে এক-আধ ফোঁটা দুধ জুটে যায়। খাদ্য অতি সামান্য, অথচ মোটা না হ'লেও তাদের চেহারা ছিল বিরাট। আমরা ভাবতুম, এই সামান্য খাদ্যে তাদের পুষ্টি হয় কি ক'রে!

রামসিং ও তার স্ত্রী, তারা দুজনেই ছিল স্বল্পভাষী। নিজেদের মধ্যেও তারা খুব কমই কথাবার্তা বলত। সকালবেলা সেখানে অনেক খদ্দের এসে জুটত বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গেও যতদূর সম্ভব কম কথা কইত তারা। সকাল থেকে স্বামীস্ত্রীতে যে যার বাঁধা কাজ

্'রে যেত। তার পরে বিকেল হতে না হতে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড় চাপা দিয়ে লাগাত ঘুম।

একদিন সকালবেলা উঠে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। দেখলুম যে, রামসিং ও সুরযবাইয়ের মধ্যে খুব কথাবার্তা চলেছে। সুকান্ত ঠাট্টা ক'রে বললে, আজ যে সিংহ-সিংহিনীতে খুবই প্রেমভাব দেখছি!

তারা নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলত, যার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না। দুজনে খুব কথা চলেছে দেখে আমরা তো বেরিয়ে পড়লুম। বিকেল নাগাদ ফিরে দেখি, তারা তখনও যে যার খাটে ব'সে উচ্চৈঃস্বরে প্রেমালাপ করছে। রামসিং মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ছে আবার উঠছে—এই রকম প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল, তারপরে দুজনেই কাপড় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য দিন ফিরে এসে বরাবর দেখেছি, তারা দুজনেই ঘুমুচ্ছে।

কিছুক্ষণ বিড়ি-টিড়ি টেনে আমরাও শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। সেখানে এসে অবধি আমাদেরও সন্ধ্যার আগেই শুয়ে পড়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বিছানাপত্তর ঝাড়া হচ্ছে এমন সময় আবিষ্কার করা গেল, সেদিন সুরযবাই প্রেমালাপে মত্ত থাকায় আমাদের আঙেঠিগুলোতে ইন্ধন দেয় নি। নিজেরাই আঙেঠি ভ'রে নিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

রাত্রি কত হয়েছিল তা বলতে পারি না, জনার্দন জোরে ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললে, ওঠ্‌, ওঠ্‌, শীগগির ওঠ্‌।

ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, সিংহ ও সিংহিনীতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অন্য দিনের মতন সেদিকে একটা বাতি জ্বলছে, আর স্বামী-স্ত্রীতে নিঃশব্দে মারপিট চলেছে। স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করছে—সে দৃশ্য এর আগেও দেখেছি এবং সেইটেই শাস্ত্রসম্মত ব'লে এতকাল জেনে এসেছিলুম, কিন্তু এখানে যা দেখলুম তা অভূতপূর্ব। দুজনেই—একে অন্যকে ঘুষো, কিল, চড়, লাথি লাগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে কোনও শব্দ নেই। বোধ হয় আমরা ঘরে রয়েছি ব'লে কেউ টুঁ শব্দটি করছে

না। ঘুষোঘুষি, ঠুস্‌সা-ঠাস্‌সা চলতে চলতে হঠাৎ একবার সুরযবাই তার শোবার খাটখানা তুলে ঝেড়ে দিলে স্বামীর মাথার ওপরে। সে আঘাত বাঁচাতে গিয়ে রামসিং নিজের খাটে পা লেগে গেল প'ড়ে। যাহাতক সে প'ড়ে যাওয়া, অমনি কুস্তিগীরের তৎপরতায় সুরযবাই লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। কাছেই একটা বড় পাথর প'ড়ে ছিল, সেখানা সে তুলে নিয়ে রামসিংয়ের মাথায় দমাদ্দম ক'রে মারতে শুরু ক'রে দিলে। শীতের চোটে আমাদের শরীরে কাঁপন তো ধ'রেই ছিল, এই দৃশ্য দেখে তার সঙ্গে ভয়ের কাঁপনও এসে যোগ দিলে। মনে হতে লাগল, সকালবেলায় এদের একটার সঙ্গে আমাদেরও তো থানায় টেনে নিয়ে যাবে। তারপরে দিশী রাজ্যের কাজীর বিচারে এই সূত্রে চরম দণ্ড হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ওদিকে স্বামীর মাথায় সুরয পাথর ঠুকেই চলেছে। ভাগ্যে তার মাথায় মোটা ক'রে কাপড় জড়ানো ছিল, তা না হ'লে তার খুলিটি বোতলচুরে পরিণত হ'ত। চোখের সামনে যখন এই খুনোখুনি অথবা কে খুন হয় কাণ্ড চলেছিল, তখন আমার পুরুষের মন এই প্রার্থনা করতে লাগল যে, খুন যদি একটা দেখতেই হয় তবে নারীর হাতে পুরুষের কাত হওয়া দৃশ্য যেন দেখতে না হয়। পুরুষের এত বড় অপমান সারা জীবন ধ'রে ব'য়ে বেড়ানো বড়ই দুর্বহ হবে।

ওদিকে সিংহিনী ক্ষিপ্রহস্তে সিংহের মস্তকচূর্ণের কাজে ব্যস্ত, এমন সময় রামসিং কি ক'রে ঠিকরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সুরযও উঠে যেমনি পাথরটা ছুঁড়ে তাকে মারতে যাবে অমনি রামসিং টপ ক'রে তার হাতখানা ধ'রে অন্য হাত দিয়ে সুরযের গলাটা চেপে ধ'রে তাকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। মেঝেতে কুকুরগুলো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল—এ রকম দৃশ্য দেখে দেখে বোধ হয় তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সেই হুটোপুটিতে কার একখানা পা একটা কুকুরের পেটে পড়তেই সেটা ক্যাঁক ক'রে একবার চেঁচিয়ে উঠেই আবার অন্য জায়গায় গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে

শুয়ে পড়ল। ওদিকে রামসিং সুরযকে ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধ'রে গায়ের জোরে মুখে দশ-বারোটা ঘুষো মারতেই সুরযের দীর্ঘ ঋজু দেহ ভালবেসে হয়ে দড়াম ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। তার পড়বার ধরন দেখে মনে হ'ল, সে ম'রে গেল।

সুরয তো ওই রকম ভাবে প'ড়ে রইল। রামসিং সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত জিনিসগুলোকে গুছোতে আরম্ভ করলে। সুরযের খাটিয়াখানা এক পাশে আকাশের দিকে চার পা তুলে প'ড়ে ছিল। রামসিং সেখানা তুলে যথাস্থানে ঠিক ক'রে রেখে নিজের খাটে গিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রদীপটা সেইভাবে জ্বলতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আমরা তো স্তম্ভিত! এর পর আঙেঠি জ্বালানো ঠিক হবে কি না তাই পরামর্শ করতে লাগলুম। জনার্দন বললে, আর আঙেঠি জ্বালিয়ে কাজ নেই, কারণ রামসিংয়ের যা মেজাজ হয়ে আছে, ধোঁয়া নাকে গেলে কি হবে বলা যায় না। কাল সকালে পুলিসের লোকেরা রামসিংয়ের সঙ্গে আমাদের কোমরেও দড়ি বেঁধে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে—সেই দৃশ্যটা মনের পটে আঁকবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

সুকান্ত বললে, তারপরে আমরা তিনটিতে এক নারীহত্যার ব্যাপারে জড়িত হয়েছি—খবরটা কাগজে প'ড়ে বাড়ির লোকে কি গ্ল্যাডই হবে!

—কিন্তু যেতে দাও, ভবিষ্যতের গর্ভে যা আছে তাই ঘটবে, এখন তো শুয়ে পড়।

রাত্রে ওই সার্কাস দেখে পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, ঠিক অন্য দিনেরই মত দুধের খদ্দেরে জায়গাটা ভর্তি। সুরয দুধ দুইছে, আর রামসিং মেপে মেপে দুধ দিচ্ছে। রামসিংয়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার মুখ ও কপালের দুই-এক জায়গায় কালশিরে পড়েছে—মুখের বাকিটা দাড়িগোঁফ ও কাপড়ে ঢাকা।

স্বরযের মুখখানা দেখবার ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে এমন ক'রে মাথা গুঁজে দোহন-কার্যে ব্যস্ত ছিল যে ভাল ক'রে দেখাই গেল না। যাক বাবা! সে যে প্রাণে বেঁচে আছে—এই আমাদের ভাগ্য মনে ক'রে দৈনিক চারণের কাজে বেরিয়ে পড়া গেল।

সেদিন কি একটা কাজে আহারাদির পরে বাসস্থানে ফেরবার প্রয়োজন হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি যে, রামসিং তার খাটে এক দিকে পা ঝুলিয়ে বসেছে আর স্বরয তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, রামসিং তার মাথার উকুন বাচছে। দৃশ্যটি দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গেল। ঝড়ের পরে প্রকৃতির শান্ত অবস্থা একেই বলে। কাল যে স্বরয পরমানন্দে স্বামীর মাথা চুর করতে ব্যস্ত ছিল, আজ যে পরম নির্ভরে তারই কোলে মাথা পেতে দিয়েছে। কাল ছিল তারা পশুর পর্যায়ে, আজ তারা মানুষের পর্যায়ে উঠে গেছে। আর একদিন দেখেছিলুম তাদের অন্য রূপ—সেই ঘটনাটি ব'লেই তাদের কথা শেষ করব।

স্বরয ও রামসিং যে রাত্রে খুনোখুনি ক'রে মরছিল, তারই কয়েক দিন পরের কথা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, চারদিকে খুব মেঘ জমেছে, রোদের দেখা নেই, মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। বাইরে বেরিয়ে মনে হতে লাগল, শীতে যেন হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে—একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল। নেহাত খাওয়ার জন্য স্টেশনে যেতেই হবে, তাই আমরা সেই ঠাণ্ডাতেই অগ্রসর হতে লাগলুম। পথে লোক-চলাচল বিশেষ দেখলুম না। স্টেশনে গিয়ে শুনলুম যে, শীতকালে নাকি এখানে এই রকম হয়ে থাকে—এই রকম হাওয়াই নাকি ভাল, তা না হ'লে শস্যের অপকার হবে। তারা বললে, শীত এ আর কি দেখছ, আরও বাড়বে। মাঝে মাঝে এই সময় নাকি এমন ঝড়-বৃষ্টি হয় যে লোকে ঘর থেকে বেরুতে পারে না।

শীতের ঠেলায় আমাদের মনে হতে লাগল, শস্যের উপকার করতে গিয়ে দেবতা এই যে মানুষ মারবার ব্যবস্থা করেছেন এটা বিশেষ

বিবেচনার কাজ হয় নি। যা হোক, স্টেশনে আহারাদি সেরে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও শীতে শীৎকার সহযোগে কাঁপতে কাঁপতে বাসস্থানে ফিরে এলুম। ভিজে পরদা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, সেই বেলাবেলিই রামসিং ও সুরয তাদের সংসার-পাট সব ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ছাগলদের ধাড়ি বাচ্চা সব বাঁধা হয়ে গেছে— অন্য দিন কুকুরগুলো এদিক ওদিক চ'লে যায় খাদ্য অন্বেষণে, কিন্তু সেদিন দুর্যোগ দেখে এরই মধ্যে ডেরায় ফিরে এসে তারা যে যার জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়েছে।

দেখলুম, রামসিং খাটে ব'সে তার বিরাট হাতের চেটোয় গাঁজা ডলছে, আর সুরয তাদের আঙেঠি দুটোতে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আমরা হি-হি করতে করতে ধুতি-জামা বদলে ঘরের মধ্যেই ছাড়া কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে খাটে ব'সে কাঁপতে লাগলুম। ওদিকে রামসিং গাঁজা সেজে আঙেঠি থেকে একটু আগুন তুলে কল্‌কেতে দিয়ে লাগালে দম— বাবা! ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। গোটা দু-তিন দম লাগিয়ে সে কল্‌কেটা সুরযকে দিলে। সেও যা দম লাগালে তাকেও রাম দম বলা যেতে পারে। তারপর ফাঁকা কল্‌কেটা স্বামীর হাতে দিয়ে দুজনের খাটের নীচে দুটো আঙেঠি ঠেলে দিয়ে দুই খাটে ব'সে তারা গল্প করতে লাগল।

ওদিকে আমাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলুম, দিনেই যখন এই অবস্থা তখন রাত কাটবে কি ক'রে। উঠে গিয়ে সুরযকে বললুম, দেখ, আমাদের বড্ড শীত করছে, দিনের বেলায় আঙেঠি জ্বালাব?

সুরয বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্বালিয়ে নাও না।

আমি ফিরে আসছিলুম, এমন সময় সে বললে, আমি জ্বেলে দেব আঙেঠি?

দেখলুম, তার মেজাজটা খুবই শরীফ রয়েছে। বললুম, দাও না দয়া ক'রে।

সুরথ আমাদের আঙ্গেঠিগুলো তুলে নিয়ে এল। আমি নিজের খাটের কাছে যাচ্ছি এমন সময় রামসিং বললে, দেখ, আগুন জ্বালিয়ে কাঁহাতক শরীর গরম রাখবে? তার চেয়ে এক কাজ কর।

—কি কাজ?

—কিছু গাঁজা আনিয়ে নাও। শীত যখন অসহ্য হবে তখন মাঝে মাঝে গাঁজায় দম লাগাবে—শরীর একেবারে গরম হয়ে উঠবে।

ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে রামসিংয়ের প্রস্তাব পেশ করা গেল। পরামর্শ চলল—শেষকালে গাঁজা খাব! না না বাবা, মাথা-টাথা খারাপ হয়ে শেষে পাগল হয়ে রাস্তায় নেচে নেচে বেড়াতে হবে!

আমি আর রামসিংয়ের কাছে ফিরে গেলুম না। একটু বাদে সুরথ তিনটে আঙ্গেঠি ভ'রে এনে দিলে। আমরা তাতে আগুন ধরিয়ে নিজের নিজের খাটের নীচে রেখে ঠিক তার ওপরেই উবু হয়ে ব'সে আগুন তাপতে লাগলুম। কিন্তু ছাগলের নাদির আর তেজ কতটুকু! কষ্টে-সৃষ্টে ঘণ্টাখানেক তাপ বিকিরণ ক'রেই সেগুলি ভস্মে পরিণত হ'ল। এই ভাবে শীত চললে রাত্রে কি অবস্থা হবে ব'সে ব'সে তাই ভাবছি, এমন সময় রামসিং—যে এতক্ষণ মাথা-মুড়ি দিয়ে পড়েছিল, সে খড়মড় উঠে ব'সে আবার গাঁজা তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সুরথবাই এতক্ষণ এদিক ওদিক কি ক'রে বেড়াচ্ছিল, শুভকার্যের সূচনা দেখে সে গুটিগুটি স্বামীর পাশে এসে বসল। কিছুক্ষণ বাদে রামসিং কল্‌কেতে গাঁজা ঠেসে সেটাকে টানবার জন্যে বাগিয়ে ধরলে, আর সুরথ উঠে তাতে দেশলাই জেলে আগুন দিতে লাগল।

আমরা হাঁ ক'রে তাদের এই কসরৎ দেখছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই আমাদের জনার্দন টপ্‌ ক'রে উঠে কোন কথা না ব'লে তাদের কাছে চ'লে গেল। সেখানে পৌঁছে সে সুরথকে কি জানি বললে। সুরথ তার মুখের দিকে চেয়ে দেশলাইটা তার হাতে দিতেই সে একটা কাঠি জ্বালিয়ে রামসিংয়ের করধৃত কল্‌কের ওপরে ধরতেই রামসিং মারলে টান—তারপরেই মুখ দিয়ে বার করলে রাশিকৃত

ধোঁয়া। এর পর রামসিং কল্‌কেটা দিলে জনার্দনের হাতে। জনার্দনও বিনা দ্বিধায় সেটাকে বাগিয়ে ধ'রে টান মেরে প্রায় রামসিংয়ের মতনই আর এক রাশি ধোঁয়া বের ক'রে কল্‌কেটা সুরথের হাতে দিলে। এই ভাবে পালা ক'রে টেনে টেনে তারা তিনজনে মিলে সেই ক্ষুদ্রকায়া কল্‌কে থেকে একটি মেঘলোক সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে ব'সে রইল।

বাইরে তখন প্রবল ধারায় বৃষ্টি চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া, সে ঝড়েরই নামান্তর।

আমি ও সুকান্ত ব'সে ব'সে তাদের দেখতে লাগলুম। প্রথমে কিছুক্ষণ তারা তিনজনেই স্থির হয়ে ব'সে রইল। তার পরে জনার্দন উঠে সুরথের খাটে গিয়ে বসল। একটু পরেই সুরথ এসে বসল তার পাশে। শেষে তারা তিনজনে কি সব কথাবার্তা বলতে লাগল। হিন্দী উর্দু বলতে পারে না ব'লে এতদিন জনার্দন রামসিং কিংবা সুরথ কারুর সঙ্গেই কথা বলত না। এখন দেখলুম, গাঁজার কল্যাণে সে হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে খুব কথা বলছে। জনার্দনের কথাগুলোও বৃথা যাচ্ছে না, কারণ তার কথা শুনে কখনও সুরথ হাসছে, কখনও রামসিং হাসছে। রামসিংয়ের পোড়ারমুখে আমরা এতদিন কখনও হাসি দেখি নি। সেই রামসিংয়ের মুখে হাসি দেখে মনে মনে জনার্দনকে তারিফ ক'রে তাকে ডাক দিলুম।

জনার্দন কাছে আসতেই বললুম, কি রে, গাঁজা খেলি শেষকালে?

জনার্দন বললে, কি করব! শেষকালে কি শীতে মারা যাব নাকি? গাঁজা গ্র্যাণ্ড জিনিস রে! এই দেখ্, আমার আর কিচ্ছু শীত লাগছে না।

এই ব'লে জনার্দন গায়ের কাপড়খানা খুলে ছুঁড়ে খাটে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, শীত তো লাগছেই না, তা ছাড়া যা চোখে পড়ছে তাই সুন্দর ব'লে মনে হচ্ছে। মাইরি, তোরাও এক এক টান খেয়ে দেখ্।

গাঁজা খাওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মনে প্রথমে যত প্রবল আপত্তি থাকুক না কেন, জনার্দন কলকে ধ'রে টান মারতেই তার প্রাবল্য অনেকখানি ক'মে গিয়েছিল। তারপর জনার্দনের যুক্তি ক্রমেই আমাদের আপত্তির ভিত টলিয়ে দিতে লাগল। শেষকালে যখন সে বললে, আমরা তো আর নেশা বা ফুর্তি করবার জন্যে খাচ্ছি না—শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কম্বল কেনবার পয়সা নেই তাই গাঁজা খেয়ে শীত নিবারণ করছি—স্রেফ প্রাণের দায়ে—

বাস্, আর বেশি যুক্তির প্রয়োজন হ'ল না। এখন গাঁজা পাওয়া যায় কোথায়? এই শীত ও জল-ঝড়ের মধ্যে সে জিনিস আহরণই বা করবে কে!

জনার্দন বললে, সে আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

সে আবার রামসিংয়ের কাছে গিয়ে তাকে কি সব ব'লে আমাদের কাছে এসে বললে, দু আনা পয়সা দাও।

পয়সা নিয়ে গিয়ে রামসিংয়ের হাতে দিতে সে মাথায় গায়ে ভাল ক'রে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে সেই জল-ঝড়ে গাঁজা কিনতে বেরিয়ে গেল।

জনার্দন আর আমাদের কাছে ফিরল না, সে ওদিকেই র'য়ে গেল। আমরা ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, গাঁজা খেয়ে তার কর্মপটুতা যেন বেড়ে গেছে। সে সুরযের সঙ্গে নানা কাজ ক'রে ক'রে ঘুরতে লাগল; শুধু তাই নয়, দেখলুম, তার সঙ্গে জনার্দনের হাসি-ঠাট্টাও চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সুরয ছাগল দুইতে আরম্ভ করলে আর জনার্দন ছাগলের বাচ্চা ধ'রে রইল। তাদের বাক্যালাপও খুব চেঁচিয়ে হচ্ছিল বটে, কিন্তু ঘরখানা এত বড় যে এক দিকে কিছু বললে অন্য দিকে আওয়াজ শোনা যায় মাত্র, তার ওপরে বায়ু ক্রমেই অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন ব'লে তাদের কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলুম না।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর বাইরের ঝড় যেন আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। আমাদের সেই জায়গাটা ছিল শহরের এক প্রান্তে। বাড়ি-ঘর বেশি না থাকায় স্থানটি একটু জংলী গোছের।

ঘরের দু দিকের দেওয়ালে খুব বড় বড় ফুটো গর্তের কথা আগেই বলেছি। সেই ফুটো দিয়ে এখন কামানের মতন গর্জন করতে করতে হাওয়া ও জল ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করলে। ক্রমে ক্রমে শীতও হয়ে উঠতে লাগল অসহ্য। মেরুপ্রদেশ ছাড়া শীতকালে সমতল ভূমিতেও যে এমন দুর্যোগ হতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। হা-পিত্যেশ ক'রে আর কতক্ষণ গাঁজার আশায় ব'সে থাকব? ভাবছি, প্রাণটা থাকতে থাকতে রামসিং এখন ফিরে এলে হয়। এদিকে একটা একটা ক'রে স্বরয চার-চারটে ছাগল দুয়ে ফেললে। তারপরে একটা বড় আঙেঠি জেলে তার ওপরে দুধ-ভর্তি পেতলের একটা বড় লোটা বসিয়ে সেটাকে নিজের খাটের নীচে রাখলে—তারপরে সে আর জনার্দন পা তুলে খাটে ব'সে রইল।

সেই যুগল মূর্তি দেখতে দেখতে আমাদের দুঃসময় কাটতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে রামসিং ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল।

এতক্ষণে এলি বাপ!—ব'লে আমরাই ছুটে তার কাছে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, বৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে, বেচারী শীতে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি ক'রে সে জামাটা খুলে ফেলে মাটিতে ব'সে প'ড়ে জ্বলন্ত আঙেঠি থেকে দুধের গরম ঘটিটা নামিয়ে আগুন পোয়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মিনিট পাঁচেক আগুন পোয়াবার পর সে ট্র্যাক থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার ক'রে স্বরযের হাতে দিয়ে বললে, তৈরি কর্।

স্বরয কাগজের মোড়কটা খুলে তার কুলোর মত হাতের চেটোয় কিছু মাল তুলে নিয়ে ডাঁটি বিচি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে সেগুলোকে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে তাতে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে টেপাটেপি আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপরে বিধিমতে পেষণ ও কর্তন ইত্যাদির পালা শেষ হয়ে গেলে কল্‌কেতে ঠেসে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বরয বললে, নাও—পিও।

সে কি কথা! তুমি এত কষ্ট ক'রে তৈরি করলে, আগে তুমি টান!

আমাদের অনুরোধে স্বরয সলজ্জ বধূর মত একটু হেসে লজ্জিত হয়ে কামানটিকে বাগিয়ে ধরলে, আর আমরা ওপর থেকে দেশলাই মারতে লাগলুম। স্বরযের পর আমার ও সুকান্তের হাতে-খড়ি হ'ল। প্রথম সেবকের পক্ষে আমরা ভালই উতরে গেলুম।

প্রথম ছিলিমে আমাদের দু টান ক'রেও হ'ল না। রামসিং অনুমতি চাইলে, শীতে কালিয়ে গিয়েছি, একটা বড় ক'রে কল্‌কে সাজব?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অত কিন্তু হচ্ছ কেন ভাই?

অবিলম্বে দ্বিতীয় ছিলিম তৈরি হ'ল। আরও তিনটি ক'রে টান মেরে নেশায় বুঁদ হয়ে গেলুম।

নেশার প্রথম দিন, ঠিক যেন ফুলশয্যার রাত্রি। সে অনুভব করা যায় মাত্র, তার আর ব্যাখ্যা করা চলে না। দুনিয়ার রঙই গেল বদলে। সেই ভাঙা ঘরখানাকে মনে হতে লাগল যেন দেওয়ান-ই-খাস। দড়ির ঝোলা খাটকে মনে হতে লাগল—তখ্‌ত্‌-এ-তাউস্‌। রামসিং, স্বরয ও আমাদের মধ্যে যে জাতি, ধর্ম, সংস্কার ও শিক্ষার প্রাচীর ছিল তা ধোঁয়ার ফুৎকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এই দুনিয়ায় তারাই আমাদের পরম বন্ধু। সাম্যবাদকে যাঁরা গাঁজাখুরি ব্যাপার ব'লে থাকেন—তাঁদের কথা যে একেবারে অসত্য নয়, তার প্রমাণ আমরা ব্যক্তিগত জীবন থেকে দিতে পারি। সরাব ও সিদ্ধির নেশার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়েই গিয়েছিল, এইবার গাঁজার হাতে-খড়ি হ'ল।

যাঁরা যোগ-যাগ ক'রে থাকেন এমন অনেকের মুখেই শুনেছি যে, আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই এবং এর অতীতে আরও কয়েকটি জগৎ আছে—অনেকে এগুলিকে বলেছেন সূক্ষ্মজগৎ। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হতে যোগী এই সব জগৎ দেখতে পান। কিন্তু গাঁজার গুণে এই দৃশ্যমান জগৎই সেবকের চোখে অন্য রূপে ধরা দেয়। অরূপকে দেখে সে রূপময়, নির্গুণকে দেখে গুণময়। অসুন্দর

তার চোখে সুন্দররূপে ধরা দেয়। অমন যে জাঠের মেয়ে সুরযবাই—আমাদের চেয়ে মাথায় আধ হাত উঁচু—যার চলনে ফেরনে বলনে কখনও কোন সময়ে একটু মাধুর্যের লেশ চোখে পড়ে নি, তাকেই সুন্দরী ও মাধুর্যময়ী ব'লে মনে হতে লাগল—ধন্য গাঁজা, তুয়া গুণ কহই না পার।

একটুখানি খোশগল্প ও হাসাহাসি চলবার পর রামসিং আবার আগের মতন মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। সুরয গাঁজার মোড়কটা আমাদের হাতে দিয়ে শুয়ে পড়বার যোগাড় করছিল, কিন্তু আমরা তাকে শুতে না দিয়ে এক রকম টেনেই নিয়ে গেলুম আমাদের খাটের কাছে।

চারজন মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে বেশ জমাটি হয়ে ব'সে গল্প শুরু ক'রে দেওয়া গেল। কিছুক্ষণ থেকে বাতাসের সেই উদ্দাম ভাব ক'মে গিয়ে চেপে বৃষ্টি নেমেছিল। সুরয বলতে লাগল, এই বৃষ্টিতে এখানকার শস্যের খুব ভাল হবে।

আমরা বললাম, শস্যের ভাল হ'লে আর তোমাদের কি লাভ বল? তোমরা তো আর চাষ বাস কর না।

সুরয বললে, আমরা চাষ নেই বা করলুম, যারা করবে তাদের তো ভাল হবে। তা ছাড়া আমাদের যে জমিতে অন্য লোক চাষ করে, তারা বেশি শস্য পেলে আমরাও তো তার ভাগ পাব।

চাষবাস জমি-জায়গার কথা হতে হতে সুরয আবার আগের মতন গম্ভীর বিষণ্ণ ও মৌন হয়ে পড়ল। আমাদের সামনের দেওয়ালে সেই প্রকাণ্ড গর্ত দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল—বিরাট ভগ্নস্তূপ, ছোট বড় নানা আকৃতির টিপি—যত দূর দৃষ্টি চলে। তার ওপরে রাজ্যের জঙ্গল জন্মেছে। বড় বড় গাছ বেয়ে লতা উঠেছে, তাতে নানা রঙের ফুল ধরেছে। আবার অনেকখানি জায়গায় গাছ পালা শুকিয়ে গেছে। আমরা এসে অবধি দেখেছি, এই ভগ্নস্তূপে, এমন কি উঁচু উঁচু গাছের ডগা অবধি ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। বৃষ্টিতে সেই আবরণ ধুয়ে গিয়ে

অঞ্চলের এক নতুন রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

সেই ভগ্নস্তূপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমাদের মৌন সুরষ আবার মুখর হয়ে উঠল। সে বলতে লাগল—এই যে ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে—একদিন, সে বোধ হয় তিন-চারশো বছর আগে হবে, ছিল এক বিরাট প্রাসাদ। তারা ছিল এই অঞ্চলের রাজা। প্রাসাদ যেমন বড় দেখছ, ঐশ্বর্যও তাদের কম ছিল না। হাতী ঘোড়া, গরু মহিষ, দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত সবই ছিল, কিন্তু সে সবই ধীরে ধীরে চ'লে গিয়েছে—সেই বিরাট প্রাসাদের মধ্যে এই ভাঙা ঘরখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর সেই রাজবংশে বাতি দিতে আছে ঐ রামসিং আর আমি। ছাগলের দুধ বেচে জীবিকা নির্বাহ করছি, তাও দু-বেলা পেট ভ'রে অন্ন জোটে না।

বলতে বলতে সুরষের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, দুঃখ ক'রো না। আমরা শুনেছি ভারতবর্ষের সম্রাটের বংশধরেরা আজ রেঙ্গুনে দপ্তরীগিরি করছে, চিরদিন সমান যায় না।

সুরষকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমিও কি এই রাজবংশেরই মেয়ে?

সুরষ বললে, হ্যাঁ। কয়েক পুরুষ আগে আমরা এই ভাঙা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজপুতানায় গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম। কিন্তু এই জঙ্গলের সঙ্গে জনমে জনমে বাঁধা প'ড়ে আছি, যাব কোথায়! রামসিংয়ের বাপ তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে এখানে নিয়ে এল—আমার স্বামী ও আমি, আমরা একই বংশের ছেলে মেয়ে।

গল্প বলতে বলতে সুরষ বেশ একটা করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করলে। সে আবার শুরু করলে, আমাদের শিরায় রাজরক্ত বইছে—বলতে গেলে আমরা রাজার মেয়ে ও রাজার ছেলে, আজ ছাগলের দুধ বেচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি।

প্রসঙ্গটা বদলে ফেলবার জন্যে বললুম—আচ্ছা, তোমরা কখনও ঐ ভগ্নস্তূপের মধ্যে গিয়েছ?

স্থরম্ উদাসভাবে বললে, যাই, দরকার পড়লে যেতে হয় বইকি।

বললুম, কি সর্বনাশ! ঐ জঙ্গলের মধ্যে আবার দরকার কিসের?

স্থরম্ একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, যখন ছাগলের দুধ থাকে না, দু-বেলা দুখানা ক'রে রুটিও বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা স্বামী স্ত্রীতে চ'লে যাই ঐ জঙ্গলের ভেতরে, আমাদের বজ্রুগুদের কাছে—তারা যা দেয় তাই দিয়েই দিন চলে তখন।

বলে কি রে বাবা! তখন নেশার শেষ অবস্থা, একটু ঘুম-ঘুম লাগছিল, শরীরটা আলস্যে ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু স্থরমের এই শেষ কথাটা যেন কেমনধারা লাগল। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, তার মানে! ওর ভেতর গুপ্ত ধন-টন আছে নাকি?

স্থরম বললে, আরে, সে তো আছেই। আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন ঐখানে পোঁতা আছে। পূর্বপুরুষেরা ম'রে যাবার পর দেও হয়ে সেই সব ধন আগলাচ্ছে। আমরা ম'রে গেলে আমাদেরও সেই কাজ করতে হবে। কারও সাধ্য নেই সেই সব টাকাকড়ি-জহরাতে হাত দেবার। তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হবে। কত লোক, কত চোর-ডাকাতের দল যে সেই সব গুপ্তধনের সন্ধানে ওখানে গিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু কেউ কিছুই পায় নি। যারা সন্ধান পেয়েছে, দেওরা তাদের মেরে ফেলেছে—ওখানে গেলে দেখতে পাবে চারিদিকে সেই সব মৃত মানুষের কঙ্কাল ছড়ানো রয়েছে।

—তবে! কি ধন তোমরা আনতে যাও ওখানে?

"মহাস্থবির"

লেখার মূল্য

আকাশের লেখা মুছে যায় বার বার,
তাই তো আকাশ কভু নহে পুরাতন।
মানুষের লেখা মূল্য কি আছে তার,
খাতার পাতায় রয় যাহা আজীবন।

চিকিৎসা ও বণিকবৃত্তি

এই কলকাতা শহরে চিকিৎসাটা একটা অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে—এই রকম একটা কথা আমরা প্রায়ই ব'লে থাকি। কিন্তু কেন এমন হ'ল সে কথা কেউ ভাবি না।

ডাক্তারেরা যখন বিদ্যাশিক্ষা করেন, তখন তাঁরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়া ব্যবসায়টাও যে বেশ ভাল ক'রে শেখেন—এমন কথা কেউ বলেন না। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানই শেখানো হয় এবং বোঝানো হয়, রুগীদের রোগ-যন্ত্রণা দূর করাই ডাক্তারদের জীবনের ব্রত। যে ভাবে বাছাই ক'রে ছেলেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে পরিমাণ সময় ব্যয় ও কঠোর শ্রম এঁদের করতে হয়, তাতে শুধু অর্থের প্রতি লোভ থাকলে এ পথে কেউ আসতেন না। অনেক কম সময়ে ও পরিশ্রমে এঁরা অন্য কোন ব্যবসায়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হতেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে রোগ থেকে বাঁচবার দু রকম ব্যবস্থা আছে। এক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, অর্থাৎ রোগটাকে শরীরে মোটেই ঢুকতে না দেওয়া; আর অন্যটা হ'ল, অসুখ হ'লে সারিয়ে তোলা। অসুখ যখন নেই তখনও কবে অসুখ হবে ভেবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত ক'রে তুলব, অত বোকা আমরা নই। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার চাইতে সারিয়ে তোলার দিকটাই আমরা বুঝি বেশি। এই সারিয়ে তোলাটাই যখন পয়সা খরচ ক'রে করতে হয়, তখন পয়সার বদলে আমরা কি পেলাম তা যাচাই ক'রে নেব না কেন?

যাচাই করতে গিয়ে দেখি, যুদ্ধের আগে রোগীর পথ্যের যা দাম ছিল এখন তার চতুর্গুণ, ওষুধের দাম ডবল, শুধু ডাক্তারের ফিই সেই যথা পূর্বং তথা পরং—২।৪।৮।১৬।৩২।৬৪৲। বেড়েছে শুধু ডাক্তারের সংখ্যা। ডাক্তারের সংখ্যা যদি ডবল হয়ে থাকে, কলকাতার লোক-সংখ্যাও তেমনই বেড়েছে দ্বিগুণ।

আগে বাচ্চাদের অথবা বুদ্ধদের নিউমোনিয়া হ'লে বাঁচবার আশা

কমই থাকত। সাত দিনের মধ্যেই অজস্র টাকা নষ্ট হ'ত। কিন্তু
াণরক্ষা হ'ত না। ডাক্তারকেও রোজ দু-তিন বার ক'রে যাওয়া-আসা
রতে হ'ত, অ্যান্টিফ্লজিস্টিন, পুলটিশ, অক্সিজেন, মকরধ্বজ, পালসেটিলা
ছুতেই কিছু হ'ত না। ৩২৲।৬৪৲ ফিয়ের ডাক্তারেরা এসেও বিশেষ
ছু সুবিধে করতে পারতেন না। এখন দেখি ২৲ ফিয়ের একজন
ক্তার জ্বর হবার প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিন থেকেই রোজ একটা ক'রে
নিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই নিউমোনিয়া
বি সারিয়ে দিচ্ছেন।

যে ডাক্তারের দু টাকা ফি, তিনিও যেমন তাঁর প্রতিটি কলে ফি
ন না, ৩২৲-৬৪৲-ওয়ালারাও তাই। প্রথম দিন পুরো ফি দিয়ে
রের দিন থেকেই কন্‌সেশনের প্রার্থনা আসে—কোথাও আবার
থম থেকেই হাফ-ফি চালাবার চেষ্টা হয়। কোথাও বা একটি ফি
য়ে পাঁচটি রোগীকে দেখিয়ে নেওয়া হয়। কোন বাড়িতে বেশি দিন
তে হ'লে সব ডাক্তারকেই তাঁর পাওনা কমিয়ে একটা থোক টাকার
বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হয়। সেই টাকারও সবটা আবার সব সময়ে
দায় হয় না। কোথাও বা সব পাওনাটাই মারা যায়।

আমরা দামী ওষুধ কিনতে দ্বিধা করি না—ওষুধ যত দুষ্প্রাপ্য হবে
ত আমাদের বিশ্বাস বাড়বে, কালোবাজার থেকে বেশি দামে
নতেও আমাদের আপত্তি হয় না। কিন্তু ডাক্তারকে তাঁর ন্যায্য
াওনা দিতে আমাদের গায়ে লাগে। তাই দেখি কোন ডাক্তার তাঁর
ফয়ের সম্বন্ধে সাবধান হ'লে তাঁর বদনাম র'টে যায়—উনি ডাক্তার
ল হ'লে কি হয়, বড়ই অর্থগৃধ্নু। আবার কাউকে প্রশংসা করার
লায় শুনতে পাই, ডাক্তারবাবুটি লোক খুব ভাল, আমাদের কাছ
কে ফি নেন না। ফি অস্বীকার করলেও অনেকে প্রত্যাশা করেন,
ক্তার ফি নেবেন না। নিলে ক্ষুণ্ণ হন। আমরা, যারা মধ্যবিত্ত,
রাই এটা বেশি ক'রে থাকি।

ডাক্তারেরা বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অসুখ হ'লে কি

পরিমাণ অর্থ আমরা ব্যয় করতে পারি সবই এঁদের জানা, তাই রোগীর অবস্থার অতিরিক্ত দাবি এঁরা কখনও করেন না। পৃথিবীর মধ্যে এই একটিমাত্র ব্যবসায় যেখানে একই বিধান—ধনীরা অধিক মূল্যে ক্রয় করেন আর গরিবরা কম পয়সায়। বিনা পয়সা অথবা কম পয়সায় যে শ্রম এবং সময় রোগীদের জন্য ডাক্তারেরা ব্যয় করেন অন্য কোন ব্যবসায়ী তাঁর মক্কেলের জন্য কোথাও তা করেন না। এই সুবিধাটি আমরা সব সময়ে নিয়ে থাকি—সামর্থ্য থাকলেও ডাক্তারকে কিছু না দেওয়া বা কম দেওয়ার চেষ্টা করি।

আগেও দেখতাম কোন ডাক্তার ডাকবার আগে খোঁজ নেওয়া হ'ত আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে কেউ ডাক্তার আছে কি না! না থাকলে বন্ধুর ভাই অথবা ভাইয়ের বন্ধু ডাক্তার কাউকে পাওয়া যায় কি না— উদ্দেশ্য চেনাশোনা হ'লে ফি দিতে হবে না, বড় ডাক্তার দেখাতে হ'লে সস্তায় দেখানো যাবে। এখনও দেখি সেই একই মনোবৃত্তি— কি ক'রে ডাক্তারকে কম টাকা দিয়ে কাজ উদ্ধার করা যায়।

আমাদের দেশে রোগীরা অথবা তাঁদের অভিভাবকেরা নিজেই স্থির করেন, কোন্ বড় ডাক্তারকে দেখানো হবে, কাকে দেখানো উচিত, কার নাম আজকাল সবচেয়ে বেশি, কাকে দিয়ে ধরালে তাঁকে কম টাকায় দেখানো যেতে পারে। বাড়ির যিনি চিকিৎসক তিনি অন্য কোন বড় ডাক্তার দেখানো আদৌ প্রয়োজন মনে করেন কি না, করলেও বা কাকে করেন—সে সব প্রশ্ন কিছু ওঠে না। যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা আবার আজ এ ডাক্তার, কাল অন্য ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসাটা ঠিক পথে চলছে কি না যাচাই ক'রে নেন।

যারা গরিব, তারা কিন্তু সব সময়েই তাদের ডাক্তারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাকে, কৃতজ্ঞ থাকে। তাই তারাই সব সময়ে কম পয়সায় অথবা বিনা পয়সায় ভাল চিকিৎসা পায়। এদের বেলায় কখনও চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে না। ডাক্তারও এদের চিকিৎসা ক'রেই আনন্দ পান। পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে না পারলে কারও কাছ

থেকেই যেমন যত বেশি পাওয়া সম্ভব তার সবটা কখনও আদায় করা যায় না—ডাক্তারের বেলায়ও তাই। ধনীরা এটা পারেন না টাকার গর্বে, আর মধ্যবিত্তরা শিকার।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগনির্ণয়-পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার চিকিৎসক রোগীর চেহারা দেখে, নাড়ী টিপে, বুক-পেট বাজিয়ে রোগ নির্ণয় করতেন। আজকাল এরও ওপর ল্যাবরেটরির সাহায্য চাই, রক্তমলমূত্রাদি পরীক্ষা করা চাই, এক্স-রে ফোটো তোলা চাই। এ সবই রোগনির্ণয়ের জন্য, চিকিৎসকের সুবিধার জন্য। এখানেও আমরা ডাক্তারের ওপর নির্ভর করতে পারি না। তিনি যেখানে করালে ভাল মনে করেন, সেখানে না গিয়ে আমরা সস্তা খুঁজি, কোথায় আমাদের দুপয়সা সাশ্রয় হবে—সেইটেই বড় ক'রে দেখি। এই থেকেই কথা ওঠে, ডাক্তারের অনুগৃহীত লোক ছাড়া অন্য জায়গায় করালে তা গ্রাহ্য হয় না। যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা আবার একই সময়ে দু-তিন জায়গায় একই জিনিস পাঠিয়ে পরীক্ষার ফল যাচাই ক'রে দেখেন।

ডাক্তার ও নার্সরা যদি বিনা পয়সায় কাজ না করতেন তা হ'লে এই শহরে আজ একটা হাসপাতালও টিঁকত কি না সন্দেহ। এখনও লোকসংখ্যার অনুপাতে যতগুলি হাসপাতাল এখানে থাকা উচিত তা নেই, যত রোগী রোজ দেখা হয় ডাক্তার-নার্সদের সংখ্যা সেই অনুপাতে সাংঘাতিক কম। তাই এঁদের খাটুনির আর অন্ত থাকে না, তবু বদনামও দেখি যায় না। রোগীর আত্মীয়েরা রোগীর জন্য যে পরিমাণে ব্যাকুল হন, ডাক্তার-নার্সরাও যদি ঐ রকম ছটফট করতেন তা হ'লে তাঁদের দিয়ে হাসপাতাল চালানো কখনও সম্ভব হ'ত না। এঁদের এই অবিচলিত ভাবটাই আমরা অনেক সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—ঔদাসীন্য, হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতা ব'লে ভুল করি।

হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে ডাক্তারকে একটা কল দিতে হয় সকলেই তা জানেন। কিন্তু কত লোক যে কত কল দিয়ে কত টাকা

নষ্ট করেছেন, তবু সীট পান নি—সে কথা বলেন কজন? আবার কত লোক যে একটা কলও না দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চ'ড়ে রোজ বিনাপয়সায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন তার খোঁজও কেউ রাখেন না। আসল কথা, যত রোগী রোজ হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত ততগুলি বেড আমাদের হাসপাতালে নেই। নেই ব'লেই আমরা সোজা রাস্তা ছেড়ে বাঁকা রাস্তায় যাই—ভাবি, তদ্বিরে না হয় এমন কাজ কিছু আছে কি?

এই তদ্বিরটি আমরা খুব বুঝি। ছেলে-মেয়েকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে, তদ্বির কর। পরীক্ষায় পাস করতে হবে, তদ্বির কর। চাকরিতে ঢোকাতে হবে, তদ্বির কর। চাকরিতে উন্নতি করতে হবে, তদ্বির কর। কিন্তু শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হ'লেও যে কিঞ্চিৎ তদ্বির আবশ্যক সে কথাটা আমাদের খেয়াল থাকে না। কলেরা-টাইফয়েডের সময় ডাক্তার যখন প্রতিষেধক ইনজেকশন নিতে বলেন, নানা ওজর আপত্তি তুলে আমরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি, বসন্তের সময় টিকা নিতে রাজী হই না। টিকা নিতে একটি পয়সাও খরচ নেই, তবু আমাদের আপত্তি কেন? নিজের ঘরের জঞ্জাল-ময়লা ডাস্টবিনে না ফেলে আমরা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিই—নিজেদের ছেলে-মেয়েরাই যে ওই রাস্তায় খেলাধুলা ক'রে ওই ময়লা গায়ে মেখে আবার বাড়ি আসে, সে কথা তখন ভুলে থাকি। মল মূত্র থুতু ইত্যাদি যত্রতত্র নিক্ষেপ করা আমাদের এতই বেশি গা-সওয়া যে কাউকে ফেলতে দেখলেও আমরা কোন প্রতিবাদ করি না। আজকাল যক্ষ্মারোগ-প্রতিরোধ করার জন্য ছেলেমেয়েদের বিনাখরচায় বি. সি. জি. ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে—আমরা কজন আমাদের ছেলেমেয়েদের এ সুযোগ দিয়েছি?

শহরের হাসপাতালগুলির উন্নতি আমরা সবাই চাই, সে জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাও আমরা জানি; কিন্তু 'হস্‌পিটাল ডে'তে যখন রাস্তায় রাস্তায় চাঁদার জন্য ছেলেরা আমাদের মুখের সামনে ভিক্ষার ফুটো বাক্স ধরে তখন আমাদের যার যেমন ক্ষমতা সেই

অনুপাতে আমরা খুশি মনে কিছু দিই কি? মনে হয় না কি, এই ভিক্ষে করাটা আজকাল একটা পাবলিক ন্যুইসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে?

হাসপাতালের বেড-সংখ্যা বাড়ানো উচিত, ডাক্তার-নার্সদের সংখ্যাও বাড়ানো উচিত—এ সব কথা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই ১০০০ ফ্রী বেডের লেক-হাসপাতাল উঠে গেল। এটা ওঠা বন্ধ করার জন্যে আমরা দু-একটা ছোটখাট প্রতিবাদ-সভা আর বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছি কি? না পেরেছি কোন বড় আন্দোলন করতে, না পেরেছি টাকা তুলতে। অথচ প্রায়ই তো দেখছি, একটা না একটা রাজনৈতিক আন্দোলন লেগেই আছে—তাতে তো টাকার অভাব হয় না, লোকও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্তদের এই শহরে চিকিৎসার সমস্যা সত্যই একটি বড় সমস্যা; এ নিয়ে যত বেশি আলোচনা হয়, তত শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান বার করা সহজ হবে। প্রথমত আমাদের বোঝা দরকার যে, চিকিৎসা-পদ্ধতি শুধু এক রকমই হওয়া চাই, সে হ'ল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি—পাশ্চাত্য পদ্ধতি ব'লে ইংরেজীর মত একে পরিত্যাগ করলে চলবে না। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মানা চাই। প্রয়োজনীয় ওষুধ সব এ দেশে তৈরি করা চাই। বিদেশ থেকে যতদিন এ সব ওষুধ আমদানি করা হবে ততদিন ওষুধের দাম কমবে না। হাসপাতাল এবং বাইরের ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চিকিৎসা-ব্যবস্থা নতুন ক'রে ঢালাই করা চাই। এ নিয়ে লিখতে হ'লে আরও অনেক কথা এসে পড়বে, তাই এইখানেই শেষ করলাম। শ্রীঅতুলানন্দ দাশগুপ্ত

মতান্তর

উঁকি দিল স্বাধীনতা-সূর্য

ভারতের মেঘ-ঢাকা আকাশে—

অরোরা-বোরিয়ালিস ভাবে কেউ;

কেহ ভাবে, রাহু-গ্রাসে রাকা সে।

কিমাশ্চর্যম্

সেদিন রবিবার।

রাস্তার পাশে ছোট রকটির উপর উবু হইয়া বসিয়া নবীনবাবু বিড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার পিছনে একটা স্যুইং-ডোর। কাচটা রঙিন। দরজার মাথায় টাঙানো সাইন-বোর্ডটা হইতে বুঝা যায় যে, সেটা একটা সেলুন।

নবীনবাবু টমসন অ্যাণ্ড জ্যাকসন কোম্পানির বড়বাবু। বয়স একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ। সুপুষ্ট গোলগাল মেদবহুল দেহটি। সবুজ রঙের লুঙ্গি পরনে, গায়ে আধময়লা একটি জালির গেঞ্জি। একমাথা বড় বড় চুল। চুলগুলি অবিন্যস্ত আর আশ্চর্য রকম উদ্ধত না হইলে মনে হইতে পারিত যে, নবীনবাবু হয়তো বা বাবরি রাখিবেন।

বিড়ির আগুন প্রায় সুতা পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু একটা সুখটান দিয়া সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। নাঃ, স্যুইং-ডোরের নীচে দিয়া পা কয়জোড়া পূর্ববৎ দেখা যাইতেছে। দরজার ধারে গিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, আর কত দেরি হে?

ভিতর হইতে মিহি গলায় একজন জবাব দিল, বেশি নয় বাবু! এই হয়ে গেল ব'লে।

নবীনবাবু আবার রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইলেন। এক গোছা চুল দুই আঙুলের ফাঁকে আটকাইয়া খাড়া করিয়া দাঁড় করাইলেন। দৈর্ঘ্য অনুভব করিয়া দেখিলেন। অসম্ভব বড় ঠেকিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া তিনি ট্যাঁকে হাত দিয়া অনুভব করিলেন।

নাঃ, বিড়িও নাই। রাস্তায় নামিয়া পাশের দোকানের দিকে চলিলেন। বিড়ি কিনিতে হইবে।

* ● *

বিড়ির দোকানের অদূরে দাঁড়াইয়া তিনটি যুবক কথাবার্তা বলিতেছিল:

রাখাল বলিল, পায়ের হাড়টা কি একেবারেই ভেঙে গেছে ?

অনিমেষ মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, ডাক্তারেরা তো তাই বলছেন। এখন দেখা যাক, এক্সরে রিপোর্ট কি বলে !

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু পড়লেন কি ক'রে ?

আর বল কেন ভাই ! আসছিলেন এই পাড়াতেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। ট্রাম বদল করবার জন্যে শিয়ালদায় নাবতে গিয়েই বিভ্রাট।

রাখাল বলিল, দেখ তো কাণ্ড! দশ বছর পর বর্মা থেকে ফিরলেন, তা দেশে পা দিতে না দিতেই ক্যাসাদ বাধল।

অনিমেষ বলিল, গেরো আর কি ! এখন এই বয়েসে ভাঙা হাড় জোড়া লাগলে হয় !

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, কত বয়স হ'ল নিখিলেশদার ?

অনিমেষ জবাব দিল, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। সবার বড় উনি, তারপর মেজদা, দিদি, সবার ছোট আমি।

রঞ্জন সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি ? সেরে যাবেন।

* * *

নবীনবাবু একটা বিড়ি মুখে দিয়া দড়ির আগুনে তাহা ধরাইলেন। মুখ তুলিয়া চাহিতেই ত্রিমূর্তির দিকে তাঁহার নজর পড়িল।

তাই তো, অ্যাঁ—

উৎফুল্লভাবে ত্বরিতপদে তিনি আগাইয়া চলিলেন।

* * *

অনিমেষের কাঁধের উপর জোর থাপ্পড় মারিয়া তিনি বলিলেন, আরে ! কলকাতায় ফিরলে কবে ?

ব্যাপারটা আকস্মিকভাবেই ঘটিল।

তাই তিনজনই হতভম্ব হইয়া পড়িল। কেহই কোন জবাব দিল না।

নবীনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, কি হে ? চিনতে পারছ না আমাকে ? আমি নবীন। খুলনার নবীন গাঙ্গুলী।

অস্ফুটকণ্ঠে অনিমেষ বলিল, নবীন? খুলনার নবীন গাঙ্গুলী? নাঃ, মনে পড়ছে না তো।

নবীনবাবু ফাটিয়া পড়িলেন, মনে পড়ছে না? বটে? আচ্ছা, নবীন গাঙ্গুলীকে মনে না পড়ুক, খুলনার কথা মনে আছে তো? কলেজের? তুমি যে নিখিল, তাও অস্বীকার করবে নাকি?

যুবক তিনটি অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইল।

রাখাল হাসিয়া বলিল, গাঙ্গুলী মশায়, আপনার ভুল হয়েছে। ওর নাম নিখিল নয়—অনিমেষ।

নবীনবাবুর অনতিদূরে যেন বোমা ফাটিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনিমেষের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া আমতা আমতা করিয়া নবীনবাবু বলিলেন, তুমি—মানে, আপনি ইয়ে—নিখিল নন—অনিমেষ?

অনিমেষ মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বাড়ি নদীয়ায়। খুলনায় জীবনে যাই নি আমি।

নবীনবাবু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া যুক্তকরে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মাপ করবেন। ভুল হয়েছে আমার।

তারপর ফিরিয়া সেলুনের দিকে চলিলেন।

যুবক তিনটি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল। তারপর হাসিল। অবশেষে গলিপথে অদৃশ্য হইল।

পরামাণিক চুল ছাঁটিতেছে। নবীনবাবু চক্ষু মুদিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। মনের মধ্যে তাঁহার ঝড় বহিতেছে।

অবশেষে তাঁহারও ভুল হইল! মারাত্মক ভুল! অসম্ভব সম্ভব হইল! নবীন গাঙ্গুলী ভুল করিল! অসম্ভব। যে মুখ একবার তিনি দেখেন, জীবনে তাহা তিনি ভোলেন না।

সুনন্দার কথাটাই ধর না কেন। নবীনবাবুর দূর-সম্পর্কীয়া

শ্যালিকা। সেবারে পুরী-এক্সপ্রেসে যদি প্রথম নজরেই তাঁহাকে চিনিতে না পারিতেন, তবে? নিশ্চিতই সর্বনাশ হইত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। একটি বিবাহিতা মহিলা, তাঁহার স্বামী, দুইটি তরুণী আর নবীনবাবু—এই পাঁচজন যাত্রী। নবীনবাবুর তখন নব-যৌবন। তরুণীদের চক্ষে বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ। সুনন্দাকে না চিনিতে পারিলে রোমাঞ্চকর এই পরিবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে তাঁহার বাধিত না। পূর্বে বা পরে বহুবার তিনি সহযাত্রী বহু তরুণীর মনোরঞ্জন করিয়া প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। যাত্রার গ্লানি ও শ্রম দূর করিয়াছেন। কিন্তু সুনন্দার প্রতি নজর পড়িতেই সে বারে তিনি সংযত হইয়া গেলেন।

না চিনিয়া সুনন্দার প্রতি কিংবা তাহার সম্মুখে অপর কোন তরুণীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে হইয়াছিল আর কি।

কথাটা যথাসময়ে গৃহিণীর কানে যাইত।

চায়ের টেবিলে সুনন্দা পরিহাস-মুখরা হইয়া উঠিত। গৃহিণী তখন অপরিমিত হাসি হাসিতেন। কিন্তু সুনন্দা চোখের আড়ালে গেলেই যাহা ঘটিত, তাহা ভাবিতেও নবীনবাবুর গায়ে কাঁটা দিল।

কিন্তু যে বিপর্যয় ঘটিতে পারিত, তাহা ঘটে নাই।

তাঁহার সৌজন্যে সুনন্দা প্রীত হইয়াছিল। টিফিন-ক্যারিয়ার হইতে খাবার বাহির করিয়া সযত্নে খাওয়াইয়াছিল। দিদির নিকট ভগ্নীপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া গৃহিণীও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অথচ এই সুনন্দাকে নবীনবাবু পূর্বে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। ঘটনাটির বছর দুই পূর্বে—বাসরঘরের হট্টগোলের মধ্যে।

তবুও নবীন গাঙুলীর ভুল হয় নাই। আর আজ?

নিখিলেশকে চিনিতে ভুল হইল? অন্তরঙ্গ বন্ধু নিখিলেশকে দশটি বছরের মধ্যে ভুলিয়া গেলেন তিনি?

অসম্ভব। সেই মুখ, সেই চোখ। চিবুকের উপর সেই আঁচিলটা

পর্যন্ত রহিয়াছে। 'বিউটি স্পট' বলিয়া কত ক্ষেপাইয়াছেন তাহাকে। সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি তেমনই উচ্ছৃঙ্খল, তৈলবিহীন। একটু মোটা হইয়াছে লোকটা—এই যা তফাত।

তবুও সে নাকি নিখিলেশ নহে, সে অনিমেষ।

স্মৃতিবিভ্রম হইল নাকি তাঁহার? নবীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন।

* * *

চলিতে চলিতে অনিমেষ হঠাৎ থামিয়া পড়িল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

অনিমেষ বলিল, ওই ভদ্রলোকই বোধ হয় দাদার সেই বন্ধু, যার সঙ্গে দাদা দেখা করতে আসছিলেন। আমার চেহারা আর দাদার চেহারা প্রায় এক রকম। তাই ভদ্রলোক ভুল করেছিলেন।

রঞ্জন বলিল, উঃ! কি বোকা আমরা! নিখিল মানে নিখিলেশ—এটাও আমাদের মাথায় ঢুকল না?

রাখাল বলিল, নিখিলেশদা চার বছর খুলনা ছিলেন না?

অনিমেষ জবাব দিল, হুঁ। সেখান থেকেই বি. এ. পাস করেছেন; চল, একটু খোঁজ ক'রে দেখা যাক।

তিনজনে বড়রাস্তায় আসিল। না। ভদ্রলোক চলিয়া গিয়াছেন।

* * *

নবীনবাবু ভাবিতেছেন, সেই মুখ, সেই চোখ। গলার স্বরটা পর্যন্ত অবিকল সেইরূপ।

তবে? নিখিলেশ কি ইচ্ছা করিয়াই আত্মপরিচয় অস্বীকার করিল। বর্মা যাইবার পূর্বে দুই শত টাকা ধার লইয়াছিল সে। এখনও শোধ করে নাই। নাঃ। সে অসম্ভব। সে ধরনের লোক নিখিল নহে। তাঁহারই ভুল হইয়াছে।

* * *

পরামাণিকের ডাকে নবীনবাবু চোখ মেলিয়া চাহিলেন।

আরশির দিকে তাকাইয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন।

কে ও ?

পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন। ছোট একখানি আরশি হাতে করিয়া পরামাণিক সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিতীয় কেহ নাই।

তবে কাহার প্রতিচ্ছবি আরশিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ?

আবার সম্মুখের দিকে তাকাইলেন। যেন সেই মুখ, কিন্তু অবিকল সে নহে। মাথার দুই পাশের শ্বেতকায় কেশরাজি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নাকের ভিতর হইতেও একটি শ্বেতাঙ্গ উঁকি মারিয়া গুম্ফস্থ স্বজাতীয়দের সহিত সংযোগস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, দুই গণ্ডের মাংসপিণ্ড দুইটিও ঝুলিয়া পড়িবে কি না তাহাই ভাবিতেছে।

কাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে আয়নায় ?

নবীনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। প্রতিবিম্বও ভ্রূ কুঁচকাইল। নবীনবাবু অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিলেন।

কর্মরত পরামাণিকেরা কাজ বন্ধ করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। খরিদ্দারেরা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন। তাঁহাদের চোখে মুখে অপরিসীম বিস্ময়।

নবীনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। সমস্যার সমাধান হইয়াছে। তিনি স্মৃতিভ্রংশ হন নাই।

ঠিকে একটু ভুল করিয়াছেন মাত্র। আয়নার প্রতিচ্ছবি তাহা ধরাইয়া দিল।

বত্রিশের সহিত দশ যোগ করিলে অনিমেষ আর নিখিলেশ এক হইতে পারিত না।

একটা বিড়ি ধরাইয়া প্রসন্ন মনে টানিতে টানিতে নবীন গাঙ্গুলী সেলুন হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আনন্দ

(খলিল জিব্রানের 'The Prophet' নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে)

আনন্দ নহে তো মুক্তি—বন্ধহীন মুক্তির সে গান,
স্বর্গের উদ্দেশে তাহা মরতের প্রেরিত আহ্বান।
মুক্তির সঙ্গীত মাত্র—স্বর্গ কিম্বা মর্ত্য তাহা নয়
নহে তাহা স্বর্গ-মর্ত্য মিলনের সম্ভাবনাময়।
পিঞ্জর-বিমুক্ত সে যে বিহগের পক্ষবিধুনন
গগন-অঙ্গনতলে, নহে দিগ্বলয় বন্ধন—
আবদ্ধ সে মহাব্যোম। প্রাণ খুলে সে সঙ্গীতধারা
কর পান, সুরে কিন্তু আপনারে হইও না হারা।

যুবক যদ্যপি কোন আনন্দ-সন্ধানী
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে সংসারের সারবস্তু জানি।
হয়তো বা সুধী বিজ্ঞ জনা
বরষিবে তার প্রতি পাণ্ডিত্যের কঠোর ভর্ৎসনা।
আমি বলি, খুঁজিছে যে দাও তারে ফিরিতে খুঁজিয়া,
একাকী আনন্দ নয়—হয়তো বা সপ্ত সখী নিয়া
আনন্দ একদা আসি হাসি তারে করিবে বরণ,
যেমন কচিৎ কোন ভাগ্যবান জন
খুঁজিয়া ক্ষুধার খাদ্য খনন করিতে গিয়া মূল
করে লাভ পৃথ্বীতলে লুক্কায়িত সম্পদ অতুল।

অতীত আনন্দ-স্মৃতি অনুতপ্ত নয়নের লোরে
স্মরে কেহ পাপ সম অনুষ্ঠিত মত্ততার ঘোরে।
অনুতাপ নহে তুষানল
ঘন ধূম্রজাল সম আচ্ছন্ন সে করে চিত্ততল।

আনন্দ সম্ভোগ স্মৃতি স্মরণীয় বরণীয়তম
ফলিত জীবন-ক্ষেত্রে হেমন্তের স্বর্ণশস্য সম।
তবু অনুতাপ হতে সান্ত্বনা লভিতে যদি চায়
একান্তে বসিয়া তবে শ্বসি সে করুক হায় হায়

আছে পুনঃ হেন নর—নহে যারা নহে কদাচন
অনুতপ্ত বৃদ্ধ কিম্বা আনন্দ-সন্ধানী যুবজন,
আনন্দ স্মরিতে কিম্বা বরিতে তাহারা নাহি চায়
আত্মা পাছে আলোড়িত হয়—এই বৃথা আশঙ্কায়।
কিন্তু নাহি জানে ভ্রান্ত জন
আনন্দ বর্জিতে গিয়া আনন্দই করে সে অর্জন।
যে আনন্দ মগ্ন ছিল সম্ভোগের মাঝে
নব কলেবর লভি পরিহার মধ্যে তাহা রাজে।
কুণ্ঠিত কৃপণ হাতে খনন করিতে গিয়া মূল
সে জনও খুঁজিয়া পায় আনন্দের সম্পদ অতুল।
আত্মারো কি আছে আলোড়ন!
পিকের সঙ্গীতশব্দে আলোড়িত হয় কি কখন
ওই নৈশ নীরবতা? কম্পন তোলে কি কভু হায়
খদ্যোতের ক্ষীণ প্রভা ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের গায়?
আত্মা নহে ক্ষুদ্র জলাশয়
লোষ্ট্রপাতে নীর তার আলোড়িত হইবার নয়।

বঞ্চিত করিতে গিয়া আপনারে আনন্দ হইতে
অতৃপ্ত বাসনা যত সঞ্চিত রহিয়া যায় চিতে।
আজ যারে ফিরাইলে দ্বার হতে বাক্যালাপ বিনা
কে জানে সে পথপ্রান্তে তোমা তরে প্রতীক্ষিছে কি না

যে দেহ-বীণায় বাজে জীবনের সঙ্গীত তোমার
বঞ্চনা সে মানিবে না—জানে সে আপন অধিকার।
তুমিই সে বীণা-তারে ধ্বনিয়া তুলিতে পার সুর
তুমিই করিতে পার অর্থহীন শব্দে ভারাতুর।

আনন্দ-সম্ভোগ মাঝে আনন্দই সম্বল কেবল
কিবা ভাল কিবা মন্দ সে প্রশ্ন তুলিয়া কিবা ফল!
দেখ নি কি কাননে-প্রান্তরে
কি খেলা খেলিছে নিত্য কুসুমে ও মত্ত মধুকরে :
অলি পরিতৃপ্ত শুধু ফুল হতে মধু আহরিয়া,
ফুল তৃপ্ত মধু ঢালি আপনার বক্ষ নিঙাড়িয়া।
কুসুম-কোরকে বহে ভ্রমরের জীবন-নির্ঝর
প্রণয়ের দূতরূপে ফুলবনে আসে মধুকর।
দান ও গ্রহণ নহে অকারণ পুলকের লীলা,
অন্তহীন প্রাণধারা ফল্গু সম সে অন্তঃসলিলা
অদৃশ্য প্রবাহে তাহে বয়,
আদান-প্রদান তাই আনন্দের লীলা মাত্র নয়।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

—

কি ?

একটু রবে না নাক-কান,
থাকবে না চক্ষুর লজ্জা,
পিঠ হবে কুলো-পরিমাণ,
হবে অপমান ফুলশয্যা—
তবে বড় হবে এই দুনিয়ায়
হ'লেই বা শয়তান খুনিয়াই
গেলেই বা দিন কড়ি গুনিয়াই,
শুকোলেও অস্থি ও মজ্জা।

পাগ্লা-গারদের কবিতা

বাণী (কোনো হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তির ৺গঙ্গাপ্রাপ্তিতে)

এঁর মহাপ্রয়াণে দেশ যে কি হারাল
তা ব'লে শেষ করা শক্ত।
দেশপ্রেম ছিল এঁর দস্তুরমতো ধারালো—
অর্থাৎ ছিলেন তিনি আজন্ম দেশভক্ত।
বিষম সংকটের ঝড় আজ ব'য়ে চলেছে বিশ্বময়,
সারা বিশ্ব যেন ভীষ্মের শর-শয্যায় শয়ান ;
দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে আজ দেশের এই ভীষণ দুঃসময়
তিনি অকালে করলেন মহাপ্রয়াণ।

এঁর মত পণ্ডিত, বক্তা, বুদ্ধিমান আর করিৎকর্মা
আলাদা আলাদা ভাবে হয়তো ঢের পেতেন,
কিন্তু একাধারে এই সব কিছু, তা ছাড়া আরো কত কি
ছিলেন এই শর্মা।
সেটা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'লেই টের পেতেন।
ভয় করতেন না কাউকেই—বাঘ, সিংহ বা যমকে,
অথচ ভালোবাসতেন সবাইকে, ছিল না আপন-পর।
অন্যায় দেখলেই তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর দিতেন ধম্‌কে,
ধমক তো নয়, সে যেন কালবোশেখীর ঝড়।

নরম ছিল তাঁর হৃদয়, যদি দেখতেন কারো দুঃখ-কষ্ট
উঠতেন অধীর হয়ে, পারতেন না সইতে।
পরের জন্যে নিজের কত সময়, কত সম্ভাবনা করেছেন নষ্ট—
চোখে জল এসে পড়ে সে সব কথা কইতে।
অজস্র ছিল তাঁর গোপন দান, ডান হাতে যা দিতেন
তাঁর আপন বাঁ হাতও তা পেত না টের,
পরের অনেক দেনাও তিনি নিজের ঘাড়ে যেচে নিতেন—
মানে, ভেতরটা ছিল তাঁর মাখন, শুধু বাহিরটাই কাঠের।

অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতেন তিনি ভারি বাছাই ক'রে,
যাকে-তাকে এ গণ্ডীতে নিতে হতেন না রাজী ;
আমার জন্যে অবারিত দ্বার সদাই ছিল তাঁর ঘরে,
আমাকে পরামর্শ না ক'রে করতেন না কোনো গুরুত্বপূর্ণ
কাজই :
আমার ওপর ছিল তাঁর এমি অগাধ বিশ্বাস,
জানি নে, আমার মধ্যে অসাধারণ কি দেখেছিলেন তিনি !
আজ তিনি হায় ফেলে গেলেন তাঁর শেষ নিশ্বাস !
হায়, আপনারা ততটা চেনেন না, তাঁকে আমি যতটা চিনি :
ছিলেন তিনি রাজনৈতিক সমস্ত দলাদলির বাইরে,
তাঁর কাছে যেমন ছিল রুশ স্তালিন, তেমনি মার্কিন
আইসেনহাওয়ার
বলতেন "বাপুজী-প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে ভাই রে !
অহিংস পথেই পাব সত্যিকারের পাওয়ার।"
তিনি ছিলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা,
আদর্শ ভ্রাতা···আরো যা যা ছিলেন সবই ছিলেন আদর্শ ;
তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,
তাঁর পুণ্যতীর্থ ছিল গোটা ভারতবর্ষ।
তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে শক্তিশেলের চোট-লাগা লক্ষ্মণের
মত কাতর;
আমি আজ মর্মাহত, শোকাচ্ছন্ন, জবাব বন্ধ, ঘুরছে মাথা।
তাঁর আত্মার কল্যাণ আমরা কামনা না করলেও হবে, তবু
তা কামনা ক'রে বলি—বন্দে মাতরম্
জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

বাথরুমের গান

(নিম্ন-উদ্ধৃত গানগুলি পাগলামির বিভিন্ন অবস্থায় বাথরুমে গীত হইবার জন্য রচিত। গায়কগণের অসুবিধার জন্য প্রত্যেকটি

গানের মৌলিক রাগ ও তালের উল্লেখ করা হইল। গায়িকাগণ ইহাদের যে কোনও গান যে কোনও রাগে বা যে কোনও তালে গাহিতে পারেন ; না গাহিলেও চলিবে। অত্যাবশ্যক-বোধে স্বরলিপি ও তাল-লিপি দেওয়া হইল না।)

গণ্ডারতারিণী—উৎকণ্ঠ তাল

বিজন কক্ষে বসি' গবাক্ষে ব্যথিত বক্ষে কাতর চক্ষে একা অলক্ষ্যে
বিষম দুঃখে শুক্লপক্ষে কাঁদে বিরহিণী তন্বাঙ্গীনা।
(মরি হায় রে) কাঁদে বিরহিণী তন্বাঙ্গীনা !
সে কাঁদন-সুরে আহা কোন্ দূরে দিগন্ত জুড়ে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে মন চুরে চুরে
বাজিছে সানাই ধিন্‌তা ধিনা।
সে সুরে ধাক্কা লেগে লেগে হায়
চাঁদের চাঁদিমা ভেগে ভেগে যায়,
একূল ওকূল ভাঙিল দুকূল, হৃদয় আকুল,
কোথা সে গোকুল ভাসিল অকূলে জীবন-বীণা
(আহা) ভাসিল অকূলে জীবন-বীণা।

প্রেমদীপক—প্রমত্ত তাল

মনে পড়ে আহা কাছায় বাঁধিয়া কাছি
ভুলে-যাওয়া কোন্ চাঁদিনী নিশায়
এসেছিলে কাছাকাছি।
আজো চেয়ে দেখি আকাশের চাঁদে
সেই স্মৃতিটুকু হাসে আর কাঁদে,
সেই আনন্দে গানের ছন্দে
ভুবন ভরিয়া নাচি।
ভুলেছ কি প্রিয় মাঠের সবুজ ঘাসে
অবুঝ স্বপন দেখেছ কভু যে
বসিয়া আমারি পাশে ?

আজো সেই মাঠে রহিয়াছে ঘাস,
মাথার উপরে আছে নীলাকাশ,
তুমি আছ কিনা সে কথা জানি না
শুধু জানি আমি আছি।

৺কাশ্মীরী কীর্তন—নিরঙ্কুশ তাল

দুনিয়ার যত ফুলকপি যদি বাঁধাকপি হয়ে যেত
(আর) ব্যাংগুলো সব টপাটপ ক'রে সাপ ধ'রে ধ'রে খেত
রুগীগুলো সব ডাক্তার হ'ত, ডাক্তার হ'ত রুগী
(আর) যতেক বানর নাচাইত নর হাতে নিয়ে ডুগ্‌ডুগি।
ছোঁড়াগুলো সব বুড়ো হ'ত যদি, বুড়োরা হইত ছোঁড়া
ঘোড়াগুলো সব গাধা হয়ে যেত, গাধারা হইত ঘোড়া।
ধোপাদের মনে কি হইত ,আমি তাই ভাবিতেছি দাদা।
ময়দানে তবে রেসের ঘোড়ারা হইত রেসের গাধা।
নারীরা সবাই নর হ'ত যদি, নরেরা হইত নারী
শাড়িরা সবাই হয়ে যেত ধুতি, ধুতিরা হইত শাড়ি।
ফলগুলো সব ফুল হ'ত যদি, ফুলেরা হইত ফল
জলগুলো সব যদি হ'ত ডাঙা, ডাঙারা হইত জল
(যদি) পুঁজিপতি সব পুঁজি ক'য়ে ক'য়ে হইত সর্বহারা
(আর) সর্বহারারা কোটিপতি হয়ে গোঁফে দিত যদি চাড়া
দুনিয়ার সব দেন্‌দার যদি হইত পাওনাদার,
(আর) পাওনাদারেরা দেন্‌দার হয়ে হইত পগার পার।
তবে আর কিবা চাই, ওলো সখি, তবে আর কিবা চাই রে
(আমি) সেই সুদিনের আশায় বসিয়া দিন গুনিতেছি ভাই রে।

ফরাক্কাবাদী বাউল—নির্ঝঞ্ঝাট তাল

ও আমার পথ-ভুলানো বাঁশী।
(তুই) আমার সুরে বাজবি ? না তোর
আপন সুরে আমায় বাজাবি ?

(আমার) কাজের মাতন গেছে থেমে
পথিক হয়ে পথে নেমে,
লাজ ভুলেছি, কেমন ক'রে
আমায় লাজাবি ?
পথে নেমেই ছাড়া পেলাম
এই ছিল মনে।
(আহা) ঘর ছেড়ে যে বন্দী হলাম
পথের বাঁধনে।
(তোর) কালো বুকের ফুটোর 'পরে
মিঠা সুরের মুক্তা ঝরে,
তারি মালার সাজে কি তুই
আমায় সাজাবি ?

পকেটমারী কানাড়া—সূক্ষ্ম তাল

(আমি) ছলুকে তুলি হালুকা হাতে
যার পকেটে যা পাই
অনেক পকেট মেরে মেরে
হাত করেছি সাফাই
দুই হাতে মোর সুড়্‌সুড়ি যে
হেথায় হোথায় তাই ঘুরি যে,
শিকার পেলে হাঁক ছাড়ি, আর
নইলে পরে হাঁফাই।
জাত-ধরমের ভেদ মানি নে,
নেই কো ও-সব বালাই
পকেট পেলেই সাফ করি, আর
চুপটি ক'রে পালাই
পেট ভরাবার এই তো পেশা
দিল্‌ ভরানো মিষ্টি নেশা,

পরের দিনের ভরসা রাখি
যেদিন কিছুই না পাই।
আল্লা, হরি, গড, জিহোভা
তোমরা কালা, অন্ধ, বোবা,
তাই তোমাদের ভরসা ক'রে মিথ্যে নাহি লাফাই।
নিজের বরাত নিজের হাতে
নিয়ে বেড়াই সাথে সাথে,
যা কিছু লাভ-ক্ষতির বোঝা নিজের ঘাড়েই চাপাই।

বাণীচিত্র-গীতিকা-মালা

[নিম্ন-উদ্ধৃত গানগুলি ভাবী কয়েকটি বাণীচিত্রের জন্য অগ্রিম রচিত এবং ধনপতি পাপ্‌লা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। গানগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নায়ক বা নায়িকা কর্তৃক গীত হইবে বলিয়া পরিকল্পিত—সংগীত-পরিচালকগণ পাছে রাগ করেন এই ভয়ে রাগ বা তালের উল্লেখ করা হইল না, শুধু প্রত্যেকটি গানের আগে পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।]

জীবন গরুর গাড়ি

(বি. এ.-পড়ুয়া নায়িকা বহুদিন পরে পৈতৃক গ্রামে আসিতেছে গ্রাম দেখিতে। এম. এস্‌-সি., এম. বি. পাস নায়ক—এই গাঁয়েই ডিস্‌পেন্‌সারি খুলিয়া সে গাঁয়ের রোগ সারাইবে ঠিক করিয়াছে—গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে স্টেশনে আসিয়া গরুর গাড়িতে চড়াইয়া নায়িকাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে চলিয়াছে। রাস্তা বেশি লম্বা নয়, তবু এ অবস্থায় গান না গাহিলে চলে না। নায়ক গাড়োয়ানী ভঙ্গীতে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে)

আহা, চলে চলে চলে রে
জীবন গরুর গাড়ি

উঠল পথে নীচল্ পথে
পিছল্ পথে দেয় সে পাড়ি—
জীবন গরুর গাড়ি।
কখনো চলে সোজা,
কখনো আঁকা-বাঁকা ;
কখনো রোদের বোঝা,
কভু পথ ছায়ায় ঢাকা।
ঘনালে ও আঁধার রাতি
যদি রয় সাথের সাথী,
মরমী সে মরম বোঝে
ব্যথার বোঝা হয় না ভারী।
চলে রে জীবন গরুর গাড়ি।
ওরে ভাবুক ফ্যাল্ রে চাবুক
ওটা যে তোর হাতের কাদা
পিরীতি-তেল পড়্লে চাকায়
সহজ চলার রয় না বাধা।
(ওরে) তেল না দিলে চাকায় মোটে
ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ ওঠে,
ও যেন কয় কেঁদে কেঁদে
'প্রেম বিহনে চল্‌তে নারি।'
চলে চলে চলে রে
জীবন গরুর গাড়ি।

নেমে যাই মাটির টানে

(অতি-আধুনিক বোম্বাই-মার্কা প্রেমচিত্র। নায়ক হাওয়াই জাহাজে উড়িয়া যাইতে যাইতে নায়িকার গ্রামের উপর দিয়া যাইবার সময় কাঁধে প্যারাস্যুট বাঁধিয়া লাফাইয়া পড়িবে, এবং নায়িকার অভিমুখে নামিতে নামিতে প্রেম-গদগদকণ্ঠে নিম্নের গানটি গাহিবে।)

আকাশ ওগো, তোমায় ছেড়ে
নেমে যাই মাটির টানে।
যেথায় আছে আমার প্রিয়া
সবুজ স্বপন বক্ষে নিয়া
তারেই ভেবে আমার হিয়া
রঙিন হ'ল গানে গানে।
প্রেমের আকাশে আমি উন্মনা পাখি গো!
কণ্ঠে পরানো মোর প্রণয়েরি রাখী গো!
ওগো মোর হৃদয়ের রাণী,
তুমি মোরে ভালবাসো জানি,
(তাই) যত দূরে যাই ফিরে ফিরে চাই গো,
ফিরে চাই তোমার পানে।
যে হাওয়া লাগিছে মোর গায় গো
(বুঝি) পরশ পেয়েছে তব, হায় গো
তাই এত মিঠে লাগে
পরাণে স্বপন জাগে
হিয়া তাই কাঁদে অভিমানে গো
কাঁদে অভিমানে।
নেমে যাই নেমে যাই গো
নেমে যাই মাটির টানে।

(গানখানা দরকার হইলে—অর্থাৎ চিত্র-পরিচালকের ফরমায়েশ মত—প্রবর্ধিত ও প্রলম্বিত করা যাইতে পারে। নায়কের গানটি থামিয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা তাহার বাগানে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে উপর দিকে না তাকাইয়া নিম্নোদ্ধৃত গানটি গাহিবে। নায়িকার সখী একটি ফুলগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া নানারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ভঙ্গী ও মুখভঙ্গী করিতে করিতে গানটি শুনিবে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইবে, সেও গাহিয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে নায়কের প্যারাস্যুট খুলিয়াছে, এবং নায়ক—নায়িকাকে গানখানা ধীরে ধীরে গাহিয়া শেষ করিতে যথেষ্ট সময় দিবার জন্য—ধীরে অতি ধীরে নামিতেছে।)

নায়িকার গান

আমার মন যে বলে আস্‌বে সে আস্‌বে সে আস্‌বে সে।
(আমার) কাজল চোখের পানে চেয়ে হাস্‌বে সে গো, হাস্‌বে সে।
ওরে ও কুসুম-কলি,
কোথা তোর প্রাণের অলি ?
মধু নিয়ে প্রাণের বঁধু গেছে কি চলি' ?
(আহা) আর কি কভু ফিরবে ?
(তোরে আর কি ভালো বাসবে সে ?
বাজে মোর কনক কাঁকন রিনি রিনি
মণি-মঞ্জীর বাজে ঝিনি ঝিনি
বুঝি চরণ-ধ্বনি শোনা যায়,
(আহা) পরাণ বলিছে চিনি চিনি—
আমার পাশে ব'সে ব'সে দূর স্বপনে ভাস্‌বে সে।
আস্‌বে সে, আস্‌বে সে, আস্‌বে সে।

(এদিকে নায়িকার সখী কিন্তু দেখিয়াছে, নায়ক প্যারাস্যুটে ভর করিয়া নায়িকা-অভিমুখে নামিতেছে। নায়িকা তাহা দেখে নাই। নায়িকার গান শেষ হইবামাত্র নায়িকার সখী গান গাহিতে গাহিতে নানারূপ ভঙ্গী করিতে করিতে নায়িকার কাছে হাজির হইবে। সখীর গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত নায়কের নামা চলে না, সুতরাং পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী নায়ক খুব ধীরে ধীরে নামিবে।)

নায়িকার সখীর গান

আহা তোর চেনা পথিক অচিন পথে
এলো এলো ঐ এলো রে, এলো বুঝি
ওলো সখি !

যে কথা জানার ছিল
হৃদয় দিয়ে জেনে নিল,
বাকি কিছু রইল না হায়, আমি তায় জানাব কি ?
সরম-রাঙা মালা যে তোর মরম-ফুলে গাঁথা
আসবে যে তোর বন্ধু জেনে আসনখানি পাতা
কোন্ সে চাঁদের জোছনা ছুঁয়ে
শিশির হেসে নামল ভুঁয়ে
বলে সে "ফুল-বাগানের ভুল-জাগানো
স্বপন প্রাণে আনাব কি ?"
এলো ঐ অচিন্ পথে
চেনা পথিক, ওলো সখি !

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

প্রসঙ্গ কথা

সঙ্গীত

গত মাসের "প্রসঙ্গ কথা"য় কলার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই গানে প্রযোজ্য। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত বাংলা দেশে গানের ধারা বহুমুখী ছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই কীর্তন ভিন্ন প্রায় সমস্ত ধারাই শুকিয়ে এসেছে। সুখের বিষয়, কলকাতা রেডিও তাদের মধ্যে কয়েকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পল্লী-সমাজ যদি তাদের পুনরায় স্থান না দেয়, তা হ'লে রেডিও কেবল এন্টিকুইটি-রূপে আর কতদিন তাদের রক্ষা করবেন ? যাঁরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পল্লী-সংস্কারকাজে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের উচিত পল্লী-সমাজের আনন্দবিধানের দিকেও দৃষ্টি রাখা, এবং সেকালের মত কবির গান, ঝুমুর, তরজা, রামায়ণগান, মনসামঙ্গল ইত্যাদি পল্লী-সঙ্গীতের চর্চায় সে সমাজকে উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া। যাত্রার মাধ্যমেও গানের অনেক উন্নতি হয়েছিল,

কিন্তু এখন যাত্রা হয়েছে থিয়েটারের ক্যারিকেচার—গীতিবহুল না হয়ে গীতিবিরল, থিয়েটার ও ফিল্মের গানকে নিম্নলিখিত 'আধুনিক' গানের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। উচ্চাঙ্গের গানের চর্চা বেড়েছে মনে হয়, কিন্তু শুধু শহরে। পল্লীগ্রামেও এককালে খুবই চর্চা ছিল, কিন্তু এখন লুপ্তপ্রায়। যেটুকু আছে, জমিদারি উচ্ছেদের সঙ্গে সেটুকুরও মহাপ্রস্থান হবে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—সহজসাধ্য গানে নবযুগ আনলেন রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত-রচনা ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট ও বৈচিত্র্যময় অবদান বোধ হয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন,—যা হবার সৌভাগ্য একালের সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেরই হয় নি,—এবং সেই জন্য তাঁর গানের ভাষার মধ্যেই সুর ও তাল সুষ্ঠুভাবে নিহিত। এমন কি, অনেক গানে সুরের সময়োপযোগী ভাব ও ভাষাও আছে,—যেমন, বেহাগ সুরের গানে "রজনী-গন্ধার গন্ধ,' "নিশীথ সমীরে" ইত্যাদি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যাঁরা এরূপ সুললিত ও বৈচিত্র্যময় সুর সংযোজনা করছেন, এবং "দক্ষিণী" প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। এই সব সুরের প্রভাব ও আকর্ষণেই বাংলা দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরকম সঙ্গীতানুরাগ জাগরিত হচ্ছে,—বিশেষ ক'রে মহিলাদের মধ্যে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে পরিবেশকদের নিকট একটা নিবেদন এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কবিতা গানরূপে লেখেন নি কিংবা লিখলেও যেগুলি গান অপেক্ষা কবিতার পর্যায়েই বেশি পড়ে, সেগুলিকে তাঁরা যেন টেনে-টুনে গানরূপে প্রচার না করেন। অবশ্য সুর সবেতেই দেওয়া যায়, এমন কি "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল"তেও,—একে প্রথম লাইন ক'রে আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু অল্পদিন আগে এক কবিতা লিখেছিলেন।

আধুনিক গান :—'আধুনিক গান' কথাটার সৃষ্টি বোধ হয় কলকাতা রেডিও প্রতিষ্ঠানেই হয়েছে, এবং আমি এই প্রবন্ধে রেডিও

দ্বারা পরিবেশিত গানের ওপরেই নির্ভর করেছি। এই নামকরণের কতদিন আগে যে এই জাতীয় গানের জন্ম এবং রেডিও ছাড়া অন্যত্র তার ক্রমবিকাশ ও প্রসার কিরূপে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত গবেষণা বোধ হয় কেউ করেন নি। আভ্যন্তরিক প্রমাণ থেকে মনে হয় এ গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিকৃত ও বিকলাঙ্গ সন্তান,—বিকলাঙ্গ, অর্থাৎ কলার অভাব, আদিলীলা বোধ হয় সিনেমাতে তাই কান্থর রূপের গুণে না হ'লেও কান্থর বেণুর গুণে ধেন্থর আকর্ষণ। যা হোক 'আধুনিক গান' এখন নিজেই এক শ্রেণী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণে (অথবা অপগুণে) এমন এক বিকট বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যে, শোনবামাত্র তাকে অন্য কোন জাতীয় গান ব'লে ভুল করা শক্ত।

প্রথমত, সুরে বৈচিত্র্যের অভাব। তা ছাড়া, সুরের মধ্যে স্বাভাবিক স্ফূর্তির অভাব। নারীকণ্ঠে এটা তেমন প্রকট নয়, কেননা তাঁরা একটু গলা ছেড়েই গান, এবং শুনতে ভালও লাগে,—যদিও চাপা মিহি সুরে গাইলে কোন কোন গান দূর থেকে কান্নার মতই শোনায়,—কিন্তু পুরুষমান্থষ যখন গলা দাবিয়ে ন্যাকামি সুরে, কখনো বা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, কখনো বা কানে কানে ফিসফিসিনির মত 'আধুনিক' গান ছাড়েন, তখন faddist ভিন্ন অন্য পুরুষমান্থষের পক্ষে সে গান সহ্য করা শক্ত। জানি না, মহিলাদের মনে কি ভাবের উদয় হয়! অবশ্য, কয়েকজন ভাল গায়কও আছেন, এবং তাঁদের সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়; কিন্তু অধিকাংশই ঐ একই টাইপের—মনে হয়, আধুনিক গান পরিবেশনের ক্ষেত্র থেকে পুরুষদের স'রে থাকাই ভাল। অবশ্য তাঁরা সৃষ্টি করবেন, কিন্তু লালনপালনের ভারটা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত।

দ্বিতীয়ত, তালের অভাব ও তালের বৈচিত্র্যের অভাব। অধিকাংশ গানই একতালা কিংবা কাওয়ালি তালে নিবদ্ধ। আগে আধুনিক গানে তালের কোন বালাই ছিল না, তবে আজকাল সঙ্গীত-শিক্ষকদের

চেষ্টায় ও রেডিওর মনোযোগে সে সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হয়েছে,—বিশেষ ক'রে মহিলাদের মধ্যে। কিন্তু এখনও অনেক গানে তালের পাত্তা পাওয়া যায় না, বাদক প্রথমেই একটু টুং টাং ক'রে হাল ছেড়ে দেন কিংবা স্থানে অস্থানে টোকা দিয়ে যান। তাঁকে কিংবা গায়ককে কোন দোষ দেওয়া যায় না। মনে হয়, যাঁরা আধুনিক গান রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই তাল সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তাঁরা হয়তো জানেন না যে, গানের ছত্রের মধ্যে যতিনির্দেশের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক অক্ষর-যুক্ত কথার সমাবেশ এবং যথাস্থানে দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের সমাবেশের ওপর তাল ও তালের বিভিন্নতা নির্ভর করে। এ নিয়ম না মেনে চললে, গানকে নিয়ে বলিদানের পাঁঠার মত টানা-হেঁচড়া ক'রে গলা টিপেও তালে ফেলা যায় না। "আমার জীবনের যে কুঁড়ি ফোটেনিক ফুল হ'য়ে" এই ছত্রটাকে সহজভাবে কোন তালের সীমানাতেই আনা যায় না। হয়তো স্বরবর্ণের অযথা প্রসারণ বা সঙ্কোচন ক'রে অতি কষ্টে একটা গানকে তালে আনা হয়েছে; কিন্তু তাতে গানটাই শ্রুতিকটু হয়ে গেছে। কোন কোন রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও এই রকম ত্রুটি অল্প কিছু আছে, যথা—"শ্রাবণের গগনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যা"। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাষা এত সুরোপযোগী যে, সুরের মিষ্টতায় ও-রকম একটু আধটু টানাটানি ঢাকা প'ড়ে যায়। 'আধুনিক' গানে এ ত্রুটি অতিমাত্রায় প্রকট, গান-রচয়িতারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে কয়েকটা সাধারণ তাল শিখে রাখেন তা হ'লে সকলের পক্ষেই ভাল হয়। উচ্চাঙ্গের তালজ্ঞান না থাকলে রবীন্দ্রনাথ চৌতাল কিংবা ধামার তালের গান রচনা করতে পারতেন না। নজরুল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-রচয়িতাদের সকলেরই তাল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। একটা গান রচনা করবার আরম্ভেই ঠিক ক'রে নিতে হবে, গানটা কোন্ তালে পড়বে। তখন রচয়িতা ইচ্ছা করলেও ছত্রের মধ্যে অযথা অক্ষর সমাবেশ করতে পারবেন না। রচনাতেও আনন্দ পাবেন। সুর নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক তাঁদের নেই, কারণ সেটা আয়ত্ত করা একটু কষ্টসাধ্য।

তৃতীয়ত, ব্যঞ্জনার অভাব। আমি আমার এক আধুনিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'আধুনিক' গানের মানে হয় না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, এ কি যাত্রার দলের গান যে, মানে হবে? এখানেও রবীন্দ্রনাথের দুর্বল অনুকরণ। অধিকাংশ গানে কেবল কতকগুলো অসম্বদ্ধ কথার সমাবেশ,—এক ছত্রের সঙ্গে আর এক ছত্রের সামঞ্জস্য নেই,—গান শোনবার সময় সবটা মিশে একটা সুসঙ্গত অর্থ মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে না। তার কারণ কবির পুঁজি কম। কাজেই একটা কিছু নিয়ে গানটা আরম্ভ ক'রেই তারপর আর উপযুক্ত কথা জুটিয়ে উঠতে পারেন না, ও যা-তা দিয়ে পাদপূরণ করেন। একজন কবি "সুতনুকা" (এ কথাটার ব্যাকরণ-সঙ্গত কি অর্থ তা বেশ বোঝা যায় না,—স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় নাকি? অথবা সুতনুওয়ালী?) কথাটা দিয়ে প্রথম লাইন শেষ ক'রে, 'বেণুকা' 'রেণুকা' এই রকম কথা দিয়ে দুটো কলি তার সঙ্গে মিলিয়ে তারপর যেন হাঁপিয়ে পড়লেন; মনে হ'ল যেন 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' দিয়েও বাকি কলিটা শেষ করতে পারলে বেঁচে যান। অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের মিল করতে গিয়ে অবান্তর বাক্যবিন্যাস করতে হয়, আর সে বাক্যজালে জড়িয়ে অর্থ ডুবে যায়।

চতুর্থত, ভাবের মৌলিকতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্যের অভাব। রচনায় অতি-কবিত্বের চমক, কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীলতার অভাব, একঘেয়ে ছাঁচে-ঢালা প্রণয় নিবেদন,—প্রায়ই পুরুষের উক্তি, কারণ মেয়েদের পক্ষে হামেশা প্রণয়-নিবেদনটা বেহায়াপনা হয়ে পড়ে, এবং প্রকাশভঙ্গীও একঘেয়ে। এ সকলেরই মূল কারণ প্রকৃত দক্ষতার অভাব। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে 'হৃদয়,' 'বেদনা,' 'সুর,' 'গান,' 'বীণা,' 'মিলন,' 'বিরহ,' 'বাসর,' 'ফাগুন,' 'বাতায়ন,' ইত্যাদি পঁচিশ-ত্রিশটা কথা সংগ্রহ ক'রে, প্রত্যেক গানে তারই কয়েকটা ছিটিয়ে দিয়ে একই ধরনের ভাবের দুর্বল অভিব্যক্তি। গান আরম্ভ হতে না হতেই বেদনা,—যেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা সকলেই বাতব্যাধি-

গ্রস্ত; তারপর অজস্র আঁখিজল,—যেন কেউ মিনিটে মিনিটে টিয়ারগ্যাস ছাড়ছে। কেন রে বাবা? ভালবাসবি তো এত ঘ্যান-ঘ্যানানি প্যানপ্যানানি কেন? এত effiminacy কেন? আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন রাইফেল ক্লাবে, ক্যাডেট কোরে ঢুকছে, তারা দুর্বল নয়, তারা ভালবাসুক,—প্রাণ খুলে ভালবাসুক, তন্ময় হয়ে ভালবাসুক, কিন্তু সে ভালবাসা হোক সবল, মর্যাদাময় আত্মপ্রত্যয়শীল। গানে সেই রকম প্রাণ-মাতানো ভাবা দাও, কিন্তু কেঁদো না। আবার একজন প্রেমিক বলছেন,—

"তব মরণের আগে যেন আমার মরণ হয়, (ছত্রটা বেতালা)
বিধাতার কাছে সারা জীবনের এই যেন অনুনয়।"

আহা! কি নিষ্ঠা! বিধাতার কাছে আর কোন প্রার্থনাই নেই, না টাকাপয়সা, না রেশনের চালের দাম কমা, না মোহনবাগানের জয়লাভ!

গানের মধ্যে কেবল 'তুমি' আর 'আমি'। তা বেশ, কিন্তু যখন তুমি কিংবা আমির টাইফয়েড হবে! তখন তো বাতায়ন ছেড়ে বিছানা নিতে হবে! তখন তো বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় দুই-একটি থার্ড পার্সন চাই! যে সব দেশ থেকে এই সব ভাব আসছে, সে দেশের মত আমাদের তো পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল নেই।

'আধুনিক'-সঙ্গীত-রচয়িতাদের প্রতি নিবেদন, তাঁরা একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন—ভাবে, ভাষায়, সুরে এবং তালে। মেঘমল্লার রাগে কিংবা চৌতাল বা পঞ্চম-সওয়ারি তালে প্রেম-সঙ্গীত হয় না তা জানি, কিন্তু সাধারণ অথচ একটু উচ্চশ্রেণীর সুর-তালের মধ্যেও এমন কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর অথচ চিত্তাকর্ষক প্রকার আছে, যথা সিন্ধু-মধ্যমান, ইমন-ঝাঁপতাল, বেহাগ-আড়াঠেকা ইত্যাদি—যেগুলি প্রেম-সঙ্গীতের জন্তও বিশেষভাবে উপযুক্ত। তাঁরা ধীরভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনুন, ও তার সুর ও তাল আয়ত্ত ক'রে তাদের কাজে লাগান। যৌন-প্রেম ছাড়া মানুষের আরও দু-একটা সুকুমার চিত্তবৃত্তি অথবা প্রকৃতির সৌন্দর্য

নিয়ে তাঁরা আরও একটু বেশি নাড়াচাড়া করুন। রবীন্দ্রনাথের "দাঁড়াও আসিয়া আঁখির আগে"র মত সুললিত সহজবোধ্য অথচ ভাবে ভরা গান আজকাল একটাও হচ্ছে না কেন ?

আধুনিক গানে যাঁরা সুর সংযোগ করেন তাঁদের কাছে নিবেদন যে, তাঁরা যদৃষ্টং তদ্‌গীতং না ক'রে যেখানে গোলমাল বুঝবেন সেখানে কথার একটু সংশোধন ক'রে নেবেন, যথা উপরোক্ত "তব মরণের আগে" গানের প্রথম ছত্রে আর দুটি অক্ষর যোগ। রচয়িতা তাতে যদি আপত্তি করেন তা হ'লে তাঁকে গান ফেরত দিয়ে দেবেন—অচল ব'লে। তবে যদি পনেরো টাকার জন্য পৃথিবীকে খোয়াতে হয়, সে অন্য কথা।

প্রেমাত্মক 'আধুনিক' গানের মধ্যে যে সর্বাঙ্গসুন্দর গান নেই তা নয়। "আমার মনের অশোক-কাননে বন্দিনী তুমি সীতা" ইত্যাদি অনেক ভাল গানই আছে। রেডিওর কর্তারা আরও বেশি সংখ্যায় ভাল আধুনিক গান পরিবেশন করেন না কেন ? ভাল খাদ্য না দিলে লোকের রুচিও শুকিয়ে যাবে। তবে যদি রোজ রোজ নতুন গান দিতে হয় তা হ'লে এত ভাল গান পাবেন কোথায় ? কি পদ্ধতিতে গান সংগ্রহ ও মনোনীত হয়, এবং রচয়িতারা টাকা পান কি না তা সাধারণে ঠিক জানে না। তবে 'আধুনিক' গানের কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে ব'লে সাধারণের তরফ থেকে মাঝে মাঝে অভিযোগ হয় এবং রেডিওর চিরাচরিত প্রথামত তার ছাঁচে-ঢালা উত্তরও দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে রেডিওর উর্ধ্বতন কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। মনে হয় একটি স্বার্থবিহীন কমিটির হাতে নূতন গান ও নাটক নির্বাচনের ভার দিলে ভাল হয়। দেশে প্রতিভার অভাব হয় নি, কিন্তু প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হচ্ছে না।

রেডিওর কর্মকর্তাদের কাছে আরও এক নিবেদন এই যে, তাঁরা যেমন সেতার ইত্যাদি যন্ত্র-সঙ্গীতের বেলায় রাগরাগিণী ঘোষণা করেন, তেমনই কণ্ঠসঙ্গীতের রাগরাগিণী ঘোষণা করতে শিল্পীদের নির্দেশ দেবেন। এই ঘোষণা সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান হবে।

বাদ্য

কিছুদিন আগে পর্যন্ত গানের শ্রেণী অনুসারে তার সঙ্গে নানা প্রকারের বাজনা বাজানো হ'ত, কিন্তু এখন তাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। বড়তালের গানের সঙ্গে আগে পাখোয়াজ বাজানো হ'ত, কিন্তু এখন তবলাতেই কোন রকমে কাজ সারা হয়। 'কোন রকমে' অর্থে, তালটাও ঠিকমত বাজানো হয় না। আর তা না হ'লেই বা ধরছে কে? আগে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই এ সব জিনিস বুঝতেন। এখন শ্রোতা থাকেন পঞ্চাশ হাত দূরে—গায়ক-গায়িকাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, অতএব বাদক বে-পরোয়া। তবলা বাজানোর ধারা এখন ক্রমশ নিম্নাভিমুখী, প্রায়ই অত্যন্ত চড়া গ্রামে তবলা বাঁধা হয়, বোধ হয় রেডিওর তবলার আদর্শ নিয়ে। কিন্তু রেডিওতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা চামড়ার বাদ্যযন্ত্রই বেশি বিকৃত শোনায়, এর কারণ হয়তো বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারেন একটু নামিয়ে বাঁধলে তবলার যে একটা নিজস্ব মিষ্টত্ব পাওয়া যায় তা বোধ হয় বাদকেরা অনেক সময় খেয়াল করেন না, এবং খেয়াল করলেও বোধ হয় সে বিষয় তাঁদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। আগেই বলেছি যে অনেক স্থলে তাল না বাজিয়ে শুধু টোকা দিয়ে যাওয়া হয়। যদি তাতেই কাজ হয়, তা হ'লে টাকা খরচ ক'রে বাজনা বাজাবার দরকারই বা কি? পুলিসের প্যারেডের সময় যেমন একটা ছোট ড্রামে ঘা মেরে স্টেপ ঠিক করা হয়, সেই রকম কিছু একটা যন্ত্রের ব্যবস্থা করলেই তো চলে। তবলায় একটা তাল যে কত রকম কায়দায় বাজিয়ে তাকে সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক করা যেতে পারে, এবং খুব আস্তে আস্তে বাজালে তাতে গানকে ড্রাউন না ক'রে তার লালিত্য যে কত বাড়ায় তা জানবার সুযোগ আজকাল কম।

অনেক ক্ষেত্রে রেডিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও অন্যান্য গানের সঙ্গে তবলা না বাজিয়ে খোল বাজানো হয়। রেডিওতে তবলা অপেক্ষা খোলের বাদ্য বেশি স্বাভাবিক শোনায় তা সত্য, কারণ খোলের আওয়াজ নিজেই চড়া, কিন্তু গানের সুরে যদি কীর্তন বা বাউলের টান

থাকে (এবং অনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তা আছে) তবেই তার সঙ্গে খোল বাজানো সঙ্গত। নতুবা তবলাই ভাল। গানের সঙ্গে খোল বাজালেই যে তাকে ক্লাসিকের মর্যাদা দেওয়া হয় তা নয়। খোল কয়েকটা নির্দিষ্ট তালের জন্যই প্রশস্ত,—যে সব তাল কীর্তনে সচরাচর লাগে, যথা—লোফা, দশকোশী, পঞ্চম-সওয়ারী, আড়া, আড়খেমটা ইত্যাদি। একতালা, ঝাঁপতাল ইত্যাদি তালে খোল বাজালে সেটা দেবমন্দিরে ইলেক্ট্রিক আলোর মতই বেমানান হয়। বাউল সুরের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে খোল না বাজিয়ে একতারা বা গোপীযন্ত্র ও খঞ্জনি বাজালে আরও সুশ্রাব্য হয়।

গানের তাল যে তার অপরিহার্য অঙ্গ, সে বিষয়ে লোকে আজকাল বিশেষরূপে সচেতন হচ্ছে। সেইজন্য এই প্রবন্ধে তাল নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা গেল।

নৃত্য

আধুনিক নৃত্যের উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে, এবং বিভিন্ন পুরাতন আঞ্চলিক নৃত্যেরও বিশেষ সমাদর হচ্ছে। প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পুরুষদের নৃত্যটা কম হয়ে আসছে। এর কারণ কি তা ঠিক বোঝা যায় না।

দুই-একটি উচ্চশ্রেণীর নৃত্য লোপ পেতে বসেছে, যথা দেবদাসী নৃত্য ও উড়িষ্যার ছৌ-নৃত্য। দেবদাসী প্রথা বহু পুরাতন; কিন্তু যদিও সে প্রথার বিলোপ বাঞ্ছনীয়, সে নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। 'ছৌ'-নৃত্য অতি সুন্দর,—শিল্পের দিক থেকে সর্বাঙ্গপুষ্ট এবং নাচের ধারাও বৈচিত্র্য-পূর্ণ। ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে এই নাচ প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে রাজ্যগুলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যেরও অবসান হচ্ছে। সুখের বিষয়, সম্প্রতি সেরাইকেলাতে ছৌ-নৃত্যের চর্চা আবার আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ময়ূরভঞ্জে বোধ হয় এ বিষয় কিছুই করা হচ্ছে না। এই নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য উড়িষ্যাবাসীরা যে বিশেষ আগ্রহশীল তা মনে হয় না। এ সম্বন্ধে বঙ্গবাসীরা কি কিছু করতে পারেন না? ছৌ-নৃত্য জানেন, এমন লোক এখনও অনেক

আছেন, তাঁদের সাহায্যে বঙ্গদেশে এই নাচ প্রচলিত করলে মেলা ইত্যাদিতে কিংবা পূজা-পার্বণে জনতার সম্মুখে প্রদর্শনের জন্ম বিশেষ উপযোগী হবে। অর্থকরী-বৃত্তি হিসাবে এর মূল্যও বিবেচনার যোগ্য। নৃত্যানুরাগীরা চিন্তা ক'রে দেখবেন কি ?

বাংলার লোক-নৃত্যে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত যে উদ্দীপনা এনেছিলেন তার ধারা 'লোক'দের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত হয়তো শারীরিক ব্যায়ামরূপে এ নৃত্য স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। যা হোক, এদিকে শিক্ষাবিভাগের আরও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। যাঁরা পল্লী-উন্নয়নকার্যে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদেরও উচিত পল্লী-গীতির মত লোক-নৃত্যকেও পল্লীসমাজে পুনর্বাসন করানো, এবং উভয়কেই নূতন প্রাণধারায় সঞ্জীবিত ক'রে তোলা। গান্ধী-স্মৃতি-সমিতির পরিকল্পিত গান্ধী-ঘরে এই নৃত্য-গীতের নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নাট্যাভিনয়

নাটকের উন্নতি করতে হ'লে অভিনয়ের উন্নতিও আবশ্যক। ভাষা, ভঙ্গী, চলা-ফেরা ইত্যাদি সবই অসাধারণ না হ'লে অভিনয় হয় না—এ ধারণা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; কিন্তু এখনও তার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে যায় নি। অভিনয়ে শিশিরবাবু যে স্বাভাবিকতার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন সেটাও যেন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে, এবং প্রাক্তন চিৎকার, নাটকীয় সুর, উচ্ছ্বাস, উচ্চহাস্য ইত্যাদি আবার দেখা দিচ্ছে,—বোধ হয় রেডিওর অভিনয় থেকে আদর্শ নিয়ে, কারণ আজকাল রেডিওই কলাকেন্দ্র। কিন্তু শুধু রেডিওকে দোষ দেওয়া যায় না, এবং মনে হয় যে পুরাতন কোন নাটক যেখানেই অভিনীত হচ্ছে সেইখানেই সেই নাটকের আদিম অভিনয়ধারা চালানো হচ্ছে,—যেমন, 'বঙ্গে-বর্গী'র আলিবর্দির কুঁজো চেহারা ও কেঁপে কেঁপে কথা বলা এবং তার মার্কা-মারা "দাদুসাহেব"। তবে সুখের বিষয়, অভিনয়ে আজকাল আর লম্বা লম্বা বক্তৃতার বহর নেই।

আমাদের দেশে নাট্য-কলা অর্থাৎ নাটক রচনা, অভিনয়, অভিনেতাদের সাজসজ্জা, প্রযোজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। অ্যামেচার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রেই তরুণ-তরুণীরা অভিনয়-কৌশল আয়ত্ত ক'রে থাকেন। তাঁদের সাফল্য দেখে মনে হয় যে, তাঁদের প্রতিভার অভাব নেই। মানুষ স্বভাবতই অভিনয়প্রবণ,—শৈশব থেকে সে অভিনয় আরম্ভ করে। অতএব যে সব বালক-বালিকা সঙ্গীত অথবা অভিনয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখায় তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তারা যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় ইত্যাদি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহশীল হয়েছেন, তখন তার একটা শাখা হিসাবে নাট্য-কলা শিক্ষার ব্যবস্থা করলে অনেক কাজ হবে। সঙ্গীত ও অভিনয় এখন অর্থকরী বিদ্যার মধ্যেও অগ্রগণ্যের দলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরি পেলে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা নাটকাদির উন্নতিকল্পে গবেষণা করতে পারবেন, এবং নাটক ও উপন্যাসাদির জন্য সাহিত্যিকদের সময় ও সমাজোপযোগী ভাল ভাল মৌলিক প্লটের আভাস দিতে পারবেন।

পরিশেষে, কলাবিদ্‌গণের কাছে নিবেদন এই যে, তাঁরা নিজের ও অন্যের বাড়িতে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাজে গল্প ক'রে তাঁদের অবসরের অধিকাংশ সময় নষ্ট না ক'রে কলার উন্নতিকল্পে একটু সচেষ্ট হবেন, এবং এক এক শ্রেণীর শিল্পীরা মাঝে মাঝে একত্র হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান ক'রে তদনুযায়ী মন্তব্য ও প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকণ্ঠা

নীলকণ্ঠে সিতিকণ্ঠে
শ্রীকণ্ঠে ও বাণীকণ্ঠে
একদিন নির্জনে আহরি
কম্বুকণ্ঠ কহিলেন ফিস ফিস করি,
ভাই সব, করহ শ্রবণ,
যে ভাবেতে বহিছে পবন
তাহাতে মোদের ভাগ্যে কি আছে জানি না,
হাল খালি ঠেকে যায়, পাই তো পানি না।
যতটুকু মগজেতে ঢুকিয়াছে মোর
তাহাতে বুঝেছি ভায়া আশু বা জ্ঞানেন্দ্র বড় জোর
সুবল বা হরি বন্দ্যো সঙ্কলিত কোষের পাতায়
জীবন কাটাতে হবে পাদাল খাতায়,
বাজারে সচল নাকি রহিব না আর।
শুনিতেছি এ সমুদ্রে পেতে পারি পার
জনতার কথ্য-কন্থার
ছদ্মবেশ পরি যদি;
সমুদ্র তা হ'লে হবে নদী।
নীল-গলা সাদা-গলা ভাল-গলা কথা-গলা নামে
নিজ পরিচয় যদি দিতে পার এই বঙ্গধামে
তা হ'লেই রবে নাকি চালু,
সিদ্ধ-ভাজা-ছ্যাঁচড়া-দমে-ডালনা-চপ-চচ্চড়িতে
রহে যথা আলু।
নিদারুণ বার্তা শুনি সকলের বিস্ফারিত আঁখি
কিছুক্ষণ নিস্পলক থাকি
অবশেষে হইল শঙ্কিত।
কি নাম হইবে তব ?—শুধাইল নীলকণ্ঠ ভীত!

আমি হব শাঁখ-গলা। জম্বু নাকি হইয়াছে জাম
আম্র নাকি হইয়াছে আম
চর্ম নাকি হইয়াছে চাম—।

শুনিয়া সবার চর্মে দেখা দিল ঘাম
সকলেরই অধরোষ্ঠ যুগপৎ নড়িতে লাগিল
শোনা গেল—রাম, রাম রাম।

"বনফুল"

তেনজিং শার্পা

তেনজিং শার্পা অবিচল যার পা
হেঁটে গেল হিমালয়-শীর্ষে,
দুর্জয় পর্বত ছেড়ে দিল যার পথ
মেনে নিল মহা নরবীর সে।
বার বার চেষ্টা জয়ী হ'ল শেষটা,
মহাবীর তেনজিং ধন্য,
মানুষের ইতিহাস ঋণী যাহাদের পাশ
তাহাদের মাঝে তুমি গণ্য।

শ্রীসন্তোষকুমার দে

সংবাদ-সাহিত্য

গত সংখ্যা প্রকাশের পর মাসেক কালের মধ্যে কত যে বিচিত্র ঘটনা আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে ঘটিয়া গেল! খবরের কাগজ পড়িয়া পড়িয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারে! ইংরেজ হাণ্টের নেতৃত্বে একাধারে ভারতীয় ও নেপালী বীর তেনজিং এবং নিউজিলাণ্ডবাসী বীর হিলারি হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গে পদার্পণ করিলেন; সদ্যসিংহাসনারূঢ়া ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ব্রিটিশের বিজয়গর্বসূচক টেলিভিসন-বাণী প্রেরণ

রিলেন; বঙ্গভুক্ত দার্জিলিঙের "ডোমিসাইল" তেনজিংকে লইয়া
আমাদেরও বুকের পাটা ফুলিয়া ঢাক হইল; জার্মান ফুটবল টীম আসিয়া
মোহনবাগান-ঈস্টবেঙ্গলকে হারাইয়া দিয়া গেল; পাকিস্তানে নাজিমুদ্দিন
বিচ্যুত হইলেন, মিশরে জেনারেল নাগুয়িব ধাড়ি-কচি রাজবংশ
উৎপাটন করিয়া স্বয়ং একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইয়া বসিলেন;
কোরিয়ায় "নবচিয়াং" সিংম্যান রী সর্ববিধ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অকম্যুনিস্ট
যুদ্ধবন্দীদের ছাড়িয়া দিয়া ইউ-এন-ও-র গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত
করিলেন; পূর্ব-জার্মানিতে সোভিয়েট ও আমেরিকান পুতুল-নাচিয়েরা
পুতুল-নাচের একদফা মহড়া দিলেন; উচ্চতম শক্তিবিশিষ্ট আণবিক
বোমার বিস্ফোরণ হইল; রোজেনবার্গ-দম্পতি বৈদ্যুতিক চেয়ারে
"ফাঁসি" গেলেন; কলিকাতায় গঙ্গায় মাছের ছিপে চার মণ ওজনের
হাঙর ধরা পড়িল; চিনি ও চালের দর বাংলা দেশে হু-হু করিয়া বাড়িয়া
গেল—পুরা একটি বৎসরের ঘটনাবলী এক মাসের মধ্যে ঘটিয়া গেল।
উনত্রিশ হাজার দুই অথবা উনত্রিশ হাজার একশো একচল্লিশ ফুটই
শুধু নয়, মানুষ-কৃষ্ণ প্রকৃতি-কালীয়-নাগের মাথায় চড়িয়া উদ্দাম নৃত্য
করিতেছে, দিকে দিকে তাহারই খবর। কিন্তু ইহার মাঝখানে বিমান
এবং ট্রেন ধ্বংস ও সংঘর্ষের সংবাদ মানুষের বিজয়োল্লাসকে ঘন ঘন
বিষাদাচ্ছন্ন করিতেছে—গত এক মাসে এই পরাজয়ের খবরই
অনেকগুলি পাইলাম। গতি ও প্রগতির দাপে আমরা মত্ত, কিন্তু
প্রকৃতি যে সুযোগ পাইলেই পাল্টা লাথি মারিতেছে, তাহার ঠেলা
সামলাইতে পারিতেছি কই? পদাঘাতে হিমালয়কে বিচলিত
করিলাম, কিন্তু হিমালয় ব্রহ্মপুত্র-খাতে যে জলধারা চালিয়া দিলেন
তাহার দাপটে যে সমগ্র উত্তর-আসাম মানুষ-বাসের অযোগ্য হইয়া
উঠিল তাহার ব্যবস্থা কই? বিঘাপ্রতি ছয় মণ ফসল বৈজ্ঞানিক সারের
গুণে ছত্রিশ মণ হইতেছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ অর্ধাশন অনাহার যে বাড়িয়া
চলিয়াছে, ভারতের খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই সাহেব তাহা অস্বীকার
করিলেও আমরা অস্বীকার করিতে পারিতেছি কই? সালফাডায়াজিন-

সিবাজল, পেনিসিলিন-স্ট্রেপ্টোমাইসিন হইল, ক্লোরোমাইসেটিন-ওরিওমাইসিন হইল, প্রত্যহ নূতন নূতন "সিন" হইয়া জীবাণুরাজ্যে ধ্বংসাত্মক "সীনে"র অবতারণা করিতেছে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ মানসিক ও হৃদয়ঘটিত রোগের প্রসার ও প্রকোপ ঠেকাইতে পারিতেছে কই? সভ্য বৈজ্ঞানিক জগতে প্রত্যহ তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মোটের উপর লাভ হইল কোথায়, এক মাসের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাই খতাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছি এবং বিষণ্ণচিত্তে এই মাত্র অনুভব করিতেছি যে, দড়ির ফাঁসি বৈদ্যুতিক চেয়ারে মাত্র রূপান্তরিত হইয়াছে, মানুষ আর কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই।

—

বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বিবিধ অনৃত-ভাষণ ও কটূক্তির জবাবে বাংলা-প্রদেশ-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে ধীর স্থির ভদ্র বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, গতবারে আমরা তাহার আলোচনার সুযোগ পাই নাই। বাংলা দেশের জবাব আপাতত ভদ্র গণ্ডিতে নিবদ্ধ থাকিলেও ব্যাপারটা বাঙালী জাতির পক্ষে এমন গুরুতর যে, কেন্দ্রীয় সরকার অচিরাৎ কোনও সুচিন্তিত ব্যবস্থা না করিলে বরাবর ভদ্রতা রক্ষা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে সে সময় ও সুযোগ দিতে আমরা বাধ্য। ততদিন পর্যন্ত আমরা শুধু আবেদন নিবেদন ও সুযুক্তিরই প্রয়োগ করিয়া যাইব, সত্যাগ্রহ বা অনশন করিব না—এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রীনেহরু ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসুন, লণ্ডন প্যারিস সুইজারল্যাণ্ডের গরম কাটাইয়া একটু ঠাণ্ডা হউন, তাহার পর তিনি বা তাঁহার গবর্মেন্ট যদি সাফ জবাব দেন, তখন আমাদের কর্তব্য ধীরস্থির বিবেচনার দ্বারা বাছিয়া লইতে হইবে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশের এই জায্য সম্প্রসারণের উপর সমগ্র বাঙালী জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এই সমস্যা মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে। অর্থাৎ আমরা অপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারি না। অতুল্যবাবু

অনেক যুক্তি দিয়াছেন। যেখানে যাঁহার আয়ত্তে যত যুক্তি আছে এখন প্রকাশ্যে তাহা প্রয়োগ করিতে থাকুন, সবগুলি মিলাইয়া এই মামলার "ব্রীফ" প্রস্তুত করিতে হইবে—সীমা-নির্ধারক কমিশনের (যাহা বসানো হইবে বলিয়া আশা করিতেছি) নিকট ন্যায়বিচারের জন্য আমরা সর্বপ্রকারে সকল দিক দিয়া আমাদের দাবি জ্ঞাপন করিব। আমাদের ইহা প্রস্তুত হইবার কাল। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমরাও কিছু নজির দাখিল করিতেছি।

সার্ জর্জ এ. গ্রীয়ারসন, সি. আই. ই., পি. এইচ.-ডি., ডি. লিট, আই. সি. এস. পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তি; তাঁহার খ্যাতি বিহার প্রদেশে দীর্ঘকাল শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া নহে, ভারতীয় ভাষা(আর্য-অনার্য)সমূহ লইয়া তিনি বিস্তর "পাইওনীয়র" গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া; তাঁহার সম্পাদিত *Linguistic Survey of India*—'ভারতের ভাষাগত জরিপ' পুস্তক কয়েক খণ্ড তাজমহলের সমশ্রেণীর গৌরবের বস্তু হইয়া আছে ও থাকিবে। পৃথিবীতে ভাষা-বিষয়ক গবেষণা যিনিই করিবেন, তাঁহাকেই এই বিপুল গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। মিথিলায় বিদ্যাপতি ঠাকুরকে লইয়া তিনিই প্রথম গবেষণা করেন এবং বিদ্যাপতির কয়েকটি খাঁটি পদ সাধারণের গোচরে আনেন। মোটের উপর ভাষা সম্পর্কে তাঁহার মত্ প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য অন্তত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—ওই বৎসরে তাঁহার পুস্তকের বাংলা ও আসামী ভাষাবিষয়ক প্রথম খণ্ড (পঞ্চম ভল্যুমের প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। অতুল্যবাবু এই পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে পূর্ণিয়া-সংক্রান্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা আরও কিছু সমীচীন উদ্ধৃতি নিম্নে দিতেছি—

The language of the Chota Nagpur plateau is Bihari, while that of the district below the plateau, and immediately to its east, Manbhum, is Bengali. Here there is no merging, Behari and Bengali live side by side as independent languages...On the other hand, where Bengali and Behari meet north of the Ganges in a level plain, with little or

no natural barrier between them, the languages so merge into each other that it would be impossible to draw a definite boundary line. A feeble barrier, it is true, does exist in the river Mahananda, and that has some slight influence in separating the two forms of Speach...

It will be noted in future volumes of this Survey, how willingly an aboiginal tribe allows its own proper language to be corrupted by those of its more civilised Aryan neighbours, and how, in some cases, it has even abandoned its own language altogether.... A good example is afforded by the Kharia tribe, who have a language of their own which belongs to the Munda family. Yet...the Kharias who live in ihe Bengali-speaking district of Manbhum speak a corrupt Bengali,... —পৃ. ৪

...Mal Paharias of the centre of the Santhal Parganas have, like the Kharias, abandoned their own Dravidian tongue. and speak a corrupt form of the language of their Bengali neighbours. —পৃ. ৭০

ইহাই হইল ঠিক অর্ধশতাব্দী পূর্বের (১৯০৩) খাঁটি তথ্য। এই কালের মধ্যে কি কিছু পরিবর্তন হইয়াছে? হয় নাই। সেই নজিরই বিহারেরই আর একজন প্রখ্যাতনামা ইংরেজ শাসনকর্তার রচনা হইতে দিতেছি। সার্ জন হুল্‌টন (Houlton) সি. এস. আই., সি. আই. ই. আই. সি. এস. ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে *Bihar, the Heart of India*—'বিহার, ভারতের হৃৎপিণ্ড' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের দুই বৎসর পর পর্যন্ত তথ্য এই পুস্তকে আছে। তিনি লিখিয়াছেন—

Purnea—"The people of the east of the Mahananda river are a Bengali-speaking race...." —পৃ. ১২১

এবং Manbhum—"The language spoken over a great part of the district is Bengali, the dialect being that of Western Bengal, known as *Rarhi Boli*." —পৃ. ১১১

গত চারি বৎসরে যদি গুরুতর কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকে বলিতে পারি না, ১৯৪৯ পর্যন্ত এই খবর। রাঁচী অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে বাংলা-ভাষাভাষী জৈনদের বাস, দুমকা অঞ্চলে বাংলা-ভাষাভাষী মাল পাহাড়িয়ারা বাস করে, হাজারিবাগের প্রাচীনতম অধিবাসীরা বাংলা বলে এবং মানভূমের মত ধলভূমের প্রধান অংশ বঙ্গভাষাভাষী—এই সকল

তথাও আমরা এই সব পুস্তক হইতে পাইতেছি। বিহারের যাঁহারা বর্তমান ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ, তাঁহারা একটু কৃপাপরবশ হইয়া বাংলার এই ন্যায্য দাবি স্বীকার করিলে বাঙালী জাতি দাঁড়াইবার একটু স্থান পায় এবং অনেক ভবিষ্যত কুৎসিত আত্মসংঘাত হইতে ভারতরাষ্ট্র রক্ষা পায়—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন।

—

পাকিস্তানের সহিত ভারতের এবং বিহারের সহিত বাংলার সাময়িক বিরোধ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ ফরাসী মনস্বী পাস্কালের (Blaise Pascal, 1623-1662) একটি উক্তি চোখে পড়িল—

Time heals griefs and quarrels, because we change; we are no longer the same persons. Neither offender nor offended are anymore themselves. It is like a nation whom we have angered, and whom we see again after two generations: they are still the French, but not the same.

কালে বেদনার প্রশমন হয়, বিরোধ শান্ত হয়, কারণ আমাদের পরিবর্তন ঘটে; আমরা কাল যাহা ছিলাম, আজ আর তাহা নই। আততায়ী এবং আহত উভয়েরই বদল হইয়াছে ঠিক জাতিতে জাতিতে বিরোধের মত, আজ যে জাতিকে চটাইলাম দুই পুরুষ পরে তাহারা নামে সেই জাতিই থাকে, কিন্তু আসলে ঠিক তাহারা থাকে না।

ইহা ভবিষ্যৎ ভরসার কথা। দুই পুরুষ পরে পাকিস্তানে ভারতে দোস্তি হইবে অথবা বাংলা-বিহার গলাগলি করিবে, ইহা ভাবিয়া আজ আমাদের সান্ত্বনা কোথায়? তবু মহতের বাণী মানিয়া লইতে বাধা নাই। আজ বিরোধের মীমাংসা না হইলেও কাল হইবে—এই আশা লইয়া আমরা মরিতে পারিব।

—

মানুষ বিলম্ব সহিতে পারে না বলিয়াই শক্ত থাকিতে থাকিতেই তথাকথিত অপরাধীর প্রতি আদর্শ শাস্তি—exemplary punishment-এর বিধান করিয়া থাকে। ভবিষ্যতের উপর মামলা ছাড়িয়া দিতে তাহারা প্রস্তুত নয়, সেটা অনুতাপের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

লোহা গরম থাকিতে থাকিতেই ইহুদীরা যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, তাহার পর দীর্ঘ কুড়ি শতাব্দী কাল নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইয়া অনুতাপ করিতেছে; নন্দকুমারকে ফাঁসি এবং নির্বাসনে নেপোলিয়নের মৃত্যু ব্যবস্থা করিয়া ইংরেজ সদ্য সদ্য এক্সেমপ্লারি পানিশমেণ্ট দিবার গৌরব অর্জন করিয়াছিল, অনুতাপের পালা এখনও শুরু হইতে দেখি নাই। জার-রোমানফ-পরিবার ক্ষিপ্ত স্বদেশীয় জনগণের তপ্ত ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া আদর্শ শাস্তির জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। মুসোলিনিও তাই। সপারিষদ্ হিট্‌লার আত্মহত্যা করিয়া শাস্তি এড়াইয়াছিলেন; তোজোর বিচার-প্রহসন একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। সর্বশেষ রোজেনবার্গ-দম্পতি আদর্শ শাস্তির আদর্শ হইলেন; আমেরিকার কর্তাদের তর সহিল না। বিধাতার প্রতি নির্ভরশীল ভারতীয় আমরা, আমাদের ইহাতে বাধে। আরও বাধে এই কারণে যে ইহা নির্লিপ্ত বিচারকের শাস্তি নয়, ইহার মধ্যে দারার ছিন্নমুণ্ডের গন্ধ পাই।

এই পর্যন্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে নির্মল আকাশ হইতে অকস্মাৎ নিদারুণ বজ্রপাতের মত বাংলার সুসন্তান শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর খবর আসিল (২৩-৬-৫৩, সকাল আটটা)। তাঁহার সহিত পরিচয়ের দরুণ ব্যক্তিগত যে বিয়োগ-দুঃখ তাহা একান্ত আমাদেরই। কিন্তু আমরা শুধু একজন নির্ভরশীল সুহৃৎ ও হিতাকাঙ্ক্ষীকেই হারাইলাম না, বর্তমানে বাংলা দেশের একমাত্র মুখোজ্জ্বলকারী নেতাকে হারাইলাম। পরাজয়ের প্রথম প্রত্যাঘাতে হিমালয় বাংলার শ্যামাপ্রসাদকে গ্রাস করিল। সাতাশ বৎসর পূর্বে এই আষাঢ় মাসের গোড়াতেই বাংলার চিত্তরঞ্জন হিমালয়ের বুকে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—"স্টেপ অ্যাসাইড"-তীর্থে এখনও স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয় নাই, আবার আজ কাশ্মীর-শ্রীনগরের কোনও আরোগ্যশালা বাঙালী জাতির আর একটি তীর্থশালা প্রস্তুত করিল। পিতা আশুতোষ বিদেশে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, পুত্রও তাহাই করিলেন,—অসহায় বাঙালী কাহারও মৃত্যুশয্যায় শেষ সম্মান দেখাইতে পারিল না।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এবং জম্মুর প্রজাপরিষদের পক্ষ লইয়া শ্যামাপ্রসাদ প্রবল সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহার অসুস্থ ও অপটু দেহ এতখানি ধাক্কা সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার নিজের দেহের দুর্বলতার কথা তিনি বার বার কঠিন আঘাতের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াও সংগ্রামে ক্ষান্তি দিতে পারেন নাই, কারণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষে আর কেহ এই নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য ছিল না; কাল যে নিজে তাঁহাকে একদিন বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিবে বীর শ্যামাপ্রসাদ তাহা মুহূর্তের জন্য মনে করেন নাই; পলায়নী মনোবৃত্তি তাঁহার মধ্যে আদপেই ছিল না। পিতার সেই বিখ্যাত উক্তি "Freedom first, Freedom second, Freedom always" পুত্রকেও নিরন্তর উদ্‌বুদ্ধ করিত। তিনি যাহা অন্যায় বা স্বাধীনতাবিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, কখনই তাহা বরদাস্ত করিতেন না। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বপদ ত্যাগ এই স্বাধীন-চিত্ততারই ফল। তৎপূর্বে একই কারণে তিনি নিখিল-ভারতীয়-হিন্দুমহাসভার প্রধানতম প্রতিনিধিত্বও ত্যাগ করিয়াছিলেন। জওহর-লালের মন্ত্রণা-পরিষৎ ত্যাগ করিয়া তিনি "জনসঙ্ঘ"-নামে নূতন দল গঠন করেন এবং তাহার প্রথম সভাপতি হন। "জনসঙ্ঘে"র প্রার্থীরূপেই তিনি কেন্দ্রীয় লোকসভায় নির্বাচিত হন; সেখানে তিনি এতদিন যোগ্যতার সহিত বিরোধীদলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। জওহরলালের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র তিনিই ছিলেন. দুইজনে এক সমতলভূমিতে দাঁড়াইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে পরস্পরকে একাধিকবার আহ্বান করিয়াছেন, শ্যামাপ্রসাদ কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বিদেশপ্রবাসী জওহরলালকে তাঁহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর এই অকাল ও আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথা সর্বাধিক বাজিবে।

তাঁহার নিজের কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি নাই বটে কিন্তু তিনি বাংলা দেশের লেখক ও সাহিত্যিক সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, বঙ্গভাষা প্রসারেও তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অন্ততপক্ষে সহস্রাধিক পুস্তক তাঁহার নামে

৲ৎসর্গিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ইউনিভার্সিটির কারণে নয়। মোহিতলাল তাঁহার 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থখানি "স্বজাতি ও স্বধর্ম প্রাণ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অচলপ্রতিষ্ঠেষু" উৎসর্গ করিয়া তাঁহার 'ভূমিকা'র সমাপ্তিতে বলিয়াছেন—

"বাঙালী হিন্দুর আজ বড় দুর্দিন; বাঙালী হিসাবেই বাঙালীর বাঁচিয়া থাকা যে কত প্রয়োজন তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি বলিয়াই আমি অধুনা আত্মভ্রষ্ট ও আত্মঘাতী বাঙালীর জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি এবং নানা মত ও নানা দলের কুরুক্ষেত্র এই বাংলা দেশে যিনি বাঙালীত্বকে রক্ষা করিবার জন্য একাই বহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছি।"

শ্যামাপ্রসাদের এই পরিচয় বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। বিপন্ন বাঙালীকে আহার্য ও আরাম দিবার জন্য তিনি বহুবার অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার খবর দেশবাসী জানেন; কিন্তু বিপন্ন সাহিত্যিকদের রক্ষার্থ তাঁহার বরাভয় কর যে কতবার উত্থিত হইয়াছে সে খবর সকলের রাখিবার কথা নয়, আমরা কিছু কিছু জানি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন সহায়সম্পদহীন অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থভাবে উত্তর কলিকাতায় চিৎপুর-সন্নিহিত এক এঁদো গলিতে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাইতেছিলেন, মাসিক সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয় নাই, তখন আমরা তাঁহার সাহায্যার্থ শ্যামাপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় আমরা এমন সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম যে, প্রায় দুই বৎসরকাল মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে কবি-পরিবারকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। এই টাকা মাসে মাসে আমরাই কবিপত্নীকে দিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া ইহার খবর রাখি। সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইলে এই সাহায্য বন্ধ করা হয়।

এইরূপ ইতিহাস আরও আছে। মোহিতলালের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গ যাহাতে বিপন্ন না হইয়া পড়েন, সে কারণেও তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত ও তৎপর দেখিয়াছি। অন্যান্য নানা গুরুতর

কাজের মধ্যেও তিনি এ বিষয়ে সাহিত্যিকদের লইয়া সভা করিয়াছেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক হাজার টাকা নরসিংহ-পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মোহিতলালের 'কাব্য-মঞ্জুষা' বইখানি স্কুল কলেজে পাঠ্য করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। চিত্তরঞ্জন ছাড়া বাংলা দেশের অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতাকে সাহিত্যিক ও সাহিত্যের জন্য এতখানি করিতে দেখি নাই।

তিনি অতিশয় ধীমান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন, নিজের ধারণা ও মতামত দৃঢ় ও স্পষ্ট ছিল অর্থাৎ তিনি শক্ত মানুষ ছিলেন; তথাপি দেখিয়াছি, কাহারও কোনও বিপদ বা দুঃখের খবর লইয়া গেলে তিনি প্রথমটা শিশুর মত বিচলিত হইয়া অসহায় ভাবেই প্রশ্ন করিতেন, বলুন তো কি করা যায়? প্রশ্ন করিয়াই আত্মস্থ হইতে বিলম্ব হইত না। এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিজেই রাস্তা বাহির করিয়া ফেলিতেন।

শ্যামাপ্রসাদ নির্ভীক ও নিরাসক্ত ছিলেন, মোটেই আত্মপরায়ণ ছিলেন না। ভীরু হইলে অথবা নিজের সম্বন্ধে একটু বেশি চিন্তা করিলে ভাঙা শরীর লইয়া এ ভাবে পরার্থে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পারিতেন না; অন্য কেহ হইলে যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু ঘটিতে পারে—এই ভাবনায় অস্থির হইয়া নিজেকে গৃহবদ্ধ করিতেন; জীবনে বীতরাগ হইলে মানুষ যেমন করে, সুখ ও আরামের দুলাল শ্যামাপ্রসাদ দেশের ও জাতির কল্যাণ ভাবিয়া ঠিক তেমনই ছটফট করিয়া ফিরিতেন। দুঃখের বিষয়, এই অবিমৃষ্যকারিতার মূল্য তাঁহাকে অকালেই দিতে হইল। মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মত কর্মীর মূল্যবান জীবন খণ্ডিত হওয়া দেশের ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলা দেশের যে কি সর্বনাশ হইল, তাহা জননী বঙ্গই অনুভব করিতেছেন।

তিনিই বাংলার শেষ বীর। আপাতদৃষ্টিতে তো তাঁহার কাছাকাছি আর কাহাকেও দেখিতেছি না। নিতান্ত চিন্তালেশহীন ছাত্রসমাজকে উস্কাইয়া দিয়া কলিকাতার রাজপথে পুলিসের আইন লঙ্ঘন করাইয়া

যে দিন শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল, সে দিনও গুলিবিদ্ধ ছাত্রসমাজকে নির্ভয় করিবার জন্ত বাংলার আর কোনও নেতা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ পারিয়াছিলেন। ভাগলপুরের মাঠে ধরা দিবার জন্য যাত্রা করিয়া নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদই মাঝপথে কহলগাঁওয়ে আটক পড়িয়াছিলেন। তাহার পরে দিল্লীর এবং কাশ্মীরের ইতিহাস। সে ইতিহাসের আর পুনরাবৃত্তি হইবে না। বাংলার শেষ বীর বাংলার বাহিরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আজ ২৩শে জুন, ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার ভোর ৩টা ৪০ মিনিটের সময়। জন্মস্থান কলিকাতার আকাশ আজ সারাদিন ক্রন্দনপরায়ণ। চিত্তরঞ্জন-আশুতোষের তিরোধানের পরেও শ্যামাপ্রসাদ স্বীয় প্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা রসা রোডের শূন্যতাকে ভরাট করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর সে পথে ট্রাম চলিবে, বাস চলিবে, লাউডস্পীকারের বিচিত্র আওয়াজে রাজপথ মুখরিত হইবে ; কিন্তু দুঃখিনী মায়ের শূন্য কোল কেহ ভরিয়া তুলিতে পারিবে না, নিদারুণ শূন্যতা সেখানে খাঁ-খাঁ করিবে।

* * *

"নচিকেতা, মোরা বালুতটে বসি রয়েছি চাহিয়া
সলিল-সমাধি-তলে,
রয়েছি চাহিয়া যুগ-যুগান্ত ধরি—
মণি-বিখচিত প্রবাল-ভূষণ তুমি একবার
এনেছিলে ডুব দিয়ে,
তাহারই কাহিনী শুনিতেছি প্রতিদিন,
শুনি রূপকথা নচিকেতা-মৃত্যুর।
শুনি আর দেখি, একটি একটি ক'রে
তটের বালুকা খসিয়া খসিয়া পড়ে,
কাল-তরঙ্গে একে একে সবে ডুবিছে মর্ত্যপ্রাণী।
পিছনে যাহারা প্রতীক্ষা করে বালুতট-আশ্রয়ে,
তারা দেখে বিস্ময়ে—
যারা যায় তারা ফিরিয়া আজিও আসিল না হায় কেউ,
ডুবিল যাহারা উঠিল না তারা কেউ।"

ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর মৃত্যুও বাংলা দেশের পক্ষে কম মর্মান্তিক নয়, তবে ইহা আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা তিলে তিলে প্রস্তুত হইতেছিলাম, অনিবার্য সংবাদ একদিন প্রাতে আসিয়া জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য নিস্পৃহ করিয়া অন্তরমুখী করিল। বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার দানের পরিমাণ হিসাব করিলে আমরা অনুমান করিতে পারিব, কতখানি হারাইলাম! বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষতা এবং মানসিক ব্যাধির নিয়মিত চিকিৎসা করিয়াও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অদ্ভুত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার এবং 'পুরাণ-প্রবেশে'র মত গভীর গবেষণামূলক একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার অবকাশ তিনি পাইয়াছেন—ইহা বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার মন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কুঠরিতে ভাগ করা ছিল, এমন সুনির্দিষ্ট যে "অসমসিসে"র দ্বারাও একে অন্যে যোগাযোগ ঘটিত না। এই কারণেই তিনি পিপীলিকাদের বিচিত্র যুদ্ধ-কাহিনী গল্পচ্ছলে যেমন চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিতে পারিয়াছেন ('লাল-কালো'), তেমনই দক্ষতার সহিত পুরাণ হইতে খাঁটি ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন; যেমন ভাবে গীতা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ঠিক তেমনই ভাবে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ স্বপ্নদর্শীদেরও চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। সাইকো-অ্যানালিসিস সম্বন্ধে তাঁহার মূল্যবান গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারাও গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার আরও একটি পরিচয় অনেকে জানেন না, তিনি একজন অসাধারণ মজলিসী লোক ছিলেন। ১৪নং পার্শিবাগান লেনে যখন রাজশেখর বসু প্রমুখ ভ্রাতারা একত্র থাকিতেন তখন তিনি একাই হাসিতে গল্পে আসর জমাইয়া রাখিতেন, দোহারকি করিতেন চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন; মুখচোরা পরশুরাম একান্তে বসিয়া প্রায় নীরবে গল্পের রসদ সংগ্রহ করিতেন। এই কালে তিনি ম্যাজিক দেখাইয়াও আড্ডাধারীদের তাক লাগাইয়া দিতেন; অ্যামেচার ম্যাজিশিয়ান হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সুদূর সাগর পারে বিস্তৃত

হইয়াছিল—"যোগী গিরীন্দ্রশেখরে"র আবিষ্কৃত দুই-একটি খেলা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, পরিষৎই তাঁহার 'পুরাণ-প্রবেশ' ও 'স্বপ্নে'র প্রকাশক। কিছুকাল পূর্বে পরিষৎ 'মনোবিদ্যার পরিভাষা' সঙ্কলনের জন্ম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রদত্ত পুরস্কার দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরীন্দ্রশেখর কার্টুন ছবিও আঁকিতে পারিতেন, তাঁহার স্বচিত্রিত একটি ব্যঙ্গচিত্র 'শনিবারের চিঠি'র গোড়ার দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। মোটের উপর তাঁহার মত একজন সাহিত্যরসিক মজলিসী বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ চৌকস ব্যক্তি এ যুগে একান্ত দুর্লভ।

জানি মৃত্যু শেষ নয়, তবু এরে মানি ভয়ঙ্কর,
আবরণ-উন্মোচনী বিদ্যা মোরা শিখি নি এখনো ;
ব্যর্থতার হাহাকারে ভরি উঠে সকল অন্তর
তবু মানি কেন জানি যোগাযোগ র'য়ে গেছে কোনো।
এত জ্ঞান জ'মে ওঠে মানুষের মস্তিষ্ক-কোটরে
এত আশা ভালবাসা ভয়হীন আনন্দ অপার—
সবই শেষ হয়ে যাবে অগ্নি কিংবা কীটের জঠরে ?
যবনিকা-অন্তরালে রঙ্গমঞ্চ নাহি কি রে আর !
না না, ইহা সত্য নয়, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা এ সংশয়।
অতীতের কুক্ষি হতে আনিয়াছি অনেক সংগ্রহ
তবেই না আমি তুমি সবার স্বতন্ত্র পরিচয় ;
যাব যবে ফেলে যাব মাত্র এই শরীরবিগ্রহ।
জানা নাহি যায় যার আরম্ভের কোনো ইতিহাস,
তার মনে কেন বল সমাপ্তির এই মহাত্রাস !

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

শ্রাবণ ১৩৬০ : দাম আট
সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস
July-Aug. : Price As. Ei-

SOLOMONCO

সিগনেট বুকশপে
১২।১ রাসবিহারী এভিনিউ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
মনের মতো বই পাবেন

সূচী

শ্রাবণ—১৩৬০

কেদারনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় বই

শোভন তৃতীয় সংস্করণ

দাম পাঁচ টাকা

প্রকাশক

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং (১৯৩৩) লিমিটেড

৩ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট কলিকাতা-১

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!!

প্রবোধ সরকারের

১। হে মোর মানসী প্রিয়া ২॥০
২। মিলন-গোধূলি ২॥০

শশধর দত্তের

১। চরিত্রহীনা ৫৲

দীপিকা দে'র

১। কামরূপের মেয়ে ৪৲ ২। বর্ম্মা দেশের মেয়ে ২॥০
৩। আধুনিক মেয়ে ২৲

মায়া দে'র

১। তাসের ঘর ২৲

বহুদিনের পর প্রবীণ ডিটেকটিভ লেখক—পাঁচকড়ি দে'র

১। মনোরমা ২॥০ ২। মায়াবিনী ১॥০
৩। মায়াবী (যন্ত্রস্থ) ৪৲
৪। রমণীর হৃদয় রহস্য (সঙ্কলিত) ১॥০

বাণীপীঠ গ্রন্থালয়।

ম্যালেরিয়া
ও তার আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রণা
দূর করে
'প্যালুড্রিন'
ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি জেনে রাখুন
প্রথমে শীত করে ও জ্বর আসে; তারপর ঘাম দেয় ও সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়।
এই সব লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন!
'প্যালুড্রিন' সব সময় আহারের পর খাবেন এবং
'প্যালুড্রিন'-এর সঙ্গে গ্লাস ভরতি জল খাবেন।
পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছরের বড় ছেলেমেয়েদের : এক বড়ি
৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের : আধ বড়ি
৬ বছরের ছোট শিশুদের : সিকি বড়ি
যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয়
প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।
ICI
ICP 177

কেশ পরিচর্য্যায়
অপরিহার্য্য
ক্যালকেমিকোর সুরভিত কেশতৈল "ক্যাষ্টরল" ঔষধার্থে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ও পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ব্যবহারে চুল বাড়ে ও কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে।
৫ ও ১০ আউন্স সুদৃশ্য শিশিতে পাওয়া যায়।
ক্যাষ্টরল
কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

বিয়োগে

আ-সমুদ্র হিমাচল হিন্দুস্থান প্রয়াণে তোমার
স্বতঃস্ফূর্ত বেদনায় স্তব্ধ ক্ষোভে করে হাহাকার।
বিদ্যুতের সরীসৃপ-কশাঘাতে অসাড় হৃদয়,—
সকলেরি এক প্রশ্ন,—'এ মৃত্যু কি অপমৃত্যু নয়?'
বন্দীশালে মৃত্যুকালে "মা" বলিয়া উঠেছিলে ডাকি'
নিষাদের বাণ-বিদ্ধ, ক্ষত-বক্ষ, রক্তাতুর পাখী।
বিনা বিচারেই তুমি, হে গুণী নজর-বন্দী হ'লে,
ভাঙে পাছে গণ-নিদ্রা তব যোগ-বিভূতির বলে!
এক নিশানের তলে একই বিধান সবাকার,
প্রধান সে একজন,—ঘোষিয়াছ তুমি বারেবার।
মানুষকে জন্ম-স্বত্বে বঞ্চিয়া যে বসে স্বর্ণাসনে
সন্ধি করিলে না তুমি দম্ভী সেই স্পর্ধিতের সনে।
অকাল বিচ্ছেদ তব শুনি নব-জীবন-বিষাণ,
আঘাতে গড়িবে জাতি, সাগরেও ভাসাবে পাষাণ।
অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্র চেয়েছিলে তুমি মহাপ্রাণ,
অমর সন্তান তুমি আত্মাহুতি করিলে প্রদান।
অবশেষে ফলিল সে ভারত-বিভাগ-অভিশাপ,
মিলিত হইয়া মোরা করিয়াছি এই মহাপাপ।
শহীদ্ শ্যামাপ্রসাদ, হে মানব-দরদী সুহৃদ্,
যজ্ঞ-বেদী-তলে তুমি রেখে গেছ শমীর সমিধ্।
বিপক্ষ-শিবির থেকে দেহ তব এল গৃহে ফিরে,
পূত তব চিতাভস্ম মিশে গেল আদি-গঙ্গানীরে।
যেখানে গিয়াছ আজি সেখানে শ্রদ্ধাই শুধু যায়,
আত্মার তর্পণ তব করি মোরা মর্ম-বেদনায়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা হওয়ার কথা

আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা হতে শুনি। বিশেষত স্বাধীনতা হবার পর থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কমিটি-কমিশনের অন্ত নেই। এটা একটা শুভলক্ষণ বলতে হবে। কারণ এ হতে প্রমাণ হয় যে, আর কিছু হোক বা নাই হোক আমরা অন্তত এটুকু অনুভব করতে শুরু করেছি আমাদের চলিত শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক নেই, তার বদল দরকার। এখনও আমরা রাস্তা খুঁজে পাই নি বটে, কিন্তু এই হাঁকপাকানি হতে বোঝা যায় যে, রাস্তা খোজবার দরকার আমরা বুঝতে শুরু করেছি। সে হিসেবে আনন্দিত হ'লেও আমার একথা মনে হয়েছে, আমাদের সমস্ত আলোচনার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ভাব আছে। প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন, "আমরা কলেজে যুগপৎ ইংরেজি-সুরা এবং সংস্কৃত-সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায় সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই করছে।" যতদিন আমরা স্বাধীন হই নি ততদিন স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাদের পশ্চিমী সভ্যতা ও সাহিত্য বিজ্ঞান অনুশীলন করতেই হ'ত। এবং আমরা তা করতাম ফরাসী জর্মান বা অন্য কোনও য়ুরোপীয় ভাষার মাধ্যমে নয়, ইংরেজীরই মাধ্যমে। ফলে যে সব ছাত্রের পক্ষে পশ্চিমী সভ্যতা ও জ্ঞান হতে মনের আলো সত্যকারের জ্বালাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না সে সব ছাত্রকেও এককালে গাড়িঘোড়া চড়বার লোভে এবং ইদানীং জীবনসংকটে ভাসবার সময় ডিগ্রী নামক একটা ভেলা পাবার আশায় বাল্যবয়স থেকেই চতুর খেঁকশেয়ালীর সঙ্গে মুরগির দেখা হবার কাহিনী মুখস্থ করতে হয়েছে। কিন্তু জোরে-টানা ধনুক হঠাৎ ভেঙে গেলে তার ছিলেটা ছিঁড়ে দুদিকে ছটুকে যায়। ইংরেজের টান চ'লে যেতে আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা—আমরা দুদিকে ছটুকে গিয়েছি। সেইজন্য একদিকে যেমন দেশময় ল্যাবরেটরি তৈরী হয়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ঝোঁক পড়েছে ভারতবর্ষের অতীতকে আবার নতুন করে দাঁড় করাবার।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হবার কথা সেদিন মন্ত্রীমহাশয় এখানে ঘোষণা করেছেন—কাশীতে রাষ্ট্রপতি নাকি বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পা নিজে ধুইয়ে দিয়েছেন। ডাঃ কাটজু তো সংস্কৃতকেই ভারতের সর্বজনচলিত ভাষা করতে বলতেন। অর্থাৎ একদল বলছেন, ওদের দেশের জিনিষগুলো (কাজে লাগুক আর নাই লাগুক) পুরোপুরি আমদানি করা চাই। বোধ হয় মনে মনে এঁরা ভাবেন যে, তা না হ'লে আমরা জাত হিসেবে জাতে উঠব না। আর অন্যদল বলছেন, ওরা কি এতই শ্রেষ্ঠ? যে সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকে আমরা এতকাল কাটিয়ে এলুম সেই তো আমাদের আসল সংস্কৃতি। সেটাকে সবচেয়ে বড় ক'রে তুলে না ধরলে আর আমাদের নির্বাধ জাতীয় স্বাধীনতা হ'ল কই? এর কোনটাই নিন্দার্হ নয় যদি আমরা তাকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ এই দ্বিধারা যে ভাবে চলছে তাতে তাকে সাংখ্যের বা কোনও কিছুরই মতানুসারে দ্বৈতবাদ বলা যাবে না। এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ পুরুষ নেই, যা আছে তা হ'ল কেবল অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। এককালে এই দ্বৈতের সমন্বয় যুগোপযোগী ভাবে বিদ্যাসাগরের মধ্যে হয়েছিল ব'লেই "হুতোম প্যাঁচার গানে" হেমচন্দ্র তাঁকে বলতে পেরেছিলেন,

> ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্।
> টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্॥

কিন্তু আজকাল যা চলছে, তা হ'ল দ্বৈরথ যুদ্ধ। যাঁরা অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন তাঁদের দৃষ্টি বেশির ভাগ সেখানেই আটকে থাকে, ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয় না। অন্যদিকে যাঁরা কেবল পশ্চিমী-বন্দর থেকে পণ্য আমদানি করতে চান তাঁরা ও দোষ থেকে মুক্ত নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁরাও সব সময়ে এদেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার দিকে উচিত মনোযোগ দেন না। শুধু যে ইংরেজী বা পশ্চিমী ধারা ও প্রাচ্য ধারার মধ্যেই এই সংঘাত চলছে তা নয়, শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এ রকম দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রসারিত হতে চলেছে। হিন্দী ও অন্যান্য

ভাষা—বিশেষত বাংলা ভাষার—দ্বন্দ্ব; কলা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব; ইস্কুল ও কলেজের দ্বন্দ্ব; প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার দ্বন্দ্ব; কেবল জ্ঞানের জন্য শিক্ষা এবং অর্থের জন্য শিক্ষা—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব। এই রকম হাজার প্রকারের দ্বন্দ্ব। কোন্‌টায় বেশী ঝোঁক পড়া উচিত? কোন্‌টার কি রকম চেহারা হওয়া উচিত?

আমি যদি য়ুনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের সভ্য হতাম, তা হ'লে এখানে প্লেটো থেকে নিউম্যান এবং উপনিষদ থেকে টি. এস. এলিয়ট মন্থন ক'রে শিক্ষা যে আত্মবিকাশের উপকরণ, তা যে ইর্‌ফান এবং ইল্‌ম্‌ অথবা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্মিলন, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করাই যে তার কাজ—এ সব কথা বলতে পারতুম এবং সেই মানদণ্ডে উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ধারণ করবার চেষ্টা করতুম। অথবা আমি যদি মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনের নাড়া-বাঁধা শিষ্য হতুম তাহ'লে স্বচ্ছন্দে বলতে পারতুম যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজের বিলোপসাধনে সহায়তা করা। কারণ যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আত্মবিকাশ মানে হচ্ছে বুর্জোয়াদেরই আত্মবিকাশ,—যারা অর্থাভাবে পড়াশুনা করতে পারে না তাদের নয়। বিপ্লবোত্তর কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত সাধনাই হবে বটে, কিন্তু সমাজের মূল লক্ষ্যকে অতিক্রম ক'রে নয়। কিন্তু যতদিন বিপ্লব না হচ্ছে ততদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতিতে সর্ববিধ সাহায্য। কিন্তু যেহেতু আমি য়ুনিভার্সিটি কমিশনের সভ্যও নই, মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনের নাড়া-বাঁধা শিষ্যও নই, সেহেতু ও দুয়ের কোনটাই না ব'লে একটা খুব ছোট ও সহজ কথা বলতে চাই।

সে কথাটি হ'ল, আমাদের শিক্ষার আগে আমাদের শিক্ষা হওয়া চাই। কেননা দেখছি, বহুকাল হাড়ে হাড়ে ভুগেও আমাদের এ বিষয়ে উচিত শিক্ষা হয় নি। পূর্বেই বলেছি, আগে এমন একটা কাল ছিল যে সময় অন্তত কিছু বাঙালী নতুন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাচমকিত পাশ্চাত্য সভ্যতার রস আকণ্ঠ পান করবার আকুল আগ্রহে ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার

গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। এ রকম মানুষ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক যুগেই গুটিকয়েক ক'রে থাকেনই। এঁদের মধ্য হ'তেই সে রকম মানুষ বেরোয়, যাঁদের বাণী মহাকালের সীমানা অতিক্রম ক'রে ভূগোলের ভেদরেখাকে অস্বীকার ক'রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের মানুষের চিত্তাকাশ দীপ্ত ক'রে থাকে। কিন্তু এ রকম মানুষ সংখ্যায় কম। বেশির ভাগ লোকই এই স্তর অবধি পৌঁছুতে পারে না। কাজেই শিক্ষার ফলাফল এই সব সাধারণ মানুষদের জীবনে আরও সীমিত। যেমন, বাঙালীরাও অনেকেই সে-যুগে লেখাপড়া শিখেছে রামমোহন-মাইকেলের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে নয়, নিশ্চিত-ডেপুটিত্বের প্রত্যাশায়। এমন কি, 'মাই লার্ড' 'ইয়োর অনার' বলতেও শিখেছে মুচিরাম গুড়ের মত। শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ আত্মবিকাশ নিশ্চয়ই। কোনও কোনও মহামানবের ক্ষেত্রে সে আত্মবিকাশের প্রায় কোনও শেষ সীমাই নেই। কিন্তু সাধারণের বেলায় সে বিকাশ অনেকখানি সীমাবদ্ধ। তার স্বল্প ক্ষমতাকে যথোচিত পরিপুষ্ট ক'রে একদিকে সুষ্ঠু জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া এবং অন্যদিকে সেই জীবিকার মাধ্যমেই আত্মবিকাশের পথ ক'রে নেবার ক্ষমতা অর্জন করায় তা আটকে থাকে। একটি ছেলের মধ্যে ইন্‌জিনিয়ার হবার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা গেল; শিক্ষার সহায়তায় সে পাস ক'রে শুধু যে চাকরিই পেল তা নয়, ইন্‌জিনিয়ারিং কাজটাও শিখল ভাল ক'রে এবং সে জীবিকার মধ্যে কাজটাও ভাল ক'রে করতে থাকল। সাধারণ আত্মবিকাশের দৌড় এর বেশি নয়।

এই কথাটা আমাদের ভাবতে হবে। যে সাধারণ মানুষদের শ্রেষ্ঠ বিকাশের চেষ্টা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে করতে হবে, সেই সাধারণ মানুষের জীবন চারপাশের কাল ও সমাজের কাঠামোতে বাঁধা। মহামনীষীরাও পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষ অনেক পরিমাণে তা পারে না। চারপাশের সমাজের মধ্যে তারা কি কি কাজ করতে পারে

এবং কে সেই কাজ কত ভালভাবে করতে পারে, শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন আছে। অথচ আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের যে সব কথাবার্তা সাধারণত হয় তার মধ্যে এই ব্যাপক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাই নে। এক কালে শেক্‌স্‌পীয়র-বর্ক পড়ে বি. এ. পাস করলেই ডেপুটিগিরি মিলত, কিন্তু এখন তা পাওয়া যায় না। সুতরাং তার উপর আমাদের বিতৃষ্ণা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তার ফলে আমরা করছি কি? এখন ঝোঁকটা পড়েছে সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে। হাতে-কলমে শিক্ষার বদলে আমরা চাচ্ছি হাতে-হেতেরে শিক্ষা দিতে। দেশটাকে কেজো মানুষের দেশ ক'রে তুলতে হবে। অতএব ছেলেবেলা থেকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা দিতে হবে। যেন তাতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানুষের কাজ থাক্ আর নাই থাক্ কাজের মানুষ চাই।

কিন্তু গলদ তো ঐখানেই। প্রথম প্রশ্ন, জীবিকার পথ কি এতে সহজ হবে? হাতিয়ার ধরতে শিখলেই কি জীবিকা সহজ হয়ে যায়? বরং বই পড়লে অনেক ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যদি কিছু বুদ্ধি থাকে) জীবিকা না হ'লেও কিছুটা বিদ্যে হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু হাতিয়ারবন্দ হ'লেই যে জীবিকা মিলবে এ রকম চিন্তা করা নিতান্ত ভুল। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল। গোবিন্দবাবু লোহার কারবারে বড়লোক হয়েছেন, নতুন বাড়ি করেছেন, ক'রে বন্ধুকে সেই নতুন বাড়ি দেখাচ্ছেন। বন্ধু সব দেখে শুনে বললেন, বাড়ি তো চমৎকার হয়েছে, কিন্তু বাড়িতে একটা লাইব্রেরি না থাকলে আজকাল লোকে বাড়ির মালিককে অভিজাত ও কালচার্ড বলে না। শুনে গোবিন্দবাবু বললেন, তা আর ভাবনা কি, কালই নিউম্যানে তিন টন বইয়ের অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তেমনই আমরা যদি কালই পনের কোটি মিস্ত্রী ও ফিটার এবং পাঁচ লক্ষ ইন্‌জিনিয়ার তৈরি ক'রে ফেলবার ব্যবস্থা করি-ও, তা হ'লে তখনই প্রশ্ন উঠবে যে আমাদের বর্তমান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় তাদের কাজে লাগাতে পারব তো? এখনও তো দেখি, যাঁরা খুব কঠিন কৌশল আয়ত্ত করেছেন এবং যাঁরা সংখ্যায়

বেশি নন—যেমন বায়ুযানচালক—তাঁদের অনেকেই তো বেকার ব'সে আছেন। দ্বিতীয় কথা, আত্মবিকাশ। চুলোয় যাক জীবিকা, যদি আত্মবিকাশ ঠিক মত হয়। কিন্তু তাও কি হওয়া সম্ভব? যদি এম. ডি. পাস ডাক্তারকে ঔষধের কারখানার পাবলিসিটি অফিসারেরই কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, পি. এইচ. ডি.-রা কেবলই লেখেন বাজারের নোট, অথবা লেদ-এর কাজ শিখে সে লোককে ময়রার দোকানে সন্দেশই মাখতে হয়, তা হ'লে বাল্যবয়সে যে শিক্ষা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল বাস্তবজীবনে কর্মের ক্ষেত্রে সে শিক্ষা কোনও কাজে এল না; শিক্ষার সাহায্যে যে কর্মের দিকে ছাত্রটিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, পরের জীবনে তা সবই গেল উল্‌টে। এর নাম কি আত্ম-বিকাশ? বাল্যকালে উপ্ত বীজ কি পর পর বাড়তে পেল? তার চেয়ে সে লোকের পক্ষে কি লেদ-এর কাজ না শিখে ভাল ক'রে সন্দেশ মাখার কাজ শিখলেই ভাল হ'ত না? যে গোমস্তা পরে কোনকালে রামপ্রসাদ হতে পারবেই না, তার পক্ষে জাবদা খাতায় গান লেখা মক্‌শ না ক'রে ভাল ক'রে জমিদারি সেরেস্তার কাজ শিখলেই কি বেশি উপকার হ'ত না? এই বুঝেই এককালে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের গুরু-নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোরু-তাড়ানো শ্রেয়। 'ক'-অক্ষর যে-কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু 'ক'-অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই।" এই সব কথা ভুলে গিয়ে শিক্ষার সংস্কার করতে যাওয়া যে চূড়ান্ত বেকুবি—আমাদের এই শিক্ষাটাই সেইজন্য সব প্রথমে হওয়া দরকার। তা না হ'লে আমরা কেবলই **skill-fetishism**-এর পাকে পাকে ঘুরে মরব,—সে **fetishism**-এর অবলম্বন কখনও হবে শেক্‌সপীয়র-বর্ক, কখনও চরকা-তাঁত। কিন্তু তার বাইরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত না হ'লে আমরা শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না, জীবনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা কোনও কাজে লাগবে না।

বাস্তবিক, অন্যান্য দেশের বেলায় কি দেখি? সর্বাত্মক পরিকল্পনার নিগড়ে যে সব দেশ আটকে গিয়েছে সে সব দেশে কতজন ডাক্তার কতজন ইন্‌জিনিয়ার হবে এ সব কথা পরিকল্পনায় ঠিক ক'রে দেওয়া থাকে। কিন্তু এসব দেশের কথা ধরছি না। যে সব দেশে এ রকম কড়াকড়ি বাঁধাধরা নেই—যেমন ইংলণ্ড—সে সব দেশেই বা কি দেখি? সেখানে বছরে কতজন ডাক্তার হবে, কতজন ইন্‌জিনিয়ার হবে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কিন্তু তবু তার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় জীবনের একটা মোটামুটি বোঝাপড়া আছে। যার কোনও প্রবণতা নেই তাকে জোর ক'রে যেমন অ্যাডমিরাল তৈরী করা হচ্ছে না, তেমনই কোনও প্রয়োজন নেই অথচ কেবলই অ্যাডমিরাল তৈরী করা হচ্ছে তাও নয়। শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে জাতির প্রতিভাকে বিকশিত ক'রে জাতির কাজে লাগাচ্ছে, তাই প্রতিভারও বিকশন হচ্ছে, জীবিকারও অভাব হচ্ছে না, বরং জীবিকা সেই প্রতিভাবিকশনের আরও সাহায্য করছে। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। দুটো দিকই হাত মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

আমাদের দেশে ওই দুটো দিক আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের হাত নেই এবং তারা চলছেও না। সুখের বিষয়, শিক্ষাবিদ্‌দের তরফ থেকে শিক্ষাসংস্কারের আলোচনায় এতদিনে এদিকটাতেও নজর পড়েছে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্‌, ইরফান্‌ এবং ইল্‌ম্‌ ইত্যাদি কথার সঙ্গে য়ুনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন এবার এ কথাটাও বলেছেন—

"we must have a conception of the social order for which we are educating our youth....Our educational system must find its guiding principle in the aims of the social order for which it prepares, in the nature of the civilisation it hopes to build. Unless we know whither we are tending, we cannot decide what we should do and how we should do it. Societies like men need a clear purpose to keep them stable in a world of bewildering change." (*Report*, p. 35)

আমার প্রশ্ন হ'ল, শিক্ষাসংস্কারের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা এদিকে নজর দেব কবে?

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আমার সাহিত্য-জীবন

১৫

'শান্তি ভবন' বোর্ডিংএ এসে পরম আরাম অনুভব করেছিলাম। জীবনে প্রোমোশন পাওয়ার স্বাদ পেলাম। এ কাল পর্যন্ত সাহিত্য-জীবনের মধ্যে আহার-বাসস্থানের সুখের দিক দিয়ে এর চেয়ে সুখে (অম্বকষা ফলের মত সুখে) ছিলাম না এমন নয় ; অর্থাৎ এর থেকে ভাল বাড়িতে, আহার্যের ভালতর ব্যবস্থা অবশ্যই পেয়েছি। যে সব আত্মীয়ের বাড়িতে এসে অতিথি হিসেবে থেকেছি তাঁরা আমাকে পরম যত্ন করেছেন, তাঁরা আমাদের বাঙালী-সমাজে ধনী-পর্যায়ের মানুষ ; এবং তাঁদের আতিথেয়তা, তাঁদের ব্যবহার যত্ন সবই তাঁদের শিক্ষা এবং শ্রীর উপযুক্ত। আমার প্রতি স্নেহের জন্য তার মধ্যে কৃত্রিমতাও ছিল না—এ সত্য অন্তর দিয়েই অনুভব করেছি। তাঁরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার সুখ-দুঃখের সমান অংশ চিরকাল তাঁরা গ্রহণ ক'রে আসছেন। আজও সেই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মনে পড়ছে, তাঁদের স্নেহ সমাদর। স্বর্গত রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই কন্যা ওই দুই আত্মীয়-বাড়ীর গৃহিণী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় মেয়ে, আমার সাহিত্যের প্রতি মতি-গতি দেখে এই পথে আমার সুবিধা ক'রে দিতে তাঁর বাবাকে একটি চাকরি দেবার অনুরোধ করেছিলেন। রায় বাহাদুরের হাতে ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা। তিনিই ছিলেন সরোজনলিনী-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক। কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন বড়মা অর্থাৎ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। তাঁর অধীনে আমাকে একটি কাজ দেবার কথা ব'লেছিলেন। রায় বাহাদুর আমাকে ভাল ক'রেই জানতেন ; স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মশায়ের সঙ্গে রায়বেঁশে নিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, তা হ'লে তো ভালই হয়। কিন্তু 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে কাজ কি সে করবে ?

তিনি ভুল ধারণা করেন নি। আমি সবিনয়েই বলেছিলাম, না বউদি, ওখানে চাকরি আমার সইবে না।

রায় বাহাদুরের মেজো মেয়ে তাঁর বাড়িতে মায়ের মত, সহোদরার মত যত্ন করেছেন, সে কথা আগে বলেছি। মনে পড়ছে, 'বঙ্গশ্রী' গল্পের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে। মাসের তিরিশ তারিখ। আমি "জলসাঘর" লিখছি; বলেছি, রাত্রে খাব না। রাত্রির মধ্যেই গল্প শেষ করব সংকল্প নিয়ে বসেছি। তিনি নিজে অল্প কিছু খাদ্য নিয়ে এসে বলেছেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না খেলে নড়ব না। না খেয়ে লিখলে শরীর থাকবে কেন? লিখতেই বা পারবে কেন?

খেতে হয়েছে। তার পরও খাবার রেখে গেছেন, হীটার দিয়ে গেছেন, ফ্লাস্কে চা রেখে গেছেন; ব'লে গেছেন, খিদে পেলে যেন খাই।

সুতরাং সুখ এবং যত্নের দিক দিয়ে পরম আরামের কথা বলি নি। মনের দিক দিয়ে এসব সুখ-যত্ন সত্ত্বেও যে সংকোচ কাঁটার মত খচখচ করত, নিজেকে অক্ষম এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে ক'রে যে অশান্তি অনুভব করতাম, তাই থেকে নিষ্কৃতি এবং বেশ ভাল সুখ-সুবিধে—দুটো একসঙ্গে পেয়ে আরাম অনুভব করলাম। অনেক আগেই, প্রায় বৎসর তিনেক, আত্মীয়-বাড়িতে থাকা ছেড়েছি; কিন্তু সুখ-সুবিধে পাই নি।

'শান্তি ভবনে' এসেছিলাম হোলির কাছাকাছি—সালটা ১৩৪৪ সাল, ইংরিজী ১৯৩৮। জায়গাটি এত ভাল লেগেছিল যে, এখানে এসে লেখা গল্পের প্রথম গল্পটিতে 'শান্তি ভবনে'র উল্লেখ এবং ছাপ না প'ড়ে পারে নি। গল্পটির নাম "হোলি"। ১৩৪৪ সালের 'শনিবারের চিঠি'র ফাল্গুনেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্যারাগ্রাফেই লিখেছিলাম—

"রাস্তা হইতেই বাড়িটা বেশ পছন্দ হইল, মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন-রোডের জংশনের উপরেই তিনতলা বাড়ি। সামনে দক্ষিণে পার্ক; দক্ষিণের বাতাস খানিকটা পাওয়া যাইবে। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাড়িখানি বেশ ঝরঝরে, এমন কি নীচের তলাতেও ধরিত্রীগর্ভের ভোগবতীর করুণা বেগবতী নয়। দোতলায় উঠিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল

না, বারান্দাটাই মন হরণ করিয়া লইল ;—শুধু আরামপ্রদই নয়, বেশ একটি আভিজাত্যও আছে। বসন্তকাল—সন্ধ্যায় একখানা ঈজি-চেয়ার পাতিয়া বসিলেই স্বর্গসুখ না হউক—ত্রিশঙ্কুলোকের সুখটাও অন্তত পাওয়া যাইবে।"

সেদিন সুবল যা বলেছিল, তাও আছে কয়েক লাইন পরে। সুবল বলেছিল, নামটা কিন্তু 'শান্তি ভবন' না হয়ে 'শান্তিকুঞ্জ' হ'লেই ভাল ছিল।

এখানকার সব থেকে আরামের ছিল প্রত্যেকের জন্য এক-একখানি কুঠরির ব্যবস্থা। লম্বায় ১২।১৪ ফুট, চওড়ায় বড় জোর ৮ ফুট। তার বেশি না। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল না। একটা মানুষের থাকতে কতটা জায়গা লাগে ? ঋষিকল্প লেখক মহাত্মা টলস্টয়ের গল্প মনে পড়ে এ কথায়।

এর পর লিখেছিলাম—"বেশ জায়গা ; একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া। কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলে দরজায় তালা পড়ে। পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁড়িতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা না বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখা শুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানেও হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলাও চলে না—করমর্দন করাও হয় না। কয়টি প্রাণী মাত্র সর্বজনপরিচিত :—কালী, নরেন, ভজ এবং লোচন, সকলে ইহাদের বিশ্বাসও করে ; সে অবশ্য বাধ্য হইয়া, কারণ উহাদের দুইজন চাকর, অপর দুইজন ঠাকুর। আর একটি প্রাণী—একটা লাল রঙের বিড়াল, সে সব ঘরেই যায়, আপন ভাষায় দুই-একটা কথাও বলে, কখন কখন কাপ-ডিশও ভাঙে, কোন কোন দিন পাশে শুইয়া গলা-ঘড়ঘড় করিয়া আদরও জানায়। আমি উহার নাম দিয়াছি—'রাঙা সখী'।"

'শান্তি ভবনে'র কথা এত ক'রে বলছি এই কারণে যে, আমার সাহিত্য-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে এইখানে। জীবনের পট-পরিবর্তনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই 'শান্তি ভবনে' থাকতেই। এখানে প্রায় দেড় বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই 'ধাত্রী দেবতা' রচনা আরম্ভ এবং শেষ; 'কালিন্দী' এখানেই আরম্ভ করি। প্রথম ছ মাসের লেখা এই-খানেই লিখেছি। এখানে থাকতেই ক্রমশ-প্রকাশিত লেখাগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি। এ একটা অভ্যাস অবশ্য। কিন্তু সে অভ্যাস সাধনাসাপেক্ষ। 'ধাত্রী দেবতা'র শেষ ছ মাস এবং 'কালিন্দী'র প্রথম ছ মাস একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। একসঙ্গেই দুখানি উপন্যাস কিস্তিতে কিস্তিতে লিখেছি তখন। লেখায় তখন নেশা চেপেছে। 'ধাত্রী দেবতা' কিছুদিন প্রকাশিত হতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বড় উপন্যাস লেখার কৌশল যেন আয়ত্ত হয়ে এসেছে আপনার অজ্ঞাতসারেই। সেই নেশাতে দেহের প্রতি চরম অবহেলা ক'রে শুধু লিখেই গিয়েছি। সব দিন ভাত খাই নি। স্নানেরও সময় নির্দিষ্ট থাকে নি। সমস্ত দিন শুধু লিখেছি এবং চা খেয়েছি; মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে দু-এক টুকরো পাঁউরুটি, কখনও বা একটা ডিম। দিনে ৩০।৩৫ কাপ চা খেয়ে খিদে অনুভব করতেই পারতাম না। পরবর্তী কালে চায়ের বিজ্ঞাপনে আমার নাম ও ছবি বের করেছিল। সেটা আমি সাহিত্যিক দাবিতে দিই নি, ওই 'চাতাল' দাবিতে দিয়েছি। আমাদের ও-অঞ্চলে মাতালের সঙ্গে মিল রেখে 'চাতাল' শব্দটা প্রচলিত আছে।

এই সময়ে আমার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মশায়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই মানুষটির স্নেহে এবং অন্তরের উদার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন খাঁটি বাংলার মানুষ আর আমি দেখি নি। বাংলার সমাজ, বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় তাঁর বাক্যে ব্যবহারে সৌজন্যে মূর্তি ধ'রে দেখা দিত। এই মানুষ ব'লেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির

প্রথম সার্থক ইতিহাস। ঘটনাটিও আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই ঘটনায় 'হাঁ' ও 'না'এর উপর পরবর্তী কালের জীবন নির্ভর করেছে। ঘটনাটির কথাই বলি।

একদিন ভৃত্য কালী এসে ডাকলে, আপনার ফোন এসেছে।

'শান্তি ভবনে' ফোন ছিল। ফোন ধরলাম, দেখলাম, 'শনিবারের চিঠি'র আপিস থেকে সুবল ফোন করছে। বললে, ওহে, তোমাকে ডক্টর দীনেশ সেন মশায় একবার ডেকেছেন।

বিস্মিত হলাম, ডক্টর দীনেশ সেন মশায়!

হ্যাঁ। 'আনন্দবাজার' আপিস থেকে ফোন ক'রে খবরটা তোমাকে দিতে বললেন। তোমার ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করলেন।

ফোন ছেড়ে দিলে সুবল। আমি ভেবেই পেলাম না, কি জন্যে তিনি ডাকলেন আমাকে! ঘণ্টা দুয়েক পর আবার ফোন এল 'আনন্দবাজার' থেকে।—আপনাকে ডক্টর দীনেশ সেন মশায় খুঁজছেন। আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আমরা ও-বেলা 'শনিবারের চিঠি'তে জানিয়েছিলাম। উনি এসেছিলেন আমাদের এখানে। আবার এখন ফোন রেছেন, আপনার কোন জবাব পেয়েছি কি না? আপনি ওঁকে ফোন 'রে জানান, কখন যাবেন। গাইডেই পাবেন ওঁর নাম্বার। উনি খুব স্ত হয়েছেন।

সত্য বলতে কি, আমি বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লাম, ডক্টর সেন মন ভাবে খুঁজছেন কেন? কোন লেখা ভাল লাগলে, অবশ্য রসিক াহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি খোঁজ ক'রে থাকেন। কিন্তু এমন ব্যস্ত হবার থা তো নয়।

যাই হোক, ফোন করলাম। তিনি আমার নাম শুনেই বললেন, ারে বাবা, আপনাকে খুঁজে আমি হায়রান, বৃদ্ধ বয়সে 'আনন্দবাজার' স্ত ছুটে গিয়েছি। তা ওরা বলতে পারলে না ঠিকানা। 'শনিবারের ঠি'তে ফোন করাতে তারা বললে, কোন বোর্ডিঙে আপনি থাকেন। ালে, খবর দেবে। আমি আর ঘুরতে পারলাম না। আমার ঘোড়াটাও

দুর্বল। বেহালা পর্যন্ত ফিরতে দম থাকবে না ব'লে আর এগুতে সাহস করলাম না। আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। কখন আসছেন বলুন?

বললাম, কাল যাব।

বললেন, নিশ্চয় কাল। যেন ভুল না হয়।

পরের দিন, 'শনিবারের চিঠি'তে গিয়ে, ওখানেই রাস্তার হালহদিস জেনে ফড়েপুকুরের মোড়ে ট্রামে চড়লাম। সঙ্গে সজনীকান্তও ছিলেন, তিনিও এস্‌প্লানেডে নেমে কোথাও যাবেন। ট্রামে উঠে একটু গিয়েই পেলাম শৈলজানন্দকে, তিনি উঠলেন শ্যামপুকুরের মোড়ে। যাচ্ছেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। ওখানে তিনি তখন চাকরি নিয়েছেন গল্প ও সংলাপ লেখক হিসেবে। ট্রামে ভিড় ছিল না, এগারোটার পর। গল্প জ'মে উঠল। শৈলজানন্দই তাঁর স্টুডিও-জীবনের গল্প করলেন। সে গল্প দুঃখজনক। অনেক অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়।

এস্‌প্লানেডে এসে তিন জনের ছাড়াছাড়ি হ'ল। আমি বেহালার ট্রামে চড়লাম।

সেন মশায়ের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসি-মুখে আমাকে গ্রহণ করলেন, আসুন, আসুন, বাবা আসুন।

এই সম্বোধনেই আমি অভিভূত হলাম। মনে হ'ল, দেশ কাল যেন পাল্টে গিয়ে মহানগরী থেকে, ১৯৩৮ সাল থেকে, বাংলার পল্লীতে ১৩৪৪ সালে পরিণত হয়েছে। এ ভাষা হারিয়ে গেল বাংলা দেশ থেকে, এ হৃদয় হারিয়ে গেল। সকল বাংলা থেকে গেল কি না জানি না, মহানগরী থেকে, বাংলা-সাহিত্য থেকে গেল।

বাংলা-সাহিত্যে কথোপকথনের ভাষা আশ্চর্য রকমের মার্জিত হয়েছে, ধারালো হয়েছে, ঝকঝকে হয়েছে; কিন্তু মধু হারিয়েছে, প্রেম হারিয়েছে, নিরাভরণ সারল্যের লাবণ্য হারিয়েছে—এ কথা বলতে আজ দ্বিধা করব না। আজকের কথোপকথনে প্যাঁচ মেরে কথা-কাটাকাটি করা চলে, কিন্তু আত্মীয়তা স্থাপন করা যায় না। সম্বোধনের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। একালে 'বাবা আসুন' এ কথা শিক্ষিত মানুষের রসনা কিছুতেই

উচ্চারণ করতে পারবে না। কি নিবিড় স্নেহ এর মধ্যে! অথচ এর মধ্যে কি যে আপত্তিজনক, তা কেউ বোঝাতে পারবেন না। ইংরিজী আমি ভাল জানি না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির অল্পবয়সীকে 'মাই সন' ব'লে সম্বোধন ইংরিজীতে অচল ব'লে মনে হয় না। তাতে ওই মাধুর্যের স্পর্শ অনুভব করা যায়। আমাদের দেশে এটা কেন হ'ল বুঝতে পারি না।

ঘরের মধ্যে সেদিন খ্যাতিমান সাহিত্যিক আমাদের অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব'সে ছিলেন। বোধ করি, এম. এ.র বাংলার খাতা দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিনলেও তিনি আমাকে চিনতেন না। চিনিয়ে দিলেন ডক্টর সেন এবং মুখোপাধ্যায়কে বসতে অনুরোধ ক'রে বললেন, এঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, সে কথাটা সেরে নিই। আপনি (কি তুমি, আমার ঠিক মনে হচ্ছে না) একটু বসুন।

ব'লে আমায় সঙ্গে নিয়ে পিছন দিকে ছোট্ট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরখানির চারিপাশে স্তূপীকৃত পুঁথি এবং পুরানো বই, মেঝেতে টেবিলে চেয়ারে পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। আমাকে বললেন, ঘরে ধুলো আছে বাবা। মা-সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পদরজ— এসব এই পুঁথির ধুলো। কার যে কত বয়ঃক্রম, তা বলতে পারব না। তবে পাঁচ শো বৎসর বয়েস দু-একখানার আছে গো। এ ঘরে আমি কাউকে হাত দিতে দিই নে। নিজে হাতে মধ্যে মাঝে ঝাঁটপাট দি। বসুন, এখানেই বসুন কোন রকমে।

তার পর বললেন, বম্বের বম্বে টকীজের হিমাংশু রায়কে জানেন? সে আমার শ্যালকপুত্র। আর ডক্টর সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের সম্বন্ধী। সে আমাকে চিঠি লিখেছে। আপনাকে বম্বে যেতে হবে বাবা।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন, সেখানে তারা একজন বাঙালী গল্পলেখক নেবে। আপনার লেখা প'ড়ে তার ভাল লেগেছে। আপনাকে চায় সে।

আমাকে চান তিনি?

হ্যাঁ, লিখেছে। আবার কাল সুরেনকে তার করেছে। আপনি চ'লে যান সেখানে। তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট হবে আপনার সঙ্গে—প্রথম বছর ৩৫০৲, দ্বিতীয় বছর ৪৫০৲, তৃতীয় বছরে ৫৫০৲ পাবেন।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি এখানে মাসে চল্লিশ টাকা নিয়মিত উপার্জন করতে পারি না। পথে আজই শৈলজানন্দের মুখে শুনে এসেছি, নিউ থিয়েটার্স তাঁকে দেড় শো কি দু শো দেন। সেন মশায়ের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

সেন মশায় ব'লেই গেলেন, তিন বছরের পর আবার কণ্ট্রাক্ট হতে পারবে। হবেও। তবে সে তো আর লেখাপড়া কথা নয়! আপনি চ'লে যান, যেতে টাকাকড়ি দরকার হ'লে আমি দেব আপনাকে।

কি ভেবেছিলাম, কোন্ তর্ক, কোন্ হিসেব মনের মধ্যে সেদিন উঠেছিল আজ মনে নেই। তবে এইটুকু ভুলি নি, কোনদিন ভুলব না যে, আমার মন সায় দেয় নি, মনে আমার কোন উৎসাহ অনুভব করি নি, বরং বেদনা অনুভব করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এ যাওয়া আমার সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে যাওয়া হবে।

সেন মশায় সস্নেহে বলেছিলেন, তা হ'লে কবে যেতে পারবেন বাবা? আমি তার করব।

আমি অভিভূত ভাবেই বলেছিলাম, আজ আমি এ কথার উত্তর দিতে পারব না। আমাকে সময় দিন।

সেন মশাই হেসে বলেছিলেন, মা ঠাকরুনের মত নেবেন?

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর।

আমি সলজ্জভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম, আমার মা আছেন, তাঁর অনুমতি চাই।

বাবার মা বেঁচে আছেন? ভাগ্যবান গো আপনি। নিশ্চয় তাঁকে লিখুন, বউমাকে লিখুন। নিশ্চয়, তাঁদের মত চাই বইকি। যারা চায় না, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আপনার নিজের মত আছে তো

সেও আজ বলতে পারব না। ভেবে দেখতে সময় দিন।

ক' দিন ?

এক সপ্তাহ।

না। সে সময় হিমাংশু দেবে না। তিন দিন। তিন দিন পর রবিবার। সকালে আপনি আসবেন এখানে।

আমি প্রণাম করতে গেলাম, তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন—না।

অদ্ভুত একটা মনের অবস্থা তখন। ঠিক বোঝানো যায় না। যেন একটা মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কিছু ঘটবার উপক্রম হয়েছে, আমার চারিপাশে আমাকে ঘিরে ফেলেছে এমন অবস্থা। ফেরবার পথে মাঠে ব'সে থাকলাম রাত্রি পর্যন্ত। তার পর হঠাৎ ফিরে পেলাম মনের জোর। স্থির ক'রে ফেললাম, না, যাব না। এই পথের সাধনা ছেড়ে আমি যাব না। তাতে যা ঘটে আমার ঘটুক।

পরদিন বাড়িতে চিঠি দিলাম মত জানাতে। সজনীদের বললাম। সজনীকান্ত প্রথমেই ব'লে উঠলেন, চ'লে যাও। কি করবে এ ক'রে ?

আমি বললাম, না। আমি যাব না ঠিক করেছি।

সজনীকান্ত আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তার পর বললেন, তোমার জয় হোক।

বাড়ি থেকে চিঠিও পেলাম। পিসীমা মা স্ত্রী সকলেই আমাকে সমর্থন করেছেন। মনে কোন কিন্তু রইল না, প্রসন্নতায় তৃপ্তি অনুভব করলাম। দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বললাম, আশীর্বাদ অভিশাপ যা তোমার ইচ্ছা তাই দিও আমাকে, তোমার পুজো করার অধিকার থেকে শুধু আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

তিন দিন পর গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, মন ঠিক হয়েছে বাবা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যেতে পারব না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, মায়েদের মত হ'ল না ?

আমি মায়ের চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম। আমার মায়ের হাতের

লেখা সেকালে ছিল অতি সুন্দর, নিটোল মুক্তার মত হরফ এবং নিপুণ গ্রন্থনে তারে-গাঁথা মালার মত পংক্তিতে সাজানো, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। তিনি বললেন, আপনার মায়ের লেখা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ততক্ষণে তিনি পড়েছেন মায়ের চিঠির প্রথম পংক্তি। মা লিখে-ছিলেন, তুমি এমন প্রলোভন জয় করিয়াছ জানিয়া আমি পরম তৃপ্তি পাইয়াছি। সুখী হইয়াছি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি।

এর পর আরও ছিল।

তিনি চিঠি থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তা হ'লে যাওয়ার মত চান নি, যাবেন না—এরই মত চেয়েছিলেন?

আমি আমার মত লিখেছিলাম।

কেন বাবা? আপনার অমত কিসে? চরিত্র চরিত্রবানের উপর নির্ভর করে।

আমি আমার মনটাকে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, এ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। আমার মনে হচ্ছে, সব হারিয়ে যাবে আমার।

সব হারিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে আমার।

আপনি তো কোথাও চাকরি করেন না?

না।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বৃদ্ধ। তার পর অকস্মাৎ তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে আকর্ষণ ক'রে বললেন, কাছে আসুন আমার।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ছেলে—তৃতীয় ছেলেকে ডাকলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, শোন এঁর কথা।

তার পর বললেন, গাড়ি আনতে বল।

তাঁর ব্রুহাম গাড়িখানির কথা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। সেই গাড়িতে আমায় নিয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

নিয়ে প্রথমেই গেলেন তাঁর বড় ছেলের বাড়ি। পৌত্র কবি সমর সেনকে ডেকে আমার পরিচয় দিয়ে সেই কথা বললেন। সমর সেন সেকালে খ্যাতিমান আধুনিক কবি; তাঁর আধুনিকতার উগ্রতা—তাঁর সম্পর্কে কোন কল্পনা করতে গেলেই সে কল্পনাকে ঝাঁঝালো ক'রে তুলত। কিন্তু তাঁকে দেখে ভারি ভাল লেগেছিল। সুন্দর মিষ্টি চেহারা, কথা-গুলি মিষ্টি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বয়সে তখন তরুণ, তখন তাঁর পাণ্ডিত্য কাঁটা-ভরা ডালের মাথায় বর্ণাঢ্য গোলাপফুলের মত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সেই ভয়ও ছিল আমার। কিন্তু কিছুক্ষণের আলাপেই দেখেছিলাম, না, তা নয়। শুভ্র স্নিগ্ধ সৌরভময় জুঁইফুলেরই সন্ধান মিলেছিল। প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন বলি, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়—এঁদের মধ্যেও এই মাধুর্য দেখেছি।

ওখান থেকে আরও দু-তিন জায়গায় তিনি আমাকে সেদিন দেখিয়ে আমার কথা শুনিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে কবি কালিদাস রায় দাদার বাড়িও ছিল। কালিদার সঙ্গে তখন পরিচয় স্বল্প।

সে যে তাঁর কি আনন্দ, সে প্রকাশ করতে পারব না।

তিনি শেষে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে কালীঘাটের মোড়ে ট্রাম ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে 'শান্তি ভবনে' ফিরেছিলাম।

সে দিন আমার দেবতা আমাকে যেতে দেন নি, তাঁরই আকর্ষণে আমি থাকতে পেরেছিলাম।

এর পর আরও একবার লোক এসেছিল। এবার লোক পাঠিয়েছিলেন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়। এসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্র মিত্র। এবার বেতনের হার ১০০৲ টাকা বাড়িয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ৪৫০৲ থেকে ৬৫০৲ টাকা। কিন্তু তাতেও 'না' বলতে আর আমার দ্বিধাই ছিল না।

এরই ঠিক দিন তিনেক পরে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, আপনি নিলেন না, আমি নিলাম ও-কাজ। বম্বে যাচ্ছি আমি।

আমার জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল সেই দিন।

দুঃখে আমার মৃত্যু হয় হোক, আমি এ সাধনা ছাড়ব না। এখানে থাকতেই 'ধাত্রী দেবতা' পুস্তকাকারে বের হল। সজনীকান্ত মনোরম প্রচ্ছদপট ক'রে 'ধাত্রী দেবতা' প্রকাশ করলেন।

'শান্তি ভবন' আমার সাহিত্য-জীবনের একটি ক্ষেত্র। ওইখানটি ছাড়বার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু চায়ের নেশা ছাড়বার জন্যেই আমাকে 'শান্তি ভবন' ছাড়তে হল। জেলখানা থেকে পেটের গণ্ডগোল, অজীর্ণ ব্যাধি নিয়ে ফিরেছিলাম। সেটা পাটনায় গিয়ে সেরেছিল। 'শান্তি ভবনে' চায়ের অত্যাচারে আবার সাড়া দিয়ে উঠল। তাতেও সাবধান হই নি। কিন্তু এক মাসে চায়ের দাম দিলাম ছাপ্পান্ন টাকা। অবশ্য সবই আমি খাই নি। তখন আমার বড় ছেলে এসে আমার কাছেই রয়েছে—এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হবে। বন্ধুবান্ধবও আসেন। কিন্তু তবু ছাপ্পান্ন টাকা চায়ের দাম! তখন দু পয়সা চার পয়সা চায়ের কাপ।

ছাড়লাম 'শান্তি ভবন'।

কোথায় যাব? সজনীকান্ত আহ্বান জানালেন, আমার এখানে এস উপস্থিত। একখানা ঘর এখানে আছে। উপস্থিত খাও আমার বাড়িতে। তার পর যা হয় ব্যবস্থা হবে। ছাপ্পান্ন টাকার চায়ের অর্ধেক খেলেও সে তো কম নয়। ম'রে যাবে তুমি।

এলাম মোহনবাগান রো'য়ে।

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যে বাড়িতে থাকতেন, তার নীচের তলায় সজনীকান্তের একখানি ঘর নেওয়া ছিল। সেই ঘরে এসে আড্ডা পাতলাম। ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গভাবে জানার সৌভাগ্যের কথা তাঁর স্মৃতিস্মরণ সংখ্যায় লিখেছি। সে কথার পুনরুক্তি এখানে করব না। থাকা ব্রজেনদার বাড়ির নীচের তলার ঘরে, খাওয়া সজনীকান্তের বাড়িতে।

সজনীকান্তের স্ত্রী সুধা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন মিষ্টভাষিণী, মধুরচরিত্র সচরাচর দেখা যায় না। এখানে এসে তাঁর হাতের সযত্ন রান্নায় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ চায়ের ব্যবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলাম। কোন্ মাসে এসেছিলাম ঠিক মনে নেই, তবে পুজোর আগে।

এখানে সেবার পুজোয় "পিতাপুত্র", "বেদেনী" —এ গল্প দুটি লিখে-ছিলাম। 'প্রবাসী'তে "কালিন্দী" চলছে। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আসেন বাইসিক্‌ল চেপে, বলেন, ভাল হচ্ছে মশাই। খুব ভাল। 'কালিন্দী'। চালান, চালান।

এখানে থাকতেই নূতন কালের শক্তিশালী লেখক শ্রীমান নারায়ণ গাঙ্গুলীকে প্রথম দেখলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর গল্প তখন চকিত করেছে সকলকে। মনে মনে শুনতে পাই নূতন জনের পদধ্বনি।

একদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসের বাড়িতেই স্নান ক'রে ঘরে যাচ্ছি, শুনলাম, শ্রীমান নারায়ণ এসেছেন। ভিজে কাপড় রেখে মাথায় চিরুনি দিয়ে খালি গায়েই বোধ করি ব্যগ্রতাভরে দেখতে এসেছিলাম। শুনেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেবার বোধ হয় পরীক্ষা দিয়েছেন, কি দেবেন। অথচ বাংলা দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। এই তো, একেই তো চাইছে দেশ।

এসে দেখলাম, আমারই মত ক্ষীণতনু অথচ ধারালো-চেহারা সুকুমার একটি তরুণ। মুখে চোখে প্রসন্নতা। অন্তরে জ্যেষ্ঠদের জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। কোমল মন, তাতে বিনয় যেন পুষ্পশোভার মত বিকশিত। তার রূপে গন্ধে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রথম দিনই।

এদের মত লোকই তো দরকার। আমার নিজের কথা আমি তো জানি; অভিজ্ঞতার সম্বল আমার যাই থাক্, যতই থাক্ দেশকে আমি যেমনই জানি, আমার মধ্যে যে পাণ্ডিত্যের অভাব রয়েছে। নারায়ণের সে সম্পদ আছে। এর পর 'ভারতবর্ষে' যেদিন নারায়ণের উপন্যাস "উপনিবেশে"র শুরু পড়লাম, সেদিন আর সন্দেহ রইল না। নারায়ণ তখন কোথায় থাকতেন জানি না, 'ভারতবর্ষে'র ঠিকানাতেই অভিনন্দন জানিয়ে

তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। মনের কথা সব লেখা যায় না। সব লিখতে পারি নি। মনে মনে বলেছিলাম—ষোল কলায় পরিপূর্ণ হও তুমি। তবে সাবধানে আকাশ প্রদক্ষিণ ক'রো। কোন ভ্রান্তি, কোন অসংযমের অপরাধে যেন তোমাকে তোমার দেবতার অভিশাপগ্রস্ত না হতে হয়। সে হ'লে পূর্ণত্বে উপনীত হতে না হতে আরম্ভ হয় ক্ষয়ের পালা।

এখান থেকেই পরে এলাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে।

নির্মল বসু মশায় আমাকে নিয়ে এলেন। তিনি থাকতেন নীচে। আমি নিলাম দোতলার একখানা ঘর ভাড়া। দোতলাটা গোটাটাই তখন খালি প'ড়ে রয়েছে। এখানে আসার মাস খানেকের মধ্যে খবর পেলাম, আমার স্ত্রীর ঘুষঘুষে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। তাঁকে কলকাতায় দেখানো দরকার। দোতলার বাকি ঘর তিনখানাও ভাড়া করলাম। সব সমেত ভাড়া ২৫৲ টাকা।

বাড়িখানার সামনেই শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ি। এ বাড়ি ও-বাড়ির মাঝখানে উঠনে একটা পাঁচিল শুধু। যামিনীদা বললেন, এইবার—এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন, নয়, সত্য ক'রে বাঁচবেন। ঠিক করলেন।

হেসে বললেন, এতদিন তো ভূমিকা করেছেন। এবার জীবন-নাট্য শুরু হ'ল। নির্মল সূত্রধারের কাজ করলে।

সত্যই, শুরু হ'ল নতুন জীবন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

...

মই

ঠেকে ঠেকে অনেক স'য়ে
দিচ্ছি "বাণী" বিজ্ঞ হ'য়ে
ভরসা রেখে আপন মইয়ে
আপনি চড়ে যাছে
সারা জগৎ ফলের লোভে
ছুটবে তোমার পাছে ॥

কালুর মাহাত্ম্য

আমাদের কুকুর—'কালু'কে লইয়া মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। দিবারাত্র চিৎকার! কখনও তর্জন-গর্জন, কখনও কাতর আর্তনাদ। বাড়িতে টেকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু কালু যে এমন হইয়া উঠিবে, কে কবে ভাবিয়াছিল! বৎসর তিন পূর্বে গৃহিণী তাঁহার জামাইবাবুর কর্মস্থলে হাওয়া-বদল করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিলেন কালুকে লইয়া। মাস দুই বয়স। কালো কুচকুচে রঙ। চেহারা দেখিয়া বিলাতী বলিয়া মনে হইল না। মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করিতেই গৃহিণী প্রবল প্রতিবাদ করিলেন, বল কি! দেশী! খাঁটি বিলিতী। ওর মাকে স্বচক্ষে দেখেছি যে! দিদিদের বাংলোর পাশের বাংলোতেই একজন সাহেব এঞ্জিনীয়ার থাকে, তার কুকুর।

শ্রীমানের পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই গৃহিণী কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়িলেন। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, তা ঠিক জানি না, তবে জামাইবাবু বললেন—ভাল কুকুর, নিয়ে যাও। গৃহিণীর জামাইবাবু কোন এক বিলাতী কোম্পানির অধীনে একটা বড় কলিয়ারির ম্যানেজার। মাসে দু হাজার টাকা রোজগার। দিবারাত্র খাঁটি সাহেবদের সঙ্গে কাজকর্ম, মেলামেশা। কাজেই কুকুর সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অনুপেক্ষণীয়। অতএব চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রচুর আদরে ও যত্নে কালু দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গৃহিণীর শিক্ষাধীনে সভ্যভব্য কুকুরোচিত আদব-কায়দাতেও রপ্ত হইয়া উঠিল। অতিথি-অভ্যাগত কেহ বাড়িতে আসিলে কালু অবিলম্বে কাছে ছুটিয়া আসিত ও লেজ নাড়িতে নাড়িতে বিনয়বিগলিত ভাবভঙ্গী-সহকারে পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহার সহিত অবাধে খেলা করিত। তাহাদের আদরের শত অত্যাচার কালু নীরবে সহ্য করিত। আমার বন্ধু-বান্ধবরা এবং গৃহিণীর বান্ধবীরা সকলেই কালুর প্রশংসা করিতেন।

তবে প্রত্যেকেই কালুর বিলাতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। গৃহিণী অবশ্য তাঁহার জামাইবাবুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এবং কালুর সম্বন্ধে তাঁহার মত উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইত বলিয়া মনে হইত না। বান্ধব-বান্ধবীদের চোখে মুখে অবিশ্বাসের হাসি লাগিয়াই থাকিত। তাঁহারা বিদায় হইলে গৃহিণী গজগজ করিতেন—গেঁয়ো ভূত পেত্নী সব! ভাবে, লম্বা লোম আর লটকানো কানওয়ালা ছাড়া বিলিতী কুকুর নেই। জামাইবাবু তো বিলেত ঘেঁটে এসেছেন। বলছিলেন—হরেক রকমের বিলিতী কুকুর আছে। দেখেছে কি কেউ কখনও!

তিন বৎসর এমনই ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। যাহার ফলে কালুর মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। ব্যাপারটা এই—

জগদীশবাবু আমাদের পাড়ার প্রাচীন বাসিন্দা। ওকালতি করেন। বেশ নামডাক। রোজগার করেন বেশ। ছেলে মেয়ে অনেক-গুলি। ছেলেগুলি সুশিক্ষিত। বড় ছেলেটি ওকালতি ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য ছেলেগুলি নানা চাকরিতে নিযুক্ত। মেয়েগুলির ভাল ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছেন। জগদীশবাবু এবং তাঁহার গৃহিণী আমার স্ত্রীকে কন্যার মত স্নেহ করেন। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও আমার স্ত্রীকে নিজের দিদির মত শ্রদ্ধা করে। জগদীশবাবুর বড় জামাই দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকুরি করেন। কি একটা কাজে তাঁহাকে সপ্তাহ খানেকের জন্য কলিকাতা আসিতে হইল। তাঁহার স্ত্রী অনেক দিন বাপের বাড়ি আসেন নাই। এই সুযোগে পুত্রকন্যা-সমেত স্বামীর সঙ্গ লইলেন। স্বামী সোজাসুজি কলিকাতা চলিয়া গেলেন, স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের লইয়া আসানসোলে নামিয়া পড়িলেন এবং অন্য এক ট্রেন ধরিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া হাজির হইলেন। কথা রহিল, ফিরতি-পথে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের লইয়া আসানসোলেই স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হইবেন।

জগদীশবাবুর কন্যা একদিন বিকালে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে

আসিলেন। সঙ্গে আসিল তাঁহার দুইটি বড় মেয়ে ও কুক্কুরী লুসি—খাঁটি বিলাতী। স্প্যানিয়েল বংশীয়া সম্ভবত, চমৎকার চেহারা, ধবধবে সাদা রঙ। সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম। চোখ দুইটি ছোট, ঈষৎ রক্তিমাভ। কান দুটি বড়, লটকানো। নাকটি চ্যাপটা! প্রতি পদক্ষেপে গলাবন্ধের ঘুঙরগুলি ঝুম ঝুম করিয়া বাজিতে লাগিল।

গৃহিণী সকলকে আপ্যায়ন করিয়া বারান্দায় বসাইলেন। লুসি মেয়েদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কালু এতক্ষণ উঠানের এক পাশে কি করিতেছিল; সকলের কথাবার্তার শব্দ শুনিতে পাইয়াই ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রবল বেগে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অভ্যাগতদের প্রতি কায়দা-মাফিক শ্রদ্ধা জানাইবার উপক্রম করিয়াই হঠাৎ লুসিকে দেখিয়া যেন জমিয়া পাথর হইয়া গেল—একেবারে নিস্পন্দ, নির্বাক। চক্ষু দুইটি চুম্বকাভিমুখে লৌহশলাকা-প্রান্তবৎ লুসির দিকে একাগ্র।

মেয়ে দুইটি হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—এ আবার কাদের কুকুর! কি চেহারা বাবা! কেলে ভূত।

বড় মেয়ে আমার স্ত্রীর উদ্দেশে কহিল, হ্যাঁ মাসীমা! আপনাদের নাকি? তা এই দিশী কুত্তাটাকে পুষেছেন কেন?

স্ত্রী শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, দিশী নয়, মা, বিলিতী। জা-–। বলিয়াই সবলে জিহ্বার রাশ টানিলেন।

মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, বিলিতী, না, ছাই!

গৃহিণী আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। বুঝিলাম, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হইবে। কাজেই গম্ভীর মুখে কহিলাম, খাঁটি বিলিতী হয়তো নাও হতে পারে। তবে ট্যাস নিশ্চয়ই। ওর মা খাঁটি বিলিতী ছিল। নিজের চোখে দেখেছি তাকে—

মেয়েটি প্রতিবাদ করিল না। তবে লক্ষ্য করিলাম, মেয়ে দুইটির পরস্পরের মধ্যে চকিতে দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিয়া গেল এবং প্রত্যেকের মুখে চোখে অবিশ্বাসের হাসি ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

জগদীশ-কন্যা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, জামাইবাবু যখন নিজের চোখে দেখেছেন, তখন আর সন্দেহ কিসের?

যাহার সম্বন্ধে এত কথাবার্তা হইয়া গেল, তাহার কিন্তু কোন দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই। সে তাহার সমস্ত চেতনা দুই চোখে কেন্দ্রিত করিয়া লুসির দিকে তাকাইয়া আছে। লুসি ইতিমধ্যে স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। কালুর দৃষ্টিরেখাও তদনুসারে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

জগদীশ-কন্যা হাসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ দিদি! তোমার কুকুর মূর্ছা গেল নাকি! মুখে চোখে জল দাও। লুসির দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওলো ছুঁড়ি! পালিয়ে আয় আমার কাছে। কাছে টানিয়া লইয়া আঁচলে তাহার মুখ ঢাকিয়া কহিলেন, লুকিয়ে থাক্, যা তাকাচ্ছে, গিলে খেয়ে দেবে এখনই।

সকলে হাসিয়া উঠিল। কালুর ব্যবহারে লজ্জায় ক্ষোভে গৃহিণীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তবু জোর করিয়া তাঁহাকে হাসিতে হইল।

চাকরটাকে ডাকিয়া কালুকে লইয়া যাইতে বলিলাম। কালু প্রথমে আপত্তি করিল। কিন্তু গৃহিণী কড়া গলায় আদেশ দিতেই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে যাইতে হইল।

চা-খাবার খাইয়া সকলে বিদায় লইলে আমি সস্ত্রীক কালুর খবর লইতে গেলাম। দেখিলাম, কালু তাহার নিজের জায়গাটিতে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রসারিত সামনের পা দুইটির উপরে মুখটি রক্ষিত। দুই চোখ মুদ্রিত। সর্বাঙ্গ শিথিল। প্রায় সমাধিস্থ-গোছের অবস্থা। ডাক দিলাম। কালু কর্ণপাত করিল না। গৃহিণী ডাক দিলেন। কালু আড়চোখে একবার তাকাইয়া, আবার যা ছিল তাই। গৃহিণী পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন। কালু অভ্যাসমত বার কয়েক লেজ নাড়িল। কিন্তু পোজের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইল না। বুঝিলাম, লুসিকে দেখিয়া কালুর গুরুতর চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। দেহ-মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। দুইজনেই চলিয়া আসিলাম।

পরদিনও কালুর মানসিক অবস্থার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন ঘটিল না। সেই স্তব্ধ, স্তিমিত ভাব। কাছে গেলে চোখ ফিরাইয়া

তাকায় না, খাইতে দিলে খায় না। ভয় হইল কালুর ভাব-ভাব দেখিয়া। অনশন শুরু করিবে নাকি? আজকাল ন্যায়-অন্যায় যে কোন আবদারের জন্য অনশন-অবলম্বন ব্যবস্থাই চল হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উপায় কি? লুসিকে পাওয়া কালুর পক্ষে অসম্ভব। তবে লুসিকে আর একবার দেখিতে চায় তো ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে না হয়তো। শুনিয়াছি, বিষ-প্রয়োগে নাকি বিষ-ক্রিয়ার প্রতীকার হয়। সে হিসাবে লুসিকে পুনরায় দেখিলে, কালুর হৃদয়ের প্রথমদর্শন-জনিত বিষ-ক্রিয়া হয়তো নিরাকৃত হইতে পারে।

গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িলাম। তিনি কাল জগদীশ-কন্যার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কাজেই প্রস্তাবটা প্রথমে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতেই রাজী হইলেন। স্থির হইল, পরদিন জগদীশবাবুর কন্যাকে ও তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে (পরিহাসচ্ছলে অবশ্য) লুসিকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যার পর আমরা দুইজনে জগদীশবাবুর বাড়ি গেলাম। সামনের বাগানে লুসি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা করিতেছিল। আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইল না পর্যন্ত। বুঝিলাম, কালু তাহার মনে বিন্দুমাত্র দাগ বসাইতে পারে নাই। জগদীশবাবুর বড় ছেলে সামনের বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল। আমাদের দেখিতে পাইয়াই উঠিয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। গৃহিণী অন্দরে চলিয়া গেলেন। আমি বৈঠকখানায় জগদীশবাবুর ছেলের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা পরে গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

রাস্তায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, নেমন্তন্ন করলে? গৃহিণী গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, কাল দিনের বেলায় ওদের কোথায় নেমন্তন্ন আছে। রাত্রে আসতে পারবে না বললে। পরশু ওরা সব চ'লে যাবে। কহিলাম, লুসিটাকে অন্তত—। গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তাই বলা যায়

নাকি? কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, ভারি অহঙ্কার হয়েছে মেয়েটার! গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখ থমথম করিতেছে। নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছেন। কাজেই মুখের ভাব যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া তুলিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে, যে কথাটি আজ তিন বৎসর ধরিয়া মনের এক কোণে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলাম। বলিলাম, শুনছ? গৃহিণী মুখ না ফিরাইয়াই কহিলেন, কি? বলিতে লাগিলাম, একটা কথা বলছি, রাগ ক'রো না। গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, কি কথা?

গৃহিণীর মুখের ভাব দেখিয়া না বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়াই ফেলিলাম, এতদিনে বুঝতে পারছ যে, কালু বিলিতী নয়, দেশী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা না হয় বিলিতী কুকুর বেশি দেখে নি, ওদের কথা এতদিন অগ্রাহ্য ক'রে এসেছ। কিন্তু জগদীশবাবুর মেয়ে বা নাতনীদের সম্বন্ধে তো সে কথা বলা চলে না। ওরা দিল্লীর মত শহরে থাকে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে হরদম মেশে, বিলিতী কুকুর ওরা অনেক রকমের অনেক দেখেছে। ওরা যখন বলছে, তখন---। গৃহিণী রোষগাঢ়কণ্ঠে কহিলেন, বেশ, কালু দিশীই। তা কি করতে হবে বল দেখি? বিষ খাইয়ে মেরে দোব?—বলিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, তা বলছি নাকি? এত দিন ধ'রে এত বড়টি করা হয়েছে---হ'লই বা দেশী। মানে, সবাই বলে কিনা—মানে, তুমি আবার—অর্থাৎ তোমার কিনা---

গৃহিণী ধমকের সুরে কহিলেন, আবোল-তাবোল ব'কে কাজ নেই। সবই জানি, সবই বুঝি। তবে একটা কথা ব'লে দিচ্ছি—কালু আমার দিশী হোক বিলিতী হোক ওকে নিয়ে কারও মাথা ঘামাতে হবে না। বলিয়া দ্রুততর পদক্ষেপে চলিতে শুরু করিলেন। আমিও যথাসাধ্য তাল বজায় রাখিতে লাগিলাম।

পরদিন হইতে কালুর মানসিক অবস্থা ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠিতে লাগিল। দিবারাত্র চিৎকার করিতে লাগিল। কেহ, এমন কি আমি পর্যন্তও, সামনে গেলে, দাঁত খিঁচাইয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। চাকরটা খাইতে দিতে গেলে লাফাইয়া কামড়াইতে আসিতে লাগিল। কুকুরটাকে লইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। ভয় হইতে লাগিল, যদি ক্ষেপিয়া যায়! যদি কোন দিন শিকল ছিঁড়িয়া সকলকে কামড়ায়। কুকুরটার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করা অবিলম্বে কর্তব্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না। অথচ, গৃহিণী কয়েক দিন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া আছেন। নিজে হইতে কথাবার্তা বলেন না। আমি পাঁচটা কথা বলিলে একটা জবাব দেন। তা সত্ত্বেও তাঁহার কাছে কথাটা পাড়িলাম।

কালুর রকম-সকম দেখছ?

গৃহিণী যেন কিছুই শুনেন নাই, কিছুই দেখেন নাই—এই ভাব-ভঙ্গীতে কহিলেন, কি হয়েছে? কহিলাম, দিনরাত চেঁচাচ্ছে যে?

চেঁচালেই বা। তাতে তোমাদের কি?

আমাকে দেখলেই গোঁ-গোঁ করছে। চাকরটাকে দেখলেই কামড়াতে আসছে--

গৃহিণী কহিলেন, তোমাদের দেখলেই ওই সব করে। আমাকে তো কিছু করে না।—বলিয়া কালুর কাছে গিয়া সস্নেহে ডাকিলেন, কালু! কালু তর্জন-গর্জন কিছুই করিল না বটে, কিন্তু সামনের দাঁত দুইটি কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া কড়া চোখে তাকাইয়া রহিল। গৃহিণী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, দেখলে?

তারপর গম্ভীর মুখে কহিলেন, ওর মনটা খারাপ হয়ে আছে। দিন কয়েক ওকে ঘাঁটিও না দেখি। দুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।

দুই

দিন কয়েক পরে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেই চাকরটা কহিল, দেখুন বাবু, কালু কি ক'রে দিয়েছে!—বলিয়া পরনের ধুতির একটা প্রান্ত

চোখের সামনে ধরিল। দেখিলাম, কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। এই কাপড়খানি কয়েক দিন মাত্র আগে কিনিয়া দিয়াছি। সক্ষোভে বলিলাম, গিন্নীমাকে দেখিয়েছিস? চাকরটা বলিল, হ্যাঁ।

কি বললেন?

ধমকালেন আমাকে। বললেন—সাবধানে খেতে দিতে পারিস নে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কুকুরটা ক্ষেপে যাবে বাবু, বিদেয় করুন ওকে।

সেই মুহূর্তেই কালুকে যে কোন প্রকারে বাড়ি হইতে বিদায় করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম।

সুযোগ ঘটিয়া গেল। বিশেষ প্রয়োজনে গৃহিণীকে পিতৃগৃহে যাইতে হইল। আমি কালুকে বিদায় করিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিলাম। বন্ধু-বান্ধবদের দুই-চারিজনকে কালুকে দিতে চাহিলাম। দরদী বন্ধুরা কহিলেন, না ভাই, আমাদের ওসব পোষাবে না। এমনই সংসারে ঝামেলার শেষ নেই। অবশ্যি তোমার কুকুরটা খুবই ভাল, সুবিধে থাকলে নিতে আপত্তি ছিল না। স্পষ্টবাদী বন্ধুরা বলিলেন, আরে, ও দিশী নেংটেটাকে নিয়ে কি হবে? পোষাচ্ছে না তো রাস্তার কুকুর রাস্তায় ছেড়ে দাও গে। আরও পাঁচটার সঙ্গে মিলে মিশে বেশ থাকবে। তোমার বাড়িতে রুটি মাংস খেয়ে যা সুখে আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দে থাকবে আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাত চেটে খেয়ে। ওই স্বভাব তো ওদের।

জনৈক রসিক বন্ধু প্রস্তাবটা শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, আরে, করছ কি? তোমার ওটি কুকুর নয়—মহা কুকুর। খুব যত্ন-আত্তি ক'রে ওকে রাখ ভায়া। মহাপ্রস্থানের পথে যখন বেরোবে, ওই সঙ্গে ক'রে স্বর্গের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এ দিক দিয়া কোন সুবিধা হইবে না দেখিয়া অন্যভাবে চেষ্টা শুরু করিলাম। চাকরটাকে বলিলাম, তুই কালুকে শহরের বাইরে নিয়ে

গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবি? সে সাফ জবাব দিল, আমার দ্বারা হবে না। আপনি পলাকে বলুন। পলা মানে—প্রহ্লাদ। আমাদের ঝিয়ের স্বামী। লম্বা-চওড়া শক্তিমান চেহারা। গোঁয়ার-গোবিন্দ-গোছের। মাতাল। মদ খাইবার জন্য সামান্য কিছু পাইলেই যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে। তাহার স্ত্রীকে সাহায্য করে। দুই-চার আনা বকশিশের বদলে বাড়তি কাজও করিয়া দেয়।

সেই দিন সন্ধ্যায় প্রহ্লাদকেই ডাকিয়া পাঠাইলাম। বকশিশ পাইবে শুনিয়া সানন্দে ও সাগ্রহে রাজী হইল। বলিলাম, যদি কামড়ে দেয়? বুক ফুলাইয়া সদম্ভে কহিল, কামড়াবেক কি! আজ্ঞে, দাঁত ভেঙে দিব নাই?

প্রহ্লাদ কালুর কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই কালু কান ও লেজ খাড়া করিয়া তর্জন-গর্জন শুরু করিল বটে, কিন্তু প্রহ্লাদের লম্বা-চওড়া চেহারা দেখিয়া মিহি সুর ধরিল। প্রহ্লাদ বাজখাঁই স্বরে এক ধমক লাগাইতেই কালু একেবারে চুপ। প্রহ্লাদ কাছে গেল, খোঁটা হইতে শিকলটা খুলিল। কালু টুঁ শব্দটি করিল না। তারপর প্রহ্লাদের সঙ্গে শান্ত সুবোধের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে প্রহ্লাদ ফিরিয়া আসিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রে? প্রহ্লাদ একগাল হাসিয়া কহিল, ছেড়ে দিয়ে এলাম। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেকটা যেয়ে বনের ধারে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

মনটা কি জানি কেন টনটন করিয়া উঠিল। কহিলাম, বনের ধারে ছেড়ে দিয়ে এলি? যদি কোন জন্তু-জানোয়ার মেরে দেয়?

প্রহ্লাদ কহিল, কাছেই একটা গাঁ রইছে। উ নিঃঘাত সেখানে পালিয়ে যাবেক। জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেড়ে দিতেই কি করলে কালু?

ছেড়ে দিতেই সামনের দিকে ছুটল কতকটা। আমি তখন একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তারপর আবার ফিরে এল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার ছুটল আর একদিকে। আমি তখন স'রে পড়লাম।

এক টাকা বকশিশ দিলাম। প্রহ্লাদ বেজায় খুশি হইয়া প্রণাম করিল এবং হাত জোড় করিয়া কহিল, তা হ'লে যাই এজ্ঞে।

হঠাৎ কালু উঠানের মাঝখানে আসিয়া হাজির। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া হাঁপাইল; তারপর আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া নিজের আস্তানার দিকে ছুটিল।

আমি স্তম্ভিত। প্রহ্লাদ ভীত ও সন্ত্রস্ত। মুখ শুকাইয়া গেল বেচারার। পাছে বকশিশটা বেহাত হইয়া যায়।

দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, এজ্ঞে, দিয়ে এসেছিলাম ঠিকই। কি ক'রে পালিয়ে এল কে জানে!

সাহস দিয়া কহিলাম, তোমার কোনও দোষ নেই প্রহ্লাদ। তুমি তোমার কাজ ঠিকই করেছ। কাজেই বকশিশ তোমার মারা যাবে না। এখন কুকুরটাকে বেশ ক'রে খোঁটায় বেঁধে দিয়ে যাও। দেখো যেন খুলে না যায়।

দিন দুই পরে গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। কাজেই কালুকে বিদায় করিবার সব চেষ্টা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

কালুর মেজাজ দিন দিন আরও কড়া হইয়া উঠিল। এখন গৃহিণীকেও রেয়াত করে না। কাছে গেলে লেজ খাড়া করিয়া, চোখ পাকাইয়া গোঁ-গোঁ করিতে থাকে। গৃহিণীও ক্রমে কালুর উপরে অপ্রসন্না হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে শহরে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শহরের একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মারা গেল। মাসখানেক আগে বাড়ির পোষা কুকুরটি হঠাৎ পাগল হইয়া ছেলেটিকে কামড়ায়। রীতিমত বিধিমত চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটির প্রাণরক্ষা হইল না। ছেলেটির মায়ের সঙ্গে গৃহিণীর পরিচয় আছে। ছেলেটিকেও দেখিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর কয়েক দিনই খবরের কাগজে পড়া বা লোক-মুখে শোনা আরও দুই-চারিটা কুকুরে কামড়ানোর গল্প গৃহিণীকে শুনাইলাম। শেষে একদিন বলিলাম, কালুরও মাতগতি যা দাঁড়িয়েছে নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে। তারপর শেকল ছিঁড়ে যদি কামড়ায় তো—। কথাটা শেষ না করিয়া কহিলাম, ছেলেপিলেরা বাড়িতে নেই এই যা রক্ষে। একটু হাসিয়া কহিলাম, পুজোর ছুটিতে তো আসবে সব। দেরিও নেই বেশি। তখন যদি ক্ষেপে গিয়ে কাউকে কামড়ায় তো—। গৃহিণী এবার ফোঁস করিয়া উঠিলেন, যা-তা অলুক্ষণে কথা ব'লো না বলছি।

কহিলাম, অলুক্ষণে তো বটে, কিন্তু অসম্ভব তো নয়।

গৃহিণী কহিলেন, ক্ষেপে যাবে ব'লে যদি মনে হচ্ছে তো বিদেয় ক'রে দাও। কে বারণ করেছে? কিন্তু নেবে কে ওকে বল দেখি?

তিন

ভগবান সুরাহা করিলেন। পূজার ছুটিতে আমার এক পুরাতন ছাত্র আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। ছেলেটির নাম অমরেশ। ছাত্রাবস্থায় আমার পরম স্নেহভাজন ছিল। প্রায় আমার বাড়ি আসিত। গৃহিণীও তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি মিলিটারী বিভাগে বড় চাকরি করে। কর্মস্থল দেরাদুন। ছুটি পায় কম। কাজেই প্রায় বাড়ি আসিতে পারে না। কিন্তু বাড়ি আসিলে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে ভুল করে না।

সাদরে তাহাকে বাড়ির ভিতরে আনিয়া বসাইলাম। গৃহিণীও খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, তোমাকে আমি দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। ভাবলাম, কোন সাহেব আসছে বুঝি! অমরেশের চেহারা সত্যই চমৎকার। লম্বা-দোহারা। ধবধবে ফরসা রঙ। সাহেবী পোশাক চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে। গৃহিণীর কথা শুনিয়া অমরেশ বিনয়ের হাসি হাসিল।

হঠাৎ কালু চিৎকার করিয়া উঠিল। অমরেশ সবিস্ময়ে কহিল, কুকুর পুষেছেন বুঝি? বিলিতী?

গৃহিণী ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিলেন, কি জানি বাবা, দিশী, না বিলিতী! দেখগে না।

অমরেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই কালু তাহাকে এক চোখ দেখিয়া লইয়া সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাথা নীচু করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে আনুগত্য জানাইতে শুরু করিল। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, তোমাকে যে খুব খাতির করছে হে! বড় অফিসার ব'লে চিনতে পেরেছে নাকি?

অমরেশ তাহার স-বুট একটা পা কালুর মাথায় চাপাইয়া দিয়া কহিল, আপনাদের করে না বুঝি?

কালুর সামনের দিকটা মাটির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে; চোখ দুইটি চরিতার্থতার আনন্দে মুদ্রিতপ্রায়; জিবটি ঈষৎ বাহির হইয়া ঠোঁটের এপাশ ওপাশ নড়িতেছে; লেজটিও ঘনঘন দুলিতেছে।

কহিলাম, আগে করত। আজকাল এমন মেজাজ বিগড়েছে যে, দেখবামাত্র তেড়ে কামড়াতে আসে। একটু থামিয়া কাহলাম, ওর এই মেজাজ দেখে ভাবছিলাম, কাউকে দিয়ে দেব, কিন্তু কেউ নিতে চাচ্ছে না।

অমরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, বেশ তো, আমাকে দিন।

গৃহিণী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; সাগ্রহে কহিলেন, বেশ তো বাবা, নিয়ে যাও। আমাদের গরিব গেরস্থর বাড়িতে ওসব হাঙ্গামা পোষায় না। ভাল ক'রে আদর-যত্ন হয় না, আদব-কায়দাও শেখানো হয় না; কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে।

ছেলে দুইটি পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিল। কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারাও সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, নিয়ে যান অমরেশদা, গরম দেশে থেকে কালু সাহেবের মাথা গরম হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে না গেলে ঠাণ্ডা হবে না।

অমরেশ তখনই কালুকে লইয়া গেল। কালু বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, কাহারও দিকে তাকাইল না, সোল্লাসে নাচিতে নাচিতে তাহার সহিত চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, যাক বাবা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সব। দিন রাত ভয়, কখন শেকল ছিঁড়ে কামড়ে দেবে!

বাহিরের রোয়াকে গিয়া দাঁড়াইলাম। অমরেশ ও কালু ক্রমে দূরবর্তী হইয়া শেষে দৃষ্টিসীমা পার হইয়া গেল। যাহাকে কি করিয়া বাড়ি হইতে দূর করিব ভাবিয়া দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না, সে অতি সহজে বিনা দ্বিধায় বিনা প্রতিবাদে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, একবারও পিছন ফিরিয়া তাকাইল না। ইহাতে মন হালকা হইবে কি, ভারী হইয়া উঠিল।

বাড়ির ভিতরে গিয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তোদের মা কোথায়? ছেলেরা বলিল, রান্নাঘরে। চুপি চুপি কহিল, কাঁদছেন।

চার

বৎসর দুই কাটিয়া গেল। জীবনে নানা বিচিত্র ঘটনার ভিড়ে তুচ্ছ একটা কুকুরের ব্যাপার কখন হারাইয়া গেল।

একদিন একটি ছাত্র দেখা করিতে আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বন-বিভাগে কাজ করে। দেরাদুনে থাকে। অমরেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল, চিনি ওঁকে।

ওর বাড়ি যাও?

প্রায়ই যাই।—ছাত্রটি বলিল।

একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম, ওর বাড়িতে একটা কুকুর দেখ নি! কালো রঙ! আমার কাছ থেকেই নিয়ে গিয়েছিল।

ছাত্রটি সোৎসাহে কহিল, দেখেছি বইকি। সেটা আপনার কুকুর ছিল? ব্যাপার সব জানেন না নাকি?

কালু তাহা হইলে ক্ষেপিয়া গিয়া অমরেশকে নিশ্চয় কামড়াইয়াছে। সভয়ে কহিলাম, কি ব্যাপার বল দেখি? পাগলা হয়ে গেছে নাকি?

ছাত্রটি আশ্বাসের স্বরে কহিল, ওসব নয়। অন্য ব্যাপার। খুব ভাগ্যবান অমরেশবাবু।

সকৌতুকে চাহিয়া রহিলাম। ছাত্রটি বলিতে লাগিল, কুকুরটা

দিশী ব'লেই আপনাদের ধারণা ছিল নিশ্চয়। অমরেশবাবুর কি ধারণা ছিল জানি না, তবে আমরা সবাই দিশী কুকুরটাকে এত দূর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অমরেশবাবুকে ঠাট্টা করতাম। মাস কয়েক আগে ওখানে একটা কুকুর-প্রদর্শনী হ'ল। অমরেশবাবু তো বেপরোয়া মানুষ। উনি ওই কুকুরটাকে প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতার জন্য পাঠালেন। জন দুই ইংরেজ, আর একজন আমেরিকান ছিলেন বিচারক। ওই আমেরিকানটি ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি কুকুর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। প্রতিযোগিতায় অমরেশবাবুর কুকুর সর্বপ্রথম হ'ল। একটি পাঁচ শো টাকার তোড়া পারিতোষিক পেল। আমেরিকান সাহেবটি নাকি বলেছেন যে, খুব ভাল কুকুর ওটা। খাঁটি একটা কোন জাতের হয়তো নয়, খুব সম্ভব সঙ্কর—তবু ও-রকমের কুকুর খুব কম দেখা যায়।

আমি বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে তাকাইয়া ছিলাম। অনুমানে বুঝিতেছিলাম, দরজার বাহিরে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া গৃহিণী সব শুনিতেছেন। ইহার পর তূণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে সব বাক্যবাণ আমাকে হানিতে থাকিবেন, তাহা ভাবিয়া বুকের ভিতরটা শুকাইয়া গিয়া গলাটা কাঠ হইয়া গেল। কোনমতে কহিলাম, তার পর ?

ছেলেটি কহিল, তার পর আর কি ? দিন কয়েক পরে একজন আমেরিকান টুরিস্ট কুকুরটা হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। অমরেশবাবু দেন নি। আরও মোটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন উনি।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। বাড়ির ভিতরে গিয়া গৃহিণীকে কহিলাম, সব শুনলে ?

গৃহিণী গম্ভীর মুখে নীরস স্বরে কহিলেন, তুমি শুনেছ তো ভাল ক'রে ? তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগুলোকে গেঁয়ো ভূতগুলোকে শোনাও গে যাও। বুঝুক সব, জামাইবাবু যা-তা বলেন না, মাস্টারি করেন না তিনি।

সরিয়া পড়িয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। শুনিতে পাইলাম, গৃহিণী ছড়া কাটিতেছেন—চাষা কি বুঝিবে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন। আবার, ভেড়ার শিঙের ঘায়, হীরে গুঁড়ো হয়ে যায়। তারপর একটি সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সক্ষোভে বলিলেন, যেমন অদেষ্ট! না হ'লে এমন লোকের হাতে পড়ি!

নীরবে বসিয়া রহিলাম। গৃহিণীর কথায় মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হইল না। সত্যই তো কালুর মাহাত্ম্য আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই।

শ্রীঅমলা দেবী

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(প্রায় বদ্ধ পাগল অবস্থায় রচিত)

শ্রাবণী (গুরুদেবী বাউল ও অন্যান্য সুরে গীতব্য)

এ কি সুর শ্রবণ করি শ্রাবণ ওরে তোর গানে?
আষাঢ়ের আশার স্বপন তলিয়ে গেল তোর বাণে
(তোর) শাঙন ঝরার জোর বাণে।
কালিদাসের ফুরিয়ে কালি
হয়েছিল কলম খালি
আষাঢ়ের জের টেনে তাই
এগোয় নি আর তোর পানে।
সেই দুখে কি মন দুখিয়ে
মেঘের ছায়ায় মুখ লুকিয়ে
কেঁদে তুই দেখাস ঢেঁকি
স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?

শ্রাবণ ওরে শ্রাবণ আমার ভাই!
তোর সুরেই সুর মিলিয়ে শ্রাবণী গান গাই

তবু তুই চ'লে গেলে
চাইব না চোখ পিছে মেলে,
নতুন প্রেমে ভাসব তখন ভাদ্রবধূর জোর টানে।
যে যখন রয় কাছে ভাই
তারি সুরেই পরাণ নাচাই,
ভাবি নে "গেল যে হায় সে আছে আজ কোন্‌খানে ?"

শ্রাবণের গান (ইচ্ছামত সুরে বা বেসুরে গীতব্য)
চরণ-চিহ্ন পিছে ফেলি
চরণ নিয়ে পালিয়ে গেলি
হায় রে আষাঢ়, হায় রে !
ওরে হায় হায় রে !
(আমি) শ্রাবণ এখন কি যে করি !
করি কি উপায় রে !
(ও তুই) মেঘের রুমাল বুলিয়ে চোখে
করলি শুরু কাঁদা
(ও তোর) চোখের জলে হেথায় হোথায়
জমিয়ে গেলি কাদা।
তোর কাঁদনের নজীর দেখে
আমিও কাঁদি থেকে থেকে,
যখন তখন ভাসাই কেঁদে
এ যে বিষম দায় রে !

*

(আহা) স্মরণ দিয়ে বরণ করি সেই সে কবিরে
(যে গেল) পরশ হেনে বিশ্ব-প্রাণের অনেক গভীরে
(সে যে) আমার মেঘেই বুলিয়ে দাড়ি
বৈতরণী দিল পাড়ি,

শেষ-পারাণীর কড়ি তাহার
গান নিয়ে গলায় রে !
তাহারি স্মরণ ঘিরে
কেঁদে গাই ফিরে ফিরে
'নবীন হয়ে আবার কবি আয় রে ফিরে আয় রে !'
ভাবি তাই ওরে আষাঢ়,
যতই প্রিয় তুই রে চাষার,
নেই এ ব্যথার পরশমণি তোর মণিকোঠায় রে !

বর্ষার মেঘকে

গুরু গুরু গুরু গুরু
গুরু গুরু গর্জন
ওরে মেঘ, কর্ দেখি বর্জন !
দুষ্টামি ভুলে ওরে দুষ্ট
থাক্ দেখি তুষ্ট,
দুর্জনপনা ভুলে হয়ে থাক্ সজ্জন—
ভুলে থাক্ গুরু গুরু গর্জন।
দুরু দুরু দুরু দুরু
থেমে যাক বক্ষে
ঝর ঝর থেমে থাক্ চক্ষে।
সাথী তোর বিদ্যুৎ চঞ্চল
ছেড়ে তোর অঞ্চল
লক্ষ্যের পথ ভুলে মিলাক অলক্ষ্যে—
দুরু দুরু থেমে যাক বক্ষে।
চট্ ক'রে ঠোঁট মেলে
কর্ দেখি হাস্য,
ভুলে ফেল্ কাঁদুনির ভাষ্য।

ঝটিকার ঝটপট ঝট্‌কায়
খটমট খট্‌কায়
দাবড়ানি দিয়ে জোর করা তোর দাস্য
ঠোঁট মেলে করে জোর হাস্য।
ভুল ক'রে বিল্‌কুল্‌ ভ্রূকুটি ও বিদ্রূপ
দেখা তোর খান্‌দানী কিদ্রূপ।
জলে মিশে করে যথা কর্পূর
খোশবু-তে ভর্‌পুর,
দিন-ভর হয়রানি রাতে ধরে নিদ্‌-রূপ –
ভুলে থাক্‌ ভ্রূকুটি ও বিদ্রূপ।
বর্ষার তরে তুই, তোরি তরে বর্ষা
তবু দোঁহে হয়ে যাবি ফর্‌সা।
তাই বলি করিস নে ডম্‌ফাই,*
লম্ফাই ঝম্ফাই,
ঠিক সেথা ভয় তোর যেথা তোর ভর্‌সা—
যাবি তুই, যাবে তোর বর্ষা।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌ (অথবা গাধার প্রতি বলদ)
কলুর বলদ কহিল ধোপার গাধারে,
"মনের কথাটি বলি তোর কানে দাদা রে!
না-দেখা চশমা দুই চোখে ঢেকে
সোজা রাস্তায় চলি এঁকেবেঁকে
চারিটি চরণ চলন-চক্রে বাঁধা রে!
ঘূর্ণি ঘানিতে সরিষা পিষিয়া
বাহির করি যে তৈল,
বাকি থেকে যায় খৈল।

* 'দম্ভ' শব্দের বিশুদ্ধ রূপ।

আমি না ঘুরিলে নাহি ঘোরে ঘানি,
ফুরায় না টানা যত জোরে টানি,
এ যেন অশ্রু-পাথার সেঁচিতে
ব্যর্থ কাঁদন কাঁদা রে!
গাধা রে, আমার দাদা রে!
আমি শুধু ভাই ঘানি টেনে যাই,
তেলে মোর কিছু ভাগ নাই—
তাতে কিছু মোর রাগ নাই।
ঘানিতে বলদ ঘুরিবেই হেঁটে
তেল যাবে সবই কলুর পকেটে,
সারা দুনিয়ার এ বিধান মোর
জীবন ভরিয়া সাধা রে!
চরণ থামিলে কলু দেবে পিঠে
চাব্‌কে
কাঁচা নারিকেল তাই বলি মিঠে
ডাবকে।
মিশায়ে আমার কান্না ও হাসি
ঘানির কেষ্টো বাজাইছে বাঁশি
একই সাথে আহা পুলকি' উদাসি'
আমার চিত্ত-রাধারে—
দাদা রে আমার, গাধা রে!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য (অথবা বলদের প্রতি গাধা)

কলুর বলদ আয় ভাই তোরে
মরমের কথা কহি।
কভু রে বসন করি না পিন্ধন,
পৃষ্ঠে শুধু বোঝা বহি।

জন্মাবধি মোর পিতা দিগম্বর,
মাতা ছিল দিগম্বরী ;
পুরুষানুক্রমে দিগম্বর আমি
'গাধা-রূপে অবতরি'।
কাঁচা পাকা ঘাস খাই বারো মাস,
নাহি করি কোনো নেশা।
রজক প্রভুর সহকারী আমি,
আজীবন এই পেশা।
মোর প্রতি বিধি কত যে সদয়
কি কহিব তোরে ভাই ?
কণ্ঠে আমার যে গান দিয়াছে
তুলনা তাহার নাই।
কত যে দ্বিপদ গায়কের দল
আমার নকল করে,
ধরি যবে গান মোর পিঠে তাই
হিংসার লাঠি পড়ে।
গ্রীষ্মে, শীতে ও বর্ষায় থাকি
এক ভাবে বারো মাসই
দুঃখে কাঁদি না রুক্ষ কান্না
সুখে না সূক্ষ্ম হাসি।
"নাই নাই" আর "চাই চাই" কভু
করি না তো মুখ তুলে
গুঁতো লাথি খেলে মারি নে পাল্‌টা,
চুপ ক'রে যাই ভুলে।
মোর আদর্শ করিয়া নকল
অনেক দ্বিপদ ভাই
মহান্ বলিয়া নাম ক'রে গেল,
খ্যাতি তবু মোর নাই।

ঘানির গান

ভুবন জুড়ে নানান্ সুরে ঘুর্‌ছে ঘানি ঘুর্‌ছে ঘানি
সেই ঘোরাতেই জোড়া আছে অগুন্‌তি হায় দ্বিপদ প্রাণী।
নয়ন হতে অশ্রু নামে,
চরণ ভেজে মাথার ঘামে,
ঘানির তবু মন ভেজে না, যায় গেয়ে সে আপন গানই।
ঘুর্‌ছে মাটির এই পৃথিবী আপন মেরুদণ্ড ঘিরে
সূর্যকেও পাক দিয়ে সে এক বছরে আসছে ফিরে
সেই পাকেরি ছোঁয়াচ লেগে
ঘুর্‌ছে ঘানি আপন বেগে,
বল্‌ছে "আমার জীবন থেকেই না'ও গো জেনে আমার বাণী।"
সবাই ঘোরে রকম ফেরে নিত্য ঘানির ঘূর্ণি ফাঁদে
কেউ ভরা আর কেউ বা ফাঁকা, কেউ হাসে আর কেউ বা কাঁদে
কেউ বা বাঁধে, কেউ বা বাঁধা
কেউ লালে লাল, কেউ বা সাদা,
দ্বন্দ্ব-ভরা ছন্দে সুরে চল্‌ছে হানা চল্‌ছে হানি—
অন্ধ আঁখি বন্ধ করে ঘুর্‌ছে ঘানি ঘুর্‌ছে ঘানি।

হিমালয়

হিম-বুক ওগো মহা-কিম্ভূত হিমালয়!
মহাকাল আহা তোমার নিভৃতে
গাহিছে ধ্রুপদ ঢিমা লয়।
পড়িতেছে শম্ বহু বাদে বাদে,
কভু বা তারায় কভু অতি খাদে
সীমার সীমায় এসে বার বার
আবার হতেছে সীমা লয়।
অভিযাত্রীর হেথা হ'ল কত অভিযান।
আসিবে হেথায় কত বেপরোয়া
দুরন্ত খ্যাতি-লোভী জ্ঞান।

তব শিঙে শিঙে হবে রাহাজানি,
তবু চটিবে না, জানি তাহা জানি,
কত যে আসিবে, কত ফিরে যাবে,
কত চলে যাবে যমালয়—
তুমি রবে খাড়া তুষার-সাহারা
চির সুশুভ্র হিমালয় !
দিতে যে পাহারা ভারতের সারা উত্তর।
হাওয়াই জাহাজ তোমারে যে আজ
অনায়াসে বলে "দুত্তোর্"।
তোমার উঁচুতা হেলায় ছাড়ায়ে
আসে অনায়াসে তোমারে পারায়ে,
তুমি তবু হাসো, তবু ভালোবাসো,
প্রেম দিয়ে করো ঘৃণা লয়—
ওগো একঘেয়ে, ওগো বিচিত্র,
নব-পুরাতন হিমালয় !

বাহনের প্রতি নারদ

স্বর্গে যাবো না, ওগো ঢেঁকি !
স্বর্গের ফুরায়েছে ধান গো,
(আহা) সেথা গিয়ে তুমি ভানিবে কি ?
তার চেয়ে ঢের ভালো মর্ত্য,
আছে হেথা অনেক আবর্ত ;
হেন বাদে তেন বাদে
বিবাদ বিসম্বাদে
দিন রাত চলে ঠেকাঠেকি।
হেথা ভাই তুমি আর আমি
অনেক খোরাক পাবো দামী।

স্বর্গের ঠোকাঠুকি
এর কাছে খোকাখুকি
মিন্‌মিনে যেন ন্যাকা-নেকী।
তাই বলি স্বর্গে তো যাবো না।
স্বর্গে এমন সুখ পাবো না।
হেথাই করিব বাড়িঘর গো,
মর্ত্য যে হয়ে গেছে স্বর্গ!
হেথা আসলেরে ওরে,
গায়ের ও মুখের জোরে
কোণ-ঠাসা করিতেছে মেকি।
পরমানন্দে ভান্‌
এই মর্ত্যেরই ধ্যান,
স্বর্গে যাস্‌ নে ওরে ঢেঁকি!

রাজঘাট

পড়ে আছি হেথা বুকে লয়ে স্মৃতি মুকুটবিহীন মহারাজার—
দলিত কোরো না মর্যাদা মোর, আমারে কোরো না হাটবাজার।
প্রেম অহিংসা আদর্শ তরে
হেলায় যে প্রাণ গেল দান ক'রে
ঘৃণা-হিংসার প্রতিভূরা আনে তারি সমাধিতে ফুলের ভার!
এ কপট ছল বুকে ব্যথা হানে, সহে না দহন এই সাজার।
প্রীতি শুভেচ্ছা অজুহাত লয়ে বাহির হইতে যারাই আসে
সবারেই কেন ফুলমালা দিতে নিয়ে আসে হেথা আমার পাশে?
যাহাদের প্রীতি শুধু ফাঁপা ভান
তাদের মালায় ভরা অপমান;
ভুয়া মান হতে অবহেলা ভালো, নহি তো পিয়াসী বন্দনার—
মিথ্যা অর্ঘ্যে হরিও না মান মুকুটবিহীন মহারাজার।

অসীম উদার আকাশের তলে শান্তিতে দাও থাকিতে মোরে
আমার রাজার পুণ্য স্মৃতিটি একাকী হেথায় বক্ষে ধরে।
দিয়ে মিছামিছি মালার ধাপ্পা
ভুয়া অভিনয়ে কোরো না খাপ্পা,
রাজঘাট আমি 'রাজ' বটে, তবু রাজনীতি হ'তে পরিষ্কার—
আমারে ভাঙায়ে মারিও না বাজি, কোরো না আমারে হাটবাজার ॥

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ছাদে প্রাদেশিকতা

বাংলা ছেড়ে মানভূমে এসেছি। মানভূমও বাংলার অংশ, কিন্তু সে কথা উপস্থিত থাক। নূতন শহর, নূতন রাস্তা, নূতন নূতন শত শত বিভিন্ন পর্যায়ের বাড়ি, ভারতীয় বাস্তুবিভাগের তত্ত্বাবধানে সদ্যনির্মিত। চারিদিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড কারখানা, দিবারাত্রি আর্তধ্বনি তুলছে—'ম্যয় ভুখা হুঁ'। কয়লা, পাথর, মানুষ সবই তার ভক্ষ্য। হিমালয় থেকে কুমারিকা, কলিকাতা থেকে বোম্বাই, সকল প্রদেশের নরনারী অধ্যুষিত নব শিল্পশহর। পণ্ডিতেরা বলেন, এটা এসিয়ার বিস্ময় এবং এই পথেই ভারতের আর্থিক মুক্তি।

আমাদের বাসাটি ছোট হ'লেও সুন্দর। শহরের এক প্রান্তদেশে অবস্থিত পল্লী, উত্তরে সুদূরবিস্তৃত ক্রমোচ্চ প্রান্তর, দিগন্তে নীলাভ শৈলশ্রেণী, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। বাড়িটি একেবারে নূতন, অঙ্গনে এখনও কিছু কিছু কাজ চলছে। বৈদ্যুতিক আলো-বাতাসে, স্যানিটারি পায়খানা-বাথরুমে সবই বেশ আরামপ্রদ। কর্মহীন বর্ষাদিনগুলি অবাধ শান্তিতে কাটবে ভেবে স্বস্তি অনুভব করলাম। এই বর্ষায় বাংলার শহরগুলির যে দুর্গতি ঘটে এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, সেই গল্পই বলছি।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরাম নেই। শার্সি বন্ধ ক'রে ঝাপসা মাঠের দিকে চেয়ে আছি। চিত্তশিখী নৃত্য শুরু করে করে,

এমন সময় খবর এল রান্না-ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি, তবু সেই ছাদে জল পড়ার রিপোর্ট! তদুপরি নূতন বাড়ি, নূতন লোহাই পোক্তার ঢালাই আধুনিক ছাদ (**reinforced concrete roof**), জল পড়ছে কি রকম! গিয়ে দেখি ঘরের সর্বত্র জল টুপিয়ে পড়ছে। গৃহিণী পাশের ঘরে জপে ব'সেছিলেন, জপ শেষ না হতেই সেখানে ছাদ টোপাতে শুরু করল। ছেলে কারখানায় **duty**তে গিয়েছে বেলা ১॥০টায়, ফিরবে রাত্রি ১০॥০টায়। রাত্রি ৮টায় তার শোবার ঘরে জল পড়া আরম্ভ হ'ল; রাত্রি ৯টায় আমার ঘরে। এমন স্থান পাওয়া কঠিন যেখানে চৌকি টেনে দিয়ে বিছানাগুলি বাঁচানো যায়। চাকরটি পাশের বাসা থেকে ঘুরে এসে খবর দিলে সেখানেও অনুরূপ বর্ষণ চলছে, আর কয়েকটি বাসার বাবুরা একত্র হয়ে বলাবলি করছেন, ঠিকাদার উপরওয়ালাদের যোগাযোগে পয়সা লুটে নিয়েছে। এই সব বাবুরা অনেক দিন বাসের নানা কষ্ট ভোগ ক'রে সম্প্রতি এই অঞ্চলের নবনির্মিত বাসা পেয়ে ভেবেছিলেন এইবার কিছু আরামে চাকরি করা যাবে। কিন্তু আষাঢ়স্য প্রথম বর্ষণেই তাঁদের মোহ কেটে গেল।

প্রায় সারারাত্রি বৃষ্টি চলল। সকালেও থেকে থেকে এক এক পসলা আসছে। সারাদিন সারারাত বাদল চলবার পর তৃতীয় দিনে ভোরের দিকে বৃষ্টি থামল। ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি থামলেও ছাদ টুপিয়ে জল পড়া সমানভাবেই চলছে। আকাশে বৃষ্টি নেই, ঘরের ভিতর আমরা ভিজছি। বেলা ১০টা পর্যন্ত সমানই অবস্থা। ভাবছি এ বাড়িতে বর্ষা কাটানো যাবে না। কিন্তু নূতন লোহাই পোক্তার ছাদে বৃষ্টি থেকে গেলেও ঝারার মত জল ঝরবে, এমন বিদ্যা তো কোন ঠিকাদারের অধিগত থাকবার কথা নয়; এ যে অনেক উচ্চস্তরের বিদ্যা! এমন সময় সহসা পাড়া সচকিত হয়ে উঠল। মোটরগাড়ি-যোগে বাস্তু-বিভাগের তম-তর কর্মচারীগণ এবং সঙ্গে ওভারসিয়ার ঠিকাদার হাজির হলেন। সকলেই সদালাপী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, যুবক। একে একে বাসাগুলি পরিদর্শন করছেন; আমাদের বাসাতেও এলেন। ধীরভাবে আমাদের দুর্দশার কথা শুনে আমায় বুঝিয়ে বললেন, 'ঘরগুলি বেশ ঠাণ্ডা থাকবে ব'লে লোহাই কংক্রীটের ছাদের ওপর সাধারণ কংক্রীটের স্তর না দিয়ে বেশ পুরু ক'রে এক স্তর কাদা চাপিয়ে তার ওপর টালি বিছানো হয়েছে;

সেইজন্যেই এমন জল পড়ছে। যা হোক সত্বর এর সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঘরগুলি যে বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে—সে কথা আমায় স্বীকার করতে হ'ল।

পরদিন ঠিকাদারের কর্মচারী মিস্ত্রি-মজুর সঙ্গে ক'রে এসে ছাদের ওপর দেশি গোবরের সঙ্গে বিলিতী মাটি মিশিয়ে যথাশীঘ্র প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে মই বেয়ে ছাদের ওপর উঠলাম। সেখানে যে ছাদ দেখলাম—ছাদের তেমন অভিনব ডিজাইন পূর্বে দেখি নি। ঠিকাদারের একমাত্র দোষ তিনি প্ল্যানমাফিক নিখুঁত কাজ করেছেন। শুনলাম এ রকম ছাদ দিল্লীতে হয়ে থাকে এবং মানভূমে তারই পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম বর্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই নাকি সিদ্ধান্ত হয়েছে, গোবর-বিলিতীমাটির প্রলেপে এ বর্ষাটা কোন রকমে ঠেকিয়ে পুনরায় একে বাংলামতে ঢেলে সাজতে হবে।

আমি প্রাদেশিকতার চিরবিরোধী। বাংলার ছাদ বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হওয়া উচিত এমন কথা কোনদিন মনে উদয়ও হয় নি। এখানকার উপরিতন ইঞ্জিনিয়ারের একজন পাঞ্জাবী, অপরজন মাদ্রাজী; ঠিকাদার খুব বড় পাঞ্জাবী ফার্ম; এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণ পাঞ্জাবী; ওভারসিয়ার সম্ভবত উত্তর-প্রদেশবাসী; মিস্ত্রি-মজুর বাঙালী বিহারী উড়িয়া ইত্যাদি। ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেক্যুলার এবং সর্ববিধ প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত। কোনখানে কারও কিছুমাত্র অপরাধ নেই; কেবল দিল্লীকা ছাদ বাংলার বর্ষণ সহ্য করতে পারবে না—সে খেয়াল ছিল না। এই সামান্য ভুলে বাস্তুবিভাগের বদনাম রটল, মোটা অপব্যয় ঘটল, এবং সর্বপ্রাদেশিক বাসিন্দাদের বহু কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে ও হবে। দিল্লীর প্ল্যান মানভূমে চালু করতে গিয়েই এই বিপত্তি। এক ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ডাকবাংলার ছাদ দিয়ে জল পড়ে কেন? সে জবাব দিয়েছিল জল না প'ড়ে কি দুধ পড়বে? অর্থাৎ ছাদ থাকলেই মাঝে মাঝে জল পড়বে এই হচ্ছে বিধিবিধান। তবু ভুলতে পারছি নে বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ও বাঙালী ঠিকাদার দিয়ে বাংলার ছাদ তৈরী করালে জল পড়তে বেশ কিছু বিলম্বই হ'ত। এই প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ চিন্তায় মনটা বেশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। আবার ভাবছি দিল্লীর ছাদের তলায় বাকি বর্ষাটা বোধ হয় ভিজেই কাটবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বারাব্বাস

অনেকেই জানেন যে ১৯৫১ সনে সাহিত্যে 'বারাব্বাস' নামক একখানি উপন্যাস নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। বইখানি পার লাগেরভিস্ট (Par Lagerkvist) নামক একজন সুইডিশ লেখকের রচনা। এই গ্রন্থকার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ সুইডেনের একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'বারাব্বাস' ১৯৫০ সনে সুইডেনে প্রকাশিত হয় এবং তাহার পরের বৎসরেই নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত হয়। বইখানি ইতিমধ্যে আটটি য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বইখানির গল্পাংশ সংক্ষেপে এই :—

যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন তাহার বদলে আর একজন ঘৃণ্য আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘৃণ্য আসামীর নামই বারাব্বাস। এই ব্যক্তি পার্বত্য পথে লুঠতরাজ, ডাকাতি, মনুষ্যহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু রোমক সরকার যখন যীশুখ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার পরিবর্তে আর একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড রদ করিয়া দিলেন। এই ব্যক্তির পক্ষে ইহা এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। নিজে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া না মরিয়া তাহার পরিবর্তে আর একজন মরিতেছে, এই দৃশ্য সে ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া দেখিল। ক্রুশ ঘাড়ে করিয়া বহিয়া বধ্যভূমিতে আনিবার পথে যীশু মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মা মেরী (Virgin Mary) এবং আরও দুই-তিনজন স্ত্রীলোক বধ্যভূমিতে (Golgotha) আসিলেন, মেরীর তখনকার মুখের চেহারা—সমস্তই বারাব্বাস দেখিতে পাইতেছিল। সে আরও দেখিল, রোমক সরকারের অফিসারেরা যীশুকে ক্রুশে টাঙাইয়া দিয়া নিজের পাশা খেলিতে বসিল, কিছুক্ষণ পরে যীশুর ঘাড় ভাঙিয়া মাথাটা বুকের উপর নুইয়া পড়িল। তাঁহার যে অপরিসীম যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, রোগা হাত দুইখানি দুই পাশে নিরাবলম্বভাবে ঝুলিতেছে, শুভ্র বুকে একটিও চুলের রেখা নাই, মাতা মেরীর মুখে একটি ভর্ৎসনার দৃষ্টি বিদ্যমান, সেই ছবি

যেন বলিতেছে—তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতেছ না কেন? তারপর গ্রীষ্মের সেই নিরতিশয় রৌদ্রতাপের মধ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর, পিপাসার্ত যীশু যেন জল চাহিলেন বলিয়া মনে হইল। পাশাখেলা ছাড়িয়া একজন কর্মচারী ছুটিয়া আসিল, একটা ভিজা স্পঞ্জ লাঠির মাথায় লাগাইয়া যীশুর মুখে পৌঁছাইয়া দিল, তৃষ্ণাক্রান্ত যীশু ন্যাকড়ার জল পান করিতে গিয়া সুরার তীব্র গন্ধে তাহা ত্যাগ করিলেন, লোকটা একবার হো-হো করিয়া হাসিয়া আবার নিজের খেলার দলে আসিয়া যোগ দিল। ইহার পর আর দেরি লাগিল না। হঠাৎ দ্বিপ্রহরে পর্বতস্থলী গাঢ় অন্ধকার হইয়া গেল, সূর্যের আলো নির্বাপিত হইল, সেই মুহূর্তে যীশু প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর আবার আলো দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পাখিরা কূজন করিতে লাগিল। কর্মচারীগুলি তখন খেলা সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া আসিল, যীশুর মৃতদেহটিকে নামাইয়া লইল। কিছুদূরে গিয়া একটা কবরের মত খুঁড়িল এবং যীশুর মৃতদেহটা তাহার মধ্যে নামাইয়া একটা বড় পাথর দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

এ সমস্তই বারাব্বাস লুকাইয়া বসিয়া দেখিল। এই ব্যক্তি আসিয়া তাহার বদলে এই শাস্তি গ্রহণ না করিলে এ সমস্ত যে তাহাকেই ভোগ করিতে হইত, নিজেকে কি কি যন্ত্রণার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইত, তাহা সে নিজের চক্ষে সমস্তই দেখিতে পাইল। দেখিবার লোভ তাহার পক্ষে দুর্নিবার, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করিবার সাহসও নাই, মনে ভয় আছে পাছে কেহ তাহাকেই আবার তাহার ন্যায্য শাস্তির পথে ঠেলিয়া না দেয়।

বারাব্বাস সমাজের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক, তাহার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমন জঘন্য। যাহার গর্ভে বারাব্বাসের জন্ম হয়, সেই স্ত্রীলোকটি পথিমধ্যে দস্যুদল কর্তৃক অপহৃতা হয়, দস্যুরা পরে তার সতীত্ব নাশ করে, কিন্তু কাহার ঔরসে বারাব্বাসের জন্ম তাহা সে নিজেও জানে না, তাহার মা-ও জানিত না, তাহার বাবাও জানিত না। গর্ভাবস্থায় গণিকালয় হইতে স্ত্রীলোকটিকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, পথের উপরে বারাব্বাসকে প্রসব করিয়াই স্ত্রীলোকটি মারা যায়। দস্যুদলের এলিয়াহু (Eliahu) নামক

এক বৃদ্ধ ডাকাতের সঙ্গে বারাব্বাসের একদিন মারামারি হয়, বৃদ্ধ একটি অস্ত্রের খোঁচায় বারাব্বাসের চক্ষুর নীচে চিরকালের জন্য একটি দীর্ঘ ক্ষত অঙ্কিত করিয়া দেয়, বারাব্বাস ধাক্কা মারিয়া বৃদ্ধকে পর্বত-গুহা হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়, তাহাতেই বৃদ্ধের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এই এলিয়াহু ছিল বারাব্বাসের জন্মদাতা। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে বারাব্বাস জন্ম হইতেই অভিশাপগ্রস্ত—সমাজের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ এবং হিংসা ব্যতীত অপর কোন মনোভাব ছিল না।

কিন্তু এই অভিশাপগ্রস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষটি তবুও মানুষ—মানুষের পদবী হইতে সে একেবারে উৎখাত হয় নাই। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার ঘটনা-দর্শন এই লোকটির উপর কি প্রভাব বিস্তার করিল এবং কি তাহার পরিণতি হইল, ইহাই এই অপূর্ব উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু।

বারাব্বাস বধ্যভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথারীতি তাহার নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে মিশিল, মদ খাইল, স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শুইয়া রহিল, কিন্তু একটা অপরিচিত অন্যমনস্কতা সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া রহিল। তাহার পূর্বের দলের লোকজনেরাও তাহাকে বুঝিতে পারে না—সেও সমস্ত কাজই করিয়া যায় অভ্যাসবশে, কিন্তু তাহার অন্যমনস্কতা কিছুতেই কাটে না। ইহার পরে তৃতীয় দিন প্রাতে কর্তিত-ওষ্ঠ (hare-lip) একটি মেয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মেয়েটিকে সে আগেই চিনিত, মেয়েটি বধ্যভূমির নিকট মাটিতে ধূলার উপর বসিয়া ছিল। বারাব্বাস শুনিয়াছিল যে, মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে যীশু কবরের মৃত্যুর রাজ্য হইতে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবেন, সত্যই তিনি উঠেন কি না—ইহা দেখিবার জন্য ভোর ভোর সে বধ্যভূমিতে আসিয়াছিল। কবরের নিকট গিয়া দেখিল, কবরের মুখ হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হইয়াছে এবং তাহার ভিতর মৃতদেহ নাই। কিন্তু যীশুকে কবর হইতে উঠিতে সে দেখিতে পায় নাই। কর্তিত-ওষ্ঠ মেয়েটি বলিল, সে দেখিয়াছে। স্বর্গ হইতে আগুনের পোশাক পরা একজন দেবদূত একটি

বর্শা হাতে করিয়া নামিয়া আসিল, বর্শার মুখ দিয়া কবরের পাথরটিকে সরাইয়া দিল এবং মৃতদেহ লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

বারাব্বাস অবাক হইয়া গেল। সেও যীশুর মৃতদেহকে স্বর্গে লইয়া যাওয়া দেখিতে আসিয়াছিল, কর্তিত-ওষ্ঠ মেয়েটিও একই জায়গায় আসিয়াছিল। সে দেখিতে পাইল না, মেয়েটি দেখিতে পাইল ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, বারাব্বাস দেখিতে পাইবে না—এই বিশ্বাস লইয়াই আসিয়াছিল, সে শুধু যীশু উঠেন কি না ইহা যাচাই করিয়া দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটি বিশ্বাস করিয়াছিল, ভগবানের কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না—তিনি কবর হইতে উঠিবেনই, তাহাকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হইবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস-পূত তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যীশুর মৃতদেহের স্বর্গপ্রয়াণ অদৃশ্য রহিল না। বারাব্বাস কর্তিতোষ্ঠ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যে বল তিনি ভগবানের পুত্র, তাঁহার কি উপদেশ তোমরা পালন কর? মেয়েটি অনেকক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, পরস্পরকে ভালবাস।

এই পরস্পরকে ভালবাসার নির্দেশ বারাব্বাসের নিকট এক অভিনব সংবাদ। কাহাকেও ভালবাসিতে হয়—এ কথা সে জানে না, কোনদিন শিখে নাই। পরস্পরকে মারধোর করিতে হয়, লুঠ-তরাজ করিতে হয়, খুন করিতে হয়—ইহাই সে জানে, জীবনে তাহাই করিয়াছ। এমন সময় শুনিল—পরস্পরকে ভালবাসিতে হয় এই নির্দেশ তিনি দিয়াছেন, যিনি বারাব্বাসের বদলে শূলে চড়িয়াছেন। এ নির্দেশের সত্যতাও তো বারাব্বাস অস্বীকার করিতে পারে না।

ইহার পর বারাব্বাস একদিন শুনিল, যে ক্রুশবিদ্ধ ওই লোকটি কবর হইতে উঠিয়া শুধু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন তাহাই নয়, তিনি নিজেও মৃত্যুর রাজ্য হইতে একজনকে বাঁচাইয়া জীবিতলোকে রাখিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া যথারীতি বারাব্বাসের বিশ্বাস হইল না। তখন যীশুর ভক্তদের একজন বারাব্বাসকে ল্যাজেরাসের নিকট লইয়া গেল। ল্যাজেরাস নিজের মুখে বলিল, সে মরিয়া গিয়াছিল, কবরে পড়িয়াছিল, প্রভু তাহাকে,

বাঁচাইয়া দিয়াছেন এবং পুনরায় মনুষ্যলোকে লইয়া আসিয়াছেন, ইহার জন্য সে প্রভুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। প্রতিদিন বহু লোক এই কথা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসে এবং সেও এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রভুর ঋণ শোধ করে।

বারাব্বাসের চরিত্রে পরিবর্তন শুরু হইয়াছিল—কিন্তু একদিনে তো কিছু হইবার নয়। সবই সময়সাপেক্ষ। কর্তিতোষ্ঠ মেয়েটির নামে এই সময় একজন অন্ধ গিয়া অত্যাচারপরায়ণ রোমক কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করিল। বলিল, এই মেয়েটি প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভগবানের পুত্র কবর হইতে উঠিয়া গিয়াছেন সে দেখিয়াছে, ভগবানের পুত্র পুনরায় আসিবেন, নূতন রাজ্য আরম্ভ হইবে, সকলের আধি-ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে ইত্যাদি। অন্ধ বলিল, এই মেয়েটিকে কি ধর্মদ্রোহিতার জন্য পাথর মারিয়া মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না? কর্তৃপক্ষ অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, হাঁ, পাথর মারিয়া তাহাকে যমালয়ে পাঠাও; কিন্তু প্রথম পাথর তোমাকেই মারিতে হইবে। অন্ধ তো রাজী হয় না, বলে, আমি মারিব কেন, আমি তো তাহাকে কখনও দেখিই নাই। যাই হোক, কর্তিতোষ্ঠ মেয়েটি কোন কথা অস্বীকার করিল না। তাহাকে একটি গর্তের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইল এবং সমবেত জনতাকে পাথর ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিতে বলা হইল। ইতস্তত করিয়া এক ব্যক্তি মেয়েটির মাথা লক্ষ্য করিয়া একখানি পাথর ছুঁড়িয়া মারিল- লক্ষ্য অব্যর্থ, কাজ হইল। বারাব্বাস তাহার পাশেই লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ত্বরিৎগতিতে একখানি ছুরিকা লোকটির পাঁজরায় আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। বারাব্বাসের শিক্ষিত হস্তের লক্ষ্য অব্যর্থ, সুতরাং তাহাতেও কাজ হইল।

মেয়েটি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বলিয়া উঠিল, তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। ইহার পর সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং কাহার পোশাকের কিনারা যেন সে চুম্বন করিতেছে মনে হইল, তারপর ভবলীলা সম্বরণ করিল। রাত্রির অন্ধকার হইলে বারাব্বাস সাবধানে কর্তিতোষ্ঠ মেয়েটিকে পাথরের স্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল

এবং তাহার মৃতদেহ দুই বলিষ্ঠ হস্তের উপর শোয়াইয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে সে চলিতে লাগিল, পাহাড় এবং মরুভূমি পার হইয়া যেখানে মেয়েটির জন্মস্থান, সেইখানে তাহার মৃতদেহ লইয়া গেল। মেয়েটি একদা একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল, কবরস্থ সেই মৃত সন্তানের পাশে তাহার মাকে সে শোয়াইয়া দিল। মাকে এবং সন্তানকে পাশাপাশি শোয়াইয়া সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। মনে মনে বলিল, সে অন্তত যতটুকু পারে তাহা করিয়াছে। প্রথম পাথর ছুঁড়িয়া যে ব্যক্তি মেয়েটিকে মারিয়াছিল, তাহাকে সে খুন করিয়াছে। কিন্তু মেয়েটির প্রভু, যিনি সকলেরই রক্ষক বলিয়া খ্যাত, তিনি—তিনি তো কই মেয়েটিকে রক্ষা করিতে আসিলেন না? পরস্পরকে ভালবাস—এই না তাঁহার নির্দেশ?

ইহার পর অনেক দিন বারাব্বাসের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে সে যে পার্বত্যপ্রদেশে দস্যুগিরি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সব অপরাধে ধৃত হইয়া তাহাকে তামার খনিতে ক্রীতদাসরূপে কাজ করিতে পাঠানো হইল। তামার খনিতে ক্রীতদাসের কাজ সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। ভূগহ্বরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। উপরে উঠিতে পারে না, দিনরাত্রি সেই অন্ধকার গহ্বরে পশুর জীবন যাপন করিতে হয়। এইখানে সাহাক নামক অপর একটি ক্রীতদাসের সহিত তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। একসঙ্গে কাজ করিত, একসঙ্গে খাইত, একসঙ্গে শুইত। কথায় কথায় সাহাক একদিন জানিতে পারিল যে, বারাব্বাস যীশুকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহার পর খনির জীবন সাহাকের পক্ষে আর ততটা দুঃখের রহিল না। যে স্বয়ং ভগবানের পুত্রকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহার সঙ্গে একসঙ্গে খাইতেছে, শুইতেছে, কাজ করিতেছে—ইহা সাহাকের পক্ষে এক মস্ত বড় সান্ত্বনা। একদিন সাহাক যখন হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছিল, তখন খনির ক্রীতদাসদের ওভারসিয়ার তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। পূর্বেকার

ওভারসিয়ার দেখিতে পাইলে বেত মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিত। কিন্তু ইতিমধ্যে ওভারসিয়ার পরিবর্তন হইয়াছিল, একজন নতুন লোক আসিয়াছিল। লোকটি ভাল, সে সাহাককে—সে কি করিতেছিল, তাহার ভগবানের নাম কি, ভগবান কি করিয়াছেন প্রভৃতি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শস্যের মাঠে যে কুলিরা কাজ করিতেছে তাহাদের ওভারসিয়ারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিকট প্রস্তাব করিল যে, তামার খনির একজন কুলিকে শস্যের মাঠের কাজে লইতে হইবে। দ্বিতীয় ওভারসিয়র প্রথমে রাজী হয় নাই, পরে লোকটির আগ্রহাতিশয্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকৃত হইল। পরদিন ওভারসিয়র যখন সাহাককে তামার খনির অন্ধকার ছাড়িয়া পুনরায় ধরণীর আলোর এবং জীবনের রাজ্যে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল তখন সাহাক বলিল, সে একলা যাইতে প্রস্তুত নয়। বারাব্বাসের সঙ্গে সে একত্রে শৃঙ্খলিত, একসঙ্গে কাজ করে, শোয়, খায়, যদি যাইতে হয় তবে দুইজনে যাইবে, নয় তো নয়। ওভারসিয়র চমৎকৃত হইল—কেন না কোন ক্রীতদাস এমন কথা বলিতে পারে, তাহার ধারণা ছিল না। যাই হোক, তাহারই চেষ্টায় সাহাক এবং বারাব্বাস দুইজনেই খনির অন্ধকারের জীবন হইতে আলোকের লোভনীয় জীবনে উত্তোলিত হইল। বারাব্বাস এই উপকারের জন্য সাহাককে ধন্যবাদ দিল; কিন্তু সাহাক বুঝিল, স্বয়ং ভগবানের পুত্র যীশু তাহাকে উদ্ধার করিলেন।

শস্যক্ষেত্রের কুলিদের মধ্যে একজন একচক্ষু ক্রীতদাস ছিল। সাহাক সরল মনে একদিন তাহার কাছে যীশুর মহত্ত্বের কথা, দয়ার কথা সমস্ত বিবৃত করিল, নিজের গলায় যে ক্রীতদাসের চতুষ্কোণ-তক্তি (**disk**) বাঁধা আছে তাহা দেখাইল—তাহাতে এক দিকে লেখা আছে সীজারের **(Caesar)** নাম, অপর দিকে খোদা আছে যীশুর নাম **(Christos Jesus)**। একচক্ষু লোকটি সব শুনিল এবং দেখিল, কিন্তু তলে তলে সাহাক ও বারাব্বাসের নামে রিপোর্ট করিয়া দিল। রোমের গভর্নর সাহেব একদিন দুইজনকেই তলব করিলেন। সাহাককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার প্রভু সীজার, না, যীশু? সাহাক বলিল, যীশু। গভর্নর বলিলেন, সীজারকে ছাড়িলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। সাহাক চুপ করিয়া রহিল। ফলে সাহাককে যীশুর মতই ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারা হইল। গভর্নরের প্রশ্নের উত্তরে বারাব্বাস বলিয়াছিল যে, যদিও তাহার গলার তক্তিতে এক দিকে যীশুর নাম লেখা আছে, কিন্তু সে তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, তাহার কোন ঈশ্বর নাই। গভর্নর বারাব্বাসের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া খুশি হইলেন, তাহাকে নিজের ক্রীতদাসের দলের মধ্যে ভর্তি করিয়া লইলেন এবং তরবারির খোঁচা দিয়া ধাতব তক্তির লেখা যীশুর নামটি কাটিয়া দিলেন। বারাব্বাস লুকাইয়া থাকিয়া এবারেও সাহাকের ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু দেখিল। সে এই প্রথম বধ্যভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং মনে হইল যেন সে হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে।

গভর্নরের বাড়ির ক্রীতদাসদের মধ্যে বারাব্বাসের সময় ভালই কাটিতেছিল। কিন্তু তাহার মনে শান্তি ছিল না। তাহার বুকে যীশুর (Christos Jesus) নাম কর্তিত অবস্থায় যে তক্তি ঝুলিতেছিল, রাত্রে তাহার মনে হইত যেন আগুনের শিখা হইয়া সেটি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। রাত্রের অন্ধকারে সে অনুভব করিত যেন একজন লোক তার পাশে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছে। সে শুনিতে পাইত, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে— তুমি কাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছ? তাহার উত্তরে প্রার্থনারত লোকটি বলিতেছে, তোমারই জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

এই সময় খ্রীষ্টানদের উপর সীজার অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিলেন। তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইত, তাহারা যাদুবিদ্যায় (witchcraft) পারদর্শী বলিয়া সন্দেহ করা হইত, তাহাদের ভগবান বহুদিন পূর্বেই ক্রীতদাসের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া কটূক্তি করা হইত। প্রকাশ্যত খ্রীষ্টানদের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং একসঙ্গে প্রার্থনা করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

একদিন বারাব্বাস অন্য দুইজন নবক্রীত ক্রীতদাসের গোপন কথাবার্তা হইতে জানিতে পারিল যে, সেই দিন রাত্রে মার্কাস লুসিয়সের

(**Marcus Lucius**) আঙুরক্ষেতের নিকট ইহুদীদের ভূগর্ভস্থ সমাধিগৃহে (**catacomb**) খ্রীষ্টানদের এক সভা হইবে। সভা করিবার অদ্ভুত জায়গা, সন্দেহ নাই। বারাব্বাস স্থির করিল, খ্রীষ্টানদের এই সভায় সে যোগ দিবে। কিন্তু সে পথ চেনে না। অন্ধকার হইবার পূর্বেই সে ক্রীতদাসদের থাকিবার আড্ডা হইতে গা-ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আঙুরক্ষেতের নাম করাতে একজন মেষপালক তাহাকে জায়গাটা দেখাইয়া দিল। সমাধি-গহ্বরে নামিয়া সে আর রাস্তা ঠাহর করিতে পারে না। একটা আলোর মত দেখিয়া সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আলোটা হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। আবার একটা আলো—আবার ছুটিল—আবার আলো অদৃশ্য হইয়া গেল। বারাব্বাস হাঁপাইতে লাগিল। চারিদিকে কেবল মৃতের রাজ্য - সে যে সেই রাজ্য হইতে কোনদিন বাহির হইয়া আসিতে পারিবে, এমন কথা তাহার মনে হইল না।

অবশেষে অর্ধমৃত অবস্থায় সে যখন তাহার ক্লান্ত দেহ এবং আচ্ছন্ন মন লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তখন রাস্তায় সে নিজেকে বড় একাকী বলিয়া বোধ করিল। তবে খ্রীষ্টানেরা গেল কোথায়? তাহারা কি সভা করিতে সমাধি-গহ্বরে আসে নাই? রাস্তার মোড় ঘুরিতেই তাহার কানে গেল---আগুন, আগুন! বারাব্বাস হতভম্ব হইয়া গেল। সে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। রাস্তার অপর পার হইতে কে বলিল, ইহারা খ্রীষ্টান, ইহারা খ্রীষ্টান। বারাব্বাসের হঠাৎ মনে হইল, খ্রীষ্টানদের ভগবান আসিয়াছেন, পুরাতন পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি-মত পৃথিবীকে নতুন করিয়া তিনি গড়িবেন। বারাব্বাস বুঝিল, খ্রীষ্টানেরা তাই আগুন লাগাইয়া পুরাতন পৃথিবীর ধ্বংসকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। তাহার মনে হইল, এই কার্যে সেও সাহায্য করিবে। তখন একটা মশাল হাতে লইয়া বারাব্বাস গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্যাপারটা আসলে ছিল উল্টা। খ্রীষ্টানদের নামে অগ্নিসংযোগের অপবাদ দিয়া তাহাদের নির্যাতন করাই ছিল সীজারের উদ্দেশ্য। সে

উদ্দেশ্য সফল হইল। সমস্ত খ্রীষ্টানকে একসঙ্গে করিয়া কারাগারে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে বারাব্বাসও ছিল। খ্রীষ্টানেরা জানিত তাহারা নির্দোষ, তাহারা সে রাত্রে ঘরের বাহিরেও আসে নাই, সমাধি-গহ্বরের সভার কথা কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছে সংবাদ পাইয়া তাহারা পূর্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছিল। তা ছাড়া, ঘরে আগুন দেওয়া যীশুর আপ্তবাক্যের মধ্যে নাই, এমন কাজ তাহারা কদাচ করিতে পারে না।

বারাব্বাস কিন্তু স্বীকার করিল যে, সে আগুন দিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা বলিল, তাহা হইলে সে তাহাদের কেহ নয়—খ্রীষ্টান নয়। বারাব্বাসের গলার তক্তি সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিল—যদিও কঠিন হস্তে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবুও সেখানে খোদিত আছে যীশুখ্রীষ্ট (Christos Jesus)। খ্রীষ্টানদের ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল—বারাব্বাসও সেই সঙ্গে দণ্ডিত হইল। দুই জন করিয়া জোড়ে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল—বারাব্বাস আসিল একাকী এবং সর্বশেষে। তাহার মৃত্যুও হইল সকলের শেষে—তখন মরিতে আর কেহ বাকি নাই। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বারাব্বাস বলিল, তোমার নিকট আমি আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম।

এইখানেই এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ (Andre Gide) এই বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রসঙ্গত একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বাসের রাজ্য এবং বাস্তবের রাজ্য এই দুই রাজ্যের অন্ধকারময় গোলকধাঁধার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারাই হইল লাগেরভিস্টের এই বইখানির অসামান্য সাফল্যের কারণ।* জিদের উক্তি হইতে দুইটি জিনিস পাওয়া গেল—

* "It is the measure of Lagerkvist's success that he has managed so admirably to maintain his balance on a tight rope which stretches across the dark abyss lying between the world of Reality and the world of Faith." (P. ix)

একটি হইল বিশ্বাসের রাজ্য, অপরটি হইল তথাকথিত বাস্তবতার রাজ্য। তথাকথিত বলিতেছি এই কারণে যে, এই বাস্তবতা থাকিয়াও নাই, এই নামরূপের বাস্তবতা নশ্বর—ইহা একদিন না একদিন বিনষ্ট হইবেই। আমরা অবশ্য এই নামরূপের বাস্তবতার রাজ্যেই বাস করি। বিশ্বাসের রাজ্য হইল ভগবানের রাজ্য। এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথম ছাড়পত্র হইল বিশ্বাস। ইহা কোন গায়ের জোরের কথা নয়—ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন বলিয়াই বিশ্বাস অবলম্বনে তাঁহার পথে চলিতে হয়। প্রথমে যাহা মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, পরে তাহাই একদিন জানায় পরিণত হয় বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। আমাদের সকলেরই মত বারাব্বাসও ছিল বাস্তবতার রাজ্যের অধিবাসী—স্বয়ং যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হইতে দেখিয়া, কর্তিতোষ্ঠ মেয়েটির মর্মান্তিক মৃত্যু দেখিয়া, সাহাকের হৃদয়বিদারক মৃত্যু দেখিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই—'পরস্পরকে ভালবাস' এই নির্দেশের অর্থ কি! ল্যাজারাসের মুখের স্বীকারোক্তি শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, ভগবান ইচ্ছা করিলে সত্যই মৃতকে বাঁচাইয়া দিতে পারেন। অথচ ইহার মধ্যে সত্য হইল যে, যাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহারা পরস্পরকে ভালবাসে, ভগবানকে ভালবাসে বলিয়াই হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারিয়াছে—নয়তো মৃত্যুকে এড়াইয়া চলা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এই বাস্তবতার রাজ্য হইতে বিশ্বাসের রাজ্যে ঊর্ধ্বায়নই হইল বারাব্বাসের জীবনের কাহিনী। সে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসের রাজ্যে উন্নীত হইতে পারিয়াছিল কি না এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিবে। মরিবার পূর্ব-মুহূর্তে যাহার হস্তে সে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করিল, সে ভগবান যীশু কিংবা বাহিরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার—সে সম্বন্ধেও চূড়ান্ত কথা কোন দিন বলা যাইবে না। কিন্তু যে মৃত্যুকে গোড়া হইতেই সে এড়াইয়া চলিতেছিল, সেই মৃত্যুকেই সে নিজেই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রহিল না। বারাব্বাস তখন যীশুকে বুঝিতেও পারে না, আবার অস্বীকার করিতেও পারে না, এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল।

বইখানির মধ্যে দেখা যাইবে ভগবান যীশুর যাহারা আশ্রিত হইয়াছিল তাহারা সকলেই দুঃস্থ, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত— তাহাদের পার্থিব বিত্ত, সম্পদ, যশ, সৌন্দর্য কিছুই নাই। ঠোঁটকাটা মেয়েটি, ন্যুব্জপৃষ্ঠ সাহাক, কুষ্ঠকার ল্যাজেরাস সকলেই সাংসারিক সুখে বঞ্চিত; কিন্তু তাহাদের একটা জিনিস ছিল—বিশ্বাস করিবার শক্তি। ভগবান যে ধনী, বিলাসী, সুখী লোকদের আশ্রয় দেন না— ইহা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়। ইহার কারণ সুখী লোকেরা ভগবানকে চায় না। তাহাদের মন পূর্ণ করিবার জন্য এমন অনেক জিনিস থাকে যেখানে ভগবানের আর জায়গা হয় না। উৎপীড়িত লোকেরা সংসারে আর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ভগবানের আশ্রয় পাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া উঠে।

ভগবান যে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হইয়াও যীশুকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন না, সাহাক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর কিংবা ঠোঁটকাটা মেয়েটি পাথরের আঘাতে মরিবে এই দণ্ডাজ্ঞা পাইবার পর কোন দৈবঘটনা (miracle) ঘটিয়া যে এই সব মৃত্যু নিবারিত হইল না, ইহার কারণ গ্রন্থকার নিজেই বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন, ভগবান এই ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা বড় অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করিলেন অর্থাৎ ক্ষমতা থাকিতেও ব্যবহার করিব না— এই সিদ্ধান্ত করিলেন। অপরেরা যে সিদ্ধান্ত করিল তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু তবু নিজের যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিপালিত করিয়া লইলেন অর্থাৎ বারাব্বাসের পরিবর্তে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। সাহাক এবং মেয়েটিও মরিল।*

দুঃখ এবং মৃত্যু দেখিয়াই আমরা ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি, মনে করি, ভগবান ইহা হইতে দিলেন কেন? অবশ্য হইতে দেন না এমন উদাহরণও আমাদের শাস্ত্রে আছে। ভক্ত প্রহ্লাদকে ভগবান কত বিপদের মধ্যে

* "He had used his power in the most extraordinary way, used it by not using it, as it were; allowed others to decide exactly as they liked; refrained from interfering and yet had got his own way all the same, to be crucified instead of Barabbas." (P. 41)

রক্ষা করিলেন, ধ্রুবকে বন্য জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে বাঁচাইলেন--- এ সব দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ভগবানের সম্বন্ধে কোন নিয়মই মানুষের পক্ষে করা চলিবে না। কোন্ ক্ষেত্রে তিনি কি করিবেন, সেটা তাঁহারই এলাকা---আমরা তাহার কিছুই বুঝি না। তবে দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে, শোকে যে তাঁহার কোন বিরাগ নাই তাহা তো চক্ষের সামনেই দেখিতে পাই। দুঃখে, দারিদ্র্যে, শোকে তো তিনি নিজেও ভোগেন—তখন তো আমাদের ছাড়িয়া যান না! হয়তো ওই ইন্ধনে তিনি মানুষকে শুদ্ধ করিয়া লন।

বইখানি পড়িয়া অনেক কথাই মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বইখানি আমাদের দেশেই রচিত হওয়া উচিত ছিল। কেন না আমাদের অধ্যাত্ম্য সাধনার দেশ। যে ধ্যানদৃষ্টি সংযোগে বইখানি লেখা হইয়াছে তাহা ভারতের পক্ষেই প্রশস্ত। কিন্তু হয়তো আর একটা সত্যের দিকে চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্যই বইখানির আবির্ভাব। তাহা এই যে, সত্য কেবলমাত্র ভারতের নিজস্ব সম্পদ নয়, তাহা দেশকালপাত্রের দ্বারা খণ্ডিতও নয়—তাহা সর্বদা স্বয়ংপূর্ণ, তাহার প্রকাশ যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে ঘটিতে পারে। আরও মনে হইয়াছিল, ভগবান আগের চেয়ে এখন কত সুলভ হইয়াছেন! আগে কত ঐকান্তিকতা, কত নিষ্ঠা ভক্তি, কত কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া ভগবানের নিকট পৌঁছিতে হইত! আর এখন তো ভগবান নিজেই আসিয়া সাধিয়া ঘরে ঘরে গীতা উপনিষৎ শুনাইয়া যান।

বইখানির টেকনিক বা রচনাশৈলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। শুধু লেখার ভঙ্গি লেখকের নিজস্ব বিবৃতি—সংলাপ বা কথোপকথন অত্যন্ত কম। তবু কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অপরিসীম গাম্ভীর্যের জন্য বইখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে উন্নীত হইয়াছে। যে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং অধ্যাত্ম্য জীবন থাকিলে এই ধরনের উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়, তাহা যে লেখকের পরিপূর্ণভাবে আছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে

ভারতের ঐক্যসাধনের মহান আদর্শে প্রণোদিত হইয়া বাংলার সুযোগ্য পুত্র বীর শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর-কারাগারে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

চিরাচরিত প্রথায় সুনির্বাচিত বাক্যবিন্যাস করিয়া শোকবাণী উচ্চারণ করিবার প্রকৃতি আমার হইতেছে না। এতবড় একটা মৃত্যু যে নিরতিশয় শোকাবহ, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এখন আমাদের শোক করিলে চলিবে না। শোকাশ্রু মুছিয়া এখন আমাদের প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্যামাপ্রসাদের আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হয় নাই।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অক্ষরে এই মহাসত্য বারম্বার লিখিত হইয়াছে যে, অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে বাঙালী সন্তান কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। শ্যামাপ্রসাদ বাঙালীর সেই গর্বোজ্জ্বল ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া অক্ষয় আদর্শ-স্বর্গে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহটাই ভস্মীভূত হইয়াছে; কিন্তু যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভঞ্জনের মত তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের উপর বাহিয়া গেলেন, যে আদর্শের জন্য তিনি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন, তাহার মৃত্যু নাই, তাহা অবিনশ্বর, সত্যের দীপ্তিতে তাহা চিরপ্রদীপ্ত, চিরভাস্বর।

হে বঙ্গসন্তানগণ, সত্যই যদি শ্যামাপ্রসাদের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে বৃথা হুজুকে মাতিয়া কালক্ষয় করিও না, রসনা-আন্দোলন করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না, নির্ভীক দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা কর।

যদিও বঙ্গের আজ অতিশয় দুর্দিন, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গমাতা অসহায়া নহেন, তিনি বীরপ্রসবিনী। তোমরাই বীর, তোমরাই অসাধ্যসাধন করিতে পার। তোমাদের এই আপাত-ক্লীবত্ব সাময়িক মোহ-বিকার মাত্র। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। কোন দ্বিধা, কোন ভীরুতা, কোন মূঢ়তা যেন তোমাদের সত্যপথ হইতে বিচলিত না করে।

বহুকাল পূর্বে এই ভারতবর্ষেই ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবা যশস্বিনী বিদুলা তাঁহার পরাজিত পুত্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই তোমাদের স্মরণ করিতে বলি।

তিনি বলিয়াছিলেন, "কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর, স্বকর্ম দ্বারা বিখ্যাত হও। তিন্দুক কাষ্ঠের অলাতের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হও, জীবনাভিলাষী হইয়া তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হইও না। চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকালও প্রজ্জ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। হয় স্বীয় প্রভাব-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর।..."

বীরাঙ্গনার এই বীরবাণী তোমাদেরও উদ্বুদ্ধ করুক। তোমরাও সত্য কর্তব্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হও। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদের অসমাপ্ত অভিযান যদি তোমাদের মনীষা, বীরত্ব ও চরিত্রবলে সফল হয়, তাহা হইলেই সেই অকালমৃত্যু-হত তেজস্বী বীরের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হইবে, কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর দ্বারা নহে,—ইহা স্মরণ রাখিও।

"বনফুল"

সূর্য-প্রয়াণ

সূর্য কখন চ'লে গেল দূর অজানা অস্তাচলে
পৃথিবী এখন ঘুমে অচেতন
ম্লান সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়াতলে
রাতের আকাশে থরথর শুধু তারকার স্পন্দন।
নেই সে দীপ্ত সূর্যের দাহ
ঝলমল রোদ্দুর
ছায়ায় রুদ্ধ জীবন-প্রবাহ
প্রাণে ক্লান্তির সুর।
মৌন আকাশ, মৌন পৃথিবী
তারায় তারায় শঙ্কিত আলাপন
সূর্য কখন চ'লে গেল দূর অজানা অস্তাচলে।

নামলো সন্ধ্যা হাঁসের পাখায়
নীল দিগন্তে আঁধারে হারায়
নীড়-বিবাগীর অস্থির প্রাণে
ভেঙে ভেঙে যায় স্বপ্নের তট
ফিরে চলে দলে দলে সেইখানে
সূর্য যেখানে হারালো আকুল অবাক অস্তাচলে।
মনে মনে কত ছবি আসে যায়
অসীম আকাশে ছুটেছি, ভুলেছি
মাটির মমতা আমি কতবার
বারে বারে বৃথা কি বঞ্চনায়
সেই সব ছবি মুছে মুছে যায়
বেদনা জাগায় মর্মে আমার,
আমার গোপন মর্মমূলে।
অন্ধকারেতে বিদ্যুৎ-মন
মনের গভীরে যে ছবি এঁকেছে
সে ছবি বুঝিবা স্বপ্ন বৃথাই স্বপ্ন
শূন্য স্বপ্ন, না পেতে হারাই পথের বাঁকেতে
হারাই তাকে।

সূর্য-হারানো রাত্রির বুকে
তারার কান্না শুনি
ক্লান্ত এ যৌবন।
বল আজ আমি কোন্‌খানে পাই,
কোন্‌খানে খুঁজে পাই
পলাতক এই মন।
সূর্য-হারানো রাত্রিতে বল
কোথা খুঁজে পাই জীবনের আশ্বাস
আকাশে আকাশে দ্বিধাহত আহ্বান
থরথর কাঁপে রাত্রির নিশ্বাস।

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

মহাস্থবির জাতক

নয়

সুরয বললে, আমাদের প্রাসাদের সবটাই কিছু পাথর দিয়ে তৈরি ছিল না, তার মধ্যে কাঠের দরজা জানলা কড়ি বরগাও ছিল। বজ্‌রুগেরা সেই সব কড়ি বরগা দরজা জানলা এখনও পর্যন্ত সযত্নে রেখে দিয়েছেন। দুঃখের দিনে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সকাল বেলা কুড়ুল হাতে ক'রে চ'লে যাই ওই গহন রহস্যের মধ্যে। খুঁজে খুঁজে বড় দেখে একখানা কড়ি সারাদিন ধ'রে দুজনে মিলে চেলা ক'রে সেই সন্ধ্যেবেলা নিয়ে ফিরে আসি—পরদিন বাজারে সেই কাঠ বিক্রি ক'রে আবার যতদিন চলে—আবার যাই, আবার নিয়ে আসি—এমনি ক'রেই তো আমাদের দিন চলে। ছাগলের দুধ বিক্রি ক'রে বা তোমাদের মতন যাত্রী রেখে বছরের আর কটা দিনই বা চলে।

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, ওখানকার কাঠের সন্ধান আর কেউ জানে না?

জানে বইকি! কিন্তু সে সব জায়গা এমন ভয়ানক ও দুর্গম যে লোকে যেতে সাহস করে না। তা ছাড়া সে সব কাঠ তো আমাদের সম্পত্তি। বড় বড় সাপ জড়িয়ে আছে সে সব কাঠে। তারা সব দেখ, আমাদেরই পূর্বপুরুষদের লোকজন। পাপ-কাজ করেছিল ব'লে সাপ হয়ে আমাদেরই সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আমরা ম'রে গেলে তারা সব মুক্তি পাবে।

তারা তোমাদের কিছু বলে না?

কেন বলবে! তারা তো আমাদেরই লোক ছিল আর আমাদের জন্যেই ওখানে রয়েছে। আমরা গেলেই তারা স'রে যায়। তা ছাড়া সব সময়েই যে আমরা কড়ি বরগা দরজা জানলা নিয়ে আসি তা নয়। দেখতে পাচ্ছ ওখানে কত বড় বড় গাছ জন্মেছে, এই সব গাছ কেটেও মাঝে মাঝে বিক্রি করা চলে, রাজার বংশের লোক আমরা, পরের নোকরি তো আর করতে পারি না। পরমাত্মার কৃপায় এই ক'রেই দিন গুজরাণ হয়ে যাচ্ছে। শীতকালে ওখানে বাঘ এসে লুকিয়ে থাকে, তারা

মানুষ গরু প্রভৃতি মেরে ঐখানে টেনে নিয়ে যায়। তা ছাড়া কত রকমের শের ও শের-এ-বব্বর বাস করে ওই ভাঙা প্রাসাদে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু বজ্‌রুগদের দয়ায় তারা আমাদের কিছুই বলে না। এই সব দেওয়ালে এত বড় বড় যে গর্ত রয়েছে, বাঘ ইচ্ছা করলেই এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেওরা রক্ষা করে।

এবারে সত্যিই আমাদের নেশা একেবারে ছুটে গেল। গাঁজা সস্তার জিনিস, তার আর জান কতটুকু! তার পেছনে এমন ক'রে শের, শের-এ-বব্বর প্রভৃতি জানোয়ার ও দেও লাগলে কতক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে! রামসিং ও সুরযের বজ্‌রুগদের দেও তাদের রক্ষা করে ব'লে তারা যে আমাদের ওপরেও দয়া করবে এমন কোনও কথা নেই!

আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোরও বাড়তে আরম্ভ করল। সুরয আমাদের কাছ থেকে উঠে গিয়ে আঙ্গেঠিগুলো সব ভ'রে প্রত্যেক খাটের নীচে একটা ক'রে রেখে গেল।

রাত্রে আহারের কি হবে! এই দুর্যোগে ঘর থেকে বেরুনো অসম্ভব। সকালবেলা যা পেটে পড়েছিল গাঁজার ধোঁয়ায় কখন তা উবে গিয়েছে, ক্ষিধের চোটে পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। রামসিং সেই যে আমাদের সঙ্গে টেনে বিছানা নিয়েছিল, সে তখনও প'ড়ে আছে। সুরয তাদের সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে তারই ক্ষীণ আলোয় এদিক ওদিক কাজ ক'রে বেড়াতে লাগল। সে ছাগলগুলোকে বাচ্চা ও ধাড়ী হিসাবে স্থানে স্থানে বেঁধে তাদের সামনে চাট্টি ক'রে শুকনো ঘাস ছড়িয়ে দিলে। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে কোথায় চরতে গিয়েছিল, তারা একটা একটা ক'রে পরদা ঠেলে ঘরে এসে জমতে লাগল। আমরা সুরযকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা রাত্রে কি খাও?

সুরয বললে, রাত্রে খাবার আমাদের কিছুই ঠিক নেই, আজ আর কিছুই খাব না। নেহাৎ ক্ষিধে পেলে আটা মেখে গুড় দিয়ে খেয়ে নেব। আমার ঘরে আটা গুড় আছে, মেখে দেব, খাবে?

না বাবা! কাঁচা আটা আমরা হজম করতে পারব না। কালই ওর নাম কি হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এ বেলায় তো তোমাদের দুধ বিক্রি হয় নি, দুধ আছে না?

সুরয বললে, হাঁ হাঁ, দুধ আছে।

বললুম, আমাদের এক-একজনকে আধ সের ক'রে গরম দুধ দিতে পারবে না?

সুরয খুশী হয়ে বললে, হাঁ হাঁ খুব পারব— কেন পারব না। আধ সেরের দাম পড়বে চার পয়সা, তিনজনের দেড় সের, তা হ'লে তিন আনা দাও।

আমরা তখুনি সুরযকে তিন আনা পয়সা দিলুম। সে আলাদা একটা ছোট মাটির কেঁড়ে গোছের পাত্রে দেড় সের দুধ ঢেলে একটা আঙ্গেঠি জ্বেলে তার ওপরে কেঁড়েটা বসিয়ে দিলে।

দুধ জ্বাল হতে লাগল। সেই ফাঁকে জনার্দন কাগজের মোড়কটা ট্র্যাক থেকে বের ক'রে বললে, তা হ'লে আর এক ছিলিমের বন্দোবস্ত করা যাক।

সুরযকে ডেকে অনেকখানি গঞ্জিকা তার হাতে দিয়ে জনার্দন বললে, তৈরি কর।

সুরয বললে, সবটা এখনই সেজে কি হবে? এত বড় রাত এখনও সামনে প'ড়ে রয়েছে, আজ রাত্রে দেবতার কি মর্জি আছে কে জানে!

কেন বল দিকিন!

সুরয বললে, আজ রাতে খুব ঝড় হবে ব'লে মনে হচ্ছে। এ রকম ঝড় আর একবার হয়েছিল, তাতেই তো পাশের ঘরখানা ও এই ঘরের ওই কোণের দিকটা প'ড়ে গেল। এবার ঘরখানা সবটা না পড়লেই বাঁচি!

বল কি! তা হ'লে তো আর কিছু বাড়াবাড়ি হবার আগেই ইস্টিশানের দিকে পাড়ি জমাতে হয়।

সুরয অভয় দিয়ে বললে, কিছু করতে হবে না, দেবতা আছেন, সব ঠিক ক'রে দেবেন।

তার পরে চারদিকে চেয়ে পরম ঔদাস্যভরে বললে, প'ড়েই যদি যায়, এবার তবে ওই কোণটা প'ড়ে যাবে, তাতে আমাদের কিছু হবার ভয় নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, সুরযের অভয়-বাণীতে ভরসা কিছু পেলুম না। ঘরের খানিকটা প'ড়ে যাবে, বাকি খানিকটায় আমরা থাকব, সেই ব্যাপারের পরেও আমাদের থাকা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলুম না।

রামসিং তখনও মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। ইতিমধ্যে গাঁজা তৈরি ক'রে সুরয তাকে ডেকে তুললে! তারপরে গোল হয়ে ব'সে আবার আমরা মেঘলোক সৃষ্টি করলুম। বেশ নেশা হ'ল, আনন্দও কিছু কম হ'ল না; কিন্তু ঐ ঘর চাপা পড়ার আশঙ্কায় থেকে থেকে মনটা বিগড়ে যেতে লাগল। দু-একবার রামসিংকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, হাঁ, দেওতার যা মর্জি আছে তাই হবে।

ছাত চাপা পড়বার আশঙ্কা নেই এমন কথা রামসিং বললে না। কত বড় দার্শনিক হ'লে তবে আসন্ন বিপদে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না ক'রে তাকে পরাশক্তির লীলা ব'লে গ্রহণ করা যায় তা বিপদের সম্মুখীন না হ'লে বোঝা যায় না।

রামসিং এবার আর না শুয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। সুরযের মুখে ঘর পড়ার কথা শুনে আমরা ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে দু-একটা অভয়-বাক্যও শোনালে। ইতিমধ্যে সুরয একটা ছোট লোহার কড়াইয়ে ক'রে তিনবারে আমাদের তিনজনকে দুধ খাইয়ে বাকী দুধটুকু তারা স্বামী-স্ত্রীতে খেয়ে ফেললে।

গাঁজার ওপরে গরম খাঁটি দুধ পড়ায় ঘর চাপা পড়ার আশঙ্কা কিছু দূর হ'ল বটে, কিন্তু ঝড় ক্রমেই যেন বাড়াবাড়ি করতে শুরু ক'রে দিলে। ঝড়ের বাতাস কি রকম খুরপাক খেতে খেতে দেওয়ালের সেই সব বিরাট গর্ত দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল, আর সেই সঙ্গে কামান-গর্জনের মতন একটা নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ হতে লাগল—বুম্-বুম্-বুম্।

পছনের সেই জঙ্গল, যাকে কয়েক ঘণ্টা আগেও শান্ত শ্রীমণ্ডিত ঘুমন্ত পসীর মতন মনে হচ্ছিল, ঝড়ের পরশ পেয়ে সে যেন সর্বনাশিনী মূর্তি রে জেগে উঠল। থেকে থেকে বিদ্যুতের চমকানিতে তার রূপ এক-কবার আমাদের চোখে প্রতিভাত হচ্ছিল—মনে হতে লাগল, গাছগুলো যন অসংখ্য বাহু মেলে আকাশ স্পর্শ করতে উদ্যত হচ্ছে, কিন্তু তখুনি াবার কে তাদের ঝুঁটি ধ'রে মাটির দিকে নামিয়ে দিচ্ছে। কখনও বা নে হয়, সুরয-বর্ণিত সেই কালনাগিনীর দল শোঁ-শোঁ শব্দে আকাশে টোছুটি করতে করতে সহস্র শাখায় তাদের অগ্নিজিহ্বা বিস্তার করছে ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হচ্ছে—কড়-কড়-কড়াৎ। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিরবচ্ছিন্ন াওয়াজ চলেছে বুম্-বুম্-বুম্! আমি কলকাতাবাসী জীব, প্রকৃতির াত্মঘাতিনী সেই স্বৈরিণী মূর্তি দেখা তো দূরের কথা, একশো মাইল বেগে বাতাস বইলে আমার জানলায় ফুর-ফুর ক'রে দক্ষিণার আমেজ দয়; কিন্তু জনার্দন ও সুকান্ত তুজনেই তারা পূর্ববঙ্গের ছেলে, ঝড়ের কালেই তারা এক রকম মানুষ হয়েছে—ব্যাপার দেখে তারাও বেশ চকে গেল।

এদিকে আমাদের ঘরের প্রদীপটি একবার বাতাসের এক ঝটকায় নিভে গেল। ঘরের মধ্যে বাতাস এমন ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করলে যে, প্রদীপ জ্বালানো আর সম্ভব হ'ল না। সেই অন্ধকারে ব'সে ঝড় সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে রামসিং তো লম্বা হ'ল। সুরয আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললে, কোনও ভয় নেই। ওপরে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে স্মরণ ক'রে শুয়ে পড়।

সুরয শোবার যোগাড় করতে লাগল। আমরা দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে নিজেদের খাটিয়ার কাছে এসে গায়ের কাপড় আড়াল ক'রে ধ'রে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে বসলুম। আমাদের শোবার জায়গাটায় বাতাস তত জোর ছিল না, তবুও ক্ষীণ মোমবাতির পক্ষে বেশিক্ষণ তার বেগ সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। কি আর করি—নিরুপায় হয়ে সেই সন্ধ্যারাত্রেই শুয়ে পড়তে হ'ল।

শুয়ে তো পড়লুম, কিন্তু ঘুম কোথায়! সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সহস্র নাগিনী ও সহস্র কামানের প্রতিযোগিতা চলেছে। এরই মধ্যে আবার নেশার ঘোরে কত রকমের চিন্তা মাথার মধ্যে জোট পাকাতে লাগল। মনে হ'তে লাগল, কবে অতীতের কোন্ এক বিস্মৃত দিনে রামসিংয়ের পূর্বপুরুষের কে এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল—আজকের এই দিন যে ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে ব'সে ছিল সে কথা কি সে ব্যক্তি ভাবতে পেরেছিল! কত রকম চিন্তা ভিড় করতে লাগল মগজে—কখনও বা নিজের মনেই হাসি, কখনও মনে হয় নেশাটা বড্ড চেপে ধরেছে। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বাইরের সেই প্রচণ্ড শব্দ ক্রমেই যেন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। ঝড়ের সেই ভীষণ শব্দগুলো যেন দূরে চ'লে যেতে লাগল—দূর—দূর—দূরতর—দূরতর, তারপর কখন করুণাময়ী নিদ্রা এসে সকল চিন্তা দূর ক'রে দিলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, হঠাৎ বাহুতে একটা ধাক্কা পেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমাদের খাট তিনটে একেবারে গায়ে-গায়েই পাতা ছিল। আমার পাশেই ছিল জনার্দনের খাট। তার ধাক্কা খেয়ে আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠে ব'সে আমাকে চেঁচিয়ে কি যেন বললে। কিন্তু তখন কার সাধ্য কিছু শুনতে পায়! বাইরে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির হুঙ্কার চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়, তা ভেদ ক'রে কোনও শব্দ কি আর কানে যায়! আমি চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, কি রে, কি বলছিস্?

জনার্দনও চেঁচাতে লাগল।

মিনিটখানেক এই রকম চলবার পর জনার্দনের কণ্ঠস্বর কানে গেল। জনার্দন বললে, বাতিটা শীগগির জ্বাল—আমায় বোধ হয় সাপে কামড়েছে!

কি সর্বনাশ!

জনার্দন চীৎকার করতে লাগল, ওরে বাবারে! ম'রে গেলুম যে! বাবা গো, আর পারি না।

ব্যস! বাইরে ঝড়ের সেই ভীষণ আওয়াজ আমার শ্রবণে ক্ষীণ হ'য়ে গেল। জনার্দনের আর্তনাদ সব শব্দ ছাপিয়ে উঠতে লাগল। তক্ষুনি সুকান্তকে ঠেলে তুলে বললুম, শীগগির ওঠ্, জনার্দনকে সাপে কামড়েছে।

মোমবাতি জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন ঝড় চলেছে, দেশলাই জ্বালাই আর নিভে যায়। শেষকালে একটা খাটিয়াকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে তার ওপর কাপড় দিয়ে একটা পর্দার মতন ক'রে তার পাশে মোমবাতি জ্বালালুম।

জনার্দন বললে, ওঠবার জন্যে মাটিতে পা রাখা মাত্র কিসে কামড়ালে, নিশ্চয় সাপ—অসহ্য যন্ত্রণা রে বাবা, আর সহ্য করতে পারছি না।

জনার্দনের কথা শুনেই সুকান্ত তো ভেউভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। কিন্তু এখন কাঁদলে চলবে না, একটা কিছু চেষ্টা করা চাই। শুনেছিলুম যে, সাপে কামড়ালে দষ্ট স্থানের ওপরেই গোটা কয়েক বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু দড়ি কোথায় পাই! ছুটে গিয়ে সুরযকে ধাক্কা দিয়ে তুললুম। সে হাঁউমাউ ক'রে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রামসিংও উঠে পড়ল। সব শুনে তারা ছুটে জনার্দনের কাছে এল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে কামড়েছে শুনেই রামসিং সেই আঙুলটা মুখে পুরে দিয়ে চুষতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ওদিকে জনার্দন চীৎকার করতে লাগল, ও বাবা! আর যে পারি না, ও বড়দা ও মেজদা ও সোনাদা রাঙাদা তোমরা কোথায় আছ, আমি যে মরি!

সুরযকে বললুম, পায়ে দড়ি বাঁধতে হবে, দড়ি দিতে পার?

সে ছুটে গিয়ে ধাড়ী ছাগলগুলোর গলা থেকে সব দড়ি খুলে নিয়ে এল। আসবার সময় তাড়াতাড়িতে দু-চারটে কুকুরের পেটে পা দিতে তারা কেঁউকেঁউ ক'রে চীৎকার শুরু করলে। ঘরের মধ্যে কুকুর ছাগল ও জনার্দন, আর বাইরে ঝড়ের আওয়াজ মিলে এক বীভৎস রসের সৃষ্টি হ'ল।

আমি ও সুরয মিলে জনার্দনের পায়ের গাঁট থেকে আরম্ভ ক'রে হাঁটু অবধি চার জায়গায় বাঁধলুম। ওদিকে রামসিং জনার্দনের পা চুষে চুষে

বার তিন-চার থুতু ফেলে বললে, সাপে কামড়ায় নি, মনে হচ্ছে বিচ্ছুতে কামড়েছে।

তারপরে সে আস্তে আস্তে বললে, সাপে কামড়ালেও মরে, বিচ্ছুতে কামড়ালেও মরে, তবে সাপে কামড়ালে এত যন্ত্রণা হয় না, এ বিচ্ছুতে কেটেছে ব'লেই মনে হচ্ছে।

রামসিংয়ের কথা শুনে জনার্দন আরও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে; সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুকান্তও শুরু করলে, ওরে বাবা! কি হবে রে!

ওদিকে জনার্দনের রজ্জুবদ্ধ পা-খানা দেখ দেখ ক'রে ফুলে ঢোল হতে লাগল। সুরয তার পায়ের অবস্থা দেখে বললে, যখন বিচ্ছুতেই কেটেছে তখন বাঁধন দিয়ে ওর কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি, ওকে শান্তিতে মরতে দাও --

কিন্তু বাঁধন কাটি কি ক'রে! দেখতে দেখতে জনার্দনের পা-খানা ফুলে এমন অবস্থা হ'ল যে, বাঁধনের দুই পাশ ফুলে দড়িগুলো মাংস কেটে ব'সে যেতে লাগল। শেষকালে সুরয তার বিছানার তলা থেকে ইয়া বড় চক্‌চকে এক খাঁড়ার মতন অস্ত্র টেনে বার করলে। সেই সাংঘাতিক জিনিস দিয়ে জনার্দন বেচারীর পা-খানা ক্ষত-বিক্ষত ক'রে বাঁধন চারটে কেটে ফেলা গেল।

বাঁধন খোলার পর বোধ হয় মৃত্যু অবধারিত বুঝতে পেরে জনার্দনের আক্ষেপ আরও বেড়ে গেল।

আমি ও সুকান্ত ঠিক করলুম, এই ভাবে জনার্দনকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া হবে না। রামসিং ও সুরযকে বললুম, তোমরা দুজনে একে দেখ, আমরা শহর থেকে একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি। এখানে সব থেকে বড় ডাক্তারের নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি?

রামসিং হেসে বললে, ডাক্তার! সে যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, কিছুই করতে পারবে না।

সুরয বললে, এই ঝড়-তুফানে বাইরে গেলে বাঁচবে! গাছ চাপা প'ড়ে পথে ম'রে থাকবে। যে মরছে তাকে মরতে দাও, দেওতার যা ইচ্ছে তাই হবে, তাই ব'লে তিনজনে মিলে মরবে কোন বুদ্ধিতে?

তবে! বন্ধু বিনা চিকিৎসায় ম'রে যাচ্ছে তাই খা দাঁড়িয়ে দেখি কি ক'রে?

আমরা বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় সুরয আমাদের একরকম বাধা দিয়ে বললে, দাঁড়াও! ডাক্তার কিছুই করতে পারবে না—

তারপরে সে তার পরনের কাপড়-চোপড়গুলো এঁটে পরতে পরতে পাশের সেই বিরাট ভগ্নস্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই জঙ্গলের মধ্যে একরকম লতা জন্মায়, সেই লতা বেটে দষ্ট স্থানে লাগাতে পারলে ও বেঁচে যেতে পারে, তা না হ'লে যে রকম লক্ষণ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মৃত্যু হবে।

এই অবধি ব'লে সে নিজেদের ঠেট ভাষায় চীৎকার ক'রে তার স্বামীকে কি বললে। সুরযের কথা শুনেই রামসিং বিনাবাক্যব্যয়ে উঠেই মাথায় কাপড়খানা বেশ ক'রে জড়িয়ে নিলে। তারপরে সেই অসভ্য নিরক্ষর জাঠদম্পতি—যারা ছাগলের দুধ বেচে জীবিকা অর্জন করে, দিন কয়েক আগেই যারা পরস্পরে খুনোখুনি ক'রে মরছিল, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই প্রভঞ্জনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যে সময়ে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গও নিজের আশ্রয় ত্যাগ করে না, তারা গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই উঁচু-নীচু ধ্বংসস্তূপে—যেখানে বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, শেয়াল—কি না আছে, চ'লে গেল এক অপরিচিতের প্রাণ বাঁচাবার জন্য, সেই ওষধির সন্ধানে।

এদিকে জনার্দনের চীৎকারের বিরাম নেই। সে তারস্বরে চেঁচিয়েই চলল। আমি কিসে যেন পড়েছিলুম যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তির কিছুক্ষণ পরে গলার স্বর ভেঙে যায়। অনবরত চীৎকার ক'রেই হোক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক ক্রমেই যেন জনার্দনের কণ্ঠস্বর ভেঙে আসতে লাগল। সে চেঁচাতে লাগল, ওরা কি আমার বাড়িতে খবর দিতে গেল?

না, ওরা তোমার জন্যে ওষুধ আনতে গেল।

আর ওষুধে কি হবে! আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও রাঙাদা—রাঙাদা গো—

বললুম, জনার্দন, চেঁচিয়ে নিজেকে কেন ক্লান্ত করছিস ভাই?

জনার্দন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মরবার সময় ভাইকে ডাকছি, যদি শুনতে পায়—

কোথায় বিক্রমপুরের কোন্ গাঁয়ে তোর বাড়ি, আর কোথায় এই ভরতপুর! এখান থেকে চীৎকার পাড়লে কি তারা শুনতে পায় কখনও!

হায় হায়! তবে মরবার সময় কারুকে দেখতে পেলুম না।

জনার্দন যত এই ধরনের সব কথা বলে, সুকান্তর কান্নার বেগ ততই বাড়তে থাকে। সুকান্ত ও জনার্দন একই দেশের ছেলে। সে কাঁদে আর বলে, ওর বাড়িতে মুখ দেখাব কি ক'রে?

এদিকে জনার্দনের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেলেও তার চীৎকারের বিরাম নেই। সে বলতে লাগল, যে সাপটা তাকে কামড়েছে সেটাকে সে দেখেছে, একেবারে কাল সাপ রে বাবা! ও বাবা, তুমি কোথায়? ব্রহ্মশাপ না হ'লে লোককে সাপে কামড়ায় না। হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিতাশ্বকে সাপে কামড়েছিল, তাকে মাত্র একটা ব্রাহ্মণে শাপ দিয়েছিল, আর আমি দেশসুদ্ধ ব্রাহ্মণের দানের টাকা মেরে নিয়ে এসেছি, এতগুলো বামুনের অভিসম্পাত, ওরে কি হবে রে!

এই রকম সব বকতে বকতে ক্রমে সে নির্জীব হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে তার কথা বলাও শেষ হয়ে গেল।

সুকান্ত বললে, ব্যস! দেখছ কি? শেষ হয়ে গেল।

সুকান্ত জনার্দনের মাথার কাছ থেকে উঠে নিজের খাটে গিয়ে বসল। আমিও সেখান থেকে উঠে মেঝেতে যেখানে মোমবাতিটা জ্বলছিল, সেখানে গিয়ে ব'সে পড়লুম।

বাইরে তুফান গর্জাতে লাগল।

সেই প্রকাণ্ড প্রায়ান্ধকার ঘরে আমরা দুজন জেগে আর একজন নিদ্রিত কি মহানিদ্রাগত তা জানি না। কুকুর ছাগলগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষন পরে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে চিন্তা করবার অবসর পেলুম। বেশ বুঝতে পারলুম যে, জনার্দন যদি ম'রে গিয়ে থাকে

তো কাল সকালেই পুলিশের লোক এসে তার মৃতদেহ আর আমাদের জীবন্ত দেহ নিয়ে একচোট টানা-পোড়েন করবে। পুলিশের কবল থেকে যদি ভালয়-ভালয় মুক্তি পাই তো প্রথমে জনার্দনের দেহের সংকার করতে হবে। তার পরে কি হবে?

ভাবতে লাগলুম, ব্রাহ্মণের অভিশাপে জনার্দন না হয় মারা গেল। কিন্তু এ কার অভিশাপ আমার জীবনকে এমন পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে! যেখানে যাই, যে কাজেই অগ্রসর হই ঠিক সাফল্যের পূর্ব-মুহূর্তটিতে অতর্কিতে বাধা এসে সব পণ্ড ক'রে দেয়! এই তো বরাবরই দেখে আসছি। কোথায় জমা হয়ে আছে এই বাধা, কে প্রয়োগ করছে এই বাধা—আমার ইচ্ছাকে, আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করবার এই চক্রান্ত প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কেন? কি আমার অপরাধ?

কার প্রতি জানি না—ধীরে ধীরে একটা অভিমান আমার অন্তরে জমা হতে লাগল। এই দুর্জয় অভিমানে আত্মহত্যা করবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে লাফালাফি করতে শুরু ক'রে দিলে। আমি ঠিক করলুম, জনার্দন যদি ম'রে যায় তো ঐ টিনে যত অর্থ এখনও অবশিষ্ট আছে তা সুকান্তর হাতে দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমি কিন্তু আর ফিরব না—ফিরব না বটে, কিন্তু জীবনযুদ্ধ থেকে একেবারে স'রে দাঁড়াব। কোনও চেষ্টা করব না জীবনে কোনও উন্নতি করবার। আমি খুঁজব তাঁকে, যিনি আমার ভাগ্যলিপি লিখেছেন। জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, কেন তিনি দিলেন আমার মধ্যে এই আবেগ ও আকুলতা, অথচ সংসারের প্রতিটি জিনিসকে লেলিয়ে দিলেন আমার বিরুদ্ধে—যেন কোনও কাজেই আমি সাফল্যলাভ করতে না পারি। কেন! কেন! কি আমার অপরাধ?

আমার পাশের মোমবাতিটা ফুরিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ থেকে নোটিশ দিচ্ছিল—দাউদাউ ক'রে কিছুক্ষণ জ'লে সেটা নিভে গেল।

অন্ধকারে ব'সে ভাবতে লাগলুম, আসুক ঐ জঙ্গল ও ভগ্নস্তূপ থেকে বাঘ নেকড়ে—আসুক বিচ্ছুর দল—কামড়ে মেরে ফেলুক আমাকে—আমি নড়ব না।

একটু পরে সুকান্ত আর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার পাশে রেখে উবু হয়ে বসল। দেখলুম, তখনও তার চোখে জল রয়েছে। তাকে আমার সংকল্পের কথা বলায় সে ঘাড় নেড়ে বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাড়ি যাবার কথা আমায় ব'লো না। জনার্দন যদি মারা যায় তো কোন্ মুখ নিয়ে আমি বাড়ি যাব? তা ছাড়া বন্ধুকে এমনভাবে ফেলে সব টাকা নিয়ে মজা ক'রে আমি বাড়ি যেতে চাই না। তুমিও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব।

সুকান্ত আমার আরও কাছে এসে তার একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। সুদূর অতীতে দুর্দিনের সেই দারুণ রাতে সে আমায় কি কি বলেছিল তার খুঁটিনাটি কথা আজ আর ভাল ক'রে মনে পড়ছে না, কিন্তু সেই ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে তার সঙ্গে আবার যেন নতুন ক'রে আমার বন্ধুত্ব হ'ল। যদিও ভবিষ্যতে তার জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা—সে থাকত এক জায়গায়, আমি থাকতুম আর এক জায়গায়। তবুও যখনই যেখানে দেখা হয়েছে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি—অতীতের সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে চোখের জলে আমাদের যে বন্ধুত্ব পাকা হয়েছিল হাসতে হাসতে সে কথা আলোচনা করেছি।

একবার অনেকদিন অসাক্ষাতের পর সকালবেলা প্রায় দশটার সময় এসে সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে! ঐ যে অমুক কাগজে 'মহাস্থবির জাতক' নামে একটা লেখা বেরুচ্ছে সেটা নাকি তুই লিখছিস?

বললুম, হ্যাঁ।

সুকান্ত বললে, ও বাবা! তা হ'লে আমাদের সেই সব কথা ফাঁস ক'রে দিবি নাকি?

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, তোর আপত্তি আছে?

সুকান্ত একটু ভেবে বললে, না, আপত্তি আর কি, তবে নামটা আর দিস্ নি। ছেলেপুলে বড় হয়েছে—নাতি-নাতনী আসছে, সে সব কেলেঙ্কারীর কাহিনী—

দুজনে একচোট খুব হাসা গেল।

সুকান্তকে বললুম, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল—দু-দিন থাক্ না আমার কাছে।

সে বললে, না ভাই, এবার অমুক জায়গায় উঠেছি, সেখান থেকে হঠাৎ চ'লে এলে কি মনে করবে তারা? এর পরের বারে একেবারে তোর এখানে এসে উঠে কদিন থাকব।

ঘণ্টাখানেক হাসিগল্প ক'রে সুকান্ত চ'লে গেল। বোধ হয় দু-তিন দিন পরেই শুনলুম, স্নানের ঘরে অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে দেখে তার আত্মীয়েরা দরজা ভেঙে দেখলে, তার প্রাণহীন দেহ বাথ-টবের পাশে প'ড়ে রয়েছে।

যাই হোক, আমরা তো জনার্দনকে নিয়ে সেইভাবে ব'সে রইলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রামসিং ও সুরয ফিরে এল, তাদের মাথায় বড় বড় দুই লতার বোঝা। বোঝা নামিয়ে তখুনি ডাঁটা থেকে পড়পড় ক'রে রাশিকৃত পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সুরয বাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

রামসিং বললে, এ লতার নাম বিশল্যকরণী, লক্ষ্মণজীর জন্যে মহাবীরজী এই লতা হিমালয় থেকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে এ ওষধি অযোধ্যায় যায়—তার পরে ভরতজী যখন এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর হুকুমে এইখানে বিশল্যকরণী লাগানো হয়েছিল। এ লতা জঙ্গলে জন্মায় বটে, কিন্তু যে-সে জঙ্গলে তা ব'লে হয় না।

ওদিকে সুরয ভাল ভাল সেই পাতা বাটতে লাগল, আর রামসিং জনার্দনের পায়ের পাতা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় কুঁচকি অবধি থেবড়ে থেবড়ে সেগুলো বসিয়ে দিতে লাগল। সব লাগানো হয়ে গেলে মেঝে পরিষ্কার ক'রে সেখানে জনার্দনকে শোয়ানো হ'ল। রামসিং ও সুরয দুজনেই বেশ ক'রে তাকে পরীক্ষা ক'রে বললে, এখনও প্রাণ আছে—বেঁচে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।

এই সব করতে করতে ফরসা হয়ে গেল। সকালের দিকে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল বটে, কিন্তু তখনও হাওয়ার জোর ছিল, রোদ ওঠার

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোরও ক'মে গেল-- প্রসন্ন সূর্যালোকে আবার পৃথিবী হাসতে লাগল।

এতক্ষণে জনার্দনকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেলুম। মনে হ'ল, তার মুখখানা যেন কালো হয়ে গিয়েছে। খুব আস্তে আস্তে সে নিশ্বাস নিচ্ছিল---সুরয কয়েকবার নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখে বললে, ও এখন বিষের ঘোরে ঘুমুচ্ছে, সেই বিকেল নাগাদ ঘুম ভাঙবে। পরমাত্মা ওকে বাঁচিয়ে দিলেন---

সকালবেলা দুধের খদ্দেররা এসে কেউ দুধ পেলে না। রাত্রে ধাড়ীদের গলার দড়ি খুলে জনার্দনের পায়ে বাঁধা হয়েছিল, সেই তালে তারা বাচ্চাদের কাছে গিয়ে দুধ খাইয়ে দিয়েছে। খদ্দেররা দুধ পেলে না বটে, কিন্তু মজা পেলে। দুধ না পাওয়ার কারণটিকে তারা দেখে গেল। তারপর নিজ নিজ মহল্লায় গিয়ে বেশ ফলাও ক'রে গল্প করার ফলে চার দিক থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল জনার্দনকে দেখতে। আমাদের উপকার করতে গিয়ে সেদিন রামসিংদের সকাল বেলার রোজগারটি নষ্ট হ'ল। তারপরে সেই দড়িগুলো কেটে ফেলায় ভবিষ্যতের অবস্থাও খারাপ হ'ল দেখে আমরা তাদের দড়ি কেনবার পয়সা তো দিলুমই, তা ছাড়া খোরাকি বাবদও কিছু পয়সা দিলুম।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর ভিড় ক'মে আসতে লাগল। সুরয বললে, যাও, তোমরা খেয়ে এস। রুগীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আর ভয় নেই। বিকেল নাগাদ ও ভাল হয়ে উঠবে, তখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দেব; সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন বিকেল নাগাদ জনার্দন সত্যিই ভাল হয়ে উঠল। চ'লে-ফিরে বেড়াতে না পারলেও, সে উঠে ব'সে আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে লাগল। জনার্দনকে বললুম যে, সুরয ও রামসিং সেই দুর্যোগে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে লতা এনেছিল ব'লেই সে বেঁচে গিয়েছে। নইলে—

জনার্দন যখন সুরযের হাত ধ'রে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, তখন তাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের চোখেই অশ্রু ফুটে বেরুল।

বাইরের আবরণটা কঠিন হ'লেও বুঝলুম, তাদের ভেতরটা তখনও দরদে ভরা রয়েছে।

সুরয বললে, বৃষ্টি-বাদলের দিনে সব বিচ্ছু বেরোয়, তোমরা বিছানা-পত্র ভাল ক'রে ঝেড়ে নাও।

আমরা বিছানা খাট ভাল ক'রে ঝেড়ে আছড়ে আবার বিছানা পাতলুম। জনার্দনের বিছানা ঝাড়তে গিয়ে প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ও সেই অনুপাতে মোটা, গায়ে খাড়া খাড়া রোঁয়াওয়ালা একটা বিচ্ছু বেরিয়ে পড়ল। তখুনি জুতোপেটা ক'রে তো সেটাকে মেরে ফেলা হ'ল। ওরা বললে, একবার কামড়ালে সাত দিন আর ওদের বিষ থাকে না, কাজেই আজকে যদি ওটা কামড়াত তা হ'লে কিছুই হ'ত না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললে যে, এই শ্রেণীর বিচ্ছুর বিষ প্রায়ই মারাত্মক হয়ে থাকে। এরা যদি সাপকে কামড়ায় তো সাপ ম'রে যায়।

বিকেলবেলা জনার্দনকে আধ সেরটাক দুধ দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু সে আরও কিছু খাবারের জন্যে এত গোলমাল আরম্ভ করলে যে তার জন্যে আবার স্টেশন থেকে রুটি মাছ কিনে আনতে হ'ল।

সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতে জনার্দনের ভাল হয়ে যাওয়া উপলক্ষ্যে আগের দিনের অবশিষ্ট গাঁজাটুকু টেনে সবাই শুয়ে পড়া গেল, তারপরে এক ঘুমেই রাত কাবার।

দিন তিনেকের মধ্যেই জনার্দন বেশ সেরে উঠে আগের মতন আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যাতায়াত আরম্ভ করলে। স্টেশনের কাছের সেই বাড়ির মালিক তখনও ফেরে নি। স্টেশনের দোকানদারটি বললে, আর আট-দশ দিনের মধ্যেই সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু এদিকে আমাদের জনার্দন মহা হাঙ্গামা জুড়ে দিলে। সে খালি বলতে লাগল, তার কি রকম মনে হচ্ছে, এখানে থাকলে সে ম'রে যাবে। সেদিন তো দক্ষিণ দরজা অবধি পৌছে গিয়েছিল—এবার চৌকাঠ পেরুতে হবে। জনার্দনকে বোঝাতে লাগলুম, এ রকম সস্তার জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে হয়তো মুস্কিলেই পড়তে হবে। ওদিকে দুধের ব্যবসার জন্য ভাল

ভাল ছাগল ইত্যাদি দেখা হয়েছে, এই সময় সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাওয়া অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ হবে।

জনার্দন কিন্তু কোনও যুক্তিই মানে না। তার যুক্তি হচ্ছে, যদি প্রাণেই না বাঁচি তো ব্যবসা দিয়ে কি করব!

এই রকম চলেছে। একদিন আমরা স্টেশন থেকে খেয়ে ডেরায় ফিরছি, বেলা তখন প্রায় দেড়টা হবে, এমন সময় একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাদের বললে, তোমাদের ওই চৌকিতে ডাকছে।

চৌকি কি রে বাবা!

শেষকালে টের পাওয়া গেল যে, পুলিসের লোক থানায় আমাদের ডাকছে। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। কাছেই একটা বড় গাছের নীচে একটা খোলার ঘর। সেখানে টেবিল বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিতে চার-পাঁচজন লোক ব'সে রয়েছে, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই থানাদার খুব খাতির ক'রে বসতে ব'লে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, আপনারা এই পথে যাতায়াত করছেন, কে আপনারা?

এই অবধি ব'লেই থানাদার আবার বললেন, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। জানেনই তো, এটা একটা রেয়াসৎ অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য। এখানকার বাসিন্দা নয় এমন লোক এখানে এলে তাদের খোঁজ রাখতে হয় আমাদের।

আগ্রায় সত্যদার কাছে আমরা রেয়াসতের অনেক খবরই পেতুম। বাঙালীর ছেলে, বিশেষ কলকাতার লোক এই স্বদেশীর সময় সেখানে গেলে যে খুব খাতির পাবে না তাও আমাদের জানা ছিল। থানাদার কিছুক্ষণ ধ'রে আমাদের আপাদমস্তক দেখে বললেন, আপনাদের দেখে তো বাঙালী ব'লে মনে হচ্ছে। বাংলা দেশের কোথায় আপনাদের বাড়ি কোন্ জেলা, কোন্ পোস্ট-অফিস, কোন্ গ্রাম, কোন্ থানা?

ক্রমশ

'মহাস্থবির'

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

ডানাকে দেখে বকুলবালা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, মেম-সাহেব-গোছ হোমরা-চোমরা কিছু দেখবেন। ডুকে-ডুরে-পরা ছিপছিপে-গড়ন ইনিই ডানা না কি! মুখখানি তো চমৎকার! নিতান্ত ছেলেমানুষও। খুব ভাল লেগে গেল।

নমস্কার।

সপ্রতিভভাবে নমস্কার ক'রে ডানা এগিয়ে গেল।

আপনাকে তো চিনতে পারছি না!

আমি বকুলবালা। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

কে আপনার স্বামী?

বকুলবালা চণ্ডীর দিকে ফিরে বললেন, বল্ না রে।

রূপচাঁদবাবু।

ও, রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী আপনি! আসুন, আসুন—আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। ওই দেখুন—

বকুলবালা দোদুল্যমান সাপের খোলসটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

সব শুনেছি আমি। আনন্দবাবুর কাছে মই ছিল না। লোকটা ঘুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল। তার হাতে আপনি যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা চণ্ডী আমাকে প'ড়ে শোনালে। আমি নিজে লিখতে পড়তে কিছু জানি না, 'ক' অক্ষর গোমাংস যাকে বলে তাই। কিন্তু আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন তা শুনে এত ভাল লাগল যে, থাকতে পারলাম না, নিজেই চ'লে এলাম। সত্যিই তো, তুচ্ছ সব ব্যাপারের জন্যে পুরুষমানুষের সাহায্য কেন নিতে যাব আমরা! চলুন, দেখা যাক। ওরে, মইটা দে তো এইবার আমাকে—

ডানাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বকুলবালা মইটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা অবলীলাক্রমে ব'য়ে নিয়ে গেলেন তালগাছটার কাছে। মইটা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর পেশীর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল ডানা। অনেক দিন আগে সার্কাসে এই রকম মেয়ে দেখেছিল সে একটা। মইটা তালগাছে লাগিয়ে ডানার দিকে ফিরে বকুলবালা বললেন, আসুন আপনি।

বকুলবালার গাছকোমর বাঁধাই ছিল, মাথার খোঁপাটা এলিয়ে বেণীটা লুটিয়ে প'ড়ে ছিল পিঠের উপর। কৌতূহল ঝলমল করছিল চোখের দৃষ্টিতে। অদ্ভুত দৃশ্য! ডানা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে। বকুলবালা হঠাৎ ডানার দিকে ফিরে অনেকটা যেন জবাবদিহির সুরে আবার বললেন, আপনি হয়তো ভাবছেন, চাকরকে দিয়ে মই বইয়ে আনা কেন তবে, ও কি পুরুষমানুষ নয়? এর উত্তরে আমি বলব, ওদের মাইনে দিয়ে যখন রেখেছি তখন খাটিয়ে নেব বইকি। ওরা যখন থাকবে না, তখন নিজেরাই সব করব। কি বলেন? আসুন, সিঁড়ির নীচের দিকটা চেপে ধরুন, আমি উঠি—

ডানা এগিয়ে গেল। বকুলবালার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যদিও প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু তাঁর সরল সপ্রতিভ আলাপে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল। রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী এমন চমৎকার মানুষ, অথচ আলাপ হয় নি এতদিন!

বেশ জোরে চেপে ধ'রে থাকুন।

আপনি উঠছেন তো, কিন্তু সত্যিই যদি সাপ থাকে!

থাকলেই বা, কি করবে আমার! চণ্ডে, ওই বাখারিটা প'ড়ে আছে, আমায় দে তো। কিছুদূরে উঠে খোঁচা দিয়ে দেখব প্রথমে। সাপ থাকলে হয় ফোঁস করবে, না হয় বেরিয়ে পড়বে।—চণ্ডী বাখারিটা এনে দিতে বকুলবালা তলোয়ার গোঁজার মত ক'রে কোমরে সেটা গুঁজে নিলেন। তারপর উঠতে লাগলেন। ডানা মইটা ধ'রে রইল শক্ত ক'রে। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল শালিক পাখিরা। দু-একটা

পাখি উড়ে এসে ঠোকরাবারও চেষ্টা করতে লাগল বকুলবালাকে। বকুলবালা কোমর থেকে বাখারিটা খুলে তলোয়ার-চালানোর ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে করতে উপরে উঠতে লাগলেন।

আর বেশি উঠবেন না। এবার খোঁচা দিয়ে দেখুন, ভিতরে কিছু আছে কি না!

বকুলবালা তর্ তর্ ক'রে বেশ অনেকখানি উঠে পড়েছিলেন। পাখির বাসা তাঁর বাখারির নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তিনি সাপের খোলসটায় প্রথমে খোঁচা দিলেন, খোঁচা দিতেই প'ড়ে গেল সেটা। বাসার ভিতর খোঁচা দিলেন, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সোজা তিনি উঠে গেলেন এবং বাসার ভিতর উঁকি মেরে দেখলেন। ডানা সোৎসুকে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, বকুলবালা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তার দিকে প্রেরণ ক'রে বললেন, সাপ-টাপ কিছু নেই। চারটি নীল রঙের ডিম রয়েছে। পেড়ে আনব?

না না, পাড়বেন কেন! বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাবে। আপনি নেবে আসুন।

বকুলবালা অকম্পিত চরণে দ্রুতগতিতে নেবে এলেন।

আচ্ছা, সাপের খোলসটা ওখানে গেল কি ক'রে তা হ'লে?

ডানা সমস্যাটার সমাধান করতে পারছিল না কিছুতে। বকুলবালা সমাধান ক'রে দিলেন। বললেন, ওই মুখপোড়ারাই নিয়ে গেছে হয়তো মুখে ক'রে। কে শত্রু, কে বন্ধু সে বোঝবার বুদ্ধি কি ওদের আছে! দেখুন না, আমাকেই তেড়ে তেড়ে ঠোকরাতে আসছে, অথচ আমি ওদের বাসা থেকে সাপ তাড়াতে যাচ্ছি। ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকলে ভাবনা ছিল কি!

চলুন, একটু চা খাওয়াই আপনাকে।

এ সময়ে কেউ আবার চা খায় না কি? চা খাব সেই পাঁচটায়, উনি আপিস থেকে ফিরে এলে।

তবু চলুন, বসবেন একটু।

তা বসছি একটু, চলুন।

বকুলবালা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল ডানার টেবিলের উপর মোটা মোটা বই দেখে।

এই সব আপনি পড়েন ?

পড়ি মাঝে মাঝে। অমরেশবাবু দিয়ে গেছেন, পাখির বিষয়ে কিছু জানবার দরকার হ'লে উলটে-পালটে দেখি—

এতে সব পাখির কথা আছে না কি ? সব পাখির বই ?

হ্যাঁ। অনেক রকম পাখির ছবিও আছে, দেখুন না।

হলদে পাখির ছবি আছে ?

হলদে রঙের পাখি তো অনেক আছে, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন ?

বেনেবউ।

ও, বুঝেছি। খুব ভাল ছবি আছে, দেখাচ্ছি আপনাকে।

ডানা ছবি বার ক'রে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বকুলবালা। চণ্ডীও সমান উৎসাহে বইটা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু বকুলবালার ধমক খেয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল বেচারাকে।

তুই ছাড়্ না, আমি আগে দেখে নিই, তারপর তোকে দেখাচ্ছি। অমন আত্মাখলাপনা করিস কেন ? বাঃ, চমৎকার তো! ঠিক যেন জ্যান্ত পাখিটি ডালে ব'সে রয়েছে। এর একটা বাচ্চা পোষবার খুব শখ আমার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।

ডানা বললে, আমরা লোক বাহাল করেছি সব রকম পাখির বাচ্চা সন্ধান করবার জন্যে। হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই, দেব আপনাকে পাঠিয়ে।

দেবেন ? সত্যি বলছেন ? তিন সত্যি করুন।

বকুলবালা উদ্ভাসিত চক্ষে ডানার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

এতটা ছেলেমানুষি ডানা প্রত্যাশা করে নি। সেও ছেলেমানুষের মত হেসে ফেললে, হেসেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভও হ'ল একটু।

তিন সত্যি করবার দরকার কি? পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।

বকুলবালার জেদ চ'ড়ে গেল হঠাৎ।

না, আপনি তিনবার বলুন—দেব দেব দেব। বলতেই হবে আপনাকে।

বকুলবালার চোখের দিকে চেয়ে ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। শুধু তিন সত্যি ক'রেই নিস্তার পেলে না সে, গায়ে হাত দিয়ে দিব্যিও করতে হ'ল তাকে। আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে চোখ-মুখ ঝলমল করতে লাগল বকুলবালার।

এবার যাই ভাই। ওঁর আসবার সময় হ'ল আপিস থেকে, খাবার-টাবার কিচ্ছু করা হয় নি এখনও। এই চণ্ডী, ওঠ্—

চণ্ডী সবিস্ময়ে নানা রকম পাখির ছবি দেখছিল। কি অদ্ভুত সব পাখি!

এটা কি পাখ?

ধনেশ।

বকুলবালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন।

ধনেশ আবার পাখির নাম হয় নাকি! ধনেশ বলতেই মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের ধনেশ ময়রাকে—মোটা কালো গোলগাল, দেখলেই মনে হ'ত একটা তরমুজ বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই বলত, খুকী, পানতোয়া খাবে? চল তা হ'লে দোকানে। আমি তাকে দেখলেই ছুটে পালাতাম। এ তো অদ্ভুত পাখি দেখছি, ঠোঁটের ওপর একটা আবের মত রয়েছে। চণ্ডী, তুই উঠবি কি না বল্, না উঠিস তো আমি একাই চললাম।

বকুলবালা চণ্ডীর সঙ্গে চ'লে গেলেন। ডানা একা ব'সে ব'সে বকুলবালার কথাই ভাবছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার মেয়েটিকে। অনিবার্যভাবে রূপচাঁদের কথাটাও তার মনে হচ্ছিল। ওই রকম প্যাঁচোয়া লোকের এত সরল স্ত্রী! এমন চমৎকার সহজ সরল স্বাস্থ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পেয়েও ওঁর এমন কাঙালপনা কেন? মনে হ'ল, সহজ সরল ব'লেই হয়তো

মনের মিল হয় নি। হাবভাবময়ী লীলাকুশলা হ'লে হয়তো পছন্দ হ'ত। হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। ছুটতে ছুটতে বকুলবালাই এসে হাজির হলেন আবার।

একটা কথা আপনাকে মানা করা হয় নি। ওঁর কাছে যেন ভুলেও কক্‌খনও বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।

কেন?

ওরে বাবা, খেয়েই ফেলবেন তা হ'লে আমাকে। কোথাও যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।

হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই, তা হ'লে পাঠাব কি ক'রে আপনাকে?

চণ্ডে আসবে নিতে। মাঝে মাঝে ও এসে খবর নিয়ে যাবে। এই চণ্ডে, ভুলিস না যেন—

না।—চণ্ডী সাগ্রহে মাথা নেড়ে জানালে যে, কিছুতেই তার ভুল হবে না।

চললুম, ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি।

বকুলবালার সমস্ত মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

চললুম ভাই, তা হ'লে।

আসুন। মাঝে মাঝে আসবেন লুকিয়ে। আমি রূপচাঁদবাবুকে কিছু বলব না।

আচ্ছা, আসব। চণ্ডে, চল্, আমরা ওই বাগানটার ভেতর দিয়ে যাই। রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায়—রোদ প'ড়ে গেছে তো, লোক চলাচল শুরু হয়েছে—

বেশ, তাই চলুন।

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা চ'লে গেলেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন আর একবার। তারপর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য মেয়েটি! বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন বাড়ে নি। দেহটা যেন মনের ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না,

ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে খেয়ালও নেই। একটু যেন ঈর্ষা হ'ল। মনে হ'ল, আধুনিকতার অতি সভ্য জটিল মানসিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের কারু-কলায় যার নিত্য নূতন রূপ বিকশিত, এই সরলতার কাছে হার মেনেছে। গাছের ফুলের কাছে কাগজের ফুল দাঁড়াতে পারে কখনও? অকারণ ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর মনে হ'ল, পাখির পালক বিষয়ে যে প্রবন্ধটা সে ফেঁদেছিল সেটা খানিকটা লেখা হয়ে প'ড়ে আছে। শালিক পাখির বাসাটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল, বকুলবালাকে নিয়ে কাটল আরও খানিকক্ষণ। এইবার পাখির পালক নিয়ে পড়া যাক। সময় কাটানোটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ফিরে পাখির পালক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অমরবাবু একগাদা বই দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অকূল পাথার। কিন্তু এ অকূল পাথারে কষ্ট হয় না, নব নব বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে মন। সাপ যে সরীসৃপ-শ্রেণীভুক্ত, সেই সরীসৃপই যে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে পরিণত হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, অথচ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলছেন। সরীসৃপদের গায়ের আঁশই নাকি পালকের রূপ ধারণ করেছে! সরীসৃপ-পূর্বপুরুষদের আঁশ পাখিদের গায়ে এখনও বর্তমান, পাখিদের নখও নাকি আঁশ থেকে হয়েছে, কোন কোনও পাখির ঠোঁটও। এদের ঠোঁট নাকি খোলসও ছাড়ে বছরে বছরে সাপের মত। এ সব কথা কল্পনাতীত ছিল তার, অথচ সবই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে সরীসৃপ বুক দিয়ে মাটিতে হাঁটত, সে-ই ক্রমশ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে শিখল, তারপর লাফিয়ে গাছে চড়ল, তারপর উড়ল আকাশে। আকাশ পেরিয়ে আর কোথাও যাবে নাকি? কিংবা হয়তো গেছে, এখনও জানা যায় নি। আকাশচারী হয়ে এদের চঞ্চলতা তো বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঘ্রাণশক্তি নাকি কমেছে। তাই এরা দুর্গন্ধ স্থানে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, দুর্গন্ধ পোকামাকড়ও গিলে খায় স্বচ্ছন্দে। ঘ্রাণশক্তি ক'মে গিয়ে একটা

বাধাই যেন অপসারিত হয়েছে, জীবনকে আরও তীব্রভাবে উপভোগ করতে পারছে ওরা। বস্তুত পাখির মত অমন স্বতঃস্ফূর্ত চঞ্চল প্রাণের প্রকাশ প্রকৃতির আর কোনও প্রাণীতে আছে কি? পাখির আসল পরিচয় ওর প্রাণলীলায়। যতক্ষণ জেগে থাকে স্থির থাকে না এক মুহূর্ত। নেচে গেয়ে লাফিয়ে উড়ে রঙের বাহার ছড়িয়ে ও যেন সর্বদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি শুধু বেঁচে নেই, আমি জীবনটাকে উপভোগ করছি। পালক ওদের এই অতিদ্রুত ছন্দ-মুখরিত বর্ণ-বিচিত্র জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। এই পালক ওদের গায়ের লেপ (ওদের পালক চুরি ক'রে আমরাও লেপ তৈরি করি), এই পালক ওদের যানবাহনও, পালকের সাহায্যেই ওরা ওড়ে। এই পালকের সাহায্যে ওরা শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে পালকের রঙ বেমালুম ভাবে মিলিয়ে দিয়ে ওরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। জীবন্ত পাখিটাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, বুঝি ঝোপের ভিতর ওটা বোধ-হয় আলোছায়ার কারিকুরি—বনমুরগী নয়, কিংবা গঙ্গার চরে ওগুলো বালির ঢেউ—টিট্টিভ নয়। এ ছাড়া পালকের সাহায্যে ওরা প্রণয়লীলাও করে নানা রকম। পুরুষপাখি নানা বর্ণের পক্ষ বিস্তার ক'রে আহ্বান জানায় প্রণয়িনীকে। প্রণয়িনীও সাড়া দেয় পালকের ইশারায়। অনেক পাখি পালক দিয়ে বাসাও তৈরি করে ডিম পাড়বার সময়। মোট কথা, পাখির জীবনে পালক অপরিহার্য, ওই ওদের ব্যক্তিত্ব। দু জাতের দু রকম পাখি পালকের জন্যই দু রকম, পালক ছাড়িয়ে ফেললে কোনও তফাত থাকে না আর বিশেষ। পালকের রঙের বিষয়েও একটা আশ্চর্য কথা চোখে পড়ল তার। সাধারণত প্রাণীদের শরীর থেকেই রঙ তৈরি হয়। পাখিরও হয়। কিন্তু অনেক পাখির পালকের এমন গঠন-বৈচিত্র্য যে, সূর্যালোকই সেই পালকে প'ড়ে ভেঙে যায় এবং সূর্য্যালোক-ভাঙা-রঙ তখন প্রতিফলিত হয় পালক থেকে। আকাশে যেমন আমরা রামধনুর রঙ দেখি, অনেকটা তেমনই। রঙটা আলোর, পালকের নয়। সব পাখির পালকে অবশ্য এমন আলোর

লীলা হয় না, কোন কোন পাখির পালকের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ রকম হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর একটা কথা চোখে পড়ল। অদ্ভুত কথাটা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে পৃথিবীর জীবেরা নাকি বোবা ছিল, তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে অনেক পরে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে এখনও অনেকেই মূক। তাদের কণ্ঠে ভাষা নেই। তাদের অনেকে শব্দ করে বটে, কিন্তু তা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় না, হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। পতঙ্গরা শরীরের এক অংশ অন্য অংশে ঘর্ষণ ক'রে শব্দ করে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট উভচরেরাই সর্বপ্রথমে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছিল। মত্ত দাদুরীরাই গান গেয়েছিল প্রথম এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রণয়িনীকে আহ্বান করা।

কবি এসে ঢুকলেন হুড়মুড় ক'রে।

মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

কি ?

সেই খুনের ব্যাপারটার তদ্বির করতে এখন ছুটতে হবে আমাকে সদর এস. ডি. ও.র কাছে। কি বিপদ বল দিকি! অমরেশবাবু এক ভীষণ ঘানিতে জুড়ে দিলেন আমাকে দেখছি। তোমাকেও। তোমার জন্যেও একটা দুঃসংবাদ এনেছি। একটা হুতোম প্যাচা কিছু খাচ্ছে না। মালীর ভার্সন অবশ্য, তুমি গিয়ে একটু দেখে এস। মালীটা বেশ মুটিয়েছে দেখলুম। প্যাচার বরাদ্দ 'কিমা'টা ওই খাচ্ছে কি না কে জানে!

ব'লেই কবি নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডানার মুখের দিকে চেয়ে—রোদের তাতে ডানার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

কি দেখছেন ?

তোমাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে। এই নিদারুণ রোদে একটা অদ্ভুত রূপ ফুটেছে তোমার। দাঁড়াও।

ব'সে পড়লেন টেবিলের ধারে এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

মরুভূমির তপ্ত বায়ে
গোলাপ ফোটে কাঁটার বনে
পথিক শুধু হারায় দিশা
অসম্ভবের আমন্ত্রণে
মরীচিকায় বয় নদী যে
স্বচ্ছধারা অলীক খাতে
কাঁটার বনে গোলাপ জাগে
পথিক-অলির প্রতীক্ষাতে।
লগ্ন জাগে কোন্ আকাশে
কোন্ বাঁশরীর কোন্ সুরে যে
বলতে পারে সেই কবি সে
কাছে থেকেও রয় দূরে যে।

কবিতাটা প'ড়ে ডানা বললে, এটা কি হ'ল ?

হ'ল একটা যা হোক কিছু। গোলাপের সঙ্গে প্রলাপ মেলাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পারলাম না। হাতে সময় নেই এখন। চললুম। তুমি প্যাঁচাটার খবর নিও একটু।

কবি চ'লে গেলেন। ডানা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কবিতাটা পড়লে আর একবার। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। অদ্ভুত প্রকৃতির ভদ্রলোক। বাপের বয়সী, অথচ ছেলেমানুষের মত মন। কোনও কুমতলব আছে ব'লে মনে হয় না, অথচ কেমন যেন··· !

(ক্রমশ)

"বনফুল"

ভ্রম সংশোধন

আষাঢ় সংখ্যার ২৩৫ ও ২৩৮ পৃষ্ঠায় 'অমরবাবু'র স্থানে 'আনন্দবাবু' হবে।

মরে-মরে মূর্তি

বর্ষা নামল।

ফুটি-ফাটা মাটি ভিজল। ভাজা-ভাজা শরীর ঠাণ্ডা হ'ল। গায়ের ঘামাচিও কমলো। মানে, প্রাণ বাঁচল। আর বাঁচল মান।

মান! হ্যাঁ গো, মান-সম্মান বাঁচল। কেমন ক'রে? বলছি।

সেদিন কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কি কুক্ষণেই যাচ্ছিলাম! দেখি, দু-তিনজন বিদেশী সাহেব ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার মনীষী স্থরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের পাথুরে মূর্তিটার দিকে চেয়ে। বিরাট কালো মূর্তিটার সারা অঙ্গই ধূলিধূসরিত, দুই ঘাড় বেয়ে সাদা সাদা দাগ, শুকনো কাক-পুরীষ, মাথার উপর তখনও একটা কাক।

আমি থমকে থেমে গেলাম।

কিন্তু ওই সাহেবদের মধ্যে দুজন যখন ক্যামেরা উঁচিয়ে মূর্তিটার ছবি নিতে যাচ্ছে দেখলাম, তখন লজ্জায় যেন পাথর ব'নে গেলাম। রামের পদস্পর্শে অহল্যা যেমন পাথর থেকে মানুষের রূপ পেয়েছিলেন ফিরে, আমিও তেমনই জ্ঞান ফিরে পেলাম বিবেকের পদাঘাতে। 'কি দেখছিস, যা না তাড়াতাড়ি ওখানে'-গোছের একটা তাগিদ পেয়েই ছুটে গেলাম সাহেবদের কাছে। চিৎকার ক'রে বললাম, ডোণ্ট টেক্।

হোয়াট?

ফোটো।

হোয়াই?

নো ল'।

ইজ ইট?

ইয়েস।

সাহেবরা ক্যামেরা গুটিয়ে নিয়ে চ'লে গেল। আমিও অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কানে এল ভারী গলা: ওহে ছোকরা, শোন।

ঘুরে দাঁড়ালাম। কাউকে দেখলাম না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার কথা: ওপর দিকে দেখ না চেয়ে। হেড আপ বয়!

উপরের দিকে চেয়ে দেখি, সুরেন বাঁড়ুজ্জে মিট্ মিট্ ক'রে হাসছেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম যেন।

সুরেন বাঁড়ুজ্জে বললেন, ফোটো তোলা কি আন-ল'ফুল ?

আমি আমতা আমতা ক'রে বললাম, না— না।

বাঁড়ুজ্জে। তবে সাহেবদের মানা করলে যে ?

আমি। মানের দায়ে।

বাঁড়ুজ্জে। কেন, ওরা তো অপমান বা মানহানিকর কিছু করে নি! আমার ছবি নিয়ে দেশে দেখাতে চায়।

আমি। তা তো বটেই। আর সেই সঙ্গে আপনার সারা গায়ের নোংরা আর ওই মাথার ওপর কাকটারও ছবি উঠত।

বাঁড়ুজ্জে। বটে! এতই যদি ভাবনা তবে আমার মূর্তিটাকে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করলেই তো পার। তোমরা এত রকম ব্যাপার নিয়ে হৈ-হৈ করতে পার আর এটা পার না? অবশ্য আমি এখন সুখ-দুঃখ-নিন্দা-প্রশংসার বাইরে। তোমার মাথা-ব্যথা দেখেই বললাম।

আমি। বললেন যা ভালই। কিন্তু আজকালকার খবর তো আর রাখেন না, তাই ওসব বলতে পারলেন। আমরা আজকাল নিজেরা ইচ্ছে ক'রে কিছুই করি না, আইন করলে তবে করি।

বাঁড়ুজ্জে। কি রকম ?

আমি। এই আইন হ'ল ব'লে সিনেমায় সিগারেট খাওয়া বন্ধ। আবার নতুন আইনে বাসে ট্রামেও বন্ধ করেছি সিগারেট। কেউ মীটিং ক'রে বা অনুনয় ক'রে পারে নি। আইন নেই ব'লে কেউ পারে না আমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা বন্ধ করতে, ফুটপাথে কেউ চলি না।

বাঁড়ুজ্জে। তা আইন করলেই হয়।

আমি। আজ্ঞে, ওইখানেই মজা। আইন করলেই যে মানবো, এমন কথা দিতে পারি না। খেয়াল হয় মানবো, নইলে নয়। ৫ আইন মানি ? সরু গলিগুলোর যে কি দুর্গন্ধ, তা আর আপনি এই ময়দানে দাঁড়িয়ে কি বুঝবেন! তার ওপর পাথুরে নাক আপনার। বেঁচে গেছেন।

বাঁড়ুজ্জে। ইংরেজ আমলে আমরা আইন অমান্য করতে শিখিয়েছিলাম, আজ মজ্জায় মজ্জায় বাঙালী তা শিখে নিয়েছে দেখছি। আজকাল কাগজে বাংলার বড় বড় লোকদের জীবন-কথা লেখা হচ্ছে বুঝি ?

আমি। আপনি জানলেন কি ক'রে ?

বাঁড়ুজ্জে। সেদিন কালবোশেখীর ঝড়ে কি একখানা বাংলা কাগজের একটা পাতা উড়ে এল আমার গায়ে, তাতেই দেখেছিলাম। তা এসব দিকে তোমরা যখন নজর দিয়েছ, তখন এই মূর্তিটার দিকে একটু নজর দিতে কি হয়েছে ? বিদেশীদের কাছে আর লজ্জার ভয় থাকে না।

আমি। ওই তো মজা। ওসব লেটেস্ট থিয়োরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার বুঝবেন না।

বাঁড়ুজ্জে। তা আমার সাধের কর্পোরেশন কি করছে ?

আমি। ক্রমেই ফাঁপছে।

বাঁড়ুজ্জে। তারা তো এদিকে নজর দিতে পারে ! তা ছাড়া স্বাধীন সরকার তোমাদের ?

আমি। আরে মশায়, জ্যান্ত মানুষদের নিয়েই আমরা সবাই হিমসিম খাচ্ছি, মরা মানুষের দিকে নজর দেবার সময় কোথায় ? নিজেদেরই বলে দাঁত মাজবার সময় না পাবার মত অবস্থা, আপনার পাথর ঘষবার সময় কোথায় বলুন ? তখন শখ হয়েছিল, মানে—হুজুগ হয়েছিল, হাতে পয়সাও ছিল, তাই মূর্তি গড়া হয়েছিল। তা ব'লে বরাবর সেটা পরিষ্কার রাখতে হবে, এসব কোন কথা ছিল কি ? তা ছাড়া নিষ্ফলা পাথরে তেল-জল মাখিয়ে লাভটা কি ? যথাস্থানে সে সব প্রয়োগ করবার তালে তালেবররা ব্যস্ত। গরু দুধ দিলে তবে তো ভুসি-খড় ; নইলে খোঁয়াড়।

বাঁড়ুজ্জে। খুব যে কথা শিখেছ ? ক্যারিয়িং কোল টু নিউ ক্যাস্‌ল ! মনে রেখো, আমি সে যুগের বিখ্যাত বাগ্মী ছিলাম।

আমি। আজ্ঞে, জানি। আর জানি ব'লেই জানাচ্ছি, কথা এ যুগেও সবাইকে শিখতে হয়। কম্‌পাল্‌সারি সাব্‌জেক্ট। এ যুগের পরম

অস্ত্র। ব্রহ্মাস্ত্র।···ভাল কথা মনে পড়েছে যেন, আপনাদের জন্ম না মৃত্যু দিনে মূর্তি ধুয়ে-মুছে মালা পরানো হয়, হা-হুতাশ করা হয় তো।

বাঁড়ুজ্জে। ও সব ভণ্ডামি। লোক-দেখানো ব্যাপার।

আমি। তাই বা ওই একদিন ছাড়া, অন্য সব দিনে দেখাতে পারি কই? তাই তো সাহেবদের হটাতে হ'ল।

বাঁড়ুজ্জে। জানতে ইচ্ছে করে, আমার মত ভাগ্যবান আরও আছেন নাকি?

আমি। তা আছেন। দুঃখ করবার নেই কিছু। সকলকেই সমান অবস্থায় রেখেছি। কেউ কাউকে হিংসে করতে পারবেন না।

বাঁড়ুজ্জে। যথা?

আমি। এই ধরুন, বিদ্যেসাগর, সার্ আর. এন্., আশু মুখুজ্জে, কেষ্টদাস, ডেভিড হেয়ার, গিরিশ ঘোষ, বীরেন শাসমল। তবে সাদা মূর্তি যাঁদের, তাঁদের গায়ে কাকের নোংরামিটা ততটা বোঝা যায় না, এই যা রক্ষে। আর মুশকিল হয়েছে, আপনাদের তিন জনকে নিয়ে। এই সার্ আর. এন্., আশু মুখুজ্জে আর আপনি।

বাঁড়ুজ্জে। কি রকম?

আমি। একবারে সদরে কিনা! বিদেশীদের চোখে ফট্ ক'রে প'ড়ে যান তাই। আশু মুখুজ্জে আবার এক বিদেশী আলো-কোম্পানি আর এক বিদেশী খবরের কাগজ-অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কালো চেহারা নিয়ে। ওই কাগজটা আবার যখন-তখন যা-তা ফোটো তুলে ছাপায়। তাই তাঁর জন্মদিনে পাল খাটিয়ে একটু বেশি ভড়ং দেখাতে হয়।

বাঁড়ুজ্জে। তা ভড়ং দেখাবার দরকার কি? মূর্তিগুলো তুলে ফেললেই তো হয়?

আমি। সে আর ভাবতে হবে না, দিন ঘনিয়ে এল ব'লে। কলকাতার শহরে বলে জ্যান্ত মানুষ দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না— পাথুরে বড় বড় চাঁই রেখে লাভ কি?

বাঁড়ুজ্জে। তা কার্জন পার্কের খানিকটা জায়গা তো খাবলে নিলে ট্রাম কোম্পানি!

আমি। নেবে না? এটা চলার যুগ, থামতে গেলে ধাক্কা খেতে হয়। অচল এখানে চলে না। আর যদি চলেই তা ব্যাকিংয়ের জোরে।

বাঁড়ুজ্জে। আমিও তো এখন অচল, চলৎ-শক্তি-হীন। ব্যাকিংও নেই। কি হবে?

আমি। প্যাকিং ক'রে কোন গোডাউনে সরাতে হবে। সত্যি, এই সব মূর্তি করা মানে জাতীয় অর্থনষ্ট। তা ছাড়া পরিষ্কার না রাখতে পারলে বিদেশীদের কাছে মাননষ্ট।

বাঁড়ুজ্জে। তুমি ছোকরা বুঝি জাতীয়তাবাদী?

আমি। আজ্ঞে, সত্যবাদীর মত যদি বলতে হয়, তবে কি বাদী যে আমি নিজেই জানি না। বাদী-বিবাদীর সংমিশ্রণ। সুবিধেবাদী বলতে পারেন। এ যুগে বাঁচবার ওই একটিমাত্র 'বাদ'ই প্রশস্ত। ওইটি বাদ দিলে একেবারে নো-হোয়ার!

'নো-হোয়ার' বলতেই—'সো হোয়ার অ্যাম আই'-গোছের একটা ভাব মনে হঠাৎ উঁকি মারলে। কাকটাও দেখি যথারীতি মূর্তিটার ঘাড়ে সদ্য নোংরামি ক'রে কর্কশ গলায় খা-খা ক'রে উড়ে গেল। সুরেন বাঁড়ুজ্জে হা-হা ক'রে বাজখাই গলায় হেসে উঠলেন। না, না, মেঘগর্জন ক'রে উঠল। আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল কে জানে! ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু খানিক ছোটবার পরই কিসে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলাম। কোন রকমে উঠে দেখি, একখানা কর্পোরেশনের সীমানার পাথর—সি. সি লেখা।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই সঙ্গে মেঘগর্জন। সুরেন বাঁড়ুজ্জের হাসি নাকি? বিদ্যুতের হঠাৎ আলোয় দেখলাম, বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে মূর্তিটা চকচক করছে।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সিনারা

(Ernest Dowson)

কাল রজনীতে আরেক জনেরে বাঁধিতে বাহুর পাশে,
হেরিনু তোমার ছায়া যে, সিনারা ! মৃদু তব নিশ্বাস
পরাণে পশিল—সুরাপান আর চুম্বন-অবকাশে ;
তখনি স্মরিনু কেহ নাই মোর ! সব গান সব হাসি
বিরস করিল সেই পুরাতন বেদনার উচ্ছ্বাস ;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি ।

সারা রাত তার তপ্ত সে বুক শ্বসিল বুকের 'পর,
সে ছিল মগন আলস-লালসে আমারি আলিঙ্গনে,—
পণ্য হ'লেও বড় যে মধুর বধূর বিম্বাধর !
তবু মনে হ'ল বড় একা আমি, সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি'
উঠিল আবার, জাগিনু যখন ধূসর উষার ক্ষণে ;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি ।

ভুলিনু সকল—ছুটিনু সহসা মত্ত ঝটিকাসম,
ছিঁড়ে ছড়াইনু রাশি রাশি ফুল ফুর্তির ফোয়ারায়,
মাতিনু নৃত্যে—ঐ ম্লান মুখ স্মরণে না আসে মম ;
তবু মনে হ'ল বড় একা আমি, দংশিল পুন আসি'
বুকে সেই ব্যথা—দীর্ঘ সে রাতি কাটিতে যেন না চায় !
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি ।

আমি যে তখন সুরার গরল, সুরের আগুন চাই !
তার পর যবে উৎসব-শেষে দীপমালা নিবে যায়,
তোমারি সে ছায়া নামে ধীরে ধীরে, সারা রাত হেরি তাই ;
অমনি শূন্য মনে হয় সব—সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি'
অধীর করে যে তব প্রিয়-মুখ-চুম্বন-লালসায় ;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি ।

মোহিতলাল মজুমদার

সংবাদ-সাহিত্য

"This madness, which seemed to be the judgment of heaven, was the signal for a revolt. The people rose, and ran to arms: and Babylon, which had been so long immersed in idleness and effiminacy, became the theatre of a bloody civil war."—Voltaire.

অর্থাৎ, এই পাগলামি, যাহা বিধাতার নির্বন্ধ বলিয়া বোধ হইল, হইল বিপ্লবের শঙ্খধ্বনিস্বরূপ—সূচনা। জনতা জাগিয়া উঠিল, অস্ত্র ধরিতে ছুটিল: এবং যে ব্যাবিলন এতদিন আলস্যে ও কাপুরুষতায় নিমজ্জিত ছিল, সহসা রক্তাক্ত গৃহ-সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইল।

কাহার পাগলামি? 'প্রবাসী' (শ্রাবণ, ১৩৬০) বলিতেছেন—

"...ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি ওজুহাত মাত্র। সাধারণের জীবন দুর্বহ হইবার বহু কারণ রহিয়াছে এবং সে সকল কারণ ট্রামভাড়া অপেক্ষা পরিমাণেও অধিক এবং জীবিকার সহিত ঘনিষ্ঠতর ভাবে যুক্ত। জীবন ধারণের প্রধান সমস্যা অন্নবস্ত্রের। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুইয়েরই দাম বাড়িয়াছে—বিশেষতঃ বস্ত্রের। অথচ ইহা লইয়া কোনও আন্দোলন হয় নাই, দৈনিক সংবাদপত্রেও ধারাবাহিকভাবে বিষোদ্গার হয় নাই, যেমন এখন কয়েকটিতে চলিতেছে।...

"একদিকে জীবিকানির্বাহের কঠোর পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে যুক্ত বাঙালী জীবনের ব্যর্থতা ও বেকার অবস্থা, অন্যদিকে অতৃপ্ত ক্ষমতা-লালসা এই আগুন জ্বালিয়াছে। আমরা কিছুদিন যাবৎ ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া চলায় এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, ইহার পরিণতি কোথায় তাহা ভাবিবারও চেষ্টা করিতে পারিতেছি না। মানুষের শরীর ও মন রোগাক্রান্ত হইলে ক্রমাগত উত্তেজকের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আমাদের জাতীয় জীবন ও মনের অবস্থা ক্রমে ঐ দিকে চলিয়াছে।...আজ অপ্রিয় সত্যের কোনও সমাদর নাই, আছে মদিরার চাহিদা—সংবাদপত্রে ও 'নেতা'র বচনে। নেতার বচনে ও সংবাদপত্রের কলমে উত্তেজকের পরিবেশনে অপরিণত মস্তিষ্কের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী এবং উহাতে দেশে

মাৎস্যন্যায়ের প্রবর্তন হইবেই জানিয়াও কি 'সারকুলেশন'-দেবতার সম্মুখে সব কিছু আহুতি দিতে হইবে? কাজ-কারবার বন্ধ হইলে সংবাদপত্র বা কিনিবে কে?"

কিন্তু এইখানেই কি "পাগলামি কাহার" সেই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হইয়া গেল? ব্যাবিলনের শাসনভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ পাশ্চাত্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর মতো আমরাও মনে করি—

"Politics is not in my line : I have always confined myself to doing my little best to make men less foolish and more honorable.·· I am tired of all these people who govern states from the recesses of their garrets,··· these legislators who rule the world at two cents a sheet···unable to govern their wives or their households they take great pleasure in regulating the universe."

রাজনীতি আমাদেরও বিষয় নয়। আমরাও চিরকাল সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি মানুষের মূর্খতা ঘুচাইয়া তাহাকে অধিকতর আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন করিতে। চিলেকোঠায় চিৎ হইয়া অবসর যাপন করিতে করিতে যাহারা রাজ্যশাসন করে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরাও হদ্দ হইয়াছি; কারণ আমরাও জানি, ইহারা দু পয়সার চোথা কাগজের মারফৎ পৃথিবী শাসন করিতে চায়, পত্নী [উপপত্নী ?] অথবা পরিবারকে শাসনে রাখিবার ইহাদের মুরোদ নাই, অথচ বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মহানন্দে ইহারা মশ্গুল।

তবে? আরও বহুজনে বহুরকম সন্দেহ করিতেছে। কেহ বলিতেছে, ঈস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের লড়াই ইহার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে, এবং বিপক্ষ নেতার পদচ্যুত আত্মীয়কে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গীয় অধিকর্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অতিশয় সুচিন্তিত। কেহ বলিতেছে, সুদূর উত্তরমেরু-সন্নিহিত স্বর্গাদপি গরীয়সী পিতৃভূমির আধুনিক কুৎসিত কেলেঙ্কারি ঢাকিবার জন্য সংশয়ান্বিত মাতৃভূমির

লোকেদের দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্টকরণার্থ প্রচ্ছন্ন শান্তিকামীদের ইহা কৌশলপূর্ণ চাতুরীমাত্র। কেহ বলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, পরাজিত নেতৃত্বের লোলুপ মুখব্যাদানসহ "দ্রংষ্ট্রাকরালানি"-বিস্তার। আরও অনেকে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব সত্য আজগুবি কথা বলিতেছে।

আমাদের মনে হয়, এ সব ছাড়াও কারণ আছে। সেটি কি তাহা স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'নবজীবন' পত্রিকায়, ১২৯১ সালের [১৮৮৫] মাঘ মাসে বলিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র কে, আজিকার দিনে অনেকেই হয়তো তাহা জানেন না; বঙ্কিমচন্দ্রই যখন হালে পানি পাইতেছেন না, 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "চন্দ্রালোকে"র লেখককে কে মনে রাখিবে? ইঁহার সম্পাদিত 'সাধারণী' 'নবজীবন' আজ ভয়ানক অসাধারণ এবং বিলকুল মৃত। "প্রাচীন পদসংগ্রহ"কার, 'গোচারণের মাঠ' 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' 'আলোচনা' 'শিক্ষানবীশের পদ্য' 'হাতে হাতে ফল' "পিতাপুত্র" 'সনাতনী' 'কবি হেমচন্দ্র' এবং 'রূপক ও রহস্যে'র লেখকেরও বাঙালীর স্মরণে থাকিবার কথা নয়। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ, তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বাঙালীর কাছে চিনাইবার এক অমোঘ উপায় প্রজাপতি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশ-কংগ্রেসের সভাপতি স্বনামধন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষের দাদামহাশয়। বর্তমান গোলযোগের কারণকে সম্বোধন করিয়া প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে তিনি বলিয়াছেন—

"ভাই…! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও,—তোমার…গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধ জলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই…আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?…ভাই, এমনই করিয়া কি বাঙ্গালার মুখ হাসাইতে হয়! কালামুখ…, তুমি ক্ষান্ত হও।…তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃতকার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।…ভাই! স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে

বীরপাত কারতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,—তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি ?”

আমাদের সমূহ দুঃখ; স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের কোনও রচনা হইতে বর্তমান হাঙ্গামার কোনও কারণ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না।

আমরা এদিকে মাথা ঘামাইয়া মরিতেছি, কিন্তু আমাদের নরেনদা—কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব—ইহা যে নিয়তির খেলা, এইরূপ যে অবশ্যই ঘটিবে “আড়াই হাজার বছর আগে”র ‘মহাস্বপ্নজাতক’ হইতে তাহার নজির আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে কতকটা আশ্বস্ত করিয়াছেন। গত জ্যৈষ্ঠের ‘ভারতবর্ষে’ ৪২৭-৪৩১ পৃষ্ঠায় এই নজির, “জগতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ভবিষ্যবাণী” তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গোড়ার কথাটা সংক্ষেপে বলিয়া লইয়া নরেনদার লেখা হইতে তুলিয়া দিতেছি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একদিন শেষরাত্রে পর পর ষোলটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদারুণ ভয়ে ভীত হইয়া স্বপ্নফল বিচারের জন্য শেষ পর্যন্ত জেতবনবিহারে অবস্থিত ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধদেব স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিলেন এবং স্বভাবসুলভ স্মিতমধুর হাস্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছেন, আপনার বা বর্তমান কালের সাহত তাহা সম্পর্কশূন্য। যাহা দেখিয়াছেন তাহা ঠিক ; কিন্তু ইহা সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। বহু শতাব্দী পরে এ দেশে এই সকল ঘটিবে। স্বপ্নানুযায়ী কি কি ঘটিবে তাহা তিনি রাজাকে বিশদভাবে নিম্নলিখিতরূপে বলিলেন, নরেনদার ভাষায়—

“সেদিন শাসকবর্গ অনাচারী ও অধর্মপরায়ণ হয়ে কর্মকুশল, সুপণ্ডিত, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অমাত্যবর্গকে রাজকর্ম পরিচালনা থেকে অবসর দিয়ে তাদের অমর্যাদা করবে। ধর্মাধিকরণে, শুল্ক নিরূপণে, শিক্ষাভবনে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যবহারবিদ্‌ বয়োবৃদ্ধদের নিযুক্ত করবে না। বরং এঁদের বিপরীত লক্ষণযুক্ত, অধৈর্যস্বভাব তরুণদের সমাদর বাড়বে। তারাই রাজ্যের নানা উচ্চপদে প্রাতষ্ঠিত হবে।…ভার বহন ক’রে নিয়ে দূরে

যেতে সক্ষম, বলিষ্ঠ বলিবর্দদের বয়স হয়েছে ব'লে উপেক্ষা ক'রে তাদের স্কন্ধের জোয়াল খুলে নিয়ে তরুণ, অক্ষম ও দুর্বল বলিবর্দদের স্কন্ধে তুলে দিলে যা হয়, এখানেও তাই ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় শকট অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ!...সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অসম্মানের পাত্র হয়ে উঠবেন। যাঁরা অকুলীন ও অপাংক্তেয় তাঁরা উচ্চপদে নিযুক্ত হবেন। এ সময় সদ্বংশীয়দের হবে দুর্গতি এবং নীচকুলোদ্ভবদের হবে উন্নতি।...সেদিন পৃথিবীর অত্যন্ত দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে মহারাজ! দেশের শাসকেরা নিঃশেষিত রাজকোষ নিয়ে বিব্রত বোধ করবে। ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টায় তাদের কৃপণতা বাড়বে।...অভাবগ্রস্ত শাসক-সম্প্রদায় নানা ভাবে জনসাধারণের কাছে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করবেন। প্রজারা উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হবে। তাদের শ্রমজাত ধান চাউল গম যব প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য কেড়ে নিয়ে রাজভাণ্ডারে জমা করা হবে। তাদের গৃহের মরাইগুলি শূন্যই থেকে যাবে।...তখন শাসক সম্প্রদায় অধর্মপরায়ণ হয়ে উঠে যথেচ্ছাচার করবে। অন্যায় ভাবে রাজ্যশাসন করবে। বিচারের সময় ন্যায়ধর্মের মর্যাদা রাখবে না। অর্থলালসায় উৎকোচ গ্রহণ করবে। প্রজা-সাধারণের প্রতি তাদের কিছুমাত্র দয়া মায়া বা প্রীতি থাকবে না। প্রজাদের নিষ্ঠুরভাবে এবং ভীষণভাবে পীড়ন ক'রে নানা অজুহাতে বিভিন্ন কর আদায় করবে। তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও শ্রমোৎপন্ন ধান্য কেড়ে নেবে। অত্যাচারে ও করভারে প্রপীড়িত প্রজারা শেষে নিজ নিজ গ্রাম ও নগর ছেড়ে রাজ্যের সীমানা পার হয়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় খুঁজবে। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জনপদসমূহ জনশূন্য হয়ে পড়বে।...সেদিন সকল বিষয়েই যারা অন্তঃসারশূন্য অলাবুপাত্র সদৃশ সেই সকল অপদার্থ লোকদেরই সারবান ব্যক্তি ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটবে।...সেদিন অলস ও বিলাসী এবং চরিত্রভ্রষ্ট রাষ্ট্রপরিচালকেরা দুর্বল ও দেশরক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়বেন।...অধার্মিক শাসক-গোষ্ঠীর আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয়পাত্রের দল সেদিন রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। দেশের প্রাচীনবংশীয় যত বুনিয়াদী জমিদারবর্গের যা কিছু ভূসম্পদ ও

ঐশ্বর্য সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করার নামে তারা আত্মসাৎ করবে।...মহারাজ, ভয় পাবেন না। এসব বহু বহু বৎসর পরে ঘটবে জানবেন।"

ভগবান তথাগতের কথায় রাজা প্রসেনজিৎ নিশ্চয়ই নির্ভয় ও শান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা? মনে হইতেছে, ভগবানপ্রোক্ত সেই দুর্দিন অন্তত বাংলা দেশে আজই সমাগত হইয়াছে। মুক্তির উপায় খুঁজিতে আজ আর যখন আসল বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইবার উপায় নাই, তখন আমাদিগকেই সমবেত চেষ্টায় বাঁচিবার রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং মহামতি ভল্‌টেয়ারের এই কথাগুলি সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে—

"It is impossible to settle these matters with simple and general formulae, or by dividing all people into fools and knaves on the one hand, and on the other, ourselves...Truth has not the name of a party."

কোনও একটা সহজ ও সাধারণ সূত্র বা মতের ছকে ফেলিয়া এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। একদল মানুষকে মূর্খ ও পাজি বলিয়া তফাত করিয়া দিয়া, আমরাই সব, আমরাই সব কিছু করিব—ইহা যাহারা ভাবিবে, তাহারা কখনই সমস্যা সমাধানে সফল হইবে না। চিরন্তন সত্য কোনও দল বা পার্টির একচেটিয়া নহে, ইহা সকলের। সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য লোক বাছাইয়ের ক্ষমতা অধিকারীদের নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু যথেচ্ছাচারিতার বশে কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না।

আজ (২৭. ৭. ৫৩) সকালে দীর্ঘ তিন বৎসর পরে কোরিয়ার ধিকিধিকি-তুষানল নির্বাপিত হইল; কিন্তু আমাদের এই পোড়া কলিকাতার মাত্র সাতাশ দিনের কাগজের আগুন এখনও নিবিল না। অমন যে বাঘা সিংম্যান রী, তিনিও আপোসে রাজী হইলেন; কিন্তু আমাদের শ্রীহেমন্ত বসু আপোসহীন সংগ্রাম চালাইয়া বাসের ধাক্কায়

আমাদের মত বুড়াদের হাড়মাস পৃথক করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। রামপ্রসাদের ঢঙে কালীসঙ্গীত লিখিয়া অনবরত গাহিতেছি; কিন্তু তাঁহার মত সাধনার তেজ নাই, তাই কাজ হইতেছে না। তেমন দরদ দিয়া গাহিয়া কেহ যদি মাকে গলাইতে পারেন, এই আশায় গানটি পত্রস্থ করিতেছি—

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা,
মোদের কেউ নাই মা, হেথা-হোথা।
ঠাঁই মেলে না কোনো বাসে
ভিড় হয়ে যায় টার্মিনাসে,
কনুই-গুঁতো খাই দু-পাশে,
হ'ল সারা অঙ্গ ভোঁতা।
কিনেছিলাম প্রমাণ মাপে
কাঁচি ধুতি, ভিড়ের চাপে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে—ঘামের ছাপে
হ'ল গামছা বাঁধিপোতা।
সুবুদ্ধি দাও হেম-সুরেশে
সত্য-বিবেক উঠুক হেসে
ভাঙুক এ 'ঘট সর্বনেশে
চলুক লোহার লাইন-পোঁতা।
আমরা আবার চ'ড়ে ট্রামে
পূজো দিই গে তোমার নামে
যেখানে মন্দিরের বামে
আদিগঙ্গা ক্ষীণস্রোতা॥

—

রক্তকরবীর রাজকীয় কক্ষের লৌহজালাবরণ অকস্মাৎ আরও বড় রাজার রুদ্র দৃষ্টিপাতে যেদিন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, সেই দিন হইতেই কৃমিলীন কক্ষের ভয়াবহ কৃমিগুলা কিল্‌বিল্ করিয়া বাহির হইয়া সারা বিশ্বের ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে। সে নারকীয় প্রবাহের শেষ

এখনও হয় নাই। আমরা মোদ্দা কথা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, অল ওয়াজ নট ওয়েল ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক। কিন্তু ঘন কৃষ্ণমেঘের রৌপ্যপাড়ের মত রাষ্ট্রধারক দুইখানা কাগজের দুই-একটা টুকরা সংবাদ আমাদিগকে ইহারই মধ্যে বিস্মিত, আশান্বিত ও পুলকিত করিয়া তুলিতেছে; নিরেট লোহা স্নিগ্ধ বায়ু-পরিমণ্ডলে পরিণত হইতে প্রয়াস পাইতেছে, হে অমৃতের পুত্র মানুষ, তোমাদের আর ভয় নাই। **এখানকার** অন্ধবিশ্বাসীদের চোখের মোহাঞ্জন চোখের জলে ধুইয়া ফেলিবার সততা দেখাইতেছেন **ওখানকার** সাহসীরা। ওখানে সব বিরাট, সব বিপুল, সব মহৎ—ইহা শুনিতেই যাহারা এতকাল অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা আজ সহসা শুনিতে পাইতেছে—সোভিয়েট দেশে আজ সাহিত্য মৃতপ্রায়, সাহিত্যিকেরা প্রোপাগাণ্ডা-সাহিত্য নির্মাণের উন্মাদনায় আত্মভ্রষ্ট, সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি স্তব্ধ। সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের ধর্মানুমোদিত কর্তব্য পালন করিতেছেন না। আর একদিন সংবাদ আসিল, ওখানে নাট্যশিল্প অবনত হইয়াছে, প্রচারের পাপচক্রে রঙ্গমঞ্চও কলুষিত হইয়াছে। তাহা হইলে এতদিন শুনিয়া আসিলাম কি! এত 'সোভিয়েট লিটারেচার' এত 'স্ট্যালিন-প্রাইজ,' বাংলা ভাষার এত অনুবাদ, সবই কি বিফলে গেল? পর্বত কি মুষিক প্রসব করিয়াছে? গোগোল পুশকিন লারমনটফ টুর্গেনিভ ডস্টয়ভস্কি চেখভ টলস্টয়ের কবরে কি আবার সবুজ ঘাস গজাইতেছে? কেচালভ আইজানস্টাইন কি পুনর্বিচার পাইবেন? ট্রট্স্কির নাম কি আবার শুনিতে পাইব?

—

অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে নিঃসংশয়ে সতীসাধ্বী পতিব্রতা জানিয়াও প্রজাকুলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নির্মমভাবে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, আজ রামরাজ্যের প্রতিভূ অযোধ্যার শ্রীজওহরলাল ভিন্ন আচরণ করিতেছেন! কাশ্মীরী ভ্রাতা শেখ আবদুল্লাকে সন্দেহাতীত জানিয়াও শ্যামাপ্রসাদের অপমৃত্যু-

জনিত পরীক্ষায় ফেলিতে রাজী হইতেছেন না। যেখানে রহস্য নাই, সমস্তটাই দিবালোকের মত স্পষ্ট বলিয়া তিনি নিজে অবগত হইয়াছেন, সেখানে পাঁচজন সাধু ভদ্র (তাঁহারই নিয়োজিত) বিচারক রহস্য ও অভিসন্ধি খুঁজিয়া বাহির করিবেন—ইহা কখনই হইতে পারে না। শুধু যদি মান-অপমানের প্রশ্ন হয়, সীতার যদি অপমান না হইয়া থাকে, শেখ আবদুল্লারও হইবে না। আর অপমান হইলেই বা কি? ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রজার স্থান সর্বাগ্রে, তাহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য সহধর্মিণী, ভ্রাতা, পুত্র সকলকেই এ দেশে বলি দেওয়া হইয়াছে। 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া'র লেখককে ভারতীয় ঐাতহ্যের কথা স্মরণ করাইতেও আমরা লজ্জিত হইতেছি।

—

দিল্লীর মসনদের এমনই গুণ যে, তাহার আশেপাশে যাঁহারা বেঞ্চিতে টুলে মোড়ায় বসিবারও অধিকার পাইতেন তাঁহারাও একটু সেক্‌সী (Sexy) হইয়া উঠিতেন। বিশ্বাস না হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ুন। লজিকে বলে, যাহা সেযুগে হইত, মধ্যযুগে হইয়াছে, তাহা আজও হইবে। সুতরাং হুমায়ুন কবির সাহেব-সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার গায়ে যদি একটু আঁসটে গন্ধ লাগিয়াই থাকে তাহাতে দোষ হয় না। দিল্লীর রাজকর্মচারী হিসাবে ইহা তাঁহার গুণ, দোষ নহে। আমাদের আপত্তি তাঁহার নামে, হুমায়ুন বেচারী একটু সাত্ত্বিকপ্রকৃতির ছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা, আর কবির তো নামকরা সাধুসন্ত। সম্পাদক মহাশয়ের নামটি জাহাঙ্গীর গালিব হইলেই 'চতুরঙ্গে'র রঙ্গমঞ্চে মানাইত ভাল।

—

ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এখনও মাঝে মাঝে ভুলিতে পারেন না যে, তিনি লক্ষপতি রাজ্যহীন নবাব মতিলালের আদরের দুলাল। তখন অভিমানে তাঁহার ঠোঁট ফুলিয়া উঠে, মেজাজ চড়ে সপ্তমে। তখন দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট অথবা লোকসভা, কংগ্রেসের

সভাপতির চেয়ার অথবা ফরাস যেখানেই তিনি বসিয়া থাকুন, তাঁহার মনে হয়, তিনি পিতার বৈঠকখানাতেই বসিয়া আছেন এবং আশেপাশে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার তাঁবেদার-হুকুমবরদার। উড়িষ্যার শ্রীবিশ্বনাথ দাস নিশ্চয়ই মতিলাল-লালের এই দুর্বলতার কথা জানেন এবং জানিয়া এ.আই.সি.সি.-সভায় তাঁহার অশোভন অবাঞ্ছিত দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। শ্রীজওহরলালের মতে হিন্দু-কোডবিলের প্রবর্তনের প্রয়োজন যদি স্বতঃসিদ্ধও হয়, তথাপি এ.আই.সি.সি.র সভা কিছু জ্যামিতির ক্লাস নয় যে, তিনি মাস্টারের মত চোখ রাঙাইবেন! অনেকের মতে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এবং মানভূমের বঙ্গভুক্তিও তো স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা এই দুই ব্যাপারে মাস্টার মহাশয়কে যুক্তির পর যুক্তি অবতারণা করিতে দেখিয়াও সমান ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্রজনবিগর্হিত ব্যবহার করিতে পারেন! কিন্তু আসলে হিন্দু-কোডবিল স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য নয়। অনেকের মনেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় আছে। ভারতবর্ষের সব ভগিনীই তো শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মত উদারহৃদয় এবং মহিয়সী নহেন, সব কন্যাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মত শিক্ষিতা ও সংস্কৃতিবতী নহেন; সুতরাং অশিক্ষা ও কুসংস্কারের রন্ধ্রপথে পরিবারে ভাঙনের বিপদাশঙ্কা যদি কেহ করেনই তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সমাজ বড় বিচিত্র জীব, বিধবাবিবাহের মত অমন একটা স্বতঃসিদ্ধ ভাল ব্যাপার আইন করিয়া বাংলার সমাজের উপর চাপাইয়াও তাহা চালু করা যায় নাই। হিন্দু-কোডবিলের মত একটা ব্যাপার আইনে পরিণত করিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ ভাবনা-চিন্তা যুক্তিতর্ক করিয়া লইতে হইবে বইকি! কংগ্রেসে নাম লিখাইলেই কি সামাজিক ব্যাপারেও স্বমতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তবে এত সভা, সমিতি, অধিবেশন, বৈঠকের প্রয়োজন কি? প্রেসিডেন্টের ফতোয়াতেই তো সব কাজ হইতে পারে।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিতলালের অনুবাদ-কবিতাটি

শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের নিকট পাইয়াছি। দীর্ঘকাল পূর্বে একটি পত্রিকায় প্রকাশার্থ তিনি কবিতাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। যত দূর মনে হয়, ইহা অন্যত্র আর বাহির হয় নাই।

—

'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখ জানিবার জন্য অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন। সকলের অবগতির জন্য জানাই, ইহা বাংলা মাসের ১৫ই এবং ইংরেজী মাসের ১লা তারিখের পূর্বে প্রকাশিত হয়।

STOP PRESS

ট্রাম সম্বন্ধে শেষ সংবাদ আনিল আমাদের সনাতন। সনাতন নাম হইলে কি হইবে, সে এখন চরম প্রগাতবাদী। রক-কন্‌ফারেন্সে আমরা কয়েক জন বৃদ্ধ কলিকাতার বর্তমান পরিবহন-দুরবস্থা সম্বন্ধে হা-হুতাশ করিতেছিলাম। সনাতন পাশে দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল, আমরা লক্ষ্য করি নাই। প্রসঙ্গটা ট্রাম চালু করা সম্বন্ধে উঠিতেই সনাতন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—ট্রাম আর চলবে না মশাই। শুধু ট্রাম কেন, ট্রেনও চলবে না। দু দিন বাদে দেখতে পাবেন। ট্রাম পয়লা জুলাই থেকে বন্ধ না হ'লেও দু দিন পরে হ'ত—হ'তই।

সনাতনের কথায় আমরা হতচকিত ও বিচলিত হইয়া পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সনাতন ওয়াকিবহাল ছোকরা। সারা বিশ্বের সংবাদ তাহার নখাগ্রে। ভাবিলাম, সে নিশ্চয়ই পাকা খবর যোগাড় করিয়াছে। সনাতন আমাদের ভাবিবারও অবকাশ দিল না। সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিল, শুনুন মশাইরা, শুধু এ দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে ট্রেন ট্রাম এ সব আর চলবে না, চলবে না, চলবে না—

ভাবিলাম, এ বুঝি আবার একটা নূতন ধ্বনি—স্লোগান আরম্ভ হইল। বিমূঢ়ের মত শুনিতে লাগিলাম—

শুনুন মশাই, পাতা লাইনে আমরা আর কাউকে চলতে দেব না। মাথায় টিকি বাঁধা অবস্থায় চোখ বুজে লাইন ধ'রে কেউ গড়গড়িয়ে চলবে অর্থাৎ চালিত হবে, এই বর্বর বুর্জোয়া অত্যাচার আমরা চলতে দেব না। যে যেদিকে ইচ্ছে যেমন খুশি যাবে—ঠিক বাসের মত, জীপের মত।

যেখানে যত লাইন সব আমরা তুলে দেব; একনিষ্ঠতা সতীত্ব এ সব সনাতন ভণ্ডামি আর চলবে না—

"চলবে না, চলবে না" হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে সনাতন তো চলিয়া গেল, একদল চ্যাংড়া পাশের মাঠে ঘুড়ি উড়াইতেছিল, তাহারাও লাটাই-সুতা-ঘুড়িসুদ্ধ তাহার পিছু লইয়া "চলবে না, চলবে না" চিৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আমরা কয়েক জন আনন্দবাজার-যুগান্তর-বসুমতী-স্বাধীনতা-হীন অন্ধকারে বসিয়া ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সম্বিৎ ফিরিলে দেখিলাম, সনাতন কয়েকটা ছাপা হ্যাণ্ডবিল ছড়াইয়া গিয়াছে। একটা টানিয়া লইয়া পড়িলাম—

চলবে না, চলবে না, চলবে না।
টিকির জোরে লাইন ধ'রে
চলা কারু চলবে না।
উপড়ে ফেলো লাইন সব,
আইন-ভাঙার ওঠাও রব,
কেঁদেই মরুক টাটা-স্কব,
হৃদয় মোদের গলবে না।

কোরাস। ভাঙো লাইন, ভাঙো লাইন,
ভাঙো লাইন, নও-জোয়ান,
ভাঙো আইন, ভাঙো আইন
ভাঙো ডাহিন, বাম-জোয়ান।
ভুয়া ভগবানের দোয়া,
সিঁথেয় সিঁদুর, হাতের নোয়া—
ছেলের হাতে-এ সব মোয়া
দিতে এলেই বলবে, "না"।

কোরাস। ভাঙো লাইন,······ইত্যাদি।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০।

আদর্শ
লিভার টনিক
ORCL'S
QUMARES
লিভারের রোগে কুমারেশ
নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় —কিন্তু
সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম
প্রয়োজনীয় নয়। কুমারেশ
অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য
করে এবং সুস্থ অবস্থায়
লিভারকে সবল ও কর্মক্ষম
রাখে।
কুমারেশ
ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

...র অভাব সর্বপ্রথমেই আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করছে—তা হচ্ছে **সঙ্গীতের ইতিহাস**", বিশেষ ক'রে ভারতীয় সঙ্গীতের, কেননা বিশ্বসঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তার অনস্বীকার্য। সে অভাব পূর্ণ করার প্রথম সহায়করূপে আত্মপ্রকাশ করলো **স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি"** পুস্তকখানি। মূল্য দশ টাকা

রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মকামী সাধকদের যে ধ্যানলোকেরই পবিত্র প্রতিচ্ছবি, ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর মূর্তি ও চিত্রে তাদের চাক্ষুস রূপ-কল্পনা ও নানা রস রূপের প্রতিকৃতি অবলম্বন ক'রে এক একটী রাগিণীর রূপ-সত্তার ব্যাখ্যা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর **"রাগ ও রূপ"** পুস্তকখানিতে। মূল্য আট টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দলনিরপেক্ষ সাপ্তাহিক

সম্পাদক—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী

...নীতি, সাহিত্য, ... ও কৌতুকরচনা, ..., কবিতা, উপন্যাস ...তি সপ্তাহের বৈশিষ্ট্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অপরাজিতা প্রকাশিত হইতেছে

বাংলার বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিকগণ নিয়মিত লেখক।

বর্তমানে যে সর্বাত্মকবাদ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে— তাহার তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং সে সম্পর্কে সত্যের সন্ধান পাইবেন—"লৌহ যবনিকার অন্তরালে" ও "বাঁশের কেল্লার দেশে"।

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা — নগদ মূল্য দুই আনা

ভারতের সর্বত্র রেলওয়ে-বুক-ষ্টলে ও জেলায় জেলায় এজেন্টদের নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য পাঠাইয়া বা ভি.-পি.তে গ্রাহক হওয়া যায়।

পূজা-সংখ্যা বহু রচনাসম্ভারে সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ইহার অন্যতম আকর্ষণ।

১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

অমলা দেবী : সাহিত্যক্ষেত্রে এঁর আত্মপ্রকাশ মাত্রেই সকল শ্রেণীর পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল, এত শক্তিশালী যাঁর লেখা তিনি কি ছদ্মনামে কোনও পুরুষ লেখক নন ? এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনেও উঠেছিল। অমলা দেবী স্বয়ং অবশ্য এর উত্তরে নীরব থাকতেই চান। অমলা দেবীর গল্প আমাদের ঘরেরই কথা। আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনাবোধ নিয়েই সেগুলি রচিত। মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র অঙ্কন এবং বিশ্লেষণ অমলা দেবীর রচনার প্রধান গুণ। সহজ সুরের গল্পের মাধ্যমে তিনি নিপুণ হাতে প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে যান, তাই তাঁর রচনা নিমেষমধ্যে পাঠকের চিত্ত জয় ক'রে নেয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা আন্তরিকতায় ভরা, তাতে অযথা জটিলতা আমদানি ক'রে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা তাঁর নেই।

'সুধার প্রেম' লেখিকার অতিপরিচিত একটি করুণ উপন্যাস। তরুণ-তরুণীর প্রেম ও তার পরিণতি নিয়েই এর কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে। বইটি কাহিনীগুণে চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছে। 'সরোজিনী' আর একখানি বিচিত্র উপন্যাস। সদ্য-প্রত্যাগত বিধবা সরোজিনীকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে যে উৎসাহের সাড়া প'ড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সকলের উন্মুখ দৃষ্টির সামনে সরোজিনীর কি অবস্থা হ'ল—এর কাহিনী তাই নিয়েই রচিত। সরোজিনীর রূপ-যৌবন-অর্থ কিছুরই অভাব ছিল না—গুণগ্রাহী লোকেরও তাই অভাব হয় নি তার জীবনে। 'মনোরমা' গল্পগ্রন্থ কয়েকটি বড় গল্পের সঙ্কলন। বাংলা-সাহিত্যের সুবিখ্যাত 'স্যাড়া', 'চন্দ্র ডাক্তার', 'নান্যঃ পন্থা' প্রভৃতি গল্পগুলি স্থান পেয়েছে এতে। 'স্বাধীনতা-দিবস' একখানি নূতন-প্রকাশিত গল্পের বই। অমলা দেবীর কয়েকটি অধুনা-রচিত গল্প এতে আছে। ছোটগল্পের রসিক যাঁরা তাঁদের অবশ্যপাঠ্য। অমলা দেবীর সর্বোত্তম এবং বিরাটতম উপন্যাস 'কল্যাণ-সঙ্ঘ' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এর গল্পাংশ সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে রচিত। দেশের হিতকামী কয়েকটি যুবক-যুবতী দেশের স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা যা চাইল তা পেল কি না তারই বেদনামধুর কাহিনী। একসঙ্গে এতগুলি চরিত্রের এত সুন্দর বিশ্লেষণ আর কোন উপন্যাসেই হয় নি। 'শেষ অধ্যায়' অমলা দেবীর নবতম উপন্যাস। স্বাধীনতা-আন্দোলনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'মাস্টার মশায়ে'র বিচিত্র জীবনের কাহিনী।

সুধার প্রেম ১॥০ সরোজিনী ৪৲ মনোরমা ১॥০
স্বাধীনতা-দিবস ৪৲ কল্যাণ-সঙ্ঘ ৫৲ শেষ অধ্যায় ২৲

বনফুল : বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকৃৎদের মধ্যে বনফুলের স্থান অতি উচ্চে এবং তা চিরদিনের শ্রদ্ধায় আসন। নানা বিচিত্র টেকনিকে বিচিত্রতর কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে রূপায়িত ক'রে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা বনফুলের এবং বোধ করি একমাত্র বনফুলেরই আছে, আমাদের সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা বনফুলের আবির্ভাবে অবসিত হয়েছে পরিপূর্ণ সার্থকতায়। তাঁর বিচিত্র কল্পনাশক্তি বলিষ্ঠ লেখনীর সহায়তায় সাহিত্যে কয়েকটি নুতন রসের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য শিল্প ও রচনানৈপুণ্যে মনের ওপর স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে নেয়। আমাদের কল্পনা যার নাগাল পায় না, বনফুলের রচনায় তা অতি বাস্তব হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর সাহিত্য আমাদের আনন্দের উৎস, সেখানে নৈরাশ্য বা নিরানন্দের ছায়ামাত্র নেই। মানুষের সুখদুঃখ-দোলায়িত বিচিত্র জীবনের যে রূপ তিনি দেখেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন, তারই ওপরে কল্পনার রঙ চড়িয়ে বনফুলের সৃষ্টি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে।

বিচিত্র এক টেকনিকে লিখিত উপন্যাস 'মৃগয়া'। যথাক্রমে কাব্যে, গদ্যে, নাটকে লিখিত এর তিনটি পরিচ্ছেদ—গ্রামে, পথে, প্রান্তরে। বাংলা-সাহিত্যে নতুন ধরনের বই। 'তৃণখণ্ড' ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী, ডাক্তারের মনে নানা চিন্তার উদয়—উপন্যাসটি কাব্যধর্মী। 'কিছুক্ষণ' একটি সরস উপন্যাস। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের নানা বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রকে একের পর এক সাজিয়ে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়েছে। অল্প সময়ের অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তের কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে এতে। 'রাত্রি' রোম্যান্টিক ধরনে লিখিত সুবিখ্যাত উপন্যাস। বনফুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এটি। 'বৈতরণী-তীরে' লেখকের খণ্ড খণ্ড চিন্তার একত্র সমাবেশ। এ শুধু ভূতের গল্প নয়—বর্তমানের গল্প এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও। 'সে ও আমি' পূজা-সংখ্যা 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হওয়ার সময় সাহিত্যজগতে প্রবল আলোড়ন এনেছিল। সে কে? আমিই বা কে? উভয়ের বিচিত্র চিন্তার রসে সরস কাহিনী। আগস্ট-আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'অগ্নি'। এই উপন্যাসে বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছে। 'বিন্দু-বিসর্গ' ছোটগল্পের সেরা বই। বনফুলের অভিনব চিন্তাধারায় পরিচয় পাওয়া যায়। নতুন বই 'ভূয়োদর্শন' ছাপা হচ্ছে।

মৃগয়া ৩৲ তৃণখণ্ড ১৷৷০ কিছুক্ষণ ১৷৷০ রাত্রি ৩৲ বৈতরণী-তীরে ২৲
সে ও আমি ২৷৷০ অগ্নি ২৲ বিন্দু-বিসর্গ ২৲

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

ভাদ্র ১৩৬০ : দাম আট আনা

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস

Aug.-Sept. : Price As. Eigh

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

একখানা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস—**'মণ্ডলবাড়ী'**

গল্প ইত্যাদি লিখিতেছেন :—

"বনফুল"	শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্ত
শ্রীসজনীকান্ত দাস	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীকালিদাস রায়	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিজয়ভূষণ দাসগুপ্ত
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	শ্রীপ্রভাত বসু
শ্রীমতী অমলা দেবী	শ্রীঅখিল নিয়োগী
শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ	শ্রীরণজিৎ সেন
শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী	শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

এবং আরো অনেকে আছেন।

একখানি সম্পূর্ণ নাটক—**"মহাযুদ্ধের একাঙ্ক"**

কবিদের নাম পরে প্রকাশ করিব—সেখানেও বিখ্যাত কবিদের পাইবেন।

প্রবন্ধ লিখিবেন :—

চক্রবর্তী রাজাগোপাল, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া, হাতী সিং, ডাঃ সুশীলকুমার দে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ।

বিভিন্ন বিভাগীয় লেখকদের নামের জন্য অপেক্ষা করুন।

রসরচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক ?

চিত্র-শোভিত, সুসজ্জিত, বিভিন্ন বিভাগীয় লেখায় সমৃদ্ধ শারদীয় সংখ্যা

'এসিয়া'—

সাগ্রহে অপেক্ষা করুন।

২৫০ হইতে ৩০০ পৃষ্ঠার বই : **মূল্য মাত্র দুই টাকা**

এখন হইতেই গ্রাহক ও এজেন্টগণ তৎপর হউন। বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইতেছে।

ম্যানেজার (পূজা-সংখ্যা)
'এসিয়া'

১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা-১

সূচী

ভাদ্র—১৩৬০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালিন্দী ৪॥০ **গণদেবতা** ৪৲ **পদচিহ্ন** ৪॥০

আগুন ৩৲ কালিন্দী (নাঃ) ২৲ যুগবিপ্লব (নাঃ) ২॥০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেম ও পৃথিবী ৪৲

রক্তমদীঘির জমিদার বধু ৩৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমৃতস্য পুত্রাঃ ২॥০

বুদ্ধদেব বসুর

অসূর্য্যম্পশ্যা ২॥০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

তুঁহু মম জীবন ৪৲ উদয়ভানু ৪৲ জাগ্রত যৌবন ৩॥০

প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲ বহ্নিকন্যা ৩৲

নীহাররঞ্জন দাশগুপ্তের

সুশান্ত সা ৫৲

পলাতক ৪৲

প্রমথনাথ বিশীর

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲

শ্রীকান্তের ৫ম পর্ব ২॥০ ষষ্ঠ পর্ব ২।০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কেদার রাজা (উপন্যাস) ৪॥০

বিপিনের সংসার ৪৲

পথের পাঁচালী ৫৲

কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১৯২৪শে শুরু

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

স্বর্গের চাবি : খোশমেজাজের আমেজে পূর্ণ এই গল্পগুলিতে ধোঁয়ার কারবার নেই। স্বর্গের চাবি মর্ত্যবাসী প্রত্যেকেই সংগ্রহ করুন। তিন টাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রসকলি : তারাশঙ্করের প্রথম গল্প "রসকলি"। 'রসকলি'র গল্পগুলি অবাস্তব নয়—লেখকের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা। রসিকেরা পড়বেন। আড়াই টাকা।

শ্রীঅমলা দেবী

স্বাধীনতা-দিবস : অমলা দেবীর গল্প সর্বপ্রকার জটিলতাহীন এবং আন্তরিকতায় ভরা। এটি তাঁর অধুনারচিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। চার টাকা।

বনফুল

ভুয়োদর্শন : ভূয়োদর্শী বনফুলের অভিনব চিন্তাধারা এই খণ্ডরচনা ক'টিতে সরস ভাষায় সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। নতুন ছাপা হ'ল। তিন টাকা।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মধু ও হুল : মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে হুলের খোঁচা রসিক পাঠকের চিত্ত জয় করবে। গল্পগুলি পড়লে কৌতুকে মুগ্ধ হতে হয়। আড়াই টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাণুর গ্রন্থমালা : রাণুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ এবং কথামালা নিয়ে রাণুর গ্রন্থমালা। এই গল্পগুলি আমাদের শাশ্বত সম্পদ। রাণুর ১ম ভাগ ২॥০, ২য় ভাগ ২॥০, ৩য় ভাগ ৩৲ ও কথামালা ৩৲।

সম্বুদ্ধ

ডায়লেক্‌টিক : সম্বুদ্ধের গল্প সাহিত্যজগতে চমক এনে দিয়েছিল। 'ডায়লেক্‌টিক' ব্যঙ্গ ও রসের সমন্বয়ে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের সঙ্কলন। আড়াই টাকা।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আবর্ত : সাহিত্য-আস্বাদনে যাঁরা উন্মুখ 'আবর্ত' তাঁদের রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্তি দেবে। এ ধরনের গল্প বাংলায় নেই বললেই চলে। দু টাকা।

শ্রীআর্যকুমার সেন

অভিনেতা : 'অভিনেতা'র মিষ্টি সুরের গল্পগুলি পড়লে আনন্দ-অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। লেখক অল্প লিখেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। দু টাকা চার আনা।

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ : লেখক পুলিসের উচ্চপদে থাকাকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা গ্রন্থে কাজে লাগিয়েছেন। বাস্তব ঘটনা নিয়ে কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প। তিন টাকা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুবর্ত্তন ৪।০

মাত্র কয়েকটি শিক্ষকের ধর্ম ও কর্মকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষাব্রতী সমাজের বেদনাময় ছবি ফুটিয়ে তুলে লেখক যে অসামান্য দরদী শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যে তা দুর্লভ।

তৃণাঙ্কুর ২৸০

লেখকের নিজস্ব জীবনের দুর্লভ অনুভূতি চিত্র। চিন্তা ও শিল্পবোধের বেদ বলা চলে

ইছামতী ৬৲

দৃষ্টিপ্রদীপ ৫৲

সন্তোষকুমার ঘোষের

চীনে মাটি ৩৲

এই বইখানির প্রতিটি গল্পেই মানব-মনের গহন রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। মধ্যবিত্ত সমাজেরই মানুষ এঁর সাহিত্যের উপজীব্য। কাহিনীগুলি পাঠকের মনকে নাড়া দেয়, চিন্তায় দ্যোতনা আনে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

অ্যাল্‌বার্ট হল ৩।০

এখনকার কফিহাউস এক কালে বাংলা সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল—এই দুটি ধারার একত্র সমন্বয়ে বইখানি উপভোগ্য হয়েছে। এই ঘরে এখনও যাঁরা আসা-যাওয়া করেন তাঁরা পড়ুন।

অমিয়নাথ সান্যালের

স্মৃতির অতলে ৩।০

সঙ্গীতবিশারদদের বিচিত্র জীবনকাহিনী—উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র এবং জীবন্ত।

রূপদর্শীর সার্কাস

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীমতী বাণী রায়ের

পুনরাবৃত্তি ২।০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাত্রির তপস্যা (যন্ত্রস্থ) স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ২।০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

নিমন্ত্রণ ২৸০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

চড়াই উৎরাই ৩৲

কালিদাস রায়ের

ইন্দুমতী ৩৲

অনুরূপা দেবীর

মা ৬৲

ইণ্ডিয়া
ল্যাম্প, বেল,
ফর্ক-প্রভৃতির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রস্তুত কারক
ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যাঃ কোং লিঃ কলিকাতা-১

PERMANENT
BLUE-BLACK
Sulekha
SULEKHA WORKS LTD.
CALCUTTA

১,০০০,০০০ এরও বেশী
প্রমাণ

IEW

'প্যালুড্রিন'

ICI

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়, আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড কিনেছেন আমাদের আপিসে চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেইরকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

এখন এই খণ্ডগুলি পাওয়া যাচ্ছে:

ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ড ৮৲

১, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,

১৪, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

খ. সাধারণ কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই।

প্রতি খণ্ড ১১৲

১০, ১২, ১৩

গ. মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই।

প্রতি খণ্ড ১২৲

১০, ১২, ১৩

এতদ্‌ব্যতীত অনেকগুলি খণ্ড প্রস্তুত হইতেছে

বিশ্বভারতী

শনিবারের চিঠি

২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬০

বই

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকবারই রীতিমত গাম্ভীর্যের সহিত নোটিশ জারি করিয়াছি—কেহ বই পাঠাইবেন না, আমরা সমালোচনা করিতে পারিব না। কেন পারিব না, তাহাও একাধিক বার জানাইয়াছি। পারা সম্ভব নয়। আমরা, অর্থাৎ বাংলা দেশের মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা, প্রত্যেকেই শরৎচন্দ্র-প্রোক্ত রেঙ্গুনের চাকুরে বাবুদের কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ডের মত; অতি-প্রত্যূষে ঝি—ঘর ঝাঁট দি, হেঁসেলঘর নিকাই, বাসন মাজি, উনানে আগুন দি, জল তুলি, বাজার করি, কুটনা কুটি, বাটনা বাটি; একটু বেলা চড়িলে বামনী—রান্না করি, বাবুকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াই; বৈকালে কন্যা-ভগিনী—পরিপাটি করিয়া জলখাবার সাজাইয়া আপিস-ফেরত বাবুর ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর করি, প্রয়োজন হইলে আঁচলের বাতাস করি; গভীর রাত্রে আবার বামনীত্ব পরিত্যাগ করিয়া গৃহিণী শয্যাসঙ্গিনী সেবাদাসী, তখন কি যে না করি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না। আজকাল মাসিকগুলি শিশুবিভাগ খোলাতে সারাদিন ছেলে মানুষ করিবার হেফাজতও পোয়াইতে হয়। এমন সর্বগুণধরদের দ্বারা আর যাহাই হউক, পুস্তক-সমালোচনা হয় না। মলাট, ছাপাই এবং ছবির অধিক অগ্রসর হইবার সময় কোথায়? বাংলা দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলির সম্পাদকদেরও ওই এক অবস্থা, কারণ সাপ্তাহিকগুলি এখানে আর কিছুই নয়, মাসিকঘাত্রী প্রচ্ছন্ন মাসিক। দৈনিকগুলিও আবার সপ্তাহে একবার সাপ্তাহিক হয় এবং বছরে এক বা দুইবার পূজায় বড়দিনে বা দোলে তিমিঙ্গিলগিল মূর্তি ধারণ করিয়া রুই-কাতলা-হাঙ্গর-কুমির-তিমি-তিমিঙ্গিল সকল মাসিককেই গিলিয়া ফেলে। এই ভয়ঙ্কর শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে যথাযথ পুস্তক-সমালোচনা করার মত বিদ্যা বুদ্ধি বা সময়ের অবকাশ কোথায়? পক্ষে বা বিপক্ষে লিখিয়া এক ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ পত্রিকাগুলি করিতে পারেন এবং তাঁহারা এতকাল তাহাই করিয়া আসিতেছেন। 'ভারতবর্ষ' প্রতি মাসে

পরিশেষে পুস্তক-সংবাদ যাহা পরিবেশন করেন অন্যান্য সাময়িক পত্রে তাহারই বিস্তারিত রূপ দেখিতে পাই। কিছুদিন ধরিয়া সিগনেট বুক-শপ যে কাজ দক্ষতার সহিত করিয়া আসিতেছেন, অধুনা বেঙ্গল পাবলিশার্স ও অন্যান্য দুই একটি পুস্তক-প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান যে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, মাসিকপত্রগুলিতে তাহাই করা হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী দুই-একটি বাংলা পত্রিকায় ঘটা করিয়া 'টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র ধরনে পুস্তক-সমালোচনার চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু অতি-পাণ্ডিত্যে ফ্রেঞ্চ-জার্মান-রাশিয়ান ভাষার সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকের দিকে অত্যধিক নজর দিতে গিয়া তালেবররা তাল সামলাইতে পারিলেন না, সমালোচনাগুলি বাংলা ভাষায় দুর্বোধ্য হেঁয়ালিই হইয়া রহিল। যে 'টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র এত নাম, তাহাতেও ভারতীয় দুই-চারিখানি বইয়ের সমালোচনার যে নমুনা দেখিয়াছি তাহাও সেই বিজ্ঞাপন (অনুকূল বা প্রতিকূল)---আদর্শ সমালোচনা নহে। শুনিয়াছি, ভাল ভাল পত্রিকায় পুস্তকের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বই পাঠাইয়া সমালোচনা আদায়ের রীতি আছে; কিন্তু আমাদের যত দূর ধারণা, সে রীতি কার্যকরী নয়, বছরের পর বছর ধরিয়া সমালোচকের কাছে বই পড়িয়া থাকে, শেষ পর্যন্ত তাড়া খাইয়া সেই সম্পাদককেই কোনও প্রকারে ঠেলা সামলাইতে হয়। তাহা ছাড়া, ঝকঝকে নূতন বইয়ের, তা সে ভাল মন্দ যাহাই হউক, লোভ সামলানো বড় কঠিন, সুতরাং সমালোচকের গুণানুযায়ী নয়, মালিকানা স্বত্বের ক্রমানুযায়ী সমালোচনার বই বিলি হইয়া থাকে—তাহাতে সমালোচনা যাহা হয় তাহা মা-গঙ্গাই জানেন। যেখানে আমাদের মত এক ঢোল এক কাঁসি, সেখানে শুধু এই "মারাত্মক" বইয়ের লোভ সম্পাদককে সর্ববিদ্যাবিশারদ করিয়া তোলে। আধুনিক সংবাদপত্রের ভাষায় "হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব" হয়।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমরা নূতন বই সম্বন্ধে বার বার উদাসীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু চেষ্টা যে ফলবতী হয় নাই টেবিলে স্তূপীকৃত বহুবর্ণের বিচিত্র মলাট-শোভিত বইগুলি

তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। অমন চমকপ্রদ চেহারা ও চটক লইয়া আশমানিরা প্রেমের ভাণে গল্প করিতে থাকিলে আমাদের মতো ক্ষুধার্ত গজপতি-বিদ্যাদিগগজেরা "না না" বলিতে বলিতে ম্লেচ্ছের এঁটো ভাত দুই-এক গ্রাস নিজের অজ্ঞাতে মুখে তোলে এবং জাতি-পাতে এক গ্রাসও যা, এক থালাও তাই--এই বোধ জন্মিয়া শেষ পর্যন্ত মরিয়া হইয়া উঠে। আমরাও তাহাই হইতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের সুবুদ্ধি ও সদিচ্ছা বলিতেছে, পূজার বাজারে বইগুলার নামও তো পাঁচজনের মধ্যে প্রচার করিয়া দিতে পার, তাই দাও না। সাধারণ পাঠকেরা খবর জানিতে পারিবে এবং তোমরাও ধর্মের দায়ে মুক্ত হইবে। সেই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া বইগুলির এক-একটি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, খারাপ মাল বেচিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সাধু ব্যবসায়ীর সাফাই-গাওয়ার মনোভাবের প্রয়োজন ছিল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যই দ্রুত ক্রমোন্নতি হইতেছে। এত বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে এত বিবিধ ও বিচিত্র ধরনের বই বাংলা দেশে কখনই লেখা হয় নাই; এত উচ্চশ্রেণীর গল্প-উপন্যাসও একসঙ্গে ইতিপূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার খবর আজকাল কিছু কিছু রাখিবার চেষ্টা করি; যেটুকু খবর পাই তাহাতে ***The Story of Oriental Philosophy***র লেখক পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্য ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণে আসে--

"The value of the thought of Asia is daily more realized by Western thinkers. The demand for knowledge of its riches grows more and more insistent. The caravans still journey from the heart of Asia, carrying merchandise more to be desired than gold or jewels." এবং মনে হয় বাংলার হৃদয়-বন্দর হইতে শ্রীমন্ত সওদাগরের মধুকর-ডিঙার বহর ভাব ও চিন্তার পণ্য লইয়া এখনও পশ্চিম-পত্তনে

বাণিজ্য স্থগিত করে নাই। যে বিদ্যা বাঙালী আজিও শিখিল না, সেই বিদ্যায় পারদর্শী পাঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাটী ভাটিয়া মারোয়াড়ী মহাজনেরা স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তা হ্যাণ্ডনোট হুণ্ডি অপেক্ষা বাংলার এই চিন্তা-পণ্যের মূল্য সম্যক উপলব্ধি করিলে এখনও উপকৃত হইবেন। ইহা বাঙালীর সুলভ দম্ভ নয়, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা যে-কেহ এই উক্তির সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইবেন।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের টেবিলে যাহা দেখিতেছি তাহা প্রকাশিত পুস্তকরাজির সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। পুস্তক-সমালোচনা করিব না বলিয়া অনেককে বিমুখ করিয়াছি, অনেক লোভনীয় বই চাহিয়া-চিন্তিয়া লইতেও লজ্জায় বাধিয়াছে। যে সকল পুস্তক উপহার-স্বরূপ পাই নাই, স্বভাবতই সেগুলি আমাদের আলোচনার বাহিরে পড়িতেছে। এই মাসের মাসিকপত্রগুলির বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা হইতেই আন্দাজ পাইতেছি, পরিত্যক্ত বই সংখ্যায় বিপুল।

যাহা পাইয়াছি তাহারই মধ্যে দেখিতেছি, শ্রীতারকচন্দ্র রায়ের 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে'র তৃতীয় বা শেষ খণ্ড (গুরুদাস)। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যথাক্রমে গ্রীক দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন এবং নব্যদর্শন বিবৃত হইয়াছে। এই খণ্ডে সমসাময়িক দর্শন বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার দীর্ঘজীবনের অনন্যচিন্ত্য সাধনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে বাঙালীকে আর ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এই অঘটন যিনি ঘটাইলেন তিনি আমাদের সকলের নমস্য। আরাম-কেদারায় বসিয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে লেখক জল্পনা করেন নাই, রীতিমত কোমর বাঁধিয়া পাকাপোক্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, শুধু দর্শনের ঢিলা কারবারীদের জন্য নয়, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের সকল প্রয়োজনের উপযুক্ত করিয়া। দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর সরোজকুমার দাসকে বলিতে শুনিয়াছি, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রচলিত ইংরেজী ইতিহাসগুলি হইতে ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। আমাদের হাতের কাছে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ***History of Western Philosophy***, উইল ডুরাণ্টের ***The Story***

of Philosophy, এস. ই. ফ্রস্টের *The Basic Teachings of the Great Philosophers*, বেঞ্জামিন র‍্যাণ্ড সম্পাদিত *Modern Classical Philosophers* ও *The Classical Moralist* এবং এডউইন এ. বার্ট সম্পাদিত *The English Philosophers from Bacon to Mill* রহিয়াছে। ডুরাণ্টের দর্শনের কাহিনী উপন্যাসের মত সুপপাঠ্য, কিন্তু তিনি দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হন নাই, প্লেটো-প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী রচনা করিয়াছেন; রাসেলের ইতিহাস তাঁহার মনের রঙে একটু বেশি রঞ্জিত, ফ্রস্ট দর্শনের কাঠামো মাত্র খাড়া করিয়াছেন এবং র‍্যাণ্ড ও বার্ট দার্শনিকদের মূল রচনা সঙ্কলন করিয়া কাজ সারিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়ের ইতিহাস গভীরতর ও ব্যাপকতর। তাঁহার দ্বারা আর একটি মস্ত কাজ হইয়াছে—যাহা আগে কেহ করেন নাই, ইংরেজী অনভিজ্ঞ অথচ সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে ভারতীয় দর্শনে অভিজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ তিনি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারাও তুলনার দ্বারা প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ দর্শনের ভালমন্দ অতঃপর বিচার করিতে পারিবেন। কলেজসমূহে যেমন, দর্শনের টোল-গুলিতেও তেমনি ইহা পাঠ্য হওয়া উচিত। বইখানির আর একটি বিশেষত্ব ইহার সুচিন্তিত পরিভাষা।

অধ্যাপক জ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডীয় 'দার্শনিক জন লক' (এ. মুখার্জী) গ্রন্থে লকের "সহজ বোঝা"র দর্শন অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে লক তাঁহার সুবিখ্যাত *Essay Concerning Human Understanding* প্রকাশ করিয়া দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনেন। লকের জীবনী ও চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন।

যে শর্বরী-প্রভাতে বঙ্গদেশে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয় সেই প্রদোষ-প্রত্যূষের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশির যুদ্ধে' (নাভানা) এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের 'মহারাজা নন্দকুমারে' (রঞ্জন)। তপনমোহনের সুবৃহৎ ও সচিত্র বইখানি

'দেশ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় নিছক রচনানৈপুণ্যের জন্য সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুস্তকাকারে পড়িয়া বড়ই ভাল লাগিল। সরস গল্পচ্ছলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার বাহাদুরি তপনমোহন দাবি করিতে পারেন। ইহা একটা স্টাইলে দাঁড়াইবে, যাহার নাম হইবে তপনমোহনী স্টাইল। উপেন্দ্রনাথ সাদাসিধা সরলভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তিনি অনেক উপকরণ ঘাঁটিয়া অল্পপরিসরে নন্দকুমারকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগে মহিমান্বিত ভারতকে পুনরাবিষ্কারের যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। জার্মানিতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ১৯৩৩-৩৪ সনে ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিন হইতে নূতন করিয়া এই আবিষ্কারের কাজ চলিতে থাকে। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁহার "বুদ্ধকথা" সাহিত্যপিপাসু ঐতিহাসিকদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। আমরা পুস্তকাকারে 'বুদ্ধকথা' পাইবার জন্য দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। ইতিমধ্যে ডক্টর সেনের 'রাজগৃহ ও নালন্দা' ও 'অশোক-লিপি' ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি বা ভারত বিদ্যাবিহার হইতে ফাউস্বরূপ বাহির হইয়া আমাদের আনন্দবিধান করিয়াছে। বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি 'বুদ্ধকথা'ও বাহির হইতেছে। 'বুদ্ধকথা' বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ, 'অশোক-লিপি' উচ্চাঙ্গের নির্ভরযোগ্য গবেষণা। সচিত্র 'রাজগৃহ ও নালন্দা' তথ্যপূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে ডক্টর সেনের জ্ঞান যে মাতৃভাষায় পরিবেশিত হইতেছে, ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর এই বিষয়ে দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সম্ভবত একমাত্র বাঙালী, যিনি মূল চৈনিক উপকরণ লইয়া কাজ করিয়াছেন, তিব্বতীয় ভাষাও তাঁহার দখলে। তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' (বিশ্বভারতী) হীনযান, মহাযান, বজ্রযান ও সহজযান সম্পর্কে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিবে। পালি, তিব্বতী, চীনা, নেপালী, মঙ্গোলীয় ও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি সংক্ষেপ-পরিচয় দিয়াছেন।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অসমীয়া সাহিত্য' ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'জাভা ও বালির নৃত্যগীত' নানা খবরে ভরা; আমাদের নিকটতম ও দূরতম প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে বই দুইখানি আমাদিগকে কতকটা ওয়াকিবহাল করিয়া তুলিবে।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের মজলিশী কথিকার (talk) তারিফ অনেক শুনিয়াছিলাম। 'স্মৃতির অতলে' (মিত্রালয়) পড়িয়া প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। ওস্তাদ মৌজুদ্দিন, ফৈয়াজ খাঁ ও কালে খাঁকে তিনি সকল ঘর-ঘরাণাসহ জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

মনস্বী সারদাচরণের সুযোগ্য পুত্র শ্রীশরৎকুমার মিত্র (৮৫ গ্রে স্ট্রীট) প্রকাশিত শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র নূতন সংস্করণে এখন-পর্যন্ত সংগৃহীত বিদ্যাপতির যাবতীয় পদাবলী এবং এখন-পর্যন্ত গবেষণালব্ধ যাবতীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থখানিকে বিদ্যাপতি-কোষও বলা চলে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ ইং) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহায়তায় সারদাচরণ সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির কয়েকটি প্রচলিত পদ পুস্তকাকারে সংগ্রহ করেন। তৎপূর্বে বিখ্যাত জগদ্বন্ধু ভদ্র 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহ হইতে বিদ্যাপতিকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। তাহার পর গ্রিয়ারসন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় অনেক নূতন পদ ও সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। বিমানবাবু যথেষ্ট যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সংস্করণে সেগুলির ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা দেশে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনার স্তম্ভ হইতেছেন সারদাচরণ, নূতন পদাবলীর পুথিও তাঁহার চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং বাংলা দেশে বিদ্যাপতি-চর্চার গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। সম্পাদকেরা সে বিষয়ে কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু কোনও কোনও পদের অর্থনির্ণয়ে সারদাচরণ-অক্ষয়চন্দ্রের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা সমীচীন হয় নাই। নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও

সমালোচনা অকারণে রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বিদ্যাপতির বর্তমান সংস্করণ বাংলা-সাহিত্যের একটি রত্নখনি বলিয়া গণ্য হইবে।

সংস্করণান্তরে শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের 'শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান" (এ. মুখার্জী) শিক্ষাবিদ্‌দের পক্ষে একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ হইয়াছে।

'মনোবিদ্যার পরিভাষা' ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর শেষ কীর্তি। প্রকাশক ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি, ১৪ পার্সীবাগান লেন। মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত সমস্ত ইংরেজী কথার পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে।

'মনুসংহিতায় বিবাহ' (রঞ্জন) শ্রীঅমলকুমার রায়ের গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ফল। বিবাহ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য বাছাই ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তিনি সাধারণের সর্বদা ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীভুক্ত 'চিত্ত-বিকাশ', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা' ও 'বীরবাহু কাব্য' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ভূমিকা সংযোগে বইগুলি হেমচন্দ্র-সাহিত্যের ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে এখনও অঘটন ঘটাইয়া চলিয়াছেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। পুরাতন 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী'কে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাঁহারা 'চণ্ডীদাস-পদাবলী', 'বিদ্যাপতি-পদাবলী', 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' ও 'জ্ঞানদাস-পদাবলী' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে। নূতন প্রকাশিত 'মণিলাল-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ, 'জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী' ও 'নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী'র প্রকাশ "বসুমতী"র সেই চিরন্তন দরিদ্রচিত্ত-বিনোদন-অবদান হইলেও বইগুলি চেহারা পাইয়াছে আভিজাত্যের।

এখনও অনেক বাকি রহিল। কাব্য-গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা, সাহিত্যিকদের জীবন ও সাহিত্য-সমালোচনা এবং ধর্ম ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ আমাদের পরবর্তী উল্লেখের অপেক্ষায় রহিল।

আমার সাহিত্য-জীবন

(দ্বিতীয় পর্ব)

আমার সাহিত্য-জীবনের এক নূতন অঙ্ক আরম্ভ হ'ল। দেশ অর্থাৎ পল্লীর বাসভূমি, সেখানকার বিষয়ের উপর নির্ভরশীল জীবন, সেখানকার শতবন্ধন ছিন্ন ক'রে কলকাতায় ১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বাসা করলাম।

যা হয় হবে।

হয়তো এই জনসমুদ্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব বন্ধুদের মত। তাতেও মন দমিত হ'ল না। যাই যাব।

বাংলা দেশ এবং গোটা ভারতবর্ষ তখন অগ্নিগর্ভ, উত্তাপ বেড়ে উঠছে—বেড়ে উঠছে। সিউড়ী জেলখানা থেকে যে দিন মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসি, সেদিন রাজবন্দীদের সভায় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে বলেছিলাম, এ পথ আমার নয়। আমার পথ আমি চিনেছি। আমি সেই পথেই আমার যৌবনে-গৃহীত সংকল্পের সাধনা করব। সে পথ সাহিত্যের পথ।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে আমার সাহিত্য-সাধনার পথে সেই সংকল্পকে রূপ দিতে খানিকটা সার্থকতা লাভ করেছি। আমার 'ধাত্রী দেবতা' প্রকাশিত হয়েছে, সমাদৃত হয়েছে। 'কালিন্দী' তখন 'প্রবাসী'তে বের হয়ে প্রায় সমাপ্তির মুখে। 'কালিন্দী' আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে লোকের।

দেশের বিপ্লবী সম্প্রদায়ের চিন্তার ধারার সঙ্গে 'কালিন্দী' মিল রেখে চলেছে। মনে মনে অনুভব করতে পারছি, বিপ্লব আসছে—আসছে। 'কালিন্দী'র চিন্তাধারার সঙ্গে এ যুগের বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক সংঘর্ষ ও রূপান্তরের মিল আছে। কিন্তু তার মধ্যেও আছে অহিংসার উপর প্রত্যয়। ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে, কিন্তু সে হবে অহিংস বিপ্লব। পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব সংঘটন। মানবসভ্যতার কল্পনায় নূতন পট-পরিবর্তন। মানবসমাজের এক নূতন কূলে উত্তরণ।

এই সময়ে সকল সংঘটনের কেন্দ্রস্থল ছাড়া কোথায় থাকব আমি? জীবনে তখন বান এসেছে। লাভপুরের মানসহ্রদ থেকে সে অবশ্যম্ভাবী গতিতে ও স্বভাবে এসে মিশল মহানগরীর সংস্কৃতি-সাগরে।

এ যেমন একটা দিক, তেমনি আরও একটা দিক আছে।

লাভপুর-জীবনে তখন আমার প্রতি অবজ্ঞা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের অবজ্ঞা আমার জীবনকে ক'রে তুলেছে অসহনীয়। নিজের জীবনাদর্শের দিক থেকেও পৈতৃক স্বল্প বিষয়ের অন্ন এবং আশ্রয় অপ্রচুর হ'লেও গলাধঃকরণ করতে নিজেও নিজের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করি। এবং 'কল্লোলে'র কাল থেকে এ পর্যন্ত সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রে বহু স্থানে বহু অবজ্ঞা পেয়ে আসার পর এই কালে স্বীকৃতি পেয়েছি—তারও একটা আকর্ষণ ছিল।

১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়ির মালিক বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু, বরং একটু—একটু কেন, বেশ খানিকটা গোঁড়া হিন্দু। আচার-আচরণের অত্যধিক গোঁড়ামি ছাড়া মানুষটি বড় ভাল। সমস্ত জীবন খেটেছেন। প্রথমে নাকি বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে ইটের নৌকার, খড়ের নৌকার হিসেব-নিকেশ রাখতেন। পাঁচ টাকা সাত টাকা ছিল মাসিক উপার্জন। শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশনে অডিট ডিপার্টমেণ্টে বেশ ভাল মাইনের চাকরিতে উন্নীত হয়েছিলেন। পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে। আমার ভাগ্য যে এমন ভদ্র-পরিবারে বাসা পেয়েছিলাম। বলাইবাবুর স্ত্রীর মত এমন সহৃদয় স্নেহময়ী মহিলা বিরল। ছেলেমেয়েগুলিও তেমনই ভাল। বলাইবাবুর স্ত্রীকে বলতাম 'দিদি'। তিনি আমাকে 'দাদা' বলতেন। সাহিত্যিক ব'লে আমার প্রতি এঁদের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। ছেলেমেয়েরা বলত 'মামা'। আজও সে সম্পর্ক ম্লান হয় নি।

নীচেতলায় তখন থাকেন শ্রীনির্মলকুমার বসু। সামনে থাকেন শিল্পী-সাধক শ্রীযামিনী রায়। তার পাশেই 'অমৃতবাজারে'র বিরাট বাড়ি। আমাদের বাসাবাড়ির দক্ষিণে বলাইবাবুর বড় ভাইয়ের বাড়ি। সে

বাড়িতেও ভাড়াটে থাকেন কয়েক জন। তার মধ্যে ছিলেন 'যুগান্তরে'র নিউজ এডিটর শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

মোটমাট এমন একটি বাঞ্ছনীয় স্থান আমার ভাগ্যই আমাকে দিয়েছিল।

১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের জীবনের গতিবেগ অত্যন্ত খর। এমন প্রচণ্ড বেগে সে ব'য়ে গেছে যে, অনেক কথা হয়তো হারিয়ে গেছে, ভুলে গেছি। এই বেগকে আরও তীব্র ক'রে তুলেছিল পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনার গতিবেগ। সমস্ত যুদ্ধকালটাই এখানে কেটেছে।

* * *

বাসাটা করবার প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছিল আমার স্ত্রীর ঘুষঘুসে জর।

সাহিত্যিক ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য বাগবাজারেই থাকেন, তাঁকেই দেখালাম। পশুপতি ভট্টাচার্য আমার সমগ্র জীবনের অন্যতম পরম বন্ধুজন। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলাপ ছিল না, অর্থাৎ অন্তরঙ্গতা ছিল না। বরং বেশ একটু সংকোচ সমীহা ছিল। তবু পশুপতিবাবু সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যিক মাত্রকেই পরম আগ্রহের সঙ্গে দেখেন, এই হিসেবেই তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ভাল ক'রে দেখে-শুনে বললেন, জটিল ধরনের ম্যালেরিয়া, অন্য কিছু নয়। ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, অলঙ্গা মেডিকেল হল থেকে আনবেন। ইটালীয়ান ওষুধ। সেই ওষুধেই স্ত্রীর জর ছেড়ে গেল। মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি এবং একদিন বললেন, আর মাসখানেক থেকে বাড়ি যাই। কি বল?

এ কথা বলার হেতু কলকাতার বাসার খরচ এবং আমার আয়। সংসারে তখন আমরা স্বামী স্ত্রী ও চারটি ছেলেমেয়ে—ছ জন, এবং একটি ঠাকুর। স্ত্রীর ওই রুগ্ন দেহে রান্না করা অসম্ভব ব'লেই ঠাকুর আছে। ঠাকুরটি দেশের ছেলে।

খরচ খতিয়ে দেখা গেছে যে, অন্তত এক শো টাকা প্রয়োজন। বাঁধা

আয়ের মধ্যে সজনীকান্তের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা মাসে। 'ধাত্রী দেবতা'র প্রথম সংস্করণ সজনীকান্তকে তিন শো টাকায় বিক্রি করেছিলাম। আমার বড় ছেলে তখন এম. এ. পড়ত, তাকেই তিনি টাকাটা পঁচিশ টাকা হিসেবে দিতেন। কলকাতায় বাসা হতেই সনৎ—আমার বড় ছেলে বাসায় এল। সুতরাং ওই পঁচিশ টাকা হ'ল বাঁধা আয়। বাকি পঁচাত্তর টাকা অনিশ্চিত। একটু ভুল হ'ল। 'প্রবাসী'তে তখন 'কালিন্দী' বের হচ্ছে, তার একটা টাকা আছে। সে টাকাটা মাসে মাসে পাই না। 'প্রবাসী'তে 'কালিন্দী' লিখে বোধ হয় দেড় শো কি এক শো পঁচাত্তর টাকা মোট পেয়েছিলাম। সেকালে এই রকমই দক্ষিণার হার ছিল। গল্প লিখে পনেরো টাকা। উপন্যাসে এক বছরে এক শো কি দেড় শো। হয়তো ৺বিভূতিভূষণ কিছু বেশি পেতেন। ঠিক জানি না। এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে রেডিয়ো থেকে একটা দুটো বক্তৃতা পাই। দক্ষিণা তখন ছিল দশ টাকা। ঢাকা রেডিয়ো তখন সদ্য স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকেও বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসত। মনে আছে, ছ মাসের মধ্যে দুবার ঢাকা গিয়েছিলাম। ঢাকার বক্তৃতায় যতদূর মনে পড়ছে—তিরিশ টাকা কি পঁয়ত্রিশ টাকা দক্ষিণা দিতেন। ঢাকা যাওয়া-আসার খরচ বাদ দিয়ে বারো-চোদ্দ টাকা থাকত। অন্য প্রকাশক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দোকান থেকে দু টাকা, চার টাকা, বড় জোর পাচ টাকা নিয়ে আসতাম সপ্তাহে। তাতে পঁচিশ তিরিশ টাকা হ'ত। রেডিয়ো অনিশ্চিত। নিশ্চিত ছিল টাকা পঞ্চাশেক। তাই তিনি ও-কথা বললেন।

আমি বললাম, ভেবে দেখি। মন এতে সায় দিল না।

এখানে একটু ভেতরের কথা বলি। সেটা সেদিন স্ত্রীর কাছেও বলতে পারি নি। আমার স্ত্রী কিছু মাতৃধন পেয়েছিলেন। হাজার কয়েক টাকা। তিনি সেটাকে খরচ করতে চাইতেন না, কারণ দুই মেয়ে আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। আমার উপর ভরসা তিনি কি ক'রে করবেন! আমার ইচ্ছা ছিল, অভাব পড়লে ওই টাকা থেকে নিলে বাসাটা রাখা যায়। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না। লজ্জা হ'ল।

গেলাম সজনীকান্তের কাছে। বললাম, ভাই, আপনার দেখেছি এই লেখাপত্র বাছাই করা বা দেখে-শুনে ফেরত দেওয়া—এ নিয়মিত হয় না। মধ্যে মধ্যে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি দেখে-শুনে দিই। উপস্থিত আমারও কিছু বাঁধা আয় প্রয়োজন। আপনি আমাকে একটা চাকরি দিন। মাসের বাড়ি-ভাড়া পঁচিশ টাকা—আপনি ওই টাকাটাই আমাকে দেবেন, আমি আপনার কাজকর্ম ক'রে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বললেন, খুব ভাল কথা। আজ থেকেই লেগে যান।

সেই দিনই লেখার রেজেস্ট্রি খাতা তৈরি ক'রে, লেখা বাছাইয়ের কিছু কাজ ক'রে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললাম, বাসা তুলতে হবে না। চাকরি পেয়েছি।

স্ত্রী দেবতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচটা পয়সা তুলে রাখলেন।

তিন মাসের পর কিন্তু দেবতা বিমুখ হলেন। পাঁচ পয়সায় তিনি কত দিন সদয় থাকবেন! তিন মাস পর সজনীকান্ত বললেন, ভাই, একটা কথা বলব?

বললাম, বলুন।

সংকুচিত হয়েই বললেন, আর চালাতে পারছি না।

সত্যই সজনীকান্তের অবস্থা তখন ভাল নয়। 'শনিবারের চিঠি' তখনও জন দুই-তিনের বেশি লোক পুষতে পারে না। তাতে তিনজনের বেশিই লোক সজনীকান্তের আছে। তিনি নিজে, প্রবোধ নান, দ্বারেশ শর্মাচার্য, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও হিসেব-নিকেশের জন্য সজনীকান্তের দাদা আছেন। তার উপর শাকের আটির মত আমি চেপেছি।

সজনীকান্তের কথায় হেসে বললাম, বেশ, তাই হবে। মাসের মাইনেটা যে পাওনা ছিল, সেটার কথা না তুলেই চ'লে এলাম। সজনীকান্তের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্র বড় একটা উপস্থিত হয় না আমার জীবনে। সেটা হয় না প্রীতির জন্য এবং আমার জীবনের

একটি বিশেষ বিশ্বাসের জন্য বা নীতিবাদের জন্য। সেটির দীক্ষা হয়েছে আমার মায়ের কাছে, বাল্যজীবনেই। মা শিখিয়েছিলেন, পরের কথায় পাথরকে দেবতা ব'লো না। আবার পরের কথায় দেবতাকে পাথর ব'লো না। যাকে দেবতা ব'লে জেনেছ, তাকে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানের বশে এক মুহূর্তে অবিশ্বাস ক'রো না। পাথরে আলোর ছটা বাজলেই তাকে মানিক ভেবো না। বেলোয়ারী কলমে সাত রঙের আলো ঝলমল করে, কিন্তু বেলোয়ারী কলম মানিক নয়—কাচ। সংসারে বিশ্বাস ক'রে ঠকা ভাল, অবিশ্বাস ক'রে ঠকতে নেই। কাউকে বিশ্বাস করলে সে যদি ঠকায় তবে ক্ষতি তোমার হবে, কিন্তু মাথাটা সোজাই থাকবে। কাউকে অবিশ্বাস ক'রে যদি ঠকতে হয়, যাকে চোর ভাবলে সে যদি সাধু হয়, তবে তোমার মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে; মনের মধ্যে নিজেকে নিজে তিরস্কার ক'রে পার পাবে না।

কলকাতায় বাসার শুরু ৬ই বৈশাখ। তিন মাস কেটে গেছে তখন। এরই মধ্যে এইটুকু বুঝেছি যে, প্রকাশকদের কাছে ঠিক ঠিক হিসেব ক'রে টাকা নিতে পারলে চ'লে যাবে কোন রকমে। কষ্ট কিছুটা হবে। সে হোক। আমার জীবন-সাধনায় তখন ধ্যানযোগের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা নেমেছে। জীবনের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ আপনা থেকেই সাড়া তুলতে সংকুচিত হয়। সংকল্প দৃঢ়কণ্ঠে শাসনবাক্য উচ্চারণ ক'রে তাদের থামিয়ে দেয়।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অভাব দেখা দিলে অধ্যাপক নির্মল বসুর কাছে দু-চার টাকা ধার করি, আবার শোধ দিই। তা ছাড়া আমার সামনেই আমার বাসার উঠানের দেওয়ালের ওপাশেই সাধক শিল্পী যামিনী রায়—আমার যামিনীদাদার বাড়ি। যামিনীদাদা জীবন-সাধনায় নিদারুণ অভাব দুঃখ সহ্য ক'রে অবিচলচিত্তে হাসিমুখে আমার চোখের সামনে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর জীবনের কঠিনতম কালের কথা আমার শোনা কথা, সে আমি চোখে দেখি নি; শুনেছি সংসার চালাবার জন্যে বিস্কুট লজেন্স ইত্যাদির ছোট একটা দোকান করতে হয়েছিল। আর বাড়ির

মধ্যে চলত তাঁর শিল্পসাধনা। আমি যখন এলাম তাঁর পাশের বাড়িতে, তখন ওই অবস্থা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, জীবনযুদ্ধে সগু শক্ত মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার অবকাশ পেয়েছেন। কিন্তু যে কাল প্রতিষ্ঠা দেন, তাঁর পরীক্ষার প্রহার তখনও শেষ হয় নি। তিনি প্রহার ক'রে চলেছেন তখনও। তাঁর বাড়িতে, শিল্পরসিকই বলুন আর শৌখিনজনই বলুন, মানুষদের তখন আনাগোনা শুরু হয়েছে। তাঁরা আসেন, বসেন, তারিফ করেন, চ'লে যান। এই পর্যন্ত। যামিনীদাদার সহধর্মিণী সত্যই সহধর্মিণী। এক হাতে কাজকর্ম রান্নাবান্না সব চালান। যামিনীদাদা আমার দৃষ্টান্ত। পরোক্ষে অভয়দাতা। উত্তরসাধক।

যামিনীদাদার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার মতভেদ আছে। আজ পরিণত বয়সে হিসেব ক'রে বলতে পারি, তার মধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে তাঁর মতই সত্য হয়েছে। কয়েক ক্ষেত্রে আমার মত সত্য হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হ'ত একান্তে। তাঁর কাছে প্রায় সন্ধ্যাতেই কলকাতায় অতি বিদগ্ধ সমাজের লোকেরা আসতেন। বেশি আসতেন তদানীন্তন 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর লোকেরা—শ্রীযুক্ত সুধীন দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন মুখুজ্জে, শ্রীযুক্ত নীরেন রায়, শ্রীযুক্ত হিরণ সান্যাল—এঁরা। এ সময় আমি যেতাম না। রাত্রে তাঁর কাছে আসতেন স্বর্গীয় নাট্যকার এবং নট যোগেশ চৌধুরী মশায়। এসেই চা-সহযোগে একটি বড় আফিমের বড়ি গলাধঃকরণ ক'রে মৌজ ক'রে গল্প করতেন।

প্রাণখোলা হাসিতে সরস বাক্যে সন্ধ্যার আসর খাটি আমার দেশের আসরে পরিণত হ'ত। চারিদিকে দেওয়াল ঘেঁষে সাদা চাদর বিছানো, ছোট ছোট চৌকি, দেওয়াল ভরা যামিনী রায়ের নয়নাভিরাম ছবির মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রাচীন বাংলার শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক রেখে নূতন কালের ছবি। একেবারে খাঁটি বাংলার সন্ধ্যার আসর রূপায়িত হয়ে উঠত।

একদিন চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে যামিনীদার ছবি সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে

বলেছিলাম, যামিনীদার ছবি দেখে প্রথম দিন আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ?

কি বলুন তো ? পটোদের ছবি ?

না, ঠিক মনে হ'ল, শহরের দরবারে বহু সম্ভ্রান্তের মাঝে হঠাৎ একজনকে দেখে বড় চেনা ব'লে মনে হ'ল। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, সে আমার গ্রামের রায়দের বাড়ির ছেলে—যে রায়েরা এক পুরুষ আগে সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ছেড়ে কোথায় চ'লে গিয়েছিল। বংশের পুণ্যে আবার সে জেঁকে বসেছে রাজদরবারে।

চৌধুরী মশায় ঘাড় নেড়ে বার বার সায় দিয়ে বলেছিলেন, খাসা বলেছেন, বেড়ে বলেছেন।

যামিনীদা খাঁটি ভারতবর্ষের মানুষ। ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করেছেন তিনি অত্যন্ত সোজা সহজ পথে। তিনি আজ মত বদলেছেন কি না জানি না। তখন বলতেন, ভায়া, এই মাটির খুরিতে চা যেদিন ওই চিনেমাটির পেয়ালার চায়ের চেয়ে আদর ক'রে খেতে পারব, সেই দিন ঠিক জানতে পারব এই দেশকে।

কথাটা তো সেই পুরানো কথা—মাটি সোনা, সোনা মাটি। ওটা সন্ন্যাসীর কথা, বৈরাগীর কথা। আর যামিনীদাদার কথাটা হ'ল গৃহস্থের কথা।

এ কথা তিনি ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত ব'লে এসেছেন। বহু দেশ-দেশান্তরের বড় বড় মানুষ এসেছেন, সকলের কাছে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। বহু আসবাব, উগ্র রঙ, বহু জটিলতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। শুধু এটা তাঁর মানসিক সহ্য-অসহ্যের কথা নয়—এর প্রভাব তাঁর দেহকে প্রভাবিত করে। তিনি অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁর উপলব্ধি মানসিক স্তরেই গণ্ডীবদ্ধ নয়, সে গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে সে উপলব্ধি দেহের রক্তে স্নায়ুমণ্ডলীতে জৈবকোষে-কোষে প্রসার লাভ করেছে।

আর একটা কথা তিনি বলতেন।

বিশেষ ক'রে আমাকেই বলতেন। বলতেন, ভায়া, বিয়োগান্ত রচনা

আর করবেন না। সংসারে দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। সে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন নিংড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে আনন্দের কথা বলুন, আশার কথা বলুন।

তারপরই হেসে বলতেন, দোহাই, তা ব'লে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ক'রো মন রক্তারক্তি, কুড়ুল হাতে জাগো পরশুরাম—এ বলতে বলছি না।

আমি এ নিয়ে তখন কত তর্কই করেছি! তিনি বলতেন, বোঝাতে তো পারছি না। তবে আমি সহ্য করতে পারি না। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি যখন কষ্ট পাই, তখন আরও কত লোক এমনই কষ্ট পায় বলুন তো!

শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রায় বলতেন, বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের কথা। এও সেই এ দেশের কথা। এই প্রসঙ্গে যামিনীদার একটি বিচিত্র অভ্যাস বা স্বভাবের কথা বলব। তিনি, নিত্যই না হোক, দু মাস এক মাস পর পর, তাঁর বসবার জায়গার এবং আসনের বদল করতেন। এদিকে থেকে ওদিকে বা ঘর থেকে বারান্দায় বা উঠানে কাঠ ও কাপড় দিয়ে ছোট্ট ঘর তৈরি ক'রে বা বাড়ির বাইরে গ্যারেজটাকে ওই কাঠ-কাপড় দিয়ে মনোরম ক'রে বদল করতেন। আবার মাস দুয়েক পর আর এক জায়গায় গিয়ে বসতেন, এবং এমনই মনোরম ক'রে তুলতেন যে, ইচ্ছে হ'ত সেইখানে গিয়ে ব'সে যাই ধ্যানাসনে। এই নিয়ে অনেক হেসেছি সে সময়, আড়ালে হয়তো ব্যঙ্গ করেছি। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, সাধক যামিনী রায় তাঁর সত্যকারের সিদ্ধ আসনটিকে এখনও পান নি। হঠাৎ তিনি একদিন পাবেন। যেদিন পাবেন, সেদিন তাঁর প্রথম ছবিতেই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর রূপ রূপায়িত হয়ে উঠবে। অথবা যেদিন ওই ছবি আঁকবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন, সেই দিন তিনি যে আসনে ব'সে সেই ছবি আঁকবেন, সেই আসনই হবে তাঁর সিদ্ধাসন। সে আসন থেকে আর অন্য আসনে যেতে চাইবেন না, পারবেন না তিনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলার গদ্যরীতি

আধুনিক বাংলা-গদ্যের রীতি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বাংলা গদ্যের মৌলিক রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। বিশ্লেষণের ধারায় ভাষাবিশেষকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) শব্দসম্পদ।

(২) বিভক্তি ও প্রত্যয় প্রকরণ এবং উপসর্গ সংযোগের রীতি, যার সাহায্যে শব্দ ও অর্থের সৃজন, সংকোচন ও সম্প্রসারণ ঘটে।

(৩) বাক্যে পদবিন্যাসের ধারা বা ভাষার মৌলিক অন্তর্ছন্দ।

(১) আপাতদৃষ্টিতে শব্দসম্পদকেই ভাষার বৈশিষ্ট্যের এক ও অদ্বিতীয় আধার ব'লে মনে হ'লেও বাস্তব পক্ষে সেটা সত্য নয়। বহমান নদীদেহে যেমন অনেক নতুন ধারা সংযুক্ত ও অনেক ধারা বিযুক্ত হয় অথচ নদীর অস্তিত্ব সেই কারণে বিপর্যস্ত হয় না, এমন কি নদীর ধারা প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'লেও হয় না, তেমনি শব্দ-স্রোতে অনেক নতুন শব্দ সংযুক্ত ও অনেক প্রচলিত শব্দ বিযুক্ত হয়ে পড়ে, শব্দের উচ্চারণ তথা বানানের রীতি পরিবর্তিত হয়, এমন কি এক শব্দ অন্য অর্থে পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় তবু ভাষার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ও ভাষার স্বকীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বস্তুত এক ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ, বিশেষত বিশেষণ শব্দ অতি সহজেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হতে পারে। সুতরাং আধুনিক গদ্যকারগণ কখনও অল্পপ্রচলিত তৎসম শব্দ এবং কখনও বা অর্বাচীন ইতর শব্দ সংযোগে গদ্য রচনা করেন এবং তা অন্যায়—এই ব'লে যে অভিযোগ উত্থিত হয়ে থাকে তা প্রাকৃতবুদ্ধির আজ্ঞাবহ। অভিযোগের হেতু গভীরে নিহিত।

(২) ভাষার বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় সূত্র ব'লে যা নির্দেশিত হয়েছে তা তুলনায় অধিকতর স্থায়ী হ'লেও প্রায়শই ভাষার নিজস্ব নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলায় সম্বন্ধকারকে ব্যবহৃত 'এর' বিভক্তিটি ফার্সী থেকে আহৃত। উপসর্গগুলিও হয় সংস্কৃত, নয় চলিত

ভাষার ক্ষেত্রে ফার্সী থেকে গৃহীত। ক্রিয়া-বিভক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য এ কথা বলা চলে না।

(৩) এইবার ভাষার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের মেরুদণ্ড—তার পদবিন্যাস-প্রণালীর আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যাক। ভাষার অন্তশ্ছন্দ কোন ব্যক্তিবিশেষের খাপছাড়া খেয়ালের সৃষ্টি নয়। সমগ্র জাতির চিন্তা চেষ্টা ও ধ্বনিসমন্বয়ের ধারায় তা গ'ড়ে ওঠে। এই অন্তশ্ছন্দই অনন্যসাধারণ; ভাষাবিশেষের মৌলিকতার আধার ও আশ্রয়। সার্থক গদ্যকার অবচেতনায় অনুভব ক'রে, সচেতনভাবে চয়ন-বর্জনের রীতি অনুসরণ ক'রে তার সুসমঞ্জস প্রয়োগ করেন। সার্থক গদ্যকার মাত্রেরই তাই কিয়ৎ পরিমাণে স্বয়ংসিদ্ধ ও বহুলপরিমাণে জাতির কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যোগযুক্ত থাকা প্রয়োজন। এটা আদৌ একটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে, বাংলার আদিগদ্যকারগণ—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ সকলেই সমাজের সর্ববিধ শুভচেষ্টার সঙ্গে সর্বতোভাবে সংযুক্ত ছিলেন; এবং এ কথাও আমাদের অজানা নয় যে, নানাবিধ আলোচনা ও বিতর্ক বিচারের দ্বন্দ্ব-জটিল পথেই ঊনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য গ'ড়ে উঠেছে। এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সামাজিক প্রয়োজনে, নিছক সাহিত্যিক প্রয়োজনে নয়।

পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা যদি স্বীকার করা হয় তা হ'লে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, ভাষার মৌলিক অন্তশ্ছন্দ বা স্বকীয় পদবিন্যাস-প্রণালীকে অস্বীকার ক'রে যদি কোন গদ্যরীতি আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে চায় তবে সে চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য;—গোক্ষুর হ্রদের মত সেই ভাষাভঙ্গী মূল ভাষাস্রোত থেকে স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হয়তো এইবার আমরা আধুনিক গদ্যরীতির ত্রুটিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে পারি।

(ক) গদ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন হ'ল এই যে, তাকে স্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব হতে হবে এবং সেইজন্যই অসম্বদ্ধ ও শিথিল গদ্যকে গদ্যহিসাবে স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু অধুনা কোন কোন জীবনী তথা ইতিকথা লেখক, অসম্পূর্ণ বাক্য, অসংলগ্ন পদ এবং অসংগত বিশেষণের

প্রতি একটা অস্বাভাবিক আসক্তি দেখাচ্ছেন। প্রচুর ডট ও ড্যাশে অলঙ্কৃত যে গদ্য তাঁরা পরিবেশন করছেন তা চম্পূকাব্যের আশ্রয় হতে পারে, কিন্তু সুস্থ গদ্য-সাহিত্যের নয়।

নমুনাস্বরূপ দেখা যাক :

"তারপর পথিক এগিয়ে যায়···
দুধারের মানুষেরা চেয়ে থাকে···ভয় পায়···অভিযোগ জানায়···
পথিক ফিরে তাকায় না···
সৌরশরে উন্মোচিত হয়েছে তার হৃদয়-কোরক···
সৌরভ···সৌরভে দেশ ভরে ওঠে··· !"

ক্রিয়াপ্রকরণকে এড়িয়ে, বাক্যের ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য রক্ষার যে দায়িত্ব তাকে অস্বীকার ক'রে এই মেরুদণ্ডহীন শব্দসমষ্টি এক নপুংসক গদ্যরীতির সূচনা করেছে।

কিন্তু এতেও ক্ষান্তি নেই। এর উপর আবার ক্রিয়াসংস্থানের উপর হাত পড়েছে। কর্ম, এমন কি কর্তারও পূর্বে ক্রিয়াকে স্থাপনা করা হচ্ছে। কাব্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'য় এবং কোন কোন গীতিনাট্যের গদ্যসংলাপে যা করেছিলেন, বিশুদ্ধ গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনী-রচনায় তার অপপ্রয়োগ অস্বাভাবিক অন্ধত্ব ও আত্মপ্রেম ব্যতীত আর কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? উপরোক্ত নমুনা-বাক্যটিকে এই রীতিতে রূপান্তরিত করলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে :

এগিয়ে যায় পথিক···
চেয়ে থাকে দুধারের মানুষেরা···পায় ভয়···জানায় অভিযোগ···
ফিরে তাকায় না পথিক···
উন্মোচিত হয়েছে সৌরশরে তার হৃদয়-কোরক···
ভরে ওঠে দেশ সৌরভে···

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী এই চম্পূকাব্যে মানুষের চিন্তাকে ঘোলাটে ও চেষ্টাকে পঙ্গু ক'রে ফেলে।

(খ) আধুনিক গদ্যের দ্বিতীয় ধারা ইংরেজী গদ্যরীতির অন্ধ

অনুকরণের ধারা। এই অনুকরণের চরিত্র-বিশ্লেষণের পূর্বে ইংরেজী ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে বাংলা-ভাষাভঙ্গীর যে মৌলিক পার্থক্য তা বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, ইংরেজী ভাষায় সরল বাক্যে আগে কর্তা, পরে ক্রিয়া ও শেষে কর্ম বসে (**I eat rice**); এবং বাংলায় আগে কর্তা, পরে কর্ম ও শেষে ক্রিয়া বসে (আমি ভাত খাই)। অনুরূপভাবে জটিল বাক্যে **clause** বা বাক্যাংশের বিন্যাসরীতি ইংরেজী ও বাংলায় পৃথক। ইংরেজীতে মূল বাক্যটির পর একে একে **clause**গুলি ব'সে যায়, কিন্তু বাংলায় স্থানকালবাচক বাক্যাংশগুলিকে আগে বক্তার ঝোঁক অনুযায়ী বসিয়ে শেষে মূল বাক্যটি সংস্থাপন করাই সাধারণ রীতি। ধরা যাক, **I take my food from a plate which was bought by my father at Benares where he went as a pilgrim along with his mother at the age of fifteen**—এই বাক্যটির বাংলা হবে: পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর মার সঙ্গে তীর্থযাত্রী হিসেবে কাশীতে গিয়ে আমার বাবা যে থালাটি কিনেছিলেন আমি সেইটিতে খাই। বাংলা ও ইংরেজীর পদবিন্যাস-প্রণালী বিপরীত এবং বাংলা-রীতি অনেক বেশি কষ্টসাধ্য, কারণ বাংলায় মূল ক্রিয়ার পূর্বাপর সমস্ত সম্বন্ধ বিবৃত ক'রে শেষে মূল বাক্যটি বসে, যার ফলে বক্তব্যটি বহুবার বিচার ক'রে তবে রূপদান সম্ভব হয়। বাংলা-বাক্য এই কারণেই অনেক বেশি তরল ও অস্থির। উপরোক্ত বাক্যটির প্রত্যেক শব্দ অবিকৃত রেখে বক্তার ঝোঁক অনুযায়ী একাধিকভাবে **clause**-এর সংস্থান পরিবর্তিত ক'রে বিভিন্ন রূপদান করা চলে: কাশীতে পনেরো বৎসর বয়সে আমার বাবা তীর্থযাত্রী হিসেবে তাঁর মার সঙ্গে গিয়ে যে থালাটি কিনেছিলেন আমি সেইটিতে খাই। অথবা, যে থালাটি আমার বাবা পনেরো বৎসর বয়সে তাঁর মার সঙ্গে তীর্থযাত্রী হিসেবে কাশীতে গিয়ে কিনেছিলেন আমি সেইটিতে খাই। অথবা, আমার বাবা তাঁর মার সঙ্গে পনেরো বৎসর বয়সে কাশীতে তীর্থযাত্রী হিসেবে গিয়ে যে থালাটি কিনেছিলেন আমি সেইটিতে খাই।

অলমতি বিস্তরেণ। বাংলায় যাঁরা ইংরেজীর অনুকরণ করেন, তাঁরা মূল বাক্যের সঙ্গে অপরাপর বাক্যাংশের যে সম্বন্ধ সেইটি অস্বীকার করতে যান। মূল বাক্যটি বিশেষত মৌলিক ক্রিয়াপদটি আগে উল্লেখ করেন, ফলে পরে বাক্যাংশগুলির সম্বন্ধ ও সংস্থান রক্ষা অসম্ভব হয়। এই ব্যবহারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বাংলায় Paranthesis-এর ব্যবহার। বাংলায় Paranthesis চালু করা সম্ভব নয়, কারণ প্রথমত বাংলায় clause-এর ব্যবহার ও সংস্থান ইংরেজীর অনুরূপ নয়, দ্বিতীয়ত বাংলায় সংস্কৃতের মত বিশেষণের উত্তর বিভক্তি চলে না। নীচের উদাহরণটি দেখা যাক :—

Philip—the king of Macedon was the father of Alexander—the conqueror of the world-এর যদি বাংলা করা যায়—'ফিলিপ—ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন আলেকজাণ্ডার—বিশ্ববিজয়ীর বাবা' তবে কোন অর্থ হয় না। সমস্যা 'এর' বিভক্তিটিকে নিয়ে। যদি আলেকজাণ্ডারের উত্তর 'এর' বিভক্তি প্রযুক্ত হয় তবে বিশ্ববিজয়ী শব্দটি বিচ্ছিন্ন হয়ে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ উলটিয়ে যায় এবং বিশ্ববিজয়ীর উত্তর 'এর' বিভক্তি প্রযুক্ত হ'লে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ফিলিপের সম্বন্ধ অব্যক্ত থাকে। সংস্কৃত হ'লে এ প্রশ্ন উঠত না, কারণ সে ক্ষেত্রে বিভক্তি আলেকজাণ্ডার ও বিশ্ববিজয়ী উভয়ের উত্তর প্রযুক্ত হতে পারত। অতএব, উপরোক্ত বাক্যটির বাংলা সংস্করণ কেবলমাত্র এই হওয়া সম্ভব: ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ ছিলেন বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বাবা। অর্থাৎ, Adjective clauseগুলিকে পূর্বাঙ্গে ব্যবহার করা ব্যতীত বাংলা লেখার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

(গ) আধুনিক বাংলা-গদ্যের তৃতীয় রীতি যা পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়ে সাধারণ পাঠকের একান্ত ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে, বাক্যে ক্রিয়াপদের বিলোপসাধন এবং তজ্জনিত অতিরিক্ত ও অনিবার্যভাবে অপ্রচলিত কৃদন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসঙ্গত শব্দের আরোপ—যথা, অবদান।

অথচ, এই ধারাটির উদ্ভব বাংলা-গদ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকেই। বাংলা-গদ্যে, বিশেষত সাধু গদ্যে, ক্রিয়ার অভাব সর্বজনস্বীকৃত এবং এই কারণে যৌগিক ক্রিয়ার অতি-ব্যবহারও সর্বজনের দুঃখের কারণ। যৌগিক ক্রিয়ার বহুল-ব্যবহার বাক্যকে শিথিলবন্ধ ও গদ্যের গতিকে ব্যাহত করে।

নীচের উদাহরণ দেখা যাক :

"অনুবাদিত গ্রন্থসকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে··· ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০৲ বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপর দিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল।" (শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' পৃ. ৮৪) এবং "কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ টিপ করিয়া কেবলই বর্ষণ হইয়াছে। সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই। (রবীন্দ্রনাথ : 'গোরা')

এইভাবে যৌগিক ক্রিয়ার অতি-ব্যবহারে গদ্যোবন্ধে যে শৈথিল্যের আবির্ভাব ঘটে ও দুর্বলতা সঞ্চারিত হয় তা দূর করার জন্যই কৃদন্ত ক্রিয়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন, যেমন অতিরিক্ত বিভক্তিযুক্ত পদের শৈথিল্য অতিক্রম করার জন্য সমাসবদ্ধ পদের সৃষ্টি করতে হয়। একটি ইংরেজী বাক্যের বাংলা রূপ পরীক্ষা করলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

Then they began to talk to each other-এর সরল বাংলা : তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথা-বলাবলি করিতে আরম্ভ করিল— অত্যন্ত শিথিল ও বিরক্তিকর। সুতরাং একে সংহত ক'রে লিখতে হয় : তখন তাহারা পারস্পরিক কথোপকথন আরম্ভ করিল। কিন্তু, যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা সংহতিবিলাসী, তাঁরা এতে তৃপ্ত হবেন না ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁদের হাতে উপরোক্ত বাক্যটির রূপ হবে : অতঃপর পারস্পরিক কথোপকথনের আরম্ভন। ক্রিয়ারূপের বিরুদ্ধে এই জেহাদ চলতে

থাকায় সেই প্রয়োজনে অনেক অপ্রচলিত, অনুচ্চার্য ও কুপাচ্য শব্দকে ভাষায় স্থান দেওয়া হয়েছে, নচেৎ 'চংক্রমণ' বা 'অংশভাক' জাতীয় শব্দ বাংলা ভাষার চৌকাঠ মাড়ানোর যোগ্য নয়। এর ফলেই এসেছে দুর্বোধ্যতা। এই সমস্তের মূল কারণ কিন্তু ভাষার রীতিবিরুদ্ধ রচনাশৈলী প্রবর্তন করার চেষ্টা—ক্রিয়ার শৈথিল্যের জন্য সমস্ত ক্রিয়াপদের নির্বাসন-দণ্ডদান। বস্তুত, এই চেষ্টা শুদ্ধ মাত্র বাংলা নয়, ভাষানির্বিশেষে গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কাজের প্রয়োজনেই গদ্যের উদ্ভব এবং ক্রিয়াপদের নির্বাসন ঘটলে গদ্যের অস্তিত্বের কোন হেতু থাকে না। পদ্যের সমস্ত দুর্বলতা ও গদ্যের সমস্ত নীরস গুরুত্ব নিয়ে এই অনাবশ্যক তৎসম শব্দভারাক্রান্ত গদ্যরীতি ভাষাকে অনর্থক পীড়িত করছে মাত্র। অথচ এর উৎপত্তি অত্যন্ত সঙ্গত অভাববোধ থেকে, এবং পণ্ডিতিপনার মোহ অতিক্রম করতে পারলে এর সম্ভাবনাও প্রচুর।

বাংলায় ক্রিয়ারূপের অনির্দিষ্ট আকারের জন্য এবং সর্বোপরি জটিল বাক্যের পীড়াদায়ক জটিলতার জন্য বাংলা-গদ্যরচনা কষ্টকর ও চিন্তাসাধ্য। এ ক্ষেত্রে লেখক যদি জাতির ভাষা ব্যবহারের সাধারণ রীতি মন দিয়ে শোনেন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করেন, তবে হয়তো শক্তিশালী লেখকের হাতে সত্যকার বাংলা-গদ্য সৃষ্টি হতে পারে।

অসিতকুমার

দ্বান্দ্বিক জড়োবাদ*

লোক করেছে জড়ো কাটা কানের ধুয়ো তুলে,
দেখিয়ে দিতে খুড়ো—কানটা ঢাকাই ছিল চুলে,
খুড়ো হ'ল ক্যাপিটালিস্ট, করল সবাই ছি-ছি!
কারণ—জড়ো করাই আসল, কানটা মিছামিছি।

গোপালদা

* Dialectical Materialism.

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

হুতোম প্যাঁচাটার খবর নেওয়ার জন্যই ডানা বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় বেরুতে হ'ল ব'লে খারাপ লাগতে লাগল খুব। একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, অর্থাভাবে প'ড়েই এই সব করতে হচ্ছে। তার পর মনে হ'ল, কবিও ওই কথাই বলেছিলেন। অর্থাভাব সকলকেই যেন ঘানি টানাচ্ছে, ঘানির চেহারাও নানা রকম। অমরবাবুর কথা মনে হ'ল। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পাখি সম্বন্ধে যে সব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না ব'লে অমরবাবুর মত বড়-লোকও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একদিন মনে পড়ল। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা। সকলেরই টাকার দরকার, সকলেরই টাকার প্রতি লোভ।

ককৃরিং—ককৃরিং—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাদামী রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখিটা আমগাছের ডালে দুলে দুলে ডাকছে। তার পর নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী আসছেন, তাঁর হাতে কি যেন একটা রয়েছে। কাছাকাছি হতেই ডানা জিজ্ঞাসা করলে, হাতে ওটা কি আপনার ?

শাবল।

শাবল নিয়ে কি করবেন ? ও, আপনার ওদিকের সেই খুঁটিটা প'ড়ে গেছে বুঝি ? তা, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি কাল আমার চাকরটাকে পাঠিয়ে ঠিক ক'রে দেব। আমাকে একটু খবর পাঠালেই হ'ত, আমি আগেই করিয়ে দিতাম।

সন্ন্যাসী কিছু না ব'লে মুচকি হাসলেন একটু। তার পর নিজের গন্তব্যপথে চ'লে গেলেন। ডানা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, এ লোকটি একেবারে স্বতন্ত্র। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না, নিজেকে নিয়েই আপন মনে আছেন ওই ভাঙা ঘরটাতে, অথচ এঁকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। ডানার সমস্ত মনটা তো এঁকে ঘিরেই স্বপ্ন রচনা করছে। রূপচাঁদের লোলুপতা, কবির কবিত্ব, অমরেশবাবুর

পক্ষীতত্ত্ব মাঝে মাঝে তার ভাল যে লাগে নি তা নয়, ওঁদের নিয়ে কিন্তু তার মন স্বপ্নরচনা করতে পারে না। ডানা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন পারে না? সামাজিক বাধা আছে ব'লে? কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হ'ত তা হ'লে সে বাধা তো এই সন্ন্যাসীর বেলাতে আরও প্রবল। তা ছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের বাইরের আচরণেরই সম্পর্ক বেশি, মন তো স্বাধীন। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে যে জগৎ সে সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাইরের সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। না, কারণটা সামাজিক নয়, অন্য কিছু। খানিকক্ষণ পরে ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর চরিত্র রহস্যময় ব'লেই কি তার সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, কিই বা এমন রহস্যময়! অস্পষ্ট তো কিছু নেই। সোজাসুজি সন্ন্যাসী, ভাঙা কুঁড়েতে আপন খেয়ালে থাকেন, ভিক্ষে করেন, ভজন করেন, কাছে গেলে আলাপ করেন, কোন রকম বাজে ভড়ং নেই, আত্মগোপন করবার প্রয়াস নেই, তাক লাগিয়ে দেবার কসরৎ নেই। নিতান্তই সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক। ওঁর চেয়ে রূপচাঁদ ঢের বেশি রহস্যময়। কিন্তু রূপচাঁদকে ঘিরে মন স্বপ্ন রচনা করতে চায় না তো। কেন···? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ডানা অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, মল্লিক মশাই যে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তা সে লক্ষ্যই করে নি।

নমস্কার। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

নমস্কার। আমার কাছে? কেন, কিছু দরকার ছিল?

আনন্দবাবু শুনলাম আপনার বাসার দিকে এসেছেন, দরকারটা আমার তাঁর সঙ্গে। কোথায় তিনি?

আমার কাছে একটু আগে এসেছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা খুন হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও.র কাছে গেলেন।

এস. ডি. ও.র কাছে! সেখানে যাবার কিছু দরকারই ছিল না। রূপচাঁদবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। উনিই তো পুলিস সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। এই কথাটাই ওঁকে বলবার

জন্যে আসছিলাম। আমার অবশ্য মাথাব্যথা হবার কথা নয়, ম্যানেজার এখন আমি নই, ম্যানেজার আনন্দবাবুই, কিন্তু ঘাঁৎঘোঁৎ ঠিক রপ্তো হয় নি তো ওঁর, তাই ভাবলাম—কথাটা ওঁকে ব'লে আসি। অমরবাবুর নিমক তো অনেক দিন ধ'রে খেয়েছি, ভাবলাম—যাতে ওঁদের একটু সুবিধা হয় সেটা করা আমার কর্তব্য। কর্তব্য নয়?

কর্তব্য কি না তার উত্তর না দিয়ে ডানা বললে, আচ্ছা, উনি এলে আমি বলব আপনার কথা।

বলবেন, নিশ্চয় বলবেন। রূপচাঁদবাবুকে আমিও বলব। তবে আমি ডিটেল্‌স্ সব জানি না তো—

আচ্ছা।

ডানা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। মল্লিক মশাই বললেন, এই তা-তাঁ রোদে চলেছেন কোথা?

পাখিগুলোর তদারক করতে। শুনলাম, একটা প্যাঁচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে—

একটি পাখিও বাঁচবে না। বনের পাখি কি অমন ভাবে রাখলে বাঁচে? আপনি বলবেন, চিড়িয়াখানায় বাঁচে কি ক'রে তা হ'লে? চিড়িয়াখানায় কত রকম ব্যবস্থা, কত রকম তদারক, গবর্মেণ্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টই রয়েছে ওর জন্যে, তবু ম'রে যায়। আর আপনারা ভেবেছেন, মুন্সী আর গোটাকতক বদমাইস পাখিওলা আপনাদের চিড়িয়াখানা চালাবে! ছাগল দিয়ে বলদের কাজ হ'লে কি কেউ বলদ কিনত?

কিন্তু ওরা তো মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে।

টিয়া ক'টা আছে গুনে দেখেছেন?

না, গুনি নি। গোটা দুই ম'রে গেছে।

মরে নি। মুন্সী বিক্রি করেছে। একটা কিনেছে আমার ছেলে, আর একটা কিনেছে চণ্ডী, রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যাতায়াত ক'রে যে ছোঁড়াটা।

ডানা অবাক হয়ে গেল।

সত্যি ?

আরও শুনবেন ? পাখিদের যে ছোলা, ফল, মাংস, মাছ আপনার কিনে দেন, তা কি ওদের দেয় ওরা ? কিচ্ছু দেয় না, বিক্রি করে।

তাই নাকি !

ডানার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল, অপরাধ তারই। অমরবাবু তার উপরেই বিশ্বাস ক'রে এতগুলি পাখি রেখে গেছেন, তারই উচিত সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ানো। মুন্সীটা এত চোর ? এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হয় তাকে।

এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছেন, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে যে ! আমার ছাতাটা নিয়ে যান না হয়।

না, থাক্। রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে।

আর কোনও কথা না ব'লে ডানা হন হন ক'রে এগিয়ে গেল। মল্লিক মশাই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তার পর মাথা নাড়লেন। মুখে একটা বিচিত্র হাসিও ফুটে উঠল তাঁর।

৩

এক লোলুপ ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার সামনে রক্ত-চর্চিত মেদ-মণ্ডিত একটা মাংসের প্রকাণ্ড টুকরো ঝুলছে আর সেটা না পেয়ে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরছে—ঠিক এ উপমা রূপচাঁদের সম্বন্ধে খাটবে না। মনে মনে তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরছিলেন ঠিকই, ডানা এখনও তাঁর নাগালের বাইরে আছে—এ কথাও মিথ্যা নয়, তাঁর একাধিক চাল ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করছেন। কিন্তু খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরবার লোক তিনি নন। খাঁচার অস্তিত্বই ছিল না তাঁর কল্পনায়। এ ধরনের আজগুবি রূপকে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি একটু নির্লিপ্ত হয়ে ক্রেতা রূপচাঁদের কৃপণতাটা উপভোগ করছিলেন। ঠিক কত দাম দিলে যে মালটা পাওয়া

যাবে তা বেচারা নির্ণয় করতে পারছে না কিছুতে। বহুকাল আগে রূপচাঁদ একবার নিলামে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। একটা কাশ্মীরী শাল খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পঞ্চাশ থেকে শুরু ক'রে ডাক দেড় শো পর্যন্ত উঠল। রূপচাঁদ ডাক দিলেন দু শো, প্রতিপক্ষ দু শো দশ হাঁকলেন। রূপচাঁদের জেদ চ'ড়ে উঠল, হেঁকে দিলেন তিন শো। প্রতিপক্ষ আবার দশ বাড়ালেন—তিন শো দশ টাকায় লোকটি আর একটু হ'লে নিয়ে নিয়েছিলেন শালটা। রূপচাঁদ হাঁকলেন—পাঁচ শো। প্রতিপক্ষ আর দাম বাড়াতে সাহস করলেন না। রূপচাঁদ শালটা কিনে নিলেন। দমকা অত টাকা খরচ ক'রে তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল কিছুদিন, কিন্তু তার জন্যে তাঁর মনোকষ্ট হয় নি, ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ ক'রে তিনি প্রীতই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ডানাও নিলামে চড়েছে। ঠিক কত দাম হাঁকলে যে তাকে পাওয়া যাবে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রতিপক্ষ অমরেশ এবং আনন্দমোহন যে কত দাম হেঁকেছে তাও আহর করতে পারছিলেন না তিনি। সেটা জানতে পারলে সুবিধা হ'ত। তবে আর একটা কথাও অবশ্য ঠিক যে, রূপচাঁদ নিছক ক্রেতাও নন। তিনি আর্টিস্টও। অতসী কাচের ভিতর দিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে রামধনু দেখতে পাওয়া যায় ব'লেই অতসী কাচের প্রতি তাঁর লোভ। লোভের সঙ্গে রামধনুর স্বপ্নটা জড়িয়ে থাকাতে লোভটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু একটু বিশেষত্ব লাভও করেছে। কারণ লোভটা কাচের প্রতি নয়, আকাশচারী রামধনুর প্রতি। নারীমাংস বাজারে অপ্রতুল নয়। প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীর ছাগমাংসও যেমন বাজারে বিক্রি হয়, নারীমাংসও হয়। কিন্তু তার প্রতি লোভ নেই রূপচাঁদের। তারা সুলভ ব'লে নয়, তাদের সংস্পর্শে এসে স্বপ্ন জাগে না ব'লে। নিতান্তই খেলো কাচ তারা—কেউ রঙিন, কেউ সাদা, কেউ পাতলা, কেউ পুরু ; কিন্তু অতসী কাচের বিশেষত্ব নেই তাদের। আলোকে তারা রামধনু করতে পারে না, ডানা পারে। ডানা কাচও নয় ঠিক, দামী হীরের টুকরো। যখনই ডানার সান্নিধ্যে এসেছেন তখনই এটা অনুভব

করেছেন তিনি। ওর চোখে শুধু দৃষ্টি নেই—মদিরাও আছে, ওর রূপ শুধু দেহেই নিবদ্ধ নয়—দেহাতীত রূপকথালোকে নিয়ে যাবার শক্তি আছে তার। ওর কাছে গেলেই মনে হয়, বয়স ক'মে গেছে, দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে মন থেকে, কোনও কিছুর জন্যেই কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আর যেন। মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা ভূমিকা রচনা করবার জন্যেই মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন তিনি ডানার কাছে। তার কাছে যাবার একটা অজুহাত চাই তো! মল্লিককে সেই অজুহাতের পটভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মল্লিকও সানন্দে রাজী হয়েছিল। ডানাকে, আনন্দবাবুকে, অমরেশবাবুর চিড়িয়াখানাকে, জমিদারিকে ছারখার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। ওই মাগীকে (অর্থাৎ অমরেশ-গৃহিণী রত্নপ্রভা দেবীকে) দেখিয়ে দিতে হবে যে, মল্লিক ছাড়া তাঁদের এখানকার জমিদারি অচল। রূপচাঁদ অধীরচিত্তে মল্লিকের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে বাদামী-কালো পাখিটা ডেকে উঠল—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আর একটু দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিলে—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্

অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের।

৪

সমস্ত দিন 'লু' চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু হাওয়ার তাপ কমে নি। ঘরের বাইরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট চেয়ার বার ক'রে ডানা ব'সে ছিল চুপ ক'রে। জাহাজে চ'ড়বার সময় ইঞ্জিনের কাছাকাছি বসলে যেমন মনে হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল তার। জাহাজের কথা মনে হওয়াতে বর্মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মা-বাবা-ভাইটির কথা। মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর কথা। নিজের মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপন ছিল, আজ তাদের কথা ক্বচিৎ মনে পড়ে। যখন পড়ে

তখনও ওদের খুব আপন ব'লে মনে হয় না, মনে হয় ওরা যেন অন্য জগতের লোক, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা মানতে হয় যেন নীতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। মৃত্যু ছিন্ন ক'রে দিয়েছে অন্তরের যোগ। এখন তার কাছে ঢের বেশি আপন অমরেশবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু (হ্যাঁ, রূপচাঁদের বর্বরোচিত লোলুপতাই যেন বেশি আপন করেছে তাকে) আর ওই ভগ্নকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। রত্নাপ্রভাকেও খুব ভাল লেগেছে তার। শ্রদ্ধা হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু সত্যিকার ভাল লেগেছে বকুলবালাকে। মন্দাকিনীর কথা শুনেছে সে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয় নি, তবু তিনি আনন্দমোহনবাবুর স্ত্রী—এই পরিচয়টুকুই যেন ওই অচেনা মানুষটিকে আপন করেছে। নিজের লোক পর হয়ে যায়, পর লোক আপন হয়ে ওঠে মনের কি রহস্যময় নিয়মে, কে জানে! যারা চোখের সামনে সদাসর্বদা ঘোরাঘুরি করে তারা যে সব সময় মনের মতন হয় তা নয়, কিন্তু আপন হয়। মনের মতন লোকও দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে আর আপন থাকে না। ইংরেজীতে প্রবচনই আছে—আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। ডানার মনে হ'ল, দৃষ্টিটা শুধু চোখের না ব'লে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বললে যেন আরও ভাল হয়। যা যতক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তা ততক্ষণ আমার আপন, ভাল হোক মন্দ হোক তা ততক্ষণ আমার অধিকারভুক্ত, যেন আমার আপন সম্পত্তি, তাই তার সম্বন্ধে মমত্ববোধ প্রবল। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল চিন্তার। মনে হ'ল, ওই সন্ন্যাসী হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে পারবেন। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। সন্ন্যাসীর কাছে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে সে যেন ব'র্তে গেল মনে মনে। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিনা কারণে বার বার ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হয় নিজের কাছেই। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে গেল সে। মনে হ'ল, সন্ন্যাসী হয়তো ভাববেন যে মিছিমিছি একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে তাঁর কাছে গিয়েছে সে। একদিন স্পষ্টই যখন বলেছিলেন যে, নারীর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ ত্যাজ্য,

তখন এমন ভাবে সেখানে যাওয়া কি উচিত ? ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তার পর হঠাৎ তার কানে অদ্ভুত শব্দ এল একটা। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররর··। টুক্ টুক্ টুক্ টুক টুকিররর···। ঠিক মনে হ'ল একটা মার্বেল যেন পাকা শানের মেঝেতে প'ড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর গড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল ডানার, মনে হ'ল কোথায় যেন পড়েছে এইরকম ধরনের কি একটা। ঘরে ফিরে এল, আলো জ্বেলে হুইস্‌লারের বইটা ওলটাতে লাগল। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। নাইট্‌জার নামক নিশাচর পাখির ডাক ঠিক ওই রকম। হুইস্‌লার লিখছেন—**resembling the sound of a stone skemming over the surface of a frozen pond**···নাইট্‌জারের কয়েকটা হিন্দী নামও অমরবাবু লিখে রেখেছেন ডানার চোখে পড়ল। চিপ্‌পাক, ডাবচুরী, ডাভাক্। একটা নামও পছন্দ হ'ল না তার। যে কখানা বই অমরবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন, সবগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল সে। পাখিটার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় মুখ, বড় বড় পোকা টপটপ ক'রে গিলে ফেলতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এর যা নাম, তার বাংলা হচ্ছে 'ব্যাংপাখি'। মন্দ না নামটা। পাখিটার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ওতে। পঠিতব্য যা কিছু ছিল সব প'ড়ে ফেলে ডানা টর্চ আর অমরবাবুর দেওয়া বাইনকুলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। পাখিটাকে দেখতে হবে। শুক্‌নো নদীর খালের কাছে কাছে যেদিকে ঝোপঝাপ আছে, সেই দিকেই এগুতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনিশ্চিত ভাবে কতক্ষণ অগ্রসর হবে ? কাছেই একটা উঁচু ঢিপির মতন ছিল। তারই উপরে উঠে বসল। ব্যাংপাখি কাছাকাছি যদি থাকে কোথাও, সাড়া পাওয়া যাবে ঠিক। অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

(ক্রমশ)

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

দশ

বললুম, বাংলা দেশে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল, কিন্তু কয়েক পুরুষ থেকেই আমাদের আগ্রাতে বাস।

প্রশ্ন হ'ল—আপনাদের তিনজনেরই কি তাই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ, আপনাদের নাম, ধাম, ঠিকানা ?

থানাদারের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি তো যা-তা একটা নাম ব'লে দিলুম। ঠিকানাও একটা দিয়ে দিলুম। বললুম, আমরা সবাই একই মহল্লায় বাস করি।

আমার দেখাদেখি জনার্দন ও সুকান্তও নাম ভাঁড়ালে। কিন্তু এতেও তারা রেহাই দিলে না। থানাদার আবার প্রশ্ন করলেন, কতদিন এসেছেন এখানে ?

—তা মাসখানেক হবে।

—কোথায় আছেন ?

—ধর্মশালায়।

—কোন্ ধর্মশালায় ?

—ঐ যে রামসিং ব'লে একটা লোকের ধর্মশালা আছে, সেখানে।

আমাদের কথা শুনে থানাদার ও উপস্থিত সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। থানাদার বললেন, রামসিংয়ের ধর্মশালা! বলেন কি! রামসিং কি ধর্মশালা খুলেছে নাকি ?

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললে, রামসিং মধ্যে মধ্যে লোক রাখে ব'লে শুনেছি।

থানাদার আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি ওকে পয়সা দেন ?

—হ্যাঁ, দিই।

এবার থানাদার একটু গম্ভীর ভাব অবলম্বন ক'রে বললেন, ঐ

রামসিং ও তার স্ত্রী কি রকম চরিত্রের লোক, তা কি আপনাদের জানা আছে ?

বললুম, ওদের ভাল লোক ব'লেই তো মনে হয়। বেচারারা আজই গরিব হয়ে পড়েছে—শুনেছি ওদের পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিল। রাজত্ব চ'লে গেছে, কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে আভিজাত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমার বক্তৃতার তোড় থামিয়ে দিয়ে থানাদার বললেন, বাবু সাহেব, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি—এ কথা খুবই সত্যি যে ওদের পূর্বপুরুষ রাজা ছিল। কিন্তু আমি এখনকার কথা বলছি। জানেন কি যে ওরা ডাকাত! ঐ রামসিং ডাকাতি ক'রে ধরা প'ড়ে পাঁচ বছর জেল খেটেছে। আর ওর বউটা—সেটারও দু বছর জেল হয়েছিল। রামসিং যে দলের লোক সে দলকে শুধু এখানকার নয়, এর চারপাশের তিন-চারটে রেয়াসতের লোক ভয় করে। ডাকাতি, নরহত্যা ও যে কত করেছে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনাদের কেন যে প্রাণে মারে নি তা বুঝতে পারছি না। মেরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিলে আর কারুর সাধ্যি নেই যে ওদের ধরে। নিজের যদি মঙ্গল চান তো এখুনি ওখান থেকে স'রে পড়ুন। এখানে ভাল ধর্মশালা আছে সেখানে চ'লে যান—পয়সাকড়ি কিছুই লাগবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, থানাদারের কথা শুনে আমরা দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত বললে, কদিন থেকে ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রায়ই বিস্কুটের বাক্সের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছে। তার ওপর সেদিন রাত্রে সুরয তার বিছানার তলা থেকে যে অস্ত্রটি বার করেছিল তার দ্বারা আমাদের এক-একজনকে দু-দুখানা ক'রে ফেলতে তাদের বিশেষ কষ্ট করতে হবে না।

আমাদের নিজেদের মধ্যে এই সব কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় জনার্দন থানাদারকে বললে, কিন্তু এখন চ'লে যেতে চাইলে ওরা যদি আমাদের যেতে না দেয় ?

থানাদার একটু ভেবে নিয়ে বললে, আচ্ছা, আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দিচ্ছি—জবরদস্ত লোক দিচ্ছি।

থানাদার তিনজন ষণ্ডা দেখে সিপাহী আমাদের সঙ্গে দিলে।

আমাদের কারুর মুখে আর কথা নেই। রামসিং ও সূরয যে সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক উঁচুদরের লোক, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহই ছিল না। সেই ঝড়ের রাতে তারা যে ক'রে জনার্দনকে বাঁচিয়ে তুলেছিল তার তুলনা কোথায় পাব? সেই রামসিং ও সূরয ডাকাত ও নরহত্যাকারী!

চলতে চলতে জনার্দন বলতে লাগল, ওরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সেই দিন থেকেই কে যেন দিনরাত আমার মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে এখান থেকে স'রে পড়তে বলছে—এখানে আর কিছুদিন থাকলে নিশ্চয় ওরা আমাদের খুন ক'রে ফেলবে।

ধীরে ধীরে রামসিংয়ের ডেরায় পৌঁছনো গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে তখন তারা শোবার যোগাড় করছিল। আমাদের পেছনে তিনজন পুলিসের সিপাহী দেখে তারা দুজনেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমরাও তাদের সঙ্গে আর কোন কথা না ব'লে তিনজনে তিনটে বোঁচকা বাঁধতে আরম্ভ ক'রে দিলুম—তারা ঠিক সেই রকম দৃষ্টিতে হাঁ ক'রে আমাদের কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

আগে আগে প্রতিদিন সকালেই সূরয আমাদের কাছ থেকে সেদিনের খাট ও ঘরের ভাড়া চেয়ে নিত। ইদানীং একটু ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় দু-তিন দিন বাদে চাইত। সে সময় কয়েক দিনের ভাড়া বাকি ছিল। আমাদের পুঁটলি বাঁধা শেষ হ'লে আমি এগিয়ে গিয়ে ঘর ও আঙেঠির জন্য বাকি পাওনা সূরযের হাতে দিলুম। সে হাত পেতে পয়সা কটা নিয়ে নিলে, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করলে না। একবার ভাবলুম, সূরযকে কিছু বলি—কিন্তু লজ্জায় তার মুখের দিকে চাইতেই পারলুম না। ফিরে এসে সিপাহীদের সঙ্গে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

এই সুরয ও রামসিং আমার সারা জীবনের বিস্ময় হয়ে আছে। তারা ছিল রাজার ঘরের ছেলে-মেয়ে, অথচ সংসারে স্বজন বলতে তাদের কেউ ছিল না। বিরাট প্রাসাদের একখানা ভাঙা ঘর তখনও অবশিষ্ট ছিল—সেখানার অবস্থাও তাদেরই মতন—তারই মধ্যে তারা বাস করত। তাদের দেখে মনে হ'ত না যে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দুঃখ ব'লে কোনও অনুভূতির বালাই তাদের আছে। তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরখানার আয়ুও বোধ হয় এতদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে। একবেলা কোনও রকমে খেয়ে বেঁচে থাকলেও সেই রুক্ষ কাঠখোট্টা চেহারার মধ্যে বাস করত দুখানা অদ্ভুত প্রাণ। জনার্দনকে সাপে কামড়িয়েছে শুনে রামসিং যে ক'রে তার পায়ের আঙুল ধ'রে চুষতে আরম্ভ করলে—তার পরে সে ও সুরয সেই ভীষণ ঝড়ের রাতে ভীষণতর সেই জঙ্গলে অন্ধকারে ওষুধ আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল—মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়!

আবার যখন শুনলুম সেই রামসিং বহু ডাকাতি করেছে—ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে জেল খেটেছে, ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সুরযকেও জেল খাটতে হয়েছে—এক বছর আগেও প্রতি রাত্রে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে দুবার ক'রে থানায় হাজিরা দিতে হ'ত—একাধিক নরহত্যা তারা করেছে, শুধু আইনের ফাঁকিতে বেঁচে গিয়েছে—তখন নিউটনের মতন আমারও বলতে ইচ্ছা করে, দুর্জ্ঞেয় মানব-চরিত্রের সমুদ্রোপকূলে সারাজীবন ধ'রে কতকগুলি উপলখণ্ড নয়—বালুকাকণা মাত্র আহরণ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের সঙ্গে তারা যে সদয় ব্যবহার করেছিল, তাতে তাদের কাছ থেকে অমন ভাবে বিদায় নেওয়া কখনই উচিত হয় নি। কিন্তু আগেই বলেছি মানব-চরিত্র অতি জটিল ও বিচিত্র—আর আমরাও মানুষ মাত্র। অর্থলোভে হত্যা করতে অভ্যস্ত জেনে—হোক না সে উপকারী—তার পাশে নিশ্চিন্ত রাত্রে ঘুমোই কি ক'রে? তখনও একটা টিন-ভরা সিকি আমাদের কাছে রয়েছে—তাই একদিন যারা আমাদের প্রাণ রক্ষার

নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ করতে দ্বিধা করে নি, তাদের কাছ থেকেই আমরা প্রাণভয়ে পলায়ন করলুম।

তার পর একদিন বিনা মাশুলে তানসেনের দেশে এসে উপস্থিত হওয়া গেল। গোয়ালিয়র ভরতপুরের চেয়ে অনেক বড় শহর। অনেক লোকজন বাজার হাট জমজম করছে সেখানে। এবারে দেখে-শুনে একটা ভাল ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়া গেল।

প্রথমে কয়েকদিন বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে ঘুরে শহরটাকে ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু শহর বোঝা, লোক বোঝা আমাদের কাছে সবই বৃথা। অতি ভাল শহরও আমাদের বরাতে খারাপ দাঁড়িয়ে যায়, অতি ভাল লোকও মন্দ লোকে পরিণত হয়। আমাদের অলক্ষ্যে ব'সে যিনি কলকাঠি নাড়াচাড়া করছেন, তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করি কি ক'রে! কি জিনিস ঘুষ দিলে যে তিনি তুষ্ট হয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন তার হদিস তো কিছুই পাই না।

অনেক ভেবে-চিন্তে তিন মাথা এক ক'রে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল, আপাতত ব্যবসা করার কল্পনা ত্যাগ করাই ভাল। প্রথমে চাকরির চেষ্টা করা যাক—তার পরে চাকরি করতে করতে একটা হদিস লেগে যেতে পারে।

গোয়ালিয়র শহরে বিস্তর মহারাষ্ট্রীয়ের বাস। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, সরকারী চাকুরে প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান মহারাষ্ট্রীয় সে সময় সেখানে বাস করতেন। মোট কথা, সেই রাজ্যটাই তো তাদের। এ ছাড়া মুসলমান ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না।

গোয়ালিয়র সঙ্গীতের রাজ্য। সেই তানসেন থেকে আরম্ভ ক'রে গত শতাব্দীর হদ্দু হস্‌সু খাঁ অবধি গোয়ালিয়র শহর বড় বড় গুণীর আবাসস্থল ছিল। আমরা যে সময় সেখানে গিয়েছিলুম, সে সময় জনসাধারণের মধ্যে গান-বাজনার খুবই চর্চা ছিল। তা ছাড়া ভারতবিখ্যাত কয়েকজন বড় গাইয়ে ও বাজিয়ে মহারাজার দরবারে বেতনভুক ছিলেন।

এঁদের বড় মেজো ও ছোট চেলায় শহর তখন ভর্তি ছিল। পুরুষ ছাড়া জনকয়েক নাম-করা গাইয়ে বাইজীও সে সময় থাকতেন সেখানে। দেখে-শুনে মনে হ'ল, একটা ক'রে চাকরি সেখানে জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে না।

আমরা যে ধর্মশালায় উঠেছিলুম, সেখানকার রক্ষক বাঙালী দেখে আমাদের সঙ্গে সেধে আলাপচারী করত। সকাল-সন্ধ্যায় তার আড্ডায় অনেক মুরুব্বী-গোছের লোক যাতায়াত করত। তারাও আমাদের আশ্বাস দিতে লাগল—তোমরা কাজের লোক, এখানে একটা কিছু লেগে যাবেই যাবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা তিনজনে মিলে বেরুতে লাগলুম চাকরির সন্ধানে। আমরা ঠিক করেছিলুম যে-কোনও কাজ—তা সে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—যা জোটে তাই করব। একটা কিছু অবলম্বন পেলে তাই ধ'রেই ওঠা যাবে।

তিনজনে মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিলুম—হ্যাঁগা, লোক রাখবে ?

সকলেই বলে, না।

সকাল বিকেল ঘোরাই সার হতে লাগল। শেষকালে ধর্মশালারই একজন পরামর্শ দিলে—তিনজনকে একসঙ্গে দেখলে কেউ রাখতে চাইবে না—একজন একজন ক'রে চেষ্টা কর।

কথাটা আমাদের মনে লাগল। পরের দিন থেকে আমরা আলাদা আলাদা এক-একদিকে বেরিয়ে পড়তে লাগলুম। বেলা বারোটা অবধি পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ধর্মশালায় ফিরে এসে নিজের নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করতুম। একদিন জনার্দন বললে, এক গৃহস্থ তাকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে পেট ভ'রে খাইয়েছে।

একদিন এক বাড়িতে আমি কাজের চেষ্টায় গিয়েছি। একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক, বোধ হয় সেই বাড়ির গিন্নী হবে, আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খাওয়া হয়েছে ?

আমি 'না' বলায় সে খান-দুয়েক গরম রুটি ও তার ওপরে এক ছিটে গন ডাল আমার হাতে আলগোছে ফেলে দিয়ে বললে, খাও।

ডালটুকু তখুনি চেটে মেরে দিয়ে রুটি দুখানা পকেটে পুরে ধর্মশালায় ফিরে এসে সকলে মিলে হাসাহাসি করতে করতে খাওয়া গেল।

এর কিছুকাল পরে অনেক দিন ধ'রে রুটি তরকারি পকেটে পুরতে হয়েছিল—সে কথা যথাস্থানে বলব। সেদিন সেই ভিক্ষের রুটি খেতে খেতে সুকান্ত বললে, ওঃ, উন্নতি যা করা যাচ্ছে, জ্ঞাত-গুষ্টির কেউ টের পেলে হিংসেয় বুক ফেটে ম'রে যাবে।

একদিন এই রকম ক'রে পথে পথে দোরে দোরে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একজনদের বৈঠকখানায় গানের আসর বসেছে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলুম। একজন লোক প্রাণপণ শক্তিতে তুম্ তারা নারা ক'রে চেঁচাচ্ছে আর একজন তবলা চাঁটাচ্ছে—দু-চারজন লোকও তাদের ঘিরে ব'সে তারিফ করছে। আমি একটু একটু অগ্রসর হতে হতে বাড়ির মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়েছি এমন সময় দেখি, একটা বাচ্চা মেয়ে—বোধ হয় আট-দশ মাসের বেশি বয়স হবে না—বনবন ক'রে হামাগুড়ি দিতে দিতে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে। তার কোমরে রূপোর পাটা, গলায় আম্ড়ার মতন রূপোর একটা বল ঝুলছে। মেয়েটা আমাকে ছাড়িয়ে দরজার কাছ অবধি এগিয়ে যাওয়ায় আমি ফিরে গিয়ে তাকে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম। সেখানে কয়েকবার 'মাইজী', 'মাইজী', 'মাতাজী' ব'লে ডাক দিতেই একটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি আপনাদের মেয়ে?

মহিলাটি এগিয়ে এসে টপ ক'রে বাচ্চাটিকে আমার কোল থেকে নিয়ে নিলেন। আমি বললুম, মাইজী, বাচ্চা এখন হামা দিতে শিখেছে—ওকে এখন সাবধানে রাখতে হয়। দেখুন, রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে আমার চোখে পড়েছিল নইলে নির্ঘাৎ আজ

গাড়িচাপা পড়ত। কোন চোর-ডাকাতের হাতে পড়লে তারা ওর গয়নার জন্য মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারে।

আমার কথা শুনে মেয়ের মা বাচ্চাটিকে কোলে চেপে ধ'রে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। আমি বললুম, কাঁদবেন না মা। মেয়ের তো কিছু হয় নি—ভবিষ্যতে ওকে সাবধানে রাখবেন।

—তুমি কে? তোমাকে তো কখনও দেখি নি!

—আমি বিদেশী, এখানে এসেছি চাকরির সন্ধানে। গান শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম।

—তোমার মা-বাপ নেই? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

—না মা, দুনিয়ায় কেউ থাকলে কি আর দেশ ছেড়ে এত দূরে চাকরির জন্য আসি! আমি আর আমার আরও দুটি বন্ধু চ'লে এসেছি এখানে পেটের দায়ে।

—তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বুঝি?

—ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মা, পয়সাওয়ালা লোক সব খেতে না পেয়ে ম'রে যাচ্ছে।

—তুমি কি জাত?

—আমরা বেনে। আপনাদের এখানে যেমন বৈশ্য আছে না, সেই জাত।

—তোমার পৈতে আছে?

—আছে।

—তুমি আমাদের বাড়িতে কাজ করবে? কাজ খুব বেশি নয়, এই ঘর-গৃহস্থালির কাজ। ঝাড়ু দেওয়া, জিনিসপত্তর সাফ রাখা, বাড়ির কর্তার ফরমাজ খাটা আর মাঝে মাঝে এই বাচ্চাকে ধরা।

আমি জাহাজে কখনও কাজ করি নি। শুনেছি, সমুদ্রের মাঝখানে দারুণ ঝড়ের মধ্যে সেই টলটলায়মান অর্ণবপোতের প্রধান মাস্তুলে চ'ড়ে পাল নামানো খুবই শক্ত কাজ। এ সম্বন্ধে আমি কোনও সন্দেহ

প্রকাশ করছি না, কিন্তু ছোট ছেলে রাখাও যে কতখানি শক্ত কাজ তা যে না করেছে সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

যা হোক, সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই গিন্নীর মুখে কাজের কথা শুনে একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলুম। বললুম, করব—কি মাইনে দেবেন ?

গিন্নী বললেন, মাইনের কথা কর্তার সঙ্গে ঠিক হবে। যা দস্তুর তাই পাবে।

কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মাছ মাংস এ সব খাও না তো ?

এক হাত জিভ বের ক'রে দুই হাত দুই কানে ঠেকিয়ে বললাম, রাম রাম, ও-সব আমরা খাই না।

গিন্নী বললেন, কিছু মনে ক'রো না—তোমাদের জাত ঐ সব জিনিস খায় কি না—

বললাম, যারা খায় তারা খায়, আমরা ও-সব জিনিস ছুঁই না।

—আমাদের বাড়িতে কাজ করতে হ'লে এইখানেই থাকতে হবে, রোজ স্নান করতে হবে।

আমি সব তাতেই হাঁ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বাড়ির কর্তা এসে হাজির হলেন। আমার সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তার পরে কর্তা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ করবে ?

—করব হুজুর।

—কিন্তু মাইনের কথা এখন নয়। এক মাস কাজ করবার পর কি রকম কাজ কর তা দেখে মাইনে ঠিক হবে।

তখনকার মতন বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, এমন সময়ে গিন্নীমা বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

—যাচ্ছি আমার মিত্ররা যেখানে আছে সেখানে। তাদের বলতে হবে। আমার ধুতি ও একটা বালিশ আছে নিয়ে আসব। তাছাড়া খেতে-টেতেও তো হবে।

গিন্নীমা বললেন, হ্যাঁ, জিনিসপত্র এনে এখানেই খেয়ো।

এদের কাছ থেকে তখনকার মতন ছুটি নিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে ধর্মশালায় এসে হাজির হলুম। চাকরি জুটেছে—দেবদুর্লভ চাকরি—কিন্তু এসে দেখি বন্ধুরা তখনও ফেরে নি। তখুনি ছুটলুম ইষ্টিশানের দিকে। সেখানে একদিন এক ফেরিওয়ালাকে পৈতে বিক্রি করতে দেখেছিলুম। সেখান থেকে তিনটে ময়লা দেখে পৈতে কিনে ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি, সুকান্ত ব'সে রয়েছে—কিছুক্ষণের মধ্যে জনার্দনও ফিরে এল। আমার একটা কাজ জুটেছে শুনে বেচারারা একেবারে দ'মে গেল। নিজেদের সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ছে দেখে আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, একজনের কাজ হওয়া মানে আমাদের সকলেরই কাজ হওয়া। অন্য জায়গায় থাকলেও তাদের সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা-সাক্ষাৎ হবে—দুদিন পরে তাদেরও কাজ লেগে যাবে, ইত্যাদি।

যাই হোক, সেদিন স্নান করবার সময় ধর্মশালার কুয়োর ধারে আমাদের উপনয়ন হয়ে গেল। তিনজনে পৈতে গলায় দিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম ক'রে জামা গায়ে চড়িয়ে ঘরে ফিরে এলুম। বন্ধুদের সঙ্গে কথা হ'ল যে, প্রতিদিন দুপুরবেলা ঘণ্টা দুয়েক ক'রে তাদের কাছে থাকতে হবে। এতে যদি মনিবরা আপত্তি করে তো চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। সেদিন ধর্মশালাতেই তাদের সঙ্গে খেতে হ'ল—আবার কবে একসঙ্গে ব'সে খাওয়া হবে তার ঠিক কি! খাওয়া-দাওয়ার পর চাকুরিস্থলের দিকে পা বাড়ানো গেল। জনার্দন ও সুকান্ত আমার সঙ্গে এসে মনিবের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। হঠাৎ আমাকে ছাড়তে হবে মনে ক'রে বেচারীরা খুবই মুষড়ে পড়েছে দেখে আরও কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশ ক'রে বিড়ি টেনে মনিব-বাড়িতে ঢুকে পড়লুম।

প্রথম চাকরি—আমার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। আমি সারা জীবন ধ'রে দাসত্বই ক'রে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বের সব রকম গ্লানি তাই সহ্য করতে হয়েছে। দাসত্ব করতে করতে যখন তা অসহ্য হয়েছে

তখন ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করেছি ; কিন্তু দাসত্ব কিংবা ব্যবসা কিছুই আমার দ্বারা ভাল ক'রে হয়ে ওঠে নি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে কেন যে এখানে পাঠিয়েছিলেন, জীবনে আমার কি করা উচিত ছিল, আজও তা ঠিক করতে পারি নি। তবুও আমার জীবনের প্রথম মনিব-বাড়ির কথা এই জাতকে থাকা উচিত।

আমার প্রথম মনিব ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। বোম্বাই, পুণা, নাসিক প্রভৃতি জায়গায় যে সব আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখতে পাওয়া যেত (এখন যায় কি না বলতে পারি না) ইনি ঠিক সে রকম ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ঐ সব জায়গাকার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর লোকদের সঙ্গে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, কোলহাপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের লোকদের অনেক তফাত আছে আচারে ও বিচারে। বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই জানা আছে রেয়াসতের অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহের লোকেরা আচারে বিচারে, অশনে বসনে, বাক্যে ও ব্যবহারে বাইরের লোকদের চাইতে অনেক বেশি বিলাসী হয়ে থাকে। স্বাধীনতা পাবার পর সেখানকার কি অবস্থা হয়েছে তা ঠিক বলতে পারি না, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেখানকার অবস্থা ঐ রকমই ছিল।

আমার মনিব রাজসরকারের কি একটা চাকরি করতেন। কিন্তু চাকরি ছাড়াও তাঁর অর্থাগমের অন্য রাস্তাও ছিল—তবে সেটা কি তা আমার জানা নেই, জানবার চেষ্টাও কখনও করি নি।

মনিবের সংসার খুব বড় ছিল না। তাঁর দুটি বিবাহ এবং দুই স্ত্রীই তখনও বর্তমান ছিলেন। কর্তাকে দেখলে মনে হ'ত বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। কিন্তু বড় গিন্নীকে দেখলে মনে হ'ত, ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। বড় গিন্নীর মাথার মাঝখানটি ছিল একেবারে ফাঁকা। মাথার চার পাশে যে কয়েক গাছা চুল তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি সর্বদা আঁচড়ানো ও খোঁপা বাঁধা থাকত। রাত থাকতে উঠে তিনি পূজা-অর্চনা করতেন এবং রান্নার জন্য ও সকলের পানীয় জল নিজ হাতে কুয়ো থেকে তুলতেন—সেই সকালেই স্নান সেরে জল তোলা ইত্যাদি

হ'ত। রান্নাও স্বহস্তে করতেন, অবশ্যি তাঁর সতীনও তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতেন। দুই সতীনে ঝগড়া বচসা হতে কখনও দেখি নি।

বড় গিন্নীকে অতিশয় দয়াশীলা ব'লে মনে হ'ত। আমাকে তিনি অতি যত্নের সঙ্গে খেতে দিতেন। খাবার সময় অনেক দিন তাঁর ছেলেও আমার কাছে বসত; কিন্তু চাকর ও পুত্রের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করতে তাঁকে কখনও দেখি নি।

বাড়ির ছোট গিন্নী ছিলেন বয়সে তরুণী। তাঁকে ত্রিশ বছরের বেশি ব'লে মনে হ'ত না। দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলতেন। এঁর এক মেয়ে—যাকে উপলক্ষ্য ক'রে আমার এখানে চাকরি। আমি তাঁর মেয়ের বায়না সামলাতুম ব'লে আমার ওপরে তিনি ছিলেন ভারি সদয়। মোট কথা, এক স্বামী ছাড়া তিনি বিশ্বসুদ্ধ লোককেই পছন্দ করতেন, কিন্তু স্বামীকে দেখলেই তাঁর মেজাজ যেত বিগড়ে।

মনিব অর্থাৎ বাড়ির কর্তার নাম ছিল সদাশিব। কিন্তু নাম সদাশিব হ'লে কি হবে, এমন তেএঁটে লোক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

বেশ রাত থাকতে উঠে তিনি রোজ পায়খানায় যেতেন। পায়খানার কাছেই একটা বড় গামলা-গোছের পাত্র থাকত—প্রতিদিন রাতে ঘুমুতে যাবার আগে কুয়ো থেকে জল তুলে আমাকে সেই পাত্রটি ভ'রে রাখতে হ'ত। কিন্তু এই বাসি জলে শৌচ করা মনিব মশায় মোটেই পছন্দ করতেন না। পায়খানায় যাবার আগে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে—এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছি ব'লে তিরস্কার করতেন—বলা বাহুল্য তখনও ঘোরতর অন্ধকার থাকত। আমি উঠে একটা ঘটির গলায় দড়ি লাগিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে তাঁর ঘটিতে ঢেলে দিতুম, তিনি সেই জল নিয়ে পায়খানায় ঢুকতেন। এততেও নিস্তার ছিল না, কারণ কখন তিনি শ্রীমন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন সেই আশায় আমায় বাইরে ব'সে থাকতে হ'ত। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে

বাইরে বেরিয়ে এলে আবার জল তুলে দিতে হ'ত ঘটির পর ঘটি। কারণ পায়খানা থেকে বেরিয়ে ভাল ক'রে মুখবিহ্বর পরিষ্কার না ক'রে তিনি শুতে যেতে পারতেন না। এর পর মনিব মশায় ফিরে যেতেন—যেদিন যেখানে শোবার পালা থাকত। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সেখানে যেতে হ'ত এবং শুয়ে পড়লে পদসেবা এবং সর্বাঙ্গ সংবাহন করতে হ'ত, প্রায় ঘণ্টা খানেক ধ'রে। ভোর হয়ে গেলে তিনি উঠে স্নানাদি করতেন এবং প্রায় দিনই তাঁকে স্নানের জল তুলে দিতে হ'ত। স্নান সেরে কর্তা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে পূজো-আহ্নিক কবতেন। ইতিমধ্যে বৈঠকখানা বা অন্য শয়নমন্দির থেকে তাঁর বিছানাপত্র তুলে ঘর পরিষ্কার করতে হ'ত। পূজো সেরে তিনি বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে তম্বুরার সঙ্গে গলা সাধতেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে পাড়ার লোককে ব্যতিব্যস্ত ক'রে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে রাজকার্যে বেরুতেন। বেলা প্রায় একটার সময় কার্য থেকে ফিরে এসে আহার ক'রে লাগাতেন ঘুম একেবারে বেলা পাঁচটা অবধি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কখনও ছোট, কখনও বড় গান-বাজনার আসর বসত। অনেক বড় গুণী আসতেন গাইতে বাজাতে এবং তা শোনবার ও তারিফ করবার জন্য অনেক ব্যক্তি নিমন্ত্রিতও হতেন। কর্তাও ভাল গাইতেন ও কোন কোন দিন একা তিনিই আসর জমাতেন। বড় বৈঠকখানা-ঘরের পাশে একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ছিল। এই ঘরের দেয়ালে গেলাপে মোড়া বিরাট সব তম্বুরা ঝুলত। তা ছাড়া বেঁটে মোটা লম্বা রোগা নানা আকারের খয়ের, রক্তচন্দন, গাম্ভেরী প্রভৃতি কাঠের তবলা আর মাটি ও তামার ওপরে রুপোলী গিল্টি করা ছোট বড় ডুগিও সাজানো থাকত। এই সব যন্ত্র ও তা ছাড়া তবলা ঠোকবার হাতুড়ির পর্যন্ত তদ্বির আমাকে করতে হ'ত। যেদিন বড় আসর বসত এবং মাননীয় ব্যক্তির শুভাগমন হ'ত, সেদিন মদ্যাদি এনে এই ছোট ঘরখানিতে জমা রাখা হ'ত। রসিকরা মধ্যে মধ্যে আসর থেকে উঠে এই ঘরে গিয়ে ঢুকু-ঢুকু চালাতেন। তা না হ'লে অধিকাংশ দিনই বড় বৈঠকখানাতে বসেই মদ্যাদি ও নানারকম

ভাজাভুজি চলত। আমাদের কর্তা প্রায় প্রতিদিনই প্রচুর টেনে একেবারে ট্যা হয়ে পড়তেন। রাত্রির আসর ভাঙলে—তা কোনদিন দশটায়, কোনদিন বারোটায়, কোনদিন বা দুটোয়—আসরের চাদর ইত্যাদি তুলে ঘর ঝাঁট দিতে হ'ত। তার পর মনিব মহাপুরুষ আমার ওপর ভর দিয়ে ভেতর-বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেন। দুটি উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছাদ পেরিয়ে ছোট গিন্নীর ঘর। ছোট গিন্নী তো দূরের কথা, সংসারের সব গিন্নীই সেই গভীর রাত্রে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করেছেন। সেই রাতে দরজা ঠেঙিয়ে তাঁকে তোলা হ'ত। সে ভদ্রমহিলা জেগে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলে আমার কণ্ঠলগ্ন মাতাল স্বামীকে দেখলেই উঠতেন জ্ব'লে। তার পরে শুরু হ'ত দাম্পত্য কলহ—কবি দাম্পত্য কলহকে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ব'লে উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমার বরাতে সবই উলটো। কারণ এ ক্ষেত্রে আরম্ভ হ'ত অতি লঘুভাবে, কিন্তু বাড়তে বাড়তে শেষে ঠেঙাঠেঙি ব্যাপারে পরিণত হ'ত। তাদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, তাতে আমার বলবার কিছু ছিল না; কিন্তু আমাকে ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। কারণ ঝগড়ার পরে কর্তা মশায় শয়নমন্দিরে যদি ঢোকবার অনুমতি পেতেন তো সেইখানেই আমার দিনের কর্ম শেষ হ'ত, নচেৎ আমায় দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত।

ব্রাহ্মণ-সন্তানের মদ্যপানে ছিল দেবীর আপত্তি। অন্তত মত্ত অবস্থায় স্বামীকে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার তিনি দিতেন না। কিন্তু ত্যাবার যুক্তি ছিল, মাল না টেনে তরুণী ভার্যার কাছে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। দুজনের পক্ষেই যুক্তি ছিল, কিন্তু ত্যাবা প্রায় প্রতিদিনই তাড়িত হতেন এবং তার পরে তিনি এত ভগ্নোদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়তেন যে, তাঁকে প্রায় কাঁধে ক'রে নিয়ে এসে আবার বৈঠকখানায় শুইয়ে দিতে হ'ত—এই জন্যই ঝগড়ার যতক্ষণ একটা ফয়সালা না হয় ততক্ষণ কর্তা আমাকে ছাড়তে পারতেন না।

কিন্তু তাঁকে বৈঠকখানায় শুইয়ে দিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার জো ছিল!

সেখানে তাঁর পা টিপতে ও কথার অর্থাৎ বকবকানির সায় দিতে হ'ত।
যেমন--

—এই বাঙালী! আরে এই বাঙালী!

--হুজুর।

--শালা, জবাব দিচ্ছিস নে কেন? তোকে আমি ব'লে রাখছি, এখনও বিয়ে করিস না। আমার দুর্দশা দেখছিস তো?

হয়তো বললুম, হুজুর, আপনি জোর ক'রে ঢুকে পড়লেই তো পারেন।

—শালা, তোর কিছু বুদ্ধি নেই। আমি জোর ক'রে ঢুকে পড়লে বিবি বেরিয়ে প'ড়ে অন্যত্র নিশি যাপন করবেন। আচ্ছা, কাল যদি ঘরে ঢুকতে না দেয়, তবে পরশুই আমি আবার একটা বিয়ে করব।

এই রকম বকতে বকতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তবে আমি শুতে যেতুম।

সদাশিবের আমার বয়সী এক ছেলে ছিল বড় গিন্নীর দরুন—তার নাম ছিল বিনায়ক। সে ছিল বাড়ির দুলাল। দুই মা-ই তাকে খুব আদর দিতেন। বয়সের ধর্মে বিনায়কের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে ইস্কুলে পড়ত এবং বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে জল-টল খেয়ে মাঠে খেলতে যেত। কিছুদিন বাদে সে আমাকেও খেলার মাঠে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। সেখানে অনেক সমবয়সী ছেলে খেলা করত। দু-একদিন যাবার পর আমি সুকান্ত ও জনার্দনকেও সেই খেলার দলে ভিড়িয়ে নিলুম। আমরা সকলেই তাদের চাইতে ভাল খেলতে পারতুম ব'লে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলুম। তখন ক্রিকেট খেলার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সামনেই ফুটবলের মরসুম পড়বে। সেই সময় কে ক্যাপ্টেন হবে, কে সেক্রেটারি হবে—এই নিয়ে খেলার শেষে তাদের মধ্যে খুব আলোচনা হ'ত, মধ্যে মধ্যে তারা আমাদেরও মতামত জানতে চাইত। শুধু তাই নয়, বিনায়ক ও তার বন্ধুরা তখন নতুন বিড়ি-সিগারেট টানতে শিখেছিল। তারা বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসত আর তাই দিয়ে সিগারেট বিড়ি ভাজাভুজি ইত্যাদি খাওয়া চলত।

আমাদের এই খেলার মাঠে খুব উৎসাহী সভ্য ছিল তুকো।

বিনায়কদের পাড়াতেই ছিল তুক্কোদের বাড়ি। সে পাড়ার মধ্যে তুক্কোরা বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল। তার বাবা ও ঠাকুরদা দুজনেই ছিলেন ওখানকার বড় উকিল।

খেলার মাঠে কাপ্তেনি করতে না পারলেও খেলার পরের আড্ডায় তুক্কোই ছিল কাপ্তেন। সে প্রায় রোজই বাপ-ঠাকুরদার পকেট মেরে দু চার আট আনা নিয়ে আসত আর তাই দিয়ে বিকেলে আমাদের মহা ভোজ হ'ত।

তুক্কোদের সঙ্গে বিনায়কদের কি একটা সম্বন্ধ থাকায় দুই বাড়ির মহিলারাই পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত করতেন। একদিন তুক্কোর ঠাকুরমা আমাকে বললেন, আমার কোনও জানাশোনা লোক তাদের বাড়ির জন্য দিতে পারি কিনা! আমি জনার্দনের নাম করায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি আগে কোথাও কাজ-টাজ করেছে ?

বললাম, হ্যাঁ, ভরতপুরের মস্ত রইস রাজা রামসিংয়ের ওখানে অনেক দিন কাজ করেছে।

বেশি কিছু বলতে হ'ল না—তুক্কোদের বাড়িতে জনার্দনের কাজ হয়ে গেল, মাইনে হ'ল তিন টাকা।

জনার্দনের কাজ হয়ে যাওয়ায় সুকান্তর হ'ল মুশকিল। একলা সারাদিন ও সারারাত সে কাটাতে পারে না। শেষকালে রাত্রিবেলা তাকে আমাদের বাড়িতে শুতে বললুম। সে এসে শুতো বটে, কিন্তু শেষরাত্রে মনিব আমাকে ডাকতে আসার আগেই তাকে বের ক'রে দিতে হ'ত। কিন্তু বেশিদিন সে রকম করতেও সাহস হ'ল না। পাছে কোন অনর্থ ঘটে—এই ভয়ে একদিন ছোট গিন্নীর কাছে সুকান্তর জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করা গেল। বললাম, সে রাত্রে শোবে, অন্য কোথাও চাকরি হ'লেই চ'লে যাবে। ছোট গিন্নী বড় গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সুকান্তকে সেখানে শোবার অনুমতি দিলেন।

একটু একটু ক'রে সুকান্তকেও বাড়ির সকলে চিনে ফেললে। ক্রমে তার ওপরে একটু ক'রে ফাই-ফরমাসের ভারও পড়তে লাগল—অবশ্য বেশি ফাই-ফরমাস করতেন মনিব মশায়। (ক্রমশ)

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(অর্ধ পাগল, বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগল অবস্থায় রচিত)

দোহাবলী

চরমের সাথে পরম যখনি মেলে,
অসীমের ছোঁয়া জানিবে তখনি পেলে।
শক্তের সাথে নরমের কোলাকুলি
সাচ্চা হবে না জেনে রাখো খোলাখুলি।
কপালে সিঁদুর, গলায় দড়িটি আঁটা,
কচি ঘাস খায় কচি সে গলির পাঁঠা।
রাম ও রহিম মক্কা এবং কাশী ;
ঠাসা বাঁশে লাঠি, ফাঁপা বাঁশে হয় বাঁশী।
রূপে ও রূপায় ঝলমল ঝন্‌ঝনা,
বারো অঙ্গনে বাড়িছে বারাঙ্গনা।
সুরে আর তালে গলাগলি করে কাঁদে,
চুলোচুলি করে তবলচী ওস্তাদে।
ডিপ্লোমা হাতে ডাঁটিছে ডিপ্লোম্যাট,
গাঁট-কাটিয়েরা বসিছে হইয়া গ্যাট্‌।
মহাভারতের মহা হ'ল চিৎপাত,
কাঁদিছে ভারত মাথায় হানিয়া হাত।
কাকা ব'লে কাক ডেকে মরে বার বার,
আপন বাঁচাতে কাকা যে পগার পার।
দুর্গত যারা, কোথা পাবে দূর-গতি ?
ট্যাঁকে ধন নাই, হাসে তাই ধনপতি ॥

কাঁচা-পাকা

ডাব কহে "প্রভু, দেখায়ে যাদুর খেল্‌
ঝুনো ক'রে মোরে ক'রে দাও নারিকেল।"

নারিকেল কহে অতি সকরুণ ভাব :
"আহা, কেঁচে যদি হতে পারিতাম ডাব !"

ভ্যক্কেন ভুঙ্গিথা

কানকাটা গো কানকাটা !
দু কান কাটা পড়ল তোমার,
মাঝ্-বাজারে তাই হাঁটা !
ক্ষেপে তোমার চুল্‌বুলিতে
ধান খেলো কোন্ বুল্‌বুলিতে ?
কান খোয়ালে কার সেলুনে
করতে গিয়ে চুল-ছাঁটা ?
কানকাটা গো কানকাটা !

মুখপোড়া গো মুখপোড়া !
মুখটি পুরো পুড়ল ব'লেই
কেয়ার কর তাই থোড়া !
বন্ধ রেখে ছন্দ সাধন
বইছ পিঠে গন্ধমাদন,
চাকের মধু রইল চাকে,
মিছেই তোমার হাত চাটা—
মুখপোড়া গো কানকাটা !

ধনপতি-উর্বশী সংবাদ

ধনপতি সুপ্ত ছিল, উর্বশী আসিয়া সেই ফাঁকে
কান-প্রান্তে মুখ রাখি 'প্রাণকান্ত' ব'লে তারে ডাকে।
সে ডাকে ভাঙিল সুপ্তি, শেষ হ'ল স্বপ্ন-পরিক্রমা.
উচ্চাটিত ধনপতি উর্বশীরে করিল না ক্ষমা॥

কঠিন ও সহজ

কঠিন আমার গান
সহজেই আমি সবারে করিনু দান
সহজ যে গানখানি,
সুরের সঙ্গে মিলিল না তার বাণী ॥

বদ্ধ পাগলের প্রেমপত্র

নিরালা আঁধারে জেলে কেরোসিন-কুপি
বদ্ধ পাগল প্রেমের লিপিকা
লিখিতেছে চুপি চুপি :
'ভালবাসিবার অখণ্ড অবসরে
কহ কোন্ বাণী দিব আনি তব করে ?
আমি নহি কবি চণ্ডীদাসের পরে,
তুমি নহ রামী ধুপী।
এলাইয়া তনু অলখ শয়নে
রামধনু-রেখা আঁকো নি নয়নে,
ফল-বাগিচায় কুসুম চয়নে
পরো নি গান্ধী টুপী !…"
উড়ে চলে মন বাহিয়া স্বপন-সিঁড়ি,
মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপা নীরবে টানিছে বিড়ি,
পাগলা-গারদী জানালা-গরাদে
হাত রেখে কভু আনমনে কাঁদে,
অপরাধী যেন বিনা অপরাধে
এক হয়ে বহুরূপী।
কত কথা ভেবে মনে পায় কত হাসি,
তারি ফাঁকে ফাঁকে কাশে ভারিক্কি কাশি :
মহা দুনিয়ার চিড়িয়াখানায়
কত না মিনতি, কত না মানায়

কত যে উৎস, কত মোহনায়
চলে তরী ভাসাভাসি।
এই ভেবে ভেবে বদ্ধ পাগল
চিত্ত-দুয়ারে খুলিছে আগল,
পাগলিনী-প্রেম নিকষিত হেম
সেথায় পশিছে আসি।
লিখিছে পাগল, "তোমারে দেব যে মালা
আসে নি যে তার ফুল ফুটিবার পালা,
তবু দিগন্তে প্রেম-ফুলঝুরি জ্বালা,
বাজে নিখিলের খিল-ভাঙানিয়া বাঁশী
ওগো রূপহীনা, ওগো সুন্দরী!
হারানো বাণের বৃথা তূণ ধরি
তব পিরীতির পাকানো দড়িতে
গলায় পরিয়া ফাঁসি।
মনে পড়ে কি গো, নয়ন-জড়ানো নিদে
কত যুগ আগে পেয়েছিল কত ক্ষিধে?
সেই ক্ষিধে আর সেই যে তিয়াষা
এতদিন ধ'রে খুঁজেছিল ভাষা,
পেয়েছে এবার, তাই নাহি আর
লুকোচুরি ছাপাছুপি।..."
লিখিছে পাগল আরো কত কি যে,
হো-হো ক'রে হেসে, আঁখি-জলে ভিজে,
নিজ প্রেমলিপি পড়ে নিজে নিজে
আলো ক'রে চৌখুপী,
একা নিরালায় নীরবে জ্বালায়ে
ছোট কেরোসিন-কুপি॥

নেপো ও দই

চুপচাপ ব'সে
আছে দেখে আমি কই,
"এত চুপচাপ
কেন ব'সে আছ দই ?"
"করি প্রতীক্ষা"—
দই কহে মৃদু হাসি,
"নেপোরা আমায়
কখন মারিবে আসি ॥"

যুগের বাণী (গান নহে)

ওরে ভাই, ভিখের মত
ভিখ্ মেলে না শূন্য ট্যাঁকে।
(লোকে) কিছু দেবার আগে কিছু
আছে কিনা সেইটে ছাখে।
শূন্য হাতে তুলবি চাঁদা ?
মিথ্যে হবে সকল কাঁদা,
কাঁচকলাটি দেখিয়ে সবাই
পড়বে কেটে একে একে।
(ওরে) চট্ ক'রে দাঁও মারবি যদি
চটক্ দেখা।
মন সেয়ানা রাখবি, তবু
সাজবি ন্যাকা।
শিশুর মত সরল হেসে
করবি ব্যাপার সর্বনেশে,
পরের তরীর ফাঁসিয়ে তলা
আপন নায়ে ভাসবি একা।

(ও তুই) শয়তানিতে হাত পাকাবি
সাধু সেজে,
নইলে আখের গুছিয়ে নিতে
পারবি নে যে।
কপ্‌চে মহা উদার বুল
বহুর চোখে দিবি ধূলি,
আপন মুখে খই ফোটাবি
পরের খোলায় ভেজে ভেজে ॥

তরী বাওয়ার গান (মিশ্র নদীয়ালী স্থর—অপরূপ তাল)

(আমি) নাই বা পেলাম তোমার হাওয়া।
(আমার) আপন হাওয়ায় চলবে তরী,
যেথায় খুশ আসা-যাওয়া।
হাওয়ার জোয়ার লাগিয়ে পালে
আপনি আমি বসব হালে,
গানখানি মোর আপন চালে
আপন স্থরেই হবে গাওয়া।
জলের পথে রয় না আঁকা
পথের নিশানা যে,
চেনা স্থরের অচিন্ বাঁশী
মন ভিজিয়ে বাজে।
বাতাস যদি নাই বা চলে,
এলিয়ে থাকে ঘুমের ছলে,
আপন হাতে বৈঠা নিয়ে
চলবে আমার তরী বাওয়া ॥

যুগ-রসায়ন (খোরাশানী গজল—উচ্ছল তাল)

(ও কে) আপন বুকে ঘ'ষে ঘ'ষে একলা ব'সে শানায় ছুরি ?
হবে সে রক্ত-রাঙা কাহার ভাঙা পাঁজর ফুঁড়ি ?

কার শিয়রে মরণ দেখে শিউরে ওঠে আনমনে কে ?
কি হবে তার হিসাব রেখে কাহার ধন কে করে চুরি ?
মুণ্ডমালায় মুণ্ডু দেখে ভয় পেল কি রুদ্র-কালী ?
ফুলের বুকে হুল ফুটিয়ে মধু কে হায় করল খালি ?
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, ধনপতির শূন্য থলি,
মনের বেদন কারে বলি ফুটিয়ে আমার স্বপন-কুঁড়ি ?

যুগ-বার্তা

দম ফুরায়েছে দমকলে ভাই, নয়া দম তায় দে রে !
তৃতীয়-লোচন-হারা ত্রিলোচন ত্রিভুবন খুঁজে ফেরে !
অসম্ভবের চড়িয়া এক্কা
সম্ভব যত মারিছে টেক্কা,
পুরী-বারাণসী মদিনা-মক্কা আলোয় আঁধারে ঘেরে।

গর্দভ-কুল লুকায়ে লাঙুল বসিয়া গদির বুকে
সাধিতেছে গলা সঙ্গীতকলা শিখিতে প্রাণের সুখে,
করিতেছে কত পারকল্পনা,
কত না জটলা, কত জল্পনা,
উচ্ছ্বসি কয় "জয় জয় জয়" এ উহার পানে ঝুঁকে।

সাজিয়া ছদ্ম অতি বেহদ্দ বেহায়া সেয়ানা পাঁঠা
যাহাদের মাঠে খায় কচি ঘাস তাদেরি মারিছে ঝাঁটা।
তবু, রে পাগল, কিছু নাহি ভয়,
আগু পানে চল্, হবে হবে জয়,
যে নদীতে আছে জীবন তাতেই আসে রে জোয়ার-ভাঁটা ॥

বিনা-টিকিটের যাত্রী

জীবনের রেলপথে ভাই রে
আমি বিনা টিকিটের যাত্রী।

নাই ভেদ ভেতরে ও বাইরে,
আনমনে কাটে দিবা রাত্রি।
নাই চাল-চুলো, নাই লজ্জা,
নাই চেকারের ভয়-বন্ধন,
পারাবারে পাতা যার শয্যা
সে কি ডরে শিশিরের ক্রন্দন ?
চলতি পথের যথা দস্তুর
হরদম দিয়ে চলি ধাপ্পা ;
বস্তায় দেখা নেই বস্তর,
তবু হাসি, হই নে তো খাপ্পা ;
চোখ ঠেলে আসে যদি কান্না
চট্ ক'রে করি তারে শান্ত,
মোটে যার হয় নাকো রান্না
কি তাহার তপ্ত বা পান্ত ?

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (??···!!···??)

বললে গোভিন্ ব্যাঙো :
"স্যাণ্ডো-গেঞ্জি গায়ে দিলেই
যায় কি হওয়া স্যাণ্ডো ?
ফোকলা দাঁতে হাসলে পরেই
যায় না হওয়া ঠান্দি।
হাঁটুর ওপর কাপড় তুলেই
চাস কি হতে গান্ধী ?
লড়াই ক'রে হারলে পরেই
যায় না হওয়া পুরু।
লম্বা পাকা দাড়ি রেখেই
হয় না কবিগুরু।

আবোল-তাবোল ব'কেই হওয়া
যায় না জবাহর।
নতুন কিছু কর্‌ রে বাপু,
নতুন কিছু কর্‌॥"

আত্ম-ধাপ্পিক

আপনি আমি ধাপ্পাঃমেরে
আপনারে যে ভুলিয়ে রাখি।
ঘোর নিরাশার অন্ধকারে
আশার দোলায় দুলিয়ে রাখি।
বুলিয়ে মুখে হাসির তুলি
চোখ-ভিজানো কাঁদন ভুলি,
কেঁদে আমি কাঁদাই নেকো;
হেসে হাসাই, দিই যে ফাঁকি।
দু দিন পরেই মরতে হবে—
এই কথাটি জানব যবে
ভাবব তখন, বেঁচে থাকার
আরো দু দিন আছে বাকি॥

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

পচা ফল

লণ্ডনে পৌঁছে অবধি মিস্টার ঘোষকে দেখেছি অনেক জায়গায়, কিন্তু আলাপ করার সুযোগ পাই নি। ভদ্রলোকের গোঁফহীন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, স্বাস্থ্যবান চেহারা এবং চোখে-মুখে কথা বলা সহজেই অপরিচিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'ল ইণ্ডিয়া হাউসের ক্যান্টিনে। আমার এক মেম ঠাকুমার সঙ্গে ব'সে দুপুরবেলার লাঞ্চ খাচ্ছিলাম। ভাত আর একান্ত অখাদ্য খানিকটা মাছের ডালনা, যা ভারতীয় 'কারি' ব'লে চালানো হয়েছে। খাওয়ার চেয়ে কথা হচ্ছিল বেশি, কারণ আমি এ দেশে নতুন এসেছি। মিঃ ঘোষ আমাদের দিকে পিঠ ক'রে একলা টেবিলে ব'সে খাচ্ছিলেন। ইঙ্গিতে মেম ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ও ভদ্রলোক কে ?

মেম ঠাকুমা বললেন, আলাপ নেই বুঝি ? আমাকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই মিঃ ঘোষকে ডেকে উনি আলাপ করিয়ে দিলেন—মিঃ ঘোষ, আলাপ করিয়ে দিই, এটি আমার এক নাতি। সবে দেশ থেকে এসেছে। আর ইনি মিঃ ঘোষ, এক কথায় এঁর পরিচয় দেওয়া যায় না, যত আলাপ হবে বুঝতে পারবে।

মিঃ ঘোষ হেসে বললেন, জানি না, এ পরিচয় নতুন লোক কেমন ভাবে নেবেন! একটু থেমে বললেন, আপনাদের আপত্তি না থাকলে টেবিলে যোগ দিতে পারি কি ?

বললাম, সানন্দে।

কফির পেয়ালা হাতে ক'রে মিঃ ঘোষ আমাদের টেবিলে এসে বসলেন।

তারপর, বলুন দেশের কি খবর ?

বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

বলেন কি, স্বাধীনতার পরও ?

বললাম, ও কাগজে-কলমের স্বাধীনতায় দেশের লোকের কি উন্নতি হবে বলুন ?

এই ভাবে চলল মিনিট কয়েক ধ'রে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের কথা। কিন্তু আলোচনা দানা বাঁধতে পেল না, অপর এক ভদ্রলোকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'আমাকে মাপ করবেন' ব'লে মিঃ ঘোষ উঠে গেলেন।

মেম ঠাকুমা হেসে বললেন, একটা জীব বটে।

এর পর মিঃ ঘোষের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল এক গান-বাজনার আসরে—ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা জলসার আয়োজন করেছিল, কি উপলক্ষ্যে ভুলে গেছি—নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিল এক ইংরেজ দম্পতি। সেতারে এক ভদ্রলোক পূরবী রাগের আলাপ করছিলেন। অনেক দিন বাদে বিদেশী পরিবেশে এই স্বদেশী সুর শুনে খুব ভাল লাগছিল। আরও দু-চার রকম বাজনা হ'ল, কিন্তু বুঝলাম ইংরেজ দম্পতির খুব ভাল লাগে নি। ইণ্টারভ্যালে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের সুরের পার্থক্য কিছুই বুঝতে পারি না। মনে হয়, সবই এক রকম।

আমি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমাদের সুরের বৈশিষ্ট্য কোথায়; কিন্তু কিছুতেই যেন গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ এসে প'ড়ে আমায় বাঁচিয়ে দিলেন। আলাপ হবার পর আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে বললেন, প্রভেদটা কোথায় জানেন? আমাদের সুরে থাকে 'মেলডি', আর আপনাদের সঙ্গীতে আছে 'হারমনি'। খুব অল্প কথায় তিনি এত সুন্দর ভাবে দু দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করলেন যে, তিনি চ'লে যাবার পর আমার বিদেশী বন্ধুরা বলেছিলেন—ভদ্রলোক নিশ্চয় খুব পণ্ডিত, সঙ্গীত বিষয়ে যথেষ্ট চর্চা না থাকলে কেউ এ ভাবে বোঝাতে পারে না।

প্রায় এক মাস পরের কথা। বিশেষ কাজে ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে কাজের জন্যে যাওয়া তার কিছুই সুবিধে করতে পারলাম না। এ বলে—ওর কাছে যাও, ও বলে—তার কাছে। মনে পড়ল মিঃ ঘোষ এখানে কাজ করেন। ঘরে গিয়ে দেখা করলাম।

টাইপিস্টকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছিলেন, আমাকে বসতে বললেন। কাজ শেষ ক'রে এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর বলুন?

যে কাজের জন্যে গিয়েছিলাম বললাম। শুনে বললেন, এ আর কি, আমি এখনই করিয়ে দিচ্ছি। আপনার তাড়া নেই তো?

বললাম, না, তেমন আর কি!

দেশের কথা শোনান দেখি। চিঠিপত্তর সব পাচ্ছেন তো?

তা পাই বইকি। থেমে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ক'দিন দেশছাড়া?

মিঃ ঘোষ হাসলেন, বললেন, সে মশাই এক যুগ। বিশ বছর তো বটেই। আপনাদের কাছেই যা দেশের খবর পাই।

কেন, চিঠিপত্র পান না?

চিঠি দেবার লোক নেই ভাই, কে লিখবে? তবে দেশের কথা বড় মনে পড়ে।

বললাম, দেশে গেলেই তো পারেন।

ইচ্ছে করলেই কি আর যাওয়া যায়! সে পথ আর নেই। মিঃ ঘোষের মুখে ম্লান হাসি। একটু থেমে কি যেন মনে ভেবে উঠে পড়লেন, বললেন, চলুন, আপনার কাজটা সেরে দিই।

সেদিন মিঃ ঘোষ যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন, কোন আত্মীয়ও বোধ হয় সে ভাবে কারুর জন্য করে না।

ক'দিন বাদেই মিঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা এক 'পাবে'। রাত তখন প্রায় নটা, রেস্তোরাঁয় খেয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, মনে পড়ল বাড়িতে দেশলাই নেই, রাত্রে গ্যাস জ্বালাতে পারব না। এ সময় দোকানপত্র বন্ধ থাকলেও 'পাবে' দেশলাই পাওয়া যায় জানতাম। ঢুকে দেখলাম, জায়গাটা প্রায় ভর্তি। সব বয়সের লোকই আছে। কয়েক জন মদ খেয়ে মাতলামিও শুরু করেছে। আমার চিনতে ভুল হয় নি, একমাত্র ভারতীয় যিনি মদ খেয়ে চুর হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি মিঃ ঘোষ। আমাকে দেখে বসতে বললেন।

কি খাও? বীয়ার?

বললাম, আমি পান করি না।

কর না? করবে। ভদ্রলোক যেন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। আমাকে ছাড়লেন না কিছুতেই। নেশার ঝোঁকে ব'লে চললেন তাঁর ফেলে-আসা দিনের কথা। কেমন ক'রে বিশ বছর আগে তিনি ভাগ্যান্বেষণে লণ্ডনে পালিয়ে আসেন। খবর পেয়ে বাবা কতদিন টাকা পাঠান। কেন তাঁর মৃত্যুর পর ভাইরা আর সম্পর্ক রাখল না। কত কষ্ট ক'রে তিনি এখানে থেকেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'কন্টিনেন্টে' কোথায় কোথায় ঘুরেছেন। যুদ্ধের পর ইণ্ডিয়া হাউসে কি ভাবে চাকরি পেলেন। কেমন ক'রে ভেরার সঙ্গে প্রেম হ'ল, বিবাহ, ছেলে, সংসার— একে একে সব কথা ব'লে গেলেন।

কিন্তু দেশের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে, আমি ফিরে যেতে চাই।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এত ভাবনার কি আছে, গেলেই তো হয়।

সে পথ আমার বন্ধ।—মিঃ ঘোষ যেন কেঁদে ফেলেন, দেশ আমাকে নেবে না, ভেরাকে নেবে না, আমার ছেলেকে নেবে না।

কেন আপনি এ রকম ভাবছেন? ফোঁটা-কাটা সমাজ তো এখন নেই।

সব সমান ভাই, সব সমান। আমার শেষ হয়ে গেছে, বিদেশেই মরতে হবে।

কোন এক শনিবার। সকালের ডাকে মিঃ ঘোষের চিঠি পেলাম। বাড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। হাতে বিশেষ কাজ ছিল না, নির্দেশমত তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম। 'ওভাল' টিউব স্টেশনের কাছেই তাঁর বাড়ি। খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় নি। নীচে ঘণ্টা বাজাতে মিঃ ঘোষ নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। হেসে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, বাড়ি চিনতে কোন অসুবিধা হয় নি তো? বললাম, না, চিঠিতে যেমন ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই রকমই এসেছি। কথা বলতে বলতে দোতলায় উঠে এলাম। ড্রইংরুমে ঢুকে তারিফ ক'রে বললাম, খুব রুচিসম্মত সাজিয়েছেন তো?

ওর কৃতিত্ব আমার কিছু নেই, সবই ভেরার। ও আর্টিস্ট কিনা।

জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস ঘোষ বাড়ি নেই ?

বেরিয়েছে, ফিরবে শিগগির।—একটু থেমে বললেন, সেদিন 'পাবে' অনেক কিছু ব'লে ফেলেছি, না ?

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ মামুলী কথাবার্তার পর আবার দেশের কথা উঠল। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ি কলকাতার কোন্ দিকে—উত্তরে, না, দক্ষিণে ?

বললাম, এলগিন রোডে।

আমরা ছিলাম শ্যামবাজারে। দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে যেতাম, বসন্ত কেবিনের চা, চাচার দোকানের কাটলেট—বড় ভাল লাগত। সে দোকানগুলো এখনও আছে ?

কলকাতার সবই আছে। হয়তো কিছু বেড়েছে, কমে নি এতটুকু।

রাস্তায় হাঁড়ি নিয়ে তিলকুট আর চন্দ্রপুলি বিক্রি করত, হাতে পয়সা থাকলেই খেয়েছি। তারপর, মনে করুন, বিশ্বকর্মা পূজোর সময় ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়ার কি মজাই! কাকের বাসা থেকে ডিম পেড়ে আনতাম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা হলদে বড় বাড়ি ছিল, সে বাড়ির ছেলেরা আমাদের সঙ্গে মিশত না, বেজায় বড়লোক। এই ঘুড়ি ওড়ানোর সময় তাদের সঙ্গে পাল্লা চলত। কি মধুর স্মৃতি!

মিঃ ঘোষ কত খাপছাড়া কথা বলতে লাগলেন। বুঝলাম, ভদ্রলোক অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মিসেস ঘোষ বাড়ি ফিরলেন। ভদ্রমহিলা রূপসী, তবে চোখে মুখে ক্লান্তির ভাব স্পষ্ট। মিঃ ঘোষের চেয়েও লম্বা, ছিমছাম শরীর, সোনালী চুল। মিঃ ঘোষ আলাপ করিয়ে দিলে ম্লান হেসে আমায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু মনে হ'ল, সে কথায় প্রাণ নেই। তাঁর উপস্থিতিতে মিঃ ঘোষ যে সহজ-ভাবে আলাপ করতে পারছিলেন না তা অনুভব করলাম, এবং নিজেও কম অস্বস্তি বোধ করি নি। এলোমেলো কয়েকটা কথার পর তিনি

কাজের অছিলায় উঠে গেলেন। কেন জানি না, সেদিন শ্রীমতী ভেরাকে আমার মোটেই ভাল লাগে নি।

মিঃ ঘোষের ওখানে চা খেয়ে আসার পর থেকেই মনে করতাম, ওঁদের নিমন্ত্রণ করা উচিত। কিন্তু নানা কাজে তা হয়ে ওঠে নি। প্রায় হপ্তাখানেক বাদে ঘোষ-দম্পতিকে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করলাম পিকাডেলির এক নামজাদা 'কাফে'তে চা খাবার জন্যে। যথাসময়ে হাজির ছিলাম, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে মিঃ ঘোষ একলা এলেন। চোখে মুখে বড় উদ্বিগ্ন ভাব।

জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস ঘোষ এলেন না?

মিঃ ঘোষ কি যেন ভেবে বললেন, ভেরা? না, ওর অন্য কাজ ছিল, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

টেবিলে ব'সে দেখলাম, মিঃ ঘোষ আজ খুব বেশি রকম অন্যমনস্ক। কোন কথারই ঠিকমত জবাব দিচ্ছেন না। এক সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কবে দেশে ফিরবেন?

বললাম, দু মাস বাদে।

আপনাদের দেখলে হিংসা হয়, কি সুখী আপনারা!— মিঃ ঘোষের গলা এত ভিজে যে, উত্তর দিতে পারলাম না। একটু পরে উঠে পড়লেন, বললেন, আমাকে মাফ করবেন, আজ আমি আসি। শিগগির একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন কিন্তু।

বললাম, যাব। আর কোন কথা না ব'লে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে মিঃ ঘোষ হন হন ক'রে চ'লে গেলেন। আমি চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

এই ঘটনার প্রায় পনেরো দিন পরে একদিন মিঃ ঘোষের বাড়ি গিয়েছিলাম। দরজায় বেল টেপার দরকার হ'ল না, কারণ নীচের ভাড়াটেরা সেই সময় বার হচ্ছিলেন। আমাকে ভারতীয় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ ঘোষের কাছে এসেছেন? ওপরে চ'লে যান। দোতলায় উঠে গেলাম, দরজার কাছে যেতেই ভেতর থেকে মিসেস ঘোষের উত্তেজিত গলার স্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। এ তো পশুর জীবন—মদ ছাড়া তুমি আর কি জান?

উত্তরে মিঃ ঘোষের জড়ানো কথা, আমি ভুলতে চাই তোমাকে, তোমার সমাজকে, তোমার দেশকে—

আমিও তাই চাই, আর এ সহ্য হয় না।—এই কথা ব'লেই রাগের মাথায় দরজা খুলে মিসেস ঘোষ বেরিয়ে এলেন। আমি একেবারে তাঁর সামনে প'ড়ে গেলাম। এতক্ষণ কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, এখন শ্রীমতী ঘোষের সামনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। তিনি কোন কথা না ব'লে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিঃ ঘোষ আছেন?

ভদ্রমহিলা বিশ্রী গলায় উত্তর দিলেন, তিনি তাঁর বোতল নিয়ে ব'সে আছেন, আপনিও ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গী হতে পারেন। কথা বলার অবকাশ না দিয়ে তিনি নীচে চ'লে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম, মিঃ ঘোষ চুপ ক'রে মুখ বুজে ব'সে আছেন। সামনের টেবিলে প্রায়-খালি হুইস্কির বোতল আর গেলাস। কি ভাবে কথা আরম্ভ করব ঠিক করছিলাম। মিঃ ঘোষ নিজে থেকেই বললেন, বসুন।

সামনের চেয়ারে বসলাম।

জিজ্ঞেস করলেন, ভেরা কি বেরিয়ে গেল?

বললাম, হ্যাঁ। একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এত মদ খাচ্ছেন?

ভুলতে, সব কিছু ভুলতে। মিঃ ঘোষ পাত্রে আরও মদ ঢাললেন।

এ রকম তিলে তিলে আত্মহত্যায় কি লাভ?

আপনারা বুঝতে পারবেন না, এই অবস্থার মধ্যে তো পড়েন নি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। নিস্তব্ধতা ভাঙলাম, বললাম, আপনার ছেলেকে তো দেখছি না?

সে ছুটিতে মাসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে।

কথা হয়তো অনেকক্ষণ চলত, যদি না মিঃ ঘোষ হঠাৎ শরীর খারাপ

লাগছে ব'লে উঠে গিয়ে বাথরুমে বমি করতেন। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, আমি তাঁকে ধ'রে সোফায় শুইয়ে দিলাম। চোখে মুখে জল দিয়ে একটু শুশ্রূষা করতেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁকে একলা ও-অবস্থায় ফেলে রেখে চ'লে আসা সমীচীন নয় মনে ক'রে একটা বই নিয়ে পড়ছিলাম, মিসেস ঘোষের প্রতীক্ষা ক'রে। শ্রীমতী ভেরা ফিরলেন প্রায় আরও আধ ঘণ্টা পরে। জিজ্ঞেস করলেন, ঘোষের কি হয়েছে? যা জানতাম, বললাম। ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললেন, আপনি আমাদের জন্যে অনেক কষ্ট পেলেন। মিসেস ঘোষের কাছ থেকে এতটা নরম কথা আশা করি নি। তাই বোধ হয় উৎসাহিত হয়ে বললাম, আপনার স্বামী বড় বেশি পান করেন, কমাতে পারলে ভাল হয়। মিসেস ঘোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিজে যত না খায় বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে বড় বাড়াবাড়ি করে। বললাম, নিজের ওপর এ রকম অত্যাচার করলে ওঁর শরীর ভেঙে যাবে, যেমন ক'রে হোক এ অভ্যাস ছাড়াতে হবে।

কথা বলতে বলতে মিসেস ঘোষ আমাকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, এই প্রথম ঘোষের একজন সত্যিকারের বন্ধু দেখলাম, যে তার ভাল চায়।

এর ক'দিন পরেই মিঃ ঘোষের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল সেই 'পাবে'তে, যেখানে একদিন তিনি আমায় ধ'রে তাঁর অতীত কাহিনী শুনিয়েছিলেন। আজ কিন্তু আমি তাঁর কাছে গিয়ে গেলাম না। দেখলাম, মাতাল ঘোষ আর একটা মেয়েকে নিয়ে ব'সে আছে। মেয়েটাও কম পান করে নি, তাদের ভাবগতিক মোটেই ভাল লাগল না। নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে পড়ল মিসেস ঘোষের বেদনাভরা মুখখানি।

এর পর থেকে ঘোষের উপর ভাল ধারণা আমার আর ছিল না। বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই তাঁর বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বললে—লোকটা একেবারে মাতাল; কেউ বললে—চরিত্র বলতে ওর কিছু নেই; কেউ বললে—একের নম্বর হাম্‌বাগ, সবজান্তার ভড়ং ক'রে ব'সে থাকে। আমি ভাবলাম, সত্যি মিথ্যে যাই হোক, ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল।

মাস তিনেক বাদে মেম ঠাকুমার কাছে যখন শুনলাম, ঘোষেদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, মোটেই আশ্চর্য হই নি। বললাম, এতদিন হয় নি কেন তাই ভাবছি। মেম ঠাকুমা জিভে শান দিয়ে বললেন, যেমনই স্বামী তেমনই স্ত্রী। আমি তো বউটাকে খুব কম ক'রে পঁচিশ জন ছেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।

পরচর্চায় আর যোগ দিলাম না।

কাজের স্রোতে ঘোষেদের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন মিসেস ঘোষের টেলিফোন পেয়ে আশ্চর্য হলাম।

বিশেষ দরকার, নিশ্চয়ই আসবেন---আজকেই।

কথার উপেক্ষা করি নি, ঠিক সময়েই তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলাম। শ্রীমতী ভেরা এখন থাকেন তাঁর বোনের সঙ্গে হ্যামস্টেডে। সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও চা-পানের পর তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন, শুনেছেন বোধ হয় আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে।

বললাম, শুনেছি।

হয়তো জানেন না, ঘোষ এখন হাসপাতালে।

কই, না। কি হয়েছে ?

অতি মাত্রায় পান করলে যে সব উপসর্গ দেখা দেয়, তাই আর কি ! একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, থাক্ সে কথা, আমি ওঁর জন্যে কিছু ফল কিনেছি, আপনি যদি দয়া ক'রে সেগুলি দিয়ে আসেন।

বললাম, নিশ্চয়ই।

অনুরোধ করলাম, কারণ জানি, আপনি তাঁর শুভকামনা করেন। কিন্তু একটা কথা, তাঁকে বলবেন না যে, আমি এ ফল পাঠিয়েছি।

আপনি না চাইলে বলব না নিশ্চয়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। শ্রীমতী ভেরা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন---ঘোষকে কেউ চিনবে না, কেউ তাকে বুঝতে পারবে না।

বুঝলাম, আমার উত্তর দেবার কিছু নেই। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে শ্রীমতী ভেরা নিজের মনের কথাই বলছেন—আমি তাকে ভালবাসি,

আমার নিজের চেয়েও বেশি। মুখে তাঁর ম্লান হাসি ফুটে ওঠে—ভাবছেন, তবে তাকে আমি ত্যাগ করলাম কেন? এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঘোষ তার দেশকে ভালবাসে, সেখানে ফিরতে চায়, কিন্তু তার মনে কেমন যেন 'কম্‌প্লেক্স' আছে,—আমাকে নিয়ে, ছেলেকে নিয়ে সে ফিরতে পারবে না। বলুন, এ অবস্থায় তাকে যদি আমি ছেড়ে না দিই, স্বাধীনতা না দিই, সে সুখী হবে কি ক'রে?

আমার কিই বা উত্তর দেবার আছে? শ্রীমতী ভেরা রুমাল দিয়ে চোখ নাক মুছতে মুছতে বললেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, যদি দেশে ফেরার সময় ঘোষকে নিয়ে যান। আমি বলছি, দেশে ফিরলে সে নিশ্চয় সুখী হবে।

বললাম, চেষ্টা করব।

চ'লে আসার আগে আমার হাতে ফলের ঝুড়িটি তুলে দিয়ে মিনতি ক'রে বললেন, এ সব কোন কথাই যেন ঘোষ না জানতে পারে। আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।

তাঁর করমর্দন ক'রে বেরিয়ে আসছি, শুনলাম, চাপা গলায় তিনি প্রার্থনা করছেন—ভগবান তাকে সুখী করুন।

হাসপাতালের পরিচালক টেলিফোনে যে সময় আমাকে আসতে বলেছিল, সেই সময় ফলের ঝুড়িটি হাতে নিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে ঘোষের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, যাক, আমাকে দেখতে আসারও লোক আছে! জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন বলছেন?

কেউ আসে না ভাই, কেউ আসে না। অন্য রুগীদের কাছে কত লোক আসে! আমি চুপচাপ ব'সে থাকি। ফল দেখে মিঃ ঘোষ খুব খুশি, বললেন, এ কি করেছেন! এত খরচ ক'রে—

সংকোচের সঙ্গে বললাম, না, এ আর কি!

আশ্চর্য, যে ফলগুলি আমি ভালবাসি ঠিক সেগুলিই এনেছেন দেখছি! আঙুর বলতে আমি পাগল।—কথা শেষ হবার আগেই দুটো আঙুর ছিঁড়ে মুখে দিয়ে বললেন, বেশ মিষ্টি।

এদিক ওদিক ছু-চারটে কথার পরেই মিঃ ঘোষের মুখ চোখ গম্ভীর হয়ে আসে। জিজ্ঞেস করলেন, জানেন তো আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে? সম্মতি জানালাম।

নিজের মনেই বললেন, একলা জীবন বড় কষ্টের, তা ছাড়া ভেরা যে আমার জীবনের কতখানি জুড়ে ছিল তা কে বুঝবে? কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। বললাম, শ্রীমতী ভেরা এ কথা জানেন?

জানতে দিই নি। যেদিন থেকে বুঝলাম ভেরার জীবনকে আমি নষ্ট করেছি, আমার অনুশোচনার সীমা রইল না। ভেরা রূপসী ছিল, অসাধারণ রূপসী। সে যদি নিজের সমাজে বিয়ে করত, আজ তার এ রকম অবস্থা হ'ত না। যত ভেবেছি, তত মনে দুঃখ পেয়েছি। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অনেক ভেবে দেখলাম, সে যদি আমাকে ঘেন্না করে, আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য কাউকে ভালবেসে আবার সংসার পাতে, আবার তার রূপ যৌবন ফিরে আসবে, সে সুখী হবে। মিঃ ঘোষ ছু-একবার কাশলেন; তার পর আবার আরম্ভ করলেন, আমি ভীষণ মদ খেতে শুরু করলাম, বাজে মেয়েদের নিয়ে ঘুরতে লাগলাম। যা চেয়েছিলাম, তাই হ'ল। ভেরা আমার ওপর চ'টে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চাইলে। আমি তাতে মত দিলাম।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। জিজ্ঞেস করলাম, শ্রীমতী ভেরা এখন কোথায় জানেন?

শুনেছি ওর বোনের কাছে আছে। ভগবান করুন ও সুখী হোক।

বললাম, চলুন না, আমার সঙ্গে দেশে ফিরবেন।

মিঃ ঘোষ ম্লান হেসে বললেন, না ভাই, সে মোহ আর নেই। যে কটা দিন বাকি আছে বিদেশেই প'ড়ে থাকব। ভেরাকে ছেড়ে বোতল ধরেছি, একে আর ছাড়ব না।

কথাগুলো বড় করুণ শোনাল। চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললাম, আজ তবে চলি। মিঃ ঘোষ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন, আপনার আসার জন্যে আর এই সুন্দর ফলগুলির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কথা দিলাম, মাঝে মাঝে আসব। মিঃ ঘোষ ঝুড়ি থেকে একটা দাগী লেবু আলাদা ক'রে বিছানায় রেখেছিলেন। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা বোধ হয় পচা, বাইরের ময়লা ফেলার জায়গায় যদি ফেলে দেন তো ভাল হয়। বললাম, নিশ্চয়। লেবু হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, মিঃ ঘোষ ডাকলেন, বললেন, দেখবেন, এ সব কথা কেউ না জানতে পারে।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোষ-দম্পতির কথাই মনে পড়ছিল—কেন তাদের জীবনে এলাম, অথচ কেনই বা তাদের জন্যে কিছু করতে পারলাম না! বাস-স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছি, বাস আসতে তখনও দেরি আছে। উচিত ছিল এরই মধ্যে হাতের লেবুটা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া। কিন্তু যখন খেয়াল হ'ল দেখলাম, অন্যমনস্কভাবে কখন ফলটা ছাড়িয়ে ফেলেছি। আশ্চর্য! খোসাটায় দাগ পড়লেও ভেতরের ফল রয়েছে পরিষ্কার। কোয়া ছাড়িয়ে মুখে দিলাম, কি মধুর, কি মিষ্টি!

শ্রীতরুণ রায়

রূপ-নারায়ণ

খরস্রোতা, ভৈরবিণী রূপ-নারায়ণ,
তীরে ব'সে স্তব্ধ আমি ঘন অন্ধকারে।
শব্দ শুনি ঝপ ঝপ—ভাদ্রের ভাঙন!
ডুবে যায়—কলস্বনা তরঙ্গ-হুঙ্কারে
সেই ধ্বনি। আতঙ্কের হিম-শিহরণ
দেহে মনে, দূরে স'রে আসি বারে বারে।
নৃত্যরতা—ছন্দোময়ী দুর্বার যৌবন,
বিরাটের স্পর্শ নামে বিপুল বিস্তারে।

* * *

দেখেছি মৃত্যুর রূপ রূপ-নারায়ণ,
আর কোন রূপ নেই স্রোতবেগে তব!
উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থলে তীব্র আকর্ষণ,
কূলে কূলে—ভাঙনের ভয়াল গৌরব।
ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি-ক্ষণ—
ধ্বংসলুব্ধা, হয়ে ওঠে আজ অভিনব

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

অম্লান বাড়রীর ক্রন্দন

কাঁদিছে মলিন কণ্ঠে অম্লান বাড়রী
বেলা দ্বিপ্রহর।
শ্বেত দেয়ালের বক্ষে ঝুলায়িত ঘড়ি
চলে নিরন্তর ;
সেকেণ্ডের লম্বা কাঁটা মিনিটে ঘুরিছে এক পাক,
মিনিটের কাঁটা করে চক্রমণে এক ঘণ্টা ফাঁক,
ঘণ্টা-কাঁটা পাক দিয়ে ঘুরে আসে এক দিন পর।
অম্লান বাড়রী কাঁদে, বেলা দ্বিপ্রহর।

অম্লান বাড়রী কে বা ? কার পুত্র ? কাহার নাপ্তি সে ?
আজি এই দ্বিপ্রহরে হায় তার কান্না পেল কিসে ?
ঘরে আর কেহ নাই, এ প্রশ্নের কে দেবে উত্তর ?
খোলা জানালার কাছে
সোফায় এলায়ে দেহ অম্লান বাড়রী ব'সে আছে,
কিম্বা আধ-ব'সে আধ-শুয়ে,
স্বপ্ন তার উড়িছে কি অনেক আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ?
ও-পাশে অনেক বই সাজানো রয়েছে দুটি র‍্যাকে,
তারি পানে মাঝে মাঝে অম্লান বাড়রী চেয়ে ছ্যাখে
লক্ষ্যহীন ছলছল মৌন চাহনিতে,
একান্ত নিভৃতে।
সে চাহনি যেন দূর দিগন্তের আবাহনে ভরা,
যেন সে শুনেছে কোন্ দূরের সঙ্গীত মধু-ঝরা
অথচ করুণ।
ক্রন্দনে, না পান-ফলে অম্লানের আঁখি দুটি এ হেন অরুণ ?

একদিনে-একপাতা ক্যালেণ্ডার দুলিছে দেয়ালে
হাওয়ার খেয়ালে

থেকে থেকে
সে যেন কহিছে তার নীরব ভাষায় ডেকে ডেকে :
"হায়, ওরে মানব-হৃদয় !
পলে পলে পলকে পলকে আয়ু ক্ষয়,
যতই নাচিস আজ, কাল তোরে করিবেই জয়।
পুরাতন পত্র ঝ'রে আসে বটে নয়া কিশলয়,
ঝ'রে-পড়া পুরানো পাতার তাতে কিবা লাভ হয় ?
চেয়ে দ্যাখ্ মোর পানে,
একটি একটি ক'রে পত্র ঝ'রে মোরে ব্যথা হানে।
আমি ফুরাইলে হেথা হয়তো আমারি মত-দামী
আসিবে নূতন, কিন্তু ফিরে আর আসিব না আমি।"
অদূরে টেবিল-বক্ষে অম্লানের দৃষ্টি ফের নামে
আছে যেথা একখানি মুখ-ছেঁড়া খামে
ভাজ-করা চিঠি একখানা,
কি তাহাতে লেখা আছে অম্লানের আছে বুঝি জানা,
তবু ফের বাড়াইয়া হাত,
খাম হতে চিঠি খুলে খামেরে ফেলিয়া চিৎপাত
পড়িতে লাগিল চিঠি,
পরিপক্ক স্পষ্ট লেখা, ভাষা মিঠি মিঠি :

"অম্লান, হে প্রিয় বন্ধু, তোমারে যে দিয়েছিনু কথা,
স্বপনেও ভাবি নাই হবে ভাই তাহার অন্যথা।
তুমি মোরে বলেছিলে 'এ জীবন পদ্মপত্রে একবিন্দু জল
যে কোন মুহূর্তে টলমল।'
আর বলেছিলে 'যদি বাধ্যতামূলক নাহি হয়,
সহজে কাহারো তবে কিছুমাত্র না হয় সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ সংস্থানের তরে,

জীবনবীমার তাই আবশ্যক প্রতি ঘরে ঘরে।'
তোমার যুক্তির নৃত্যে চিত্ত মোর হ'ল ভক্তিমান,
গদগদ হয়ে বন্ধু প্রতিশ্রুতি করিলাম দান
তোমারে নিভৃতে,
করিব জীবনবীমা তব কোম্পানিতে
পঁচিশ হাজারী।
কথা পেয়ে মিষ্ট হেসে হৃষ্ট চিত্তে ফিরে গেলে বাড়ি।
তুমি বাহিরিলে যেইক্ষণে
সেই ক্ষণে
পার্শ্ববর্তী কক্ষ হতে মৃদু হাসি
মেজো শালা অকস্মাৎ দেখা দিল আসি,
শুধাইল ধীরে ধীরে,
'কেবা এসেছিল হেথা, এইমাত্র চ'লে গেল ফিরে ?'
আমি কহিলাম হাস্য করি,
'বীমার দালাল বন্ধু অম্লান বাড়রী।
কথা দিনু কোম্পানিতে তার
করিব জীবনবীমা পঁচিশ হাজার।'
শুনি মোর মেজো শালা আর্তকণ্ঠে কহে,
'নহে নহে, কখনই নহে।
বাড়রী বঞ্চিবে মোরে ? হায়, এ আবদার কোন্ দেশী ?
শালা হতে বন্ধু হবে বেশী ?
ওগো ভগ্নীপতি, তুমি হেন শেল হেনো না মরমে,
অম্লানবদনে হেথা কর সই আমার ফরমে,
ভুলে গিয়ে বাড়রীরে।
অসংখ্য মক্কেল তার, অন্যতম হবে সেই ভিড়ে ?
তার চেয়ে হও মোর সম্মানিত একমাত্র, প্রথম শিকার,
কর কর কর অঙ্গীকার।

ব্যথাদগ্ধ জীবনের জীর্ণ ক্লান্ত মধ্যাহ্ন-সীমায়
বহু দ্বারে ব্যর্থ হ'য়ে ঢুকিয়াছি জীবনবীমায়
এই তো সেদিন। দেখি যদি কিছু হয়,
তা না হ'লে বক্ষে ল'য়ে ব্যর্থ পরাজয়
হতে হবে আত্মঘাতী। ওগো ভগ্নীপতি!
প্রিমিয়াম-হার নীচু, বোনাসের হার চড়া অতি
মোর কোম্পানিতে—
এইখানে সই কর অকুণ্ঠিত চিতে।'
আমি যত কহি 'এ কি জ্বালা!'
যতই এড়াতে চাই ততই নাছোড়বান্দা শালা।
বলে 'মোর তাড়াতাড়ি দিতে হবে কেস
না হ'লে বিপদ হবে, কাত্যায়নী মেস
ঢুকিতে দিবে না ঘরে, দিবে না আহার
না শুধিলে পূর্ব দেনা-ভার।
দিলেই তোমার কেস বছরের প্রিমিয়াম সাথে
আগাম পাইব কিছু হাতে,
মেসে আর অন্য যেথা দেনা আছে ক'রে দেব ইতি,
তা না হ'লে তব গৃহে হব এসে কায়েমী অতিথি,
ভগ্নীপতি হে আমার!'
শিহরিয়া তৎক্ষণাৎ করিলাম অঙ্গীকার,
শালা-দত্ত বীমাপত্রে করিনু স্বাক্ষর।
অতঃপর
চেক-বই খুলে
প্রিমিয়ামী চেক লিখে শ্যালকের হাতে দিনু তুলে।
নাচার অবস্থা বুঝে হে অম্লান, হে বাড়রী ভাই,
আমারে করিও ক্ষমা। কি করিব, মোর ভাগ্যে নাই
তব কোম্পানিতে বীমা এ জনমে হায়!

কিন্তু যদি জন্ম কভু লভি পুনরায়,
পুনর্জন্ম ললাটেতে যদি লেখা থাকে
নব জন্মে পূর্ণ ক'রে দেবই তোমাকে
এ জন্মের এই ক্ষতি, এই মর্মজ্বালা—
পরজন্মে যদি নাহি থাকে মেজো শালা।"

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

দেনা

উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নমস্কার করলাম।
আমি নন্দ, কমলের ছোট ভাই।

ভদ্রমহিলা এক মুহূর্তের জন্যে হতচকিত হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই একটু হেসে বললেন, চিনতে পেরেছি। তুমি নন্দ! মাস্টারমশাই কেমন আছেন?

বললাম বিনীতভাবে, ভালই। কিন্তু আমি মুশকিলে পড়েছি। হঠাৎ নাকি কলকাতায় বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। তাই একটু আশ্রয় যদি পাই রাত্রের মতন—

খিল খিল ক'রে ভদ্রমহিলা এবার হেসে উঠলেন।

বাঃ, বেশ অ্যাকটিং করতে শিখেছ তো? তিন বছর আগে বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতে যখন দেখেছিলাম, তখন তো মুখে কথা সরত না! ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে কেন?

বসতে হ'ল। ভদ্রমহিলা চেয়ারটা টেনে নিয়ে সামনে বসলেন। ব'সেই একবার ডাক দিলেন, এই, কে আছিস? স্বরেন—মনা—

জবাব পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, নাঃ, এদের নিয়ে আর পারা গেল না। দু-দুটো চাকর, একটা ঝি আর একটা বামুন, অথচ ঠিক কাজের সময়টিতে যে কে কোথায় ডুব মারেন, আর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না। তুমি ভাই একটু একলা ব'সে কাগজ পড়, আমিই চা ক'রে আনি।

ইতস্তত করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ভদ্রমহিলা অন্দরে অদৃশ্য হয়েছেন।

কাগজ সেদিনের নয়। দু দিনের বাসী। পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। বরঞ্চ কাগজে মুখ ঢেকে নিজের নির্লজ্জতার কথাই ভাবতে শুরু করলাম। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে ভদ্রমহিলাকেও ভাবলাম। ভদ্র-মহিলা, যাঁকে ক'বছর আগেও দেখেছি, মিশেছি, গল্প করেছি ঘনিষ্ঠভাবে, আজ এই ক'বছরের ব্যবধানে তাঁকে 'বউদি' ব'লে সম্বোধন করতেও কত সংকোচ! এত পরিবর্তন! অথচ এই পরিবর্তন কি শুধু আমারই?

বউদিকে দেখলেই মনে হয়, পরিবর্তন তাঁরও একটা হয়েছে, বেশ বড় রকমের পরিবর্তন। তার চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে পোশাকে পরিচ্ছদে। তবু তারই গভীরে কোথায় যেন একটা অতি-পরিচিত হারানো সুর লুকিয়ে রয়েছে।

একটু পরে ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। পরিপাটী ক'রে সজ্জিত ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। হালফ্যাশনের হেলানো কাপ। উত্তপ্ত চায়ের ধোঁয়া উড়ছে। ডিশের এক পাশে দুটি বিস্কুট।

বউদি অপ্রতিভ হয়ে বললেন, তোমার কপাল ঠাকুরপো। ভেবে-ছিলাম একটু কোকো খাওয়াব, তা হতভাগা চাকরগুলোর জ্বালায় হ'ল না। কখন যে কোকো ফুরিয়েছে তা যদি একবার জানায় আগে থেকে!

ভদ্রমহিলা সামনের টেবিলের ওপর চা নামিয়ে রাখলেন। বললেন, মাপ কর ভাই, বার বার আর কৈফিয়ৎ দিতে পারি না। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, তার ওপর যদি সামান্য দুটি বিস্কুট দেখে হাত গোটাও, তা হ'লে তো ওঁকে আবার এই অসুস্থ শরীরে দোকানে যেতে হয়।

গরম সীসের মত কথাগুলো কানে এসে বিঁধল। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠি, না না, সে কি কথা! সে কি কথা! কিন্তু, অরুণদা অসুস্থ না কি?

বউদি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, সে কথা আর বল কেন? বার বার বলেছি, প্রোমোশন তো যথেষ্ট পেয়েছ, আর কেন লোভ? অত ঝুঁকি নিতে গেলে শরীর থাকবে কি ক'রে? তা কি শুনবে ভাই?

বলেন কি জান? বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার সম্মান যে কি জিনিস, তা তোমরা মেয়েমানুষ—বুঝবে না। বোঝো একবার ঠাকুরপো, মেয়েরা বুঝবে না! মেয়েরা যেন কখনও কারও দায়িত্ব নেয় না।···ওমা, ও কি! চা ফেললে কেন? ভাল হয় নি বুঝি? তা ভাই, সত্যি কথা বলছি, কোন কালে নিজে হাতে জলটি পর্যন্ত গড়িয়ে খাই নি, বিয়ে হয়েও না। তবে ওই হতভাগা চাকর-ঠাকুরগুলোর যে এক-একদিন কি হয়, একসঙ্গে দল পাকিয়ে বেরোয় আড্ডা দিতে। কিছু বলতেও পারি না। যা দিনকাল পড়েছে, বেশি মাইনে দিয়েও চাকর-ঠাকুর মেলা দায়।

কথায় কথায় রাত বেড়ে চলল। বউদি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

নাঃ ঠাকুরপো, আর অপেক্ষা নয়। হতভাগারা কখন ফিরবে কে জানে! তার চেয়ে বরং আমি নিজে হাতেই—

না না না। এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার একটু রাত ক'রে খাওয়াই অভ্যেস। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, মেসে থাকি।

বউদি কিন্তু বসলেন। একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, না, তা হোক, অন্তত আমারও তো একটা শখ আছে। নিজের ঠাকুরপো নেই ব'লে কি নিজের হাতে খাওয়াবার আনন্দটুকুও পাব না একটা দিন?

বউদির এ যুক্তি খণ্ডাবার উপায় নেই। একটু হাসবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

বউদি বললেন, ভাল কথা, তুমি রাত্রে লুচি খাও, না, ভাত?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, লুচি! কি বলছেন বউদি? ভাল ময়দা আর খাঁটি ঘি যে কত দিন চোখে দেখি নি, তার কি ঠিক আছে? না, দরকার নেই। দু মুঠো ভাত যদি এ বাজারে পাই তো সেই ভাগ্য।

বউদি এবার হাসির ঝঙ্কার তুলে বললেন, ঠাকুরপো, তুমি যে এত ঢঙে কথা বলতে পার, এতদিন তো জানতাম না! তবে ওই যে ময়দার কথা বললে, ওতে ভাই আমিও একমত। এক চিমটি খাঁটি ময়দার মুখ দেখবার উপায় নেই। তবে কি জান, এ দিক দিয়ে আমাদের কিছু সুবিধে আছে। মানে, ওঁর একটু খাতির আছে পাড়ায়। কাজেই

ওরই মধ্যে যেটা ভাল জিনিস, আমরা সেটা পাই। খরচের কথা ভাবছ? তা ভাই, একটু কেন, বেশ খরচা হয় বইকি। ভাল জিনিস দেখলে আর রক্ষে নেই। যত দাম দিয়েই হোক নেওয়া চাই। এ ছাড়া দু বেলা মাখন ডিম-সেদ্ধ এ তো আছেই। একটু দুধ নইলেও চলে না। এ নিয়ে ওঁকে কিছু বলতে গেলেই উনি চিৎকার ক'রে ওঠেন—পেটে না খেয়ে বাপু টাকা জমাতে পারব না। না-খেয়ে টাকা জমানোর কথা আমিও বলি না। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকেও তো তাকাতে হয়! পিণ্টু বড় হচ্ছে। ওকে তো লেখাপড়া শেখাতে হবে, মানুষ করতে হবে! তার জন্যেও তো সঞ্চয় দরকার!

ঘড়িতে নটা বাজল। চমকে উঠে বউদি বললেন, আর দেরি করব না ভাই। তুমি আর একটু ব'সে ব'সে কাগজ পড়। আমার এখুনি হয়ে যাবে।—ব'লে বউদি চ'লে গেলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে বউদি নিজের হাতে বিছানা পেতে দিলেন। টেবিলের ওপরে কাচের গ্লাসে জল ডিশ-ঢাকা দিয়ে রাখলেন। যাবার সময় বললেন একটু হেসে, ভাল ক'রে খাওয়াতে পারলাম না ভাই। আর একদিন যদি আস, আজকের নিন্দে সে দিন ষোল আনা ঢেকে দেব।

বউদি হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

রাত তখন কত হবে জানি না। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। অকাল বর্ষার অবিশ্রাম বর্ষণ। বেশ একটু শীত-শীত করছে। উঠে গেঞ্জির ওপর শার্টটা চড়িয়ে নিলাম। মাথার কাছে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

নতুন জায়গায় ভাল ঘুমও হয় না। এ-পাশ ও-পাশ করছি। হঠাৎ মনে হ'ল, ভেতর দিকের দরজায় কে যেন শব্দ করছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো বা বাতাসের শব্দ। একটু পরেই কিন্তু ভুল ভাঙল। শব্দটা এবার জোরে জোরে হ'ল—ঠক্—ঠক্—ঠক্।

ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

ঠাকুরপো, একবার দরজাটা খোল তো।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। আমার দু চোখে বিস্ময় জেগে উঠল। বউদি ঘরে এসে ঢুকলেন। শাড়ি ব্লাউজ ভিজে গিয়েছে বৃষ্টির ছাটে। মাথার চুলগুলে অগোছালো—মুখে একটা নীরব চাঞ্চল্য।

বউদি মুচকে হেসে বললেন, হঠাৎ এসে পড়লাম।

ইতস্তত ক'রে বললাম, তা বেশ তো, আমারও ঘুম হচ্ছিল না।

ঘুম হচ্ছিল না! সে কি! বিছানায় ছারপোকা আছে নাকি? বউদি একটু সান্নিধ্যে এগিয়ে এলেন। বললেন, ব'স না, এত সঙ্কোচ কেন?

বসলাম। বউদি বসলেন পাশে—কাছটি ঘেঁষে। শুরু হ'ল গল্প, সংসারের, স্বামীর, একমাত্র রুগ্ন পুত্র পিণ্টুর আর পাশের বাড়ির মিসেস দত্তগুপ্তের। মিসেস দত্তগুপ্ত ধরেছেন, গড়িয়াহাটা রোডের ধারে তাঁদের নূতন কেনা বাড়ির পাশের জমিটুকু কিনতেই হবে। আজকের অকৃত্রিম সখ্যতা যেন তাঁদের চিরস্থায়ী হবার সুযোগ পায়।

বউদি বললেন, কি যে করি, ভেবে পাই না। বাড়ি কিনব, না, ওখানকার জমিটাই আগে নিয়ে রাখব? তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস করলে একটা সদুত্তর পাবার আশা নেই।

আমার তখন ঘন ঘন হাই উঠছে। বাইরে বৃষ্টির বেগটা বেড়েছে।

বউদি বললেন, দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই, ছাট আসছে।

আমি এবার চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। ব'লে ফেললাম একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে, অরুণদা আপনাকে খুঁজবে না তো?

বউদি আবার হাসলেন। হাসিটা এবার মিয়ানো। বললেন, ওঁর কি ভাই আর সেই হুঁশ আছে? রাত নটা বাজল তো ওই যে বিছানা নিলেন আর নড়বেন না। উঠবেন একেবারে যখন আমি চা নিয়ে হাজির হব তখন। তার ওপর এখন তো আবার শরীর খারাপ। আর ব'লো না ঠাকুরপো, আমি এবারে পাগল হয়ে যাব। অসুখ আর অসুখ। এ যেন নিত্যি লেগেই রয়েছে। পিণ্টুটার তো যা শরীর, দুখানা হাড় মাত্র। কাল থেকে হঠাৎ যে আবার কি হয়েছে—বমি করছে আর জ্বর। সারারাত ঘুমোতে পারে নি। এই ঘুম পাড়িয়ে আসছি।

বউদি হঠাৎ থামলেন। তার পর তাঁর বড় বড় চোখ দুটো আমার মুখের ওপর ন্যস্ত করলেন। এক মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তার পর একটু হেসে বললেন, ঠাকুরপো, দশটা টাকা দিতে পার? মানে, উনি তো শয্যাশায়ী, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতেও পারছি না। অথচ পিণ্টুর যে রকম গতিক দেখছি, তাতে কাল একটু ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা না করলেই নয়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো ব'লে ফেলে বউদি থামলেন। চোখটা এবার নীচু ক'রে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে শক্ত শানে ঘষতে লাগলেন।

তোমার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যেও, উনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই টাকাটা তোমায় পাঠিয়ে দেব।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, এর জন্যে আর কি!

ঘড়ির পকেট থেকে দুটো পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে দিলাম। বউদি পাশের দেরাজ থেকে একটা পেন আর একটা ছোট নোটবুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন—ঠিকানাটা?

* * *

কমলদা আমার পিসতুতো দাদা।

আজ কমলদাকে মনে পড়ল হঠাৎ। কয়েক বছর আগের এক সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম কমলদার বাসায়। দাদা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, বললাম, তবে থাক্, আর একদিন আসব।

দাদা হেসে বললে, চল্ না আমার সঙ্গে। একটা টুইশন আছে, কোন রকমে একবার চেহারাটা দেখিয়ে দিয়েই চ'লে আসব।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমিও যাব নাকি তোমার সঙ্গে?

ক্ষতি কি? আমার ছাত্রী আর যাই হোক খুব ভদ্র এবং মিশুক। তোর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশিই হবে। তবে দেখিস, স্মার্টলি কথাবার্তা বলিস। বড় ফরোয়ার্ড মেয়ে।

ইতস্তত করতে করতে ট্রামে উঠলাম। তারপর চ'লে এলাম বালিগঞ্জ প্লেসে, দাদার ছাত্রীর বাসায়। দাদা হেসে বললেন, কি রে, নার্ভাস হয়ে

পড়েছিস ? সলজ্জ হেসে উত্তর দিলাম, না না, নার্ভাস হব কেন ? দাদা বললেন, যত যাই হোক না, তবু জাতে ওরা মেয়েছেলে। কোন মেয়ের সান্নিধ্যে পুরুষ ঘাবড়াবে এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

আমিও পারি না, অন্তত চাই না। কিন্তু দাদাকে বলি কি ক'রে যে, ওই মেয়ে জাতটাকেই আমার ভয় বেশি, বিশেষ ক'রে যদি তাঁরা মাতৃস্থানীয়া না হন। মায়ের বয়সীদের সম্বোধনে বাধা নেই। একটা অনাবশ্যক 'মা' আবশ্যকমত জুড়ে দিলেই চুকে যায়। কিন্তু যাঁরা শ্রদ্ধায় মা নন অথচ সম্মানে মাতৃ-দুহিতা, তাঁদের সম্ভাষণ নিয়েই যে যত বিপত্তি।

লাল-কাঁকর-বিছানো পথে দু পাশে দেশী-বিদেশী বহু রকমের ফুল। নানা রকমের পাতাবাহার গাছ-গাছড়ার অপূর্ব সমাবেশ। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ঢুকছি, পাশ থেকে একটা বড় রকমের কুকুর হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাদা ধমক দিলে, টাইগার! পোষ মেনে গেল। দরোয়ান শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে ছুটে আসছিল, দাদাকে দেখে সেলাম দিয়ে স'রে দাঁড়াল। দাদার পিছু পিছু আমিও ঢুকলাম ঘরে।

হালকা-নীল-আলো-জ্বালা ঘর। পরিষ্কার দেওয়ালে পরিচ্ছন্নভাবে টাঙানো রয়েছে ছবি—রবীন্দ্রনাথ আর শ'য়ের। এক কোণে ঢাকা-পিয়ানোর ওপরে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ পাথরের ছোট্ট স্ট্যাচু। ঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের গোল টেবিলের ওপর পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার ঝাড়। দক্ষিণ দিকে কোণে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পড়ছিলেন নীলিমা ব্যানার্জি।

দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। পরিচয় পেয়ে ছোট্ট নমস্কার করলেন আমায়। হালকা রোলেক্সখানা নীলিমা ব্যানার্জির ক্ষীণ কব্জিতে বাঁধা পড়েছে ক্ষীণতর সোনার চেনে।

রঙে-রাঙা পাতলা ঠোঁটের ওপর হাসি ফুটে উঠল, বললেন, আপনার কথা শুনেছি এঁর মুখে। আজ এতদিনে দেখা হ'ল। মাস্টারমশাই তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আপনার মত নাকি ছেলে হয় না!

কৌতুক হাসিতে নীলিমা ব্যানার্জির সমস্ত মুখটা ঝলমল ক'রে উঠল।

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। মেয়েরা অযাচিতভাবে সামনাসামনি পুরুষের প্রশংসা করলে যেন কেমন নিজেকে অসহায় মনে হয়। নীলিমা ব্যানার্জি মন্তব্য করলেন আবার, আপনার ভাই এত লাজুক! আশ্চর্য!

দাদা একটু হেসে বললেন, ও-বয়েসে আমিও কম লাজুক ছিলাম না। তা ছাড়া এ লজ্জা ঠিক শরম নয়, বিনয়। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিনয় ঘুচে যাবে, তখন নিজের নির্লজ্জতায় নিজেই নিজেকে প্রকাশ করবে। ভাবনা নেই তার জন্যে।

নীলিমা ব্যানার্জি হাসলেন, বললেন, তখনও কি লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি আছে? পারিবারিক লজ্জা, সামাজিক লজ্জা, প্রেস্টিজ নিয়ে লজ্জা, মনের সত্য অকপটে খুলে বলার লজ্জা—লজ্জার আর শেষ কই মাস্টার মশাই? লোকের কাছে নিজের দীনতা প্রকাশ করার লজ্জাও নাকি অনেককে পীড়া দেয় শুনেছি।

বেয়ারা ট্রেতে ক'রে কোকো নিয়ে এল এই সময়ে। নীলিমা ব্যানার্জি কাছে এসে হাত ধ'রে বসালেন আমায় চেয়ারে, বললেন, নিন, আগে কোকোটা খেয়ে নিন, তার পর আলাপ করব। আজ আর ইকনমিক্সের লেকচার শুনব না আপনার দাদার কাছে।

এর পর আরও একদিন গিয়েছিলাম।

দেখি, ঘর শূন্য। ওঁর বসবার চেয়ারে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র মলাট বন্ধ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকি আর বারে বারে তাকাই নীলপর্দা-ফেলা দরজার পানে অধৈর্য হয়ে। শেষে বোতাম টিপি কলিংবেলের।

ঝন্ ঝন্ ক'রে বেল বেজে উঠল ওপরতলার অন্তঃপুরে। আয়া নেমে এল। এসেই আবৃত্তি ক'রে গেল নীলিমা ব্যানার্জির বক্তব্য—শরীরটা তেমন ভাল নেই। ও-বেলা জন-তিনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে গল্প ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আমার যে. খুব বেশি দরকার ছিল। আচ্ছা, তুমি গিয়ে বরঞ্চ ব'লে এস—কমলবাবু খবর পাঠিয়েছেন, আজ আর আসতে পারবেন না। অসুস্থ।

আয়া সায় দিয়ে ওপরে চ'লে গেল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। কিন্তু তখনও গেট পার হই নি। পেছন থেকে নীলিমা ব্যানার্জি ডাকলেন, শুনছেন ?

একটু আশ্চর্য হয়েই ফিরে তাকাই। নীলিমা ব্যানার্জি নীচে নেমে এসেছেন। মুখে-চোখে কেমন একটা ক্লান্তি। এই অল্প শীতেও গায়ে একটা স্কার্ফ আলগোছে প'ড়ে রয়েছে। ফিরতে হ'ল।

কি ব্যাপার ? মাস্টার মশাইয়ের কি জ্বর হয়েছে ?

বললাম, হ্যাঁ। কাল রাত থেকেই একটু একটু জ্বর। আজও ছাড়ে নি

এক মুহূর্তে নীলিমা ব্যানার্জির মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, ভাল ক'রে ট্রিটমেণ্ট করান। সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

মাথা নেড়ে চ'লে আসছিলাম, কিন্তু আরও কিছু বলবার ছিল। দাদা অন্তত পাঠিয়েছে সেই কারণেই। কিন্তু মুখ ফুটে বলি কি ক'রে ?

মেয়েদের কাছে কি চাওয়া যায় কখনও কিছু ? ন্যায্য পাওনা হ'লেও তাগিদ দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এখনও তিরিশ তারিখ আসে নি। অথচ টাকাটা এ সময়ে না হ'লে—

নীলিমা ব্যানার্জি আবার ডাকলেন এই সময়, শুনুন, শুনুন।

ফিরে দাঁড়ালাম।

আলমারি থেকে ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন।

যদি ভাই কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি। আপনার দাদাকে এখন দিনকতক আসতে দেবেন না। সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আর এ মাসের টাকাটা—

কয়েকখানা ঝক্‌ঝকে নোট নীলিমা ব্যানার্জি একটা খামে পুরে আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

এর পর নীলিমা ব্যানার্জির সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল অরুণদার সঙ্গে বিয়ের পর।

সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন নীলিমা মুখার্জিই—তোমায় তা হ'লে 'ঠাকুরপো' ব'লেই ডাকব ভাই। আমাদের দেশে বউদির সঙ্গে সমবয়সী ছেলেদের এর চেয়ে মধুর সম্পর্ক আর কিছু নেই। এবার ভাইফোঁটায় কিন্তু আসতেই হবে। নেমন্তন্ন ক'রে রাখলাম।

কথাও দিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দীর্ঘকাল আর আসা হয় নি।

* * *

অনেক দিন কেটে গেছে এর পর। প্রতিদিনের বাঁধা-ধরা কেরানী-গিরির চাপে আর পারিবারিক অশান্তির মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ভুলে গেলাম ক মাস আগের তুচ্ছ ঘটনা।

না ভুলেই বা উপায় কি? মধ্যবিত্তের ঘরের খুঁটিনাটি ঘটনা—তার একটা দিনের দুঃখ বেদনা আর অভিমান, এর কি কোন মূল্য আছে? কোন ঐশ্বর্য আছে কি—কোনও আসক্তির ঐশ্বর্য যে, মনে রাখতে হবে বৎসরান্তর ধ'রে?

হঠাৎ এমনই সময় এল একদিন টেলিগ্রাম। সোমড়া থেকে খবর এসেছে—কমলদা মৃত্যুশয্যায়।

হাত দুটো কেঁপে উঠল থরথর ক'রে। কমলদা মৃত্যুশয্যায়!

কলকাতা-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছিল কমলদা একদিনের একটি কলমের খোঁচায়।

বনিবনা হ'ল না, ভাল চাকরি ছেড়ে দিলে। বললে—না, এ ভাবে চাকরি করা চলবে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে এল সোমড়ায়। একটা সামান্য মাস্টারি নিয়ে আঁকড়ে রইল সেই মফস্বলের মাটি।

সেই দিনই বিকালের ট্রেনে রওনা হলাম। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে বারহারওয়া লুপ লাইনের ট্রেন চলেছে। খোলা জানলা দিয়ে আসছে ঝাপটা বাতাস। মনে পড়ল আবার কমলদাকে। এই তো ক মাস আগেও দেখে এসেছি। মুখে উজ্জ্বল হাসির রেখা টেনে বলেছিল—নন্দ,

এত ক'রে আসতে বলি, তবু আসিস না! দেখবি কিন্তু, আমি ম'রে গেলে তোর দুঃখের সীমা থাকবে না।

তার পর পনেরোটা দিন যায় আর উপরি-উপরি দুখানা চিঠি—কবে আসছ? আমার শরীর খুবই খারাপ।

কাজের অজুহাত দেখিয়ে আরও মাস খানেক কাটিয়ে দিই। তার পর এক শনিবার রাত্রে হানা দেওয়া। চোখ-নাক বুজে একটা রবিবারও কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া। তার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সত্যি কথা, ভাল লাগে না দাদা-বউদি আর শীর্ণকায় দুই শিশু-পুত্রের সেই দারিদ্র্য-কাতর মূর্তি—ছন্নছাড়া অসহায় সংসারযাত্রা।

সেই কমলদা মৃত্যুশয্যায়!

হঠাৎ যেন নিজেকে কেমন অপরাধী ব'লে মনে হ'ল। সে অপরাধের যেমন কোনও যুক্তি নেই, তেমনই যেন নেই ক্ষমা।

দুজন ডাক্তার দিনে রাতে আসেন বার বার। তাঁদের ভিজিট?

বউদি আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলেন—ঠাকুরপো, তুমি এসেছ?

একদিন দুদিন তিনদিন ক'রে সপ্তাহ কেটে গেল। একটু যেন উন্নতি দেখা যাচ্ছে। দু দিন পর দাদার পূর্ণ চেতনা ফিরে এল।

ডাক্তার বললেন, ভয় কেটেছে। কিন্তু এখন পথ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

ডাক্তার চ'লে গেলেন।

বউদি আমার দিকে তাকালেন, করুণ মর্মভেদী দৃষ্টি। অলঙ্কারশূন্য শীর্ণ দুখানা হাত আমার দিকে মেলে ধরলেন—ঠাকুরপো!

আশার আনন্দ আর অভাবের কান্না বউদির কণ্ঠস্বর রোধ ক'রে দিল।

নিজের অবস্থা জানি। যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব শেষ ক'রে দিয়েছি। বিদেশে ধারও মিলবে না। এখনও মেসের খরচা দেওয়া বাকি, মাইনে পাওয়ার দিন অনেক দূরে। মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

কমলদা যেন কি হাতড়াচ্ছে!

লেবু—লেবু খাবে? বউদি মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞেস করলেন। দাদা কি চাইলে বোঝা গেল না।

কিন্তু বউদি তখনই উঠে আলমারি থেকে ছোট্ট সাবানের বাক্সটা বের ক'রে পাগলের মত হাতড়াতে লাগলেন। বললেন, এই নাও, এই নাও ঠাকুরপো, কটা পয়সা আছে। একটা লেবু এনে দাও।

হঠাৎ বাইরের ঘর থেকে কে ডাকল, মুরারীমোহনবাবু আছেন?

চমকে উঠে বললাম, কে?

পিওন।

বউদি ছুটে গেলেন।

আবার কার টেলিগ্রাম?

মনি-অর্ডার আছে তোমার নামে।

আমার নামে মনি-অর্ডার!

চমকালাম বইকি। এতখানি প্রসন্নভাগ্যের অকস্মাৎ আবির্ভাবের আঘাত সহ্য করার অভ্যাস আমার নেই। যে চিরকাল মনি-অর্ডার ক'রে এসেছে তার ভাগ্যে মনি-অর্ডার আসে! ফর্মটি নিয়ে দেখি, পাঁচ টাকার মনি-অর্ডার। পাঠাচ্ছেন পার্বতী গুহ লেনের সেই বউদি—নীলিমা মুখার্জি।

তলায় ছোট ছোট ক'রে লেখা—ঠাকুরপো, টাকাটা পাঠাতে দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না। তাও সব টাকাটা পাঠাতে পারলাম না। যত শিগগির পারি, বাকিটা পাঠিয়ে দেব। উনি এখনও শয্যাশায়ী। আর আমার পিণ্টু আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে গত মাসের তেরো তারিখে। মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তাই টাকা পাঠানোর ত্রুটি মার্জনা ক'রো ভাই। ইতি—

বউদি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার দিকে একবার তাকালেন। দেখি, বড় বড় চোখ দুটো জলে ভ'রে গিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুরপো, পিণ্টু কে গো?

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬০

[জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে লিখিত পত্র]

১

চুয়ান্ন তো পার হয়েছি পঞ্জিকাতে বলছে
জীবন-ধারা কিন্তু ভায়া সাবেক চালেই চলছে
মেঘ দেখলেই মনের ময়ূর মেলছে পেখম তেমনি
রূপ-সায়রে আজও দেখি চিত্ত-চিনি গলছে!
সকাল আসে সন্ধ্যা আসে
আসে রাতের কালো
খারাপ কিছুই লাগছে না তো
লাগছে সবি ভালো।

২

যে সব 'ভাবে' যৌবনেতে লাগিয়ে ছিলে 'ছন্দ'
আজও তো ভাই এই বয়সে লাগল না কো মন্দ
মাংস মাছে নেই অরুচি চপ কাটলেট কোর্মায়
'সুক্তো' 'ভাতে' তাও তো খাশা,—হয় নি কিছুই বন্ধ।
জানি না কোন্ নিপুণ মাঝি
আছেন ব'সে হালে
নূতন হাওয়ায় চলছে তরী
ইন্সুলিনের পালে।

৩

সত্য বটে বিদায় নেছেন কসের ক'টি দন্ত
গিন্নী তবু সদয় আছেন ধরেন নি বাম-পন্থ
নাকের চুলে পাক ধরেছে ভুরুর চুলেও কিঞ্চিৎ
চুলায় কিন্তু বহ্নি আছেন হয় নি তাতের অন্ত।
দিল-দরিয়ায় চলছে তরী
খামখেয়ালী বায়ে
ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল
ঢেউ লাগছে গায়ে।

৪

বনে যাবার সাধ তো খুবই স্বভাবটা মোর বন্য
কিন্তু বল কোথায় সে বন ছুটব যাহার জন্য
বনেও যে ভাই বেতার-যোগে গাইছে কোকিল-কণ্ঠী
বনের কোকিল খাঁচায় ঢুকে করছে শহর ধন্য।
কীচক-বনে বাজবে যেদিন
বঁধুর বাঁশী সাধা
সেদিন জানি ছুটতে হবেই
পেরিয়ে সকল বাধা।

"বনফুল"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ। বঙ্গীয়-রবীন্দ্র-পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনগরে সমারোহের সঙ্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে ব'লে সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাতে অংশ নেবেন ব'লে প্রকাশ।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার কথা। বীরচাঁদ মিঠোলিয়ার গদির হিসাবরক্ষক জয়ন্ত পৌনে পাঁচটা নাগাদ তার হিসেবের খাতাটি ফিতে দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ভাবছিল যে, এখন রওনা হ'লে সোয়া পাঁচটার মধ্যে রবীন্দ্রনগরে পৌঁছানো যাবে কি না! শহরের প্রধান অনুষ্ঠান—অতএব প্রচণ্ড ভিড় হবার সম্ভাবনা।

জয়ন্তর পাশে গলার স্বর সপ্তমে তুলে হিন্দী আর্যা আওড়াতে আওড়াতে হিসেব লিখছিল বীরচাঁদের ভাগ্নে সুখনলাল। খাতা বাঁধা শেষ হ'লে পর জয়ন্ত তাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, সিন্দুকের চাবিটা দিন তো সুখনলালজী।

আর্যা আবৃত্তি বন্ধ হ'ল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুখনলাল বললে, এত্‌না জল্‌দি চলা যাতেঁ হায় বাবুজী? গম্ভীর মুখে জয়ন্ত বললে, কাজ আছে।

রোজই আপনার কাম থাকে বাবুজী! কাল সাড়ে চার বাজে বোললেন আপনার ভাইয়ের বেমারী আছে। আজ পৌনে পাঁচও বাজে নি, আজভি বোলছেন—কাম আছে। এইসা করনেসে চোলবে কি ক'রে বাবুজী?

জবাবদিহি করবার মত সময় আমার নেই—চাবি দিন।

আচ্ছা!—সুখনলালের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ফুটে ওঠে। জবাবদিহি কোরবার সময় হোবে না আপনার! কি এমন রাজকাজ আছে?

আরক্তমুখে জয়ন্ত বললে, চাবি দিন। নয়তো এই খাতা রইল—আপনি সিন্দুকে তুলে রাখবেন।

আহা-হা, নারাজ হচ্ছেন কেন? এই নিন চাবি।

সিন্দুকের মধ্যে হিসাবের খাতাটি রেখে সুখনলালের হাতে চাবিটি ফেরত দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই জয়ন্ত দেখলে যে, তার সুমুখে বীরচাঁদ গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। নিমেষে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল—হৃৎকম্প শুরু হ'ল বুকের ভিতর।

এত তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছেন বাবুজী?—বপুর বহরমাফিক গলায় বীরচাঁদ বললেন, পৌনে পাঁচভি বাজে নি।

জবাব দেবার চেষ্টায় জয়ন্তর ঠোঁট দুটি বার কয়েক কেঁপে উঠল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। বীরচাঁদ তার হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়ে বললেন, খাতামে এইগুলো এন্‌ট্রি ক'রে তবে যাবেন বাবুজী। ব'লে তিনি পাশের ঘরে, অর্থাৎ তাঁর খাস কামরায় ঢুকে পড়লেন।

ম্লানমুখে জয়ন্ত আবার সিন্দুক থেকে হিসাবের খাতাটি বের ক'রে ব'সে পড়ল।

বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে সুখনলাল বললে, বীরচাঁদজীকে বললেন না কেন যে, আপনার জরুরী কাম আছে?

তার মুখের ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে জয়ন্ত নীরবে তার কাজে মন দিলে, কিছু বললে না।

গদি থেকে বের হতে জয়ন্তর প্রায় সোয়া পাঁচটা বেজে গেল।

তার সৌভাগ্যক্রমে তখন বীরচাঁদের বাড়ির সামনে রবীন্দ্রনগরের বাস এসে দাঁড়িয়েছে। সে ছুটতে ছুটতে তাতে উঠে পড়ল।

রবীন্দ্র-পরিষদের হলের মধ্যে ভিড় ঠেলে ঢোকে জয়ন্ত। হলে যদিও প্রচণ্ড ভিড়, বসবার জায়গার অভাবে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, তবু স্টেজের সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। বোধ হয় জায়গাটুকু বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। কিংবা হয়তো স্টেজের খুব নিকটবর্তী ব'লে ভীরু জনতা ঐটুকু জায়গা ছেড়ে বসেছে। জয়ন্ত ওখানেই ব'সে পড়ে। তার সামনে একটি সুসজ্জিত তরুণী সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোকের পাশে ব'সে। জয়ন্তর কানে এল মেয়েটি বলছে—বেশ উচ্চৈঃস্বরেই বলছে যাতে হলের সবাই শুনতে পায়—সোফারকে ব'লে এসেছ তো গাড়ি পাহারা দিতে? হরদম গাড়ি চুরি যাচ্ছে আজকাল। সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দেন, তা আর বলি নি! আমাকে কি কাঁচা ছেলে পেয়েছ মল্লিকা? আমার কি আর খেয়াল নেই যে, আমাদের গাড়িটা প্যাকার্ডের লেটেস্ট মডেল? ভদ্রলোকের কথাগুলি হলের প্রায় অর্ধেক লোকের শ্রুতিগোচর হয়।

দু পাশে দুটি ছোট মেয়ের হাত ধ'রে একজন তরুণী জয়ন্তর ডান পাশের দরজা দিয়ে হলের মধ্যে ঢুকল। তাকে দেখেই জয়ন্ত চিনতে পারলে, সুমিত্রা হালদার। বিয়ে হয়েছে বুঝি? কবে? কার সঙ্গে? যুগপৎ কয়েকটি প্রশ্ন তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

সুমিত্রা জয়ন্তর মুখের পানে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়, বোধ হয় সে তাকে চিনতে পারে নি। জয়ন্তর সামনেই সুমিত্রা তার দু পাশে মেয়ে দুটিকে বসিয়ে নিজে বসল। কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্ত শুনতে পেল যে, সুমিত্রা বলছে—মিতা, নীতা, একদম কথা বলবে না। চুপচাপ সব মন দিয়ে শুনে যাবে। সামনে ঐ যে দেখছ কবিগুরুর ছবি, ঐ দিকে চেয়ে মনে মনে ওঁর চেহারা ধ্যান কর। মনে মনে আবৃত্তি কর। মেয়ে দুটির মধ্যে যেটি বড়, সে তার বোনের দিকে চেয়ে তার

মার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে বিকৃত মুখে, বড্ড শক্ত রবি ঠাকুরের কবিতা। সুমিত্রা কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে মেয়েটির মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হানে। তার চোখের দৃষ্টি থেকে নির্গত নীরব তিরস্কারের প্রতিক্রিয়া মেয়েটির মুখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা দিল। জয়ন্ত দেখল যে, তার চোখ দুটি ছলছল করছে।

উদ্বোধন-সঙ্গীত আরম্ভ হয়। গানের প্রথম অংশ হলের গণ্ডগোলের আড়ালে চাপা প'ড়ে যায়। কে একজন ব'লে ওঠে, মাইক কাজ দিচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তার কথাগুলির প্রতিধ্বনি ক'রে অনেকে মিলে সমস্বরে কলরব ক'রে ওঠে, মাইক কাজ দিচ্ছে না। মাইক—মাইক—

সুমিত্রার ছোট মেয়ে তার মায়ের মুখের পানে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, মাইক কি মা? সুমিত্রার বড় মেয়েটি তার বোনের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বলে, তাও জানিস না! ওই যে নলের মাথায় চোঙ বসানো রয়েছে, ওইটা মাইক। সুমিত্রা চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠে, আঃ! তোরা চুপ কর্ তো। স্টেজের অনতিদূরে বসেছিল ব'লে মাইক ঠিক কাজ না দিলেও গান শুনতে জয়ন্তর কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু গানে তার মন ছিল না। তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে এই কথাটি বার বার এসে তীব্র খোঁচা দিয়ে জেগে উঠছিল যে, সুমিত্রা তাকে চিনতে পারে নি। মেয়েরা কি এত সহজেই ভুলে যায়?

কেয়া তামাসা হোগা রে আবদুল?—কথাগুলি জয়ন্তর কানে যেতে সে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, বক্তা একটি হিন্দুস্থানী কিশোর। বক্তার পাশে বসা আর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে চিন্তিত মুখে বললে, কেয়া জানে। সুক্কুরনে বোলা থা কাক্কু নাচেগী আওর লতামঙ্গেস্করনে গায়েগী। প্রশ্নকর্তার চোখ দুটি অসম্ভব রকম বিস্ফারিত হয়ে ওঠে বলে, সচ্! কাক্কু আওর লতা কল্‌কত্তেমে আয়ী? উত্তর আসে, হাঁ। আজ হাওয়াই জাহাজমে আয়ী।

এখন আমরা সভাপতি মহাশয়কে বরণ করব। যান্ত্রিক গোলযোগ সংশোধিত হওয়ার দরুন হলের সব কটি লাউডস্পীকার কলরব ক'রে

ওঠে। সভাপতিকে দেখবার জন্য মুখ তুলে চেয়ে সভাপতির নির্দিষ্ট আসনে বীরচাঁদ মিঠোলিয়াকে দেখে চমকে ওঠে জয়ন্ত।

জয়ন্তর পাশের ভদ্রলোক বললেন, রবীন্দ্র-পরিষদ্‌কে পাঁচ হাজার টাকা ডোনেট করেছেন। ওঁকে সভাপতি না ক'রে উপায় কি ?

তাঁর কথাগুলি জয়ন্তর কানে যায় না। সে বীরচাঁদের পাশে সুখনলালকে দেখছিল। সুখনলালও এসেছে!

সভাপতিকে মাল্যদান শেষ হ'লে পর সুখনলাল লম্বা মাইকটির সুমুখে উঠে দাঁড়াল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে সুখনের মুখের পানে চেয়ে জয়ন্ত ভাবলে, সুখন দেবে বক্তৃতা!

সুখনলাল বলতে শুরু করে, আজ রবি-ইন্দ্রনাথজীকি বার্থডে আছে। সেইজন্য বহুৎ গানা-বাজা হোবে। গানা-বাজা শুরু হবার আগে পহেলে হামি আপনাদের কাছে সভাপতিজীকো ইন্‌ট্রোডিউস করিয়ে দেবে। সভাপতিজী বীরচাঁদ মিঠোলিয়ানে ভারী বেওসাদার আছে। উন্‌কে তেল আওর ঘেওকে বেওসা সারা বাংলা মুলুক জুড়ে হোয়ে থাকে। ফি বছর এক লাখ, দেড় লাখ রূপেয়াকা মুনাফা হোয়। বেওসামে বীরচাঁদ-জীকে বেশির ভাগ টাইম চ'লে গেলেও ইনি তুলসীদাসজীকি রামায়ণ আওর কবীরজীকি দোঁহা পড়েন। মাঝে মাঝে রবি-ইন্দ্রনাথজীকি পোয়েট্রি ভি প'ড়ে থাকেন। ইনি ধার্মিকভি আছেন। কলকত্তেমে বহুৎ মন্দির নির্মাণকা ওয়াস্তে বিশ-পঁচিশ হাজার রূপেয়া দান করেছেন। তেতাল্লিশ সালকা ফেমিনকা টাইমে কলকাত্তা শহরমে ইনি বহুৎ লঙ্গরখানা খুলে দিয়েছিলেন।

ওমা সুমি—তুই! খুব পরিচিত মধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে জয়ন্ত তার সুমুখে দৃষ্টিপাত করল। দেখলে, সুমিত্রার কাছে লাল রঙের প্ল্যাস্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একটি সুন্দরী মেয়ে ব'সে আছে। কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে থেকে জয়ন্ত তাকে চিনতে পারলে, মীরা মিত্র। সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, ওমা, মীরু যে! আয়, কাছে আয়। মীরা কাছে আসতেই তার একটি হাত চেপে ধ'রে সুমিত্রা বললে,

উঃ! কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল! ব্যাপার কি বল্ তো! বিয়ের পর একেবারে ডুব মেরে গেছিস, ভুলেও একবার আমাদের ওখানে পা মাড়াস না? মীরা বলে, তুইও তো যাস না আমাদের ওখানে? সুমিত্রা উত্তর দেয়, একদম সময় পাই না ভাই। রোজ দশটা থেকে চারটে ইস্কুল, বাদ বাকি সময় মেয়েদের ও মেয়েদের বাবার তদারক করতে কেটে যায়। সুমিত্রার মেয়ে দুটির দিকে চেয়ে মীরা বললে, ওমা, তোর মেয়ে দুটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে তো! কতটুকুন দেখেছিলাম ওদের! ভারি মিষ্টি হয়েছে কিন্তু দেখতে—ঠিক তোর মত। গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে সুমিত্রা প্রশ্ন করে, তোর কিছু হয় নি? লাল হয়ে ওঠে মীরার মুখ। চাপা গলায় সে বলে, না। তারপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললে, শিগগিরই হবে।

তখন প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণ পাঠ আরম্ভ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি নাকি তাঁর ডক্টরেটের থীসিসের সারাংশ। কলেজের ছাত্রছাত্রীর একটি দল হলের মাঝখানে ব'সে চীনাবাদাম চিবুচ্ছিল। তারা হঠাৎ ব'লে উঠল, হরিবল! তার পরেই তাদের মধ্যে কে একজন বললে, মৃগাঙ্কবাবুর বইটা থেকে বড্ড বেশি টুকে ফেলেছে। একটু র'য়ে-স'য়ে টোকা উচিত ছিল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রে মীরা, তুই কি একা এসেছিস? মীরা বলে, না, উনিও এসেছেন। ওই যে স্টেজে ব'সে আছেন, আজকের ফাংশনের গানগুলি সব উনিই কন্‌ডাক্ট করছেন কিনা! স্টেজের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সুমিত্রা বললে, কই? মীরা বললে, ওই যে দেখতে পাচ্ছিস না, হারমোনিয়মের সামনে ব'সে আছেন, রীমলেস চশমা চোখে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। বাঃ, তোর বরের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে তো! বিয়ের আগে তো রোগা-পটকা ছিলেন একেবারে। খুব যত্ন-আত্তি করছিস বুঝি?

মাথা নীচু ক'রে মীরা অস্ফুটকণ্ঠে বললে, যাঃ! তারপর মুখ তুলে মৃদু হেসে বলে, তুই বুঝি একা মেয়েদের নিয়ে চ'লে এসেছিস?

না, না, আমার কর্তাও এসেছেন। তিনিও স্টেজের ওপর ব'সে আছেন, একটা প্রবন্ধ পড়বেন কিনা!

কই তোর বর? দেখিয়ে দে না ভাই।—মীরার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম অনুনয় ফুটে ওঠে।

বাঁ দিকে দেখ্।—ব'লে সুমিত্রা স্টেজের উত্তরপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর মনে হ'ল, সুমিত্রার মুখের দীপ্তি যেন একেবার নিবে গেছে। সে একটু বিস্মিত হয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখতে পেল যে স্টেজের উত্তরপ্রান্তে খদ্দরের পাঞ্জাবি-পরা একজন ভদ্রলোক একটি তরুণীর কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির মুখে চোখে কৌতুক উপচে উঠছে।

চিত্রার সঙ্গে কথা বলছেন যিনি, তিনি তোর বর?—মীরা সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

হুঁ।—গম্ভীরমুখে সুমিত্রা জবাব দেয়।

চিত্রার সঙ্গে সত্যেনবাবুর আলাপ আছে বুঝি? চিত্রাকে তুই চিনিস তো? খুব ভাল গান গায়। আজকাল দারুণ নাম করেছে। এক কালে অবশ্য ওঁরই ছাত্রী ছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ওঁরই হাতে গড়া মেয়েটি। অবশ্য আজকাল ওর দেমাক হয়েছে খুব। সব্বাইকে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, ও একেবারে সেল্‌ফ্-মেড।

বিয়ে হয়েছে তো?

বিয়ে! ওর বিয়ে করার দরকার আছে নাকি!—চাপা গলায় মীরা বললে।

সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হয়েছে। মীরা স্টেজের দিকে চেয়ে বললে, প্রায় পঞ্চাশ জন একসঙ্গে গাইছে—দেখছিস সুমি?

হুঁ।

স্টেজে তিলধারণের জায়গাও নেই। ওঁর কিন্তু এতগুলো মেয়েকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না একেবার। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নিয়েছেন।

এদের মধ্যে সঙ্গীতভবনের পরিচালকদের বাড়ির মেয়ে আছে পঁচিশটি। ভাল গাইতে পারে এমন সব মেয়েদের বাদ দিয়ে এদের নিতে হয়েছে। যে মেয়েটি ওর বাঁ পাশে ব'সে আছে না—ঐ যে সবুজ শাড়ি-পরা, এর পরেই ওর সোলো আছে। শুনিস কি রকম বিশ্রী গায় মেয়েটা! গলা নেই, তালজ্ঞান নেই, তবু ওকে সোলো গাইবার চান্স দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু ওর বাবা হচ্ছেন রায় বাহাদুর শুভেন্দু সান্যাল। সত্যি ভাই, একজিকিউটিভ কমিটীর মেম্বার, ডোনার, পেট্রন সবাইকে গুব্লাইজ করতে করতে উনি প্রাণান্ত হচ্ছেন। এত অসুবিধার মধ্যে ওঁকে কাজ করতে হচ্ছে যে বলবার নয়। অথচ তুই তো জানিস ওঁর কি রকম সাধ ছিল সঙ্গীতভবনটি সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার! প্রথম যখন সঙ্গীত-ভবনের প্রতিষ্ঠা হ'ল—

মীরার পাশের একজন ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, একটু আস্তে।

মীরা রুষ্ট মুখে ভদ্রলোকের মুখের ওপর ভ্রূকুটি হেনে নীরব হ'ল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে সুমিত্রার কানের কাছে মুখ এনে সে বললে, ভারি অসভ্য তো লোকটা! স্টেজের দিকে দৃষ্টি রেখে সুমিত্রা অন্যমনস্ক-ভাবে বললে, হুঁ।

মীরার উচ্ছ্বসিত বাক্যস্রোতের এক বর্ণও যে তার কানে যায় নি, তার মুখের ভাবে জয়ন্ত বুঝতে পারল। স্টেজের যে অংশে সত্যেন ও চিত্রা পাশাপাশি ব'সে গল্প করছিল সুমিত্রার দৃষ্টি সেখানে আঠার মত আটকে গেছে, পলক পড়ছে না তার।

জয়ন্তর মনে হ'ল, চিত্রা ও সত্যেনের আলাপ যেন ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ-ষাট জনের কানের পর্দাবিদারী কোরাসে তাদের কথোপকথনে বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটছে না। সত্যেনের কথা শুনতে শুনতে চিত্রা ঘন ঘন তার চোখের পল্লব দুটি তুলে সত্যেনের মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

সুমিত্রা হঠাৎ ব'লে ওঠে, আচ্ছা বেহায়া মেয়েটা তো!

কার কথা বলছিস?—ব'লে মীরা সুমিত্রার মুখের পানে তাকাল।

তারপর সুমিত্রার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে স্টেজের ওপর দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, সত্যি চিত্রার চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু নেই। কথা বলতে বলতে তোর বরের গায়ে প্রায় ঢ'লে পড়ছে। মেয়েটা একটা ডাইনি, বুঝলি? আবার ওঁকেও চেষ্টা করেছিল ফাঁদে ফেলবার জন্যে।

সেই হিন্দুস্থানী ছেলেটি ব'লে ওঠে, কাঁহা তুমহারা লতামঙ্গেস্কর, আবদুল? ঝুট বাত বোলা শালা সুক্কুর। আবদুল নির্লিপ্তস্বরে জবাব দেয় কেয়া জানে।

প্যাকার্ডের ফিফটিটু মডেল কিনেছেন বুঝি? হাউ ওয়াণ্ডারফুল!—মল্লিকার পার্শ্ববর্তিনী উগ্র-প্রসাধনে এনামেল করা মূর্তি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, আমারও ভারি ইচ্ছে প্যাকার্ডের এই মডেলটি কেনবার। ওঁকে এত বলি যে, ওঁর ঐ মান্ধাতা আমলের ফোর্ডটা একেবারে রিডিকুলাস, উনি কানেই তোলেন না আমার কথা। প্যাকার্ডের ফিফটিটু মডেলের মালিক সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাগুলি ছেড়ে দিলেন। সত্যি, মিস্টার সেনের একেবারে রুচি নেই।

আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন না মিস্টার বাসু। বরং একটা কাজ করুন, কাল আপটারনুনে আপনারা আপনাদের এই গাড়ি ক'রে আমাদের ওখানে আসুন। হ্যাভ টী উইথ আস। তখন না হয়—

ও সুমি, তোর পাশে রেখা এসে বসেছে যে!—সুমিত্রার কাঁধে খোঁচা মেরে ব্যগ্র কণ্ঠে মীরা বললে।

কই?—ব'লে সুমিত্রা তার বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখলে, সত্যিই রেখা তার পাশে ব'সে আছে।

রেখার পাশে একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর বিপুল বপু বিস্তার ক'রে ব'সে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ জয়ন্ত ও তার আশে-পাশে কয়েকটি তরুণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি রেখার মুখের পানে চেয়ে গম্ভীরগলায় বললেন, বউমা, তোমার ঘোমটাটা আর একটু টেনে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সো। ছোঁড়াগুলো কি রকম হাঁ ক'রে তাকাচ্ছে দেখ না, যেন গিলে খাবে! তাঁর গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর

সামনের সারি থেকে একজন প্রৌঢ়া মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে উদ্ভাসিত মুখে ব'লে উঠলেন, ওমা, বকুলফুল যে! বকুলফুল বললে, কে গা? ওমা তুমি! কি ভাগ্যি!

মীরা বললে, মেয়েটা কি রকম গাইছে শুনছিস সুমি? অন্তরাতে আসতেই তাল কেটে যাচ্ছে। ডিস্‌গাস্টিং!

একটু হেসে সুমিত্রা বললে, মেয়েটার গলা কিন্তু বেশ মিষ্টি।

এই ক্যানক্যানে গলার স্বরকে তুই মিষ্টি বলিস! মীরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। উনি বলেন—

এমন সময় হঠাৎ রেখা যে এক দৃষ্টে তাদের দুজনের মুখের পানে চেয়ে আছে তা নজরে আসতেই মীরা তার বাক্যবিন্যাসে ব্রেক কষল। তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সুমিত্রার কাঁধে ঠেলা মেরে সে বললে, এই, রেখা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমিত্রা রেখার মুখের পানে তাকাল। দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

চিনতে পেরেছিস তা হ'লে?—মীরা বললে।

পেরেছি বইকি—দেখেই পেরেছি। আমার মনে হচ্ছিল, তোমরাই আমাকে চিনতে পার নি বোধ হয়।

না পারাই তো উচিত।— মীরা হেসে বললে, যে জরদগবের মত সাজ ক'রে এসেছিস! আমি তো তোর এই চওড়া-পাড় শাড়ি, কানের প্রকাণ্ড মাকড়ি, মোটা সিঁদুরের ফোঁটা দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম। তোকে দেখে কে বলবে, এই সেই স্কটিশ চার্চের বিখ্যাত রেখা রায়!

রেখার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে।

রেখার পার্শ্ববর্তিনী বর্ষিয়সী মহিলার দিকে চেয়ে মীরা বললে, উনি তোর শাশুড়ী বুঝি?

মাথা হেলিয়ে মৃদুকণ্ঠে রেখা বললে, হ্যাঁ।

তুই ওঁর সঙ্গে এসেছিস! তোর বর আসে নি?

নত নেত্রে অস্ফুটস্বরে রেখা বললে, না।

তোর শাশুড়ী বুঝি খুব কন্‌জারভেটিভ ? তোকে তোর বরের সঙ্গে বেরুতে দেন না ?

নত নেত্রে রেখা আঁচলের এক প্রান্ত আঙুলে জড়াতে লাগল, কোনও জবাব দিল না।

সহসা সক্ষোভে ব'লে ওঠে মীরা, ওমা, ওঁর সোলো শুরু হয়ে গেছে যে ! ইস্ !—হায়, হায়, আরম্ভটা মিস্ করলুম।

কেয়া ভেড়াকা মাফিক চিল্লাতা হায় !—মীরার স্বামীর গান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করে আবদুল, এ কেয়া গানা গাতা হায়, না, রোতা হায় ! চল্ রহমান, হিঁয়া রহনেসে আওর কুছ ফয়দা নেই। তুমহারা স্কুর নে ঝুটবাত বোলা থা। রহমান উঠে দাঁড়িয়ে বললে, শালা স্কুর।

অ বউমা !—রেখার শাশুড়ীর কাংস্যবিনিন্দিত গলার স্বর শোনা গেল, ওদিকে স'রে বসেছ কেন ? এদিকে এসো। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দাও। হ্যাঁ, হয়েছে। এবারে ইদিকে স'রে এস দিকিন। নাও, একে পেন্নাম কর। বকুলফুল, এ আমার ছেলের বউ।

দিব্যি বউটি তো ! থাক্, থাক্, হয়েছে বাছা, হয়েছে। শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক—শতায়ু হও। কোলে সোনার চাঁদ ছেলে আসুক।

আঃ !—চাপা বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে মীরা ব'লে ওঠে, গানটা শুনতে দেবে না দেখছি ! কোথাকার বাঙাল রে বাবা ! কিছুক্ষণ বাদে ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে আবার বললে, হল-সুদ্ধ কেউ শুনছে না গান। সকলেই গল্পগুজব নিয়ে মশগুল। কারুর খেয়ালই নেই যে, এটা স্মৃতিসভা। লোকগুলোর এতটুকু শালীনতাবোধও যদি থাকে ! সত্যি সুমি, বাঙালী জাতটা একেবারে অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে।—ব'লে বোধ হয় তার কথার সমর্থনে কিছু শোনবার প্রত্যাশায় সুমিত্রার মুখের পানে তাকাল মীরা। সুমিত্রার কানে তার কথাগুলো পৌঁছেছে ব'লে জয়ন্তর বোধ হ'ল না। সে দেখলে, স্টেজের দিকে নিষ্পলক, অঙ্গারের মত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুমিত্রা। তার মুখের পানে তাকিয়েই জয়ন্ত স্টেজের ওপর দৃষ্টিপাত করল। দেখলে, সেখানে চিত্রার হাত থেকে তার রুমালটি নিয়ে

মুখ মুছছে সত্যেন। যতক্ষণ সে মুখ মুছল তার মুখের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল চিত্রা।

মীরার স্বামীর গান শেষ হ'ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরা বললে, এত ভাল গাইলেন উনি, অথচ কেউ মন দিয়ে শুনলে না!

এবারে সতইয়েনবাবু পরবন্ধ্ পাঠ করবেন।—সভাপতি ঘোষণা করলেন। সভাপতির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হলের প্রায় অর্ধেক লোক উঠে দাঁড়াল। কলেজের ছেলেমেয়েদের সারি থেকে কে একজন বেশ জোরে ব'লে উঠল, ওরে, সেই স্যাটেন্ প্রবন্ধ পড়ছে রে! আর একজন বললে, আশ্চর্য বদলে গেছে কিন্তু ভদ্রলোক, ছিল পেলব রায় মার্কা চেহারা—এখন একেবারে গণেশ! আর একটি মেয়ে বললে, চিত্রা তালুকদারের ওল্ড ফ্লেম্। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের হাসিতে হলঘর ভ'রে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে পেছন দিকে তাকায় সুমিত্রা।

সত্যেনবাবু তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে বিরাট একটি কাগজের তাড়া বের ক'রে প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করলেন। প্রবন্ধটির আকার দেখে ভয় পেয়ে জয়ন্তও উঠে দাঁড়াল।

স্টেজের ওপরে সভাপতি সত্যেনের মুখের পানে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে হাই তুললেন। গায়ক-গায়িকারা পরস্পরের মধ্যে গল্পগুজব শুরু ক'রে দিল। কেবলমাত্র চিত্রা তার আয়ত চোখ দুটির মুগ্ধ দৃষ্টি সত্যেনের মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে একাগ্র মনে তার প্রবন্ধ পড়া শুনতে লাগল। স্টেজের ওপর তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি হেনে সুমিত্রা উঠে দাঁড়ায়। জয়ন্ত দেখলে যে, বাঁশপাতার মত তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে।

এখুনি উঠলে কেন মা?—সুমিত্রার ছোট মেয়ে বললে, বাবা যে এখনও পড়ছে!

পড়ুক গে।—ব'লে মেয়ে দুটির হাত ধ'রে সুমিত্রা হল থেকে বেরিয়ে গেল।

জয়ন্তও বেরিয়ে যাবার জন্যে ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

সংবাদ-সাহিত্য

সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয় বৎসর রবীন্দ্র-পুরস্কারের উপযুক্ত পাত্র-নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলা দেশের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদিগকে ইতিমধ্যেই সম্মানের তেনজিং-শিখরে তুলিয়া ছাড়িয়াছেন; আর একটি সম্মান বাকি ছিল, এবারে সে শ্যামচাঁদও প্রযুক্ত হইল। সংবাদপত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন দেখিলাম—প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের শিক্ষানবিস জীবনের সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ইতিহাস দিতে হইবে, যে সকল শিক্ষালয়ে তাঁহারা পড়িয়াছেন তাহাদের নামের তালিকাসহ ("a short chronological history of their educational career with names of institutions attended")। ইটন-হ্যারো-হার্ভার্ডে পড়া কোন্ মহাবিদ্বান এই বিজ্ঞাপনের জনয়িতা জানি না—যাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিবার জন্য এই পুরস্কারের উদ্ভব তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই আমরা দুঃখ লজ্জা ও অনুকম্পা অনুভব করিতেছি। মনে মনে কল্পনা করিতেছি, একজন হতভাগ্য প্রার্থীর দরখাস্ত হুজুরদের দরবারে পৌঁছিয়াছে যাহাতে "এডুকেশনাল কেরিয়ার" খাতে এইরূপ লেখা আছে—১। গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি—নিম্নশ্রেণীতে বৎসরখানেক কাল পাঠ, ২। জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডে শ্যামলাল মল্লিকের বাটিতে অবস্থিত নর্মাল স্কুলে তিন বৎসর "ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নিচে" পর্যন্ত, ৩। ডিক্রুজ (DeCruz) নামীয় এক ফিরিঙ্গীর বেঙ্গল একাডেমি নামক স্কুলে বৎসরখানেক কাল, ৪। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে দুই বৎসর। ইতি "এডুকেশনাল কেরিয়ার" খতম। কোথাও নিয়মিত একটানা পড়া হয় নাই, ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় একবার মাত্র পাস করিয়াছিলেন। বড়লোকের ছেলে, সতরো বৎসর বয়সে লণ্ডনে গিয়া সেখানকার স্কুলে শিক্ষিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও অচিরাৎ খণ্ডিত হইয়াছিল। এখন এই প্রার্থীর আবেদন-পত্র লইয়া হুজুরেরা কি করিবেন? ধরিয়া লইলাম তিনি লোকেন পালিত আই.সি.এস. এবং প্রিয়নাথ সেন নামক দুই মনীষীর নিকট হইতে প্রশংসা বা অনুমোদন যোগাড় করিয়া 'আবেদন-

পত্রের সহিত যথারীতি দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু "এডুকেশনাল কেরিয়ার" অতিশয় লজ্জাকর নিম্নস্তরের বিধায় দরখাস্তকারীর আবেদন বাতিল না করিয়া হুজুরদের উপায় কি ?

আমাদের দুঃখ ও লজ্জা এই যে, ইহার পরেও "এডুকেশনাল কেরিয়ার" ও ডবল অনুমোদন সহ যথারীতি দরখাস্ত দাখিল হইবে। বাংলা দেশের পেঁচোয়-পাওয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে পাঁচ হাজারের লোভ সকল আত্মসম্মানকে পদদলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

গোপালদার পাত্তা নাই, কিন্তু তিনি এখনও আমাদিগকে উত্যক্ত ও বিভ্রান্ত করিবার জন্য উড়োচিঠি ছাড়িতেছেন। সব চিঠিগুলির পোস্টমার্ক কাটমুণ্ডুর। আমাদের বিশ্বাস ছিল তিনি গা-ঢাকা দিয়া তিব্বতে আছেন এবং সেখানে ক্রমিক কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশে (infiltration) সহায়তা করিতেছেন। কাটমুণ্ডুতে নিজের অথবা অনুচরদের যাতায়াত আছে, সেখান হইতেই মাঝে মাঝে ডাকযোগে বাণ ছাড়িতেছেন। কিন্তু এবার যে কয়েকটি শব্দভেদী বাণ আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতেছি, আমরা এতদিন ভুল অনুমান করিয়াছিলাম। ডায়ালেক্টিক্সের ভেল্‌কীতে যেমন খোদ সোভিয়েট দেশে 'মার্কসিস্ট গ্লসারি' সংস্করণে সংস্করণে বদলাইতেছে (L. Harry Gouldএর 'Marxist Glossary'র বিভিন্ন সংস্করণ দ্রষ্টব্য), গোপালদাও তেমনই মুহুর্মুহু শব্দকোষ পাল্টাইতেছেন। অবশ্য ইহা মস্কোরই অনুপ্রেরণায়। 'Political Dictionary'তে যে ট্রট্স্কির (লিও ডেভিডোভিচ) নামে পূর্বে এই বিবরণ দেওয়া ছিল : "Leading Russian revolutionary... joined Lenin and the Bolsheviks, was the driving power and chief organiser of the October revolution side by side with Lenin. Organised and commanded the Petersburg uprising on Nov. 7, 1917, became War Commissar, created the Red Army and led it through the

the General Secretary of **the Communist Party**…" ১৯৪৬ সনে **'Marxist Glossary'**তে সেই ট্রট্স্কিরই এই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—"**was connected with Russian Labor Movement for many years. He and his followers were exposed as Fifth Columnists in Russia.…Trotskyism is a very useful weapon in the hands of the capitalists for fighting Communism**…"। আরও কিছুকাল পরে ট্রট্স্কির নামগন্ধও কোথাও নাই। 'মহান্ পিতা' স্টালিনের কবরের মাটি এখনও শুকায় নাই, ইহারই মধ্যে সংবাদপত্রে পড়িলাম, মহামতি ম্যালেনকভ তাঁহার নামটাকে পর্যন্ত লোপাট করিবার তালে আছেন। যাঁহার ছবি ইউ. এস. এস. আরের ইতিহাসে শতাধিকবার এবং নাম সহস্রাধিকবার ছাপা ছিল, নূতন ইতিহাসে (সম্প্রতি প্রকাশিত) তাঁহার নাম পাঁচবার মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে ছবির যখন উল্লেখ নাই তখন ছবি বোধ হয় একবারও নাই। এই তো ডায়ালেক্‌টিক্‌স্—সুতরাং গোপালদাকে দোষ দিতে পারি না। গোপালদা এবার মাত্র তিনটি শব্দ পাঠাইয়াছেন, এই সংখ্যার ৪৬৬ পৃষ্ঠায় কবিতার শিরোনামায় প্রয়োগ করিয়াছেন "দ্বান্দ্বিক জড়োবাদ" শব্দ। আমরা জানিতাম ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজ্‌মের অর্থ "দ্বান্দ্বিক জড়বাদ"—গোপালদা বলিতেছেন, "দ্বান্দ্বিক জড়োবাদ"। কোনও দ্বন্দ্ব ঝগড়া কলহ বা কাজিয়ার উদ্দেশ্যে অন্য ভাঁওতা দিয়া লোক জড়ো করার নামই "দ্বান্দ্বিক জড়োবাদ," গোপালদা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। গোপালদার এই অর্থ আমরা সমীচীন মনে করি না। তাঁহার দ্বিতীয় শব্দ "পিশাচ"। পিশাচ যেমন পিশিতাশ শব্দজ, অর্থ—মাংস ভক্ষণ করে যে, অর্থাৎ রাক্ষস, তেমনি Peace অর্থাৎ শান্তি ভক্ষণ করে যে সেই Peace-আশ বা পিশাচ; শান্তির ধুয়া তুলিয়া যাঁহারা অশান্তি সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহাদিগকে গোপালদা পিশাচ বলিতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাঁহার তৃতীয় শব্দ "চিন্ময়"। বন্দোবস্তী ভ্রমণে চিনে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া যাঁহারা সারা পৃথিবী চিন-ময় দেখিতেছেন, গোপালদার মতে তাঁহারাই চিন্ময়। তিনি

দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, "চিন্ময় মনোজ্ঞ বস্তু"। অর্থে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু দৃষ্টান্তে আছে। অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া আমাদের সেই নিরীহ গোপালদা আরও কি সব মতলব ভাঁজিতেছেন, ভাবিয়া অস্থির আছি।

—

সাহিত্যিকেরাও যে স্টেটের কাজে আসিতে পারে, এই বোধ এই সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জাগ্রত হইয়াছে—মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে সাহিত্যিকদের আহ্বান করিয়া স্টেট পরিচালনে তাঁহার সহায়ক হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন; অবশ্য পরিমাণে কম হইলেও সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্রশিল্পীরাও এই জমায়েতে ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া কবিরা চিরদিনই পৃথিবীর সর্বত্র স্ব স্ব জাতি ও দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের দেশেও পটুয়া ও চারণেরা রাজা-রাজড়াদের বীরত্ব ও মহত্ব কাহিনী প্রচার করিয়া সাধারণের মনে কম উৎসাহের সঞ্চার করে নাই। তবে গড়ার কাজে সাহিত্যিকদের খ্যাতি ততটা নয় যতটা ভাঙার কাজে। ইংলণ্ডীয় কবিরা স্পেনীয় আর্মাডাকে ধ্বংস করিবার মন্ত্র জোগাইয়াছিলেন; ফরাসী বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন ভল্‌টেয়ার রুশো প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা; আমেরিকায় ওয়াল্ট হুইটম্যান, মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টো কম অঘটন ঘটান নাই; এবং ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যিকেরাই যে প্রধানত জারের শাসনাবসানের কারণ সে সত্যও আজ অবিসংবাদিত। গঠনমূলক কার্যে তাঁহারা এখন পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সোভিয়েট ও মার্কিন দেশ বহু সাহিত্যিক ও শিল্পীকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যে ভাবেই হউক বশীভূত করিয়া প্রকারান্তরে কাজে লাগাইয়াছেন শুনিতে পাই; কিন্তু ফলেন যাহা দেখি, তাহা বিশেষ কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। যাহা রয়টার-তাস টাইমস্‌-প্রাভদা-ইজভেস্টিয়া করিতে পারে সাহিত্যিকদের তাহা করিবার সাধ্য নাই। সংবাদপত্রের মত হাতে হাতে সদ্য-ফল দিতে সাহিত্য অক্ষম, সাহিত্যের প্রভাব অন্তত পক্ষে এক পুরুষ পরে অনুভূত হয়। তাই বলিতেছিলাম, বিধানচন্দ্র সেদিন যে কথাগুলি অমন চমৎকার

করিয়া সাহিত্যিকদের বলিলেন, সেই কথাগুলিই আবার আর একদিন গুছাইয়া সাংবাদিকদের বলা প্রয়োজন। আমরা জানি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রত্যেকই ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইয়াছেন, ঘরের আশে-পাশে দশ মাইল বিশ মাইলের মধ্যে যে সকল দেশহিতকর সমাজ-কল্যাণকর বড় বড় গঠনমূলক কাজ হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কাহারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমরা জানিলাম, মুখে মুখে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদেরও জানাইলাম, কিন্তু গল্পে উপন্যাসে কবিতায় এই সকল কাণ্ড মনোরম করিয়া ঢুকাইতে হইলে যে বাল্মীকি-হোমার-বেদব্যাসের মহাকাব্যিক (এপিক) প্রতিভার প্রয়োজন তাহা আমাদের কোথায়? ইঁহাদের হাতে বানরের সেতুবন্ধনও কাব্য হইয়াছে, ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থে সভা-নির্মাণও সাহিত্য হইয়াছে, তিলাইয়া-মসানজোড়ও কাব্য হইত সন্দেহ নাই। দৈনিক সংবাদপত্রে চিত্রে সংবাদে ও সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেশের লোকের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিতে পারিলেই কাজগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে সহজেই জানিতে পারিবে, এবং যে সরকার এত অসুবিধার মধ্যেও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই দুরূহ কাজগুলি করিতেছেন তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইবে। বিধানবাবুর সেদিনের বিবৃতিতে একটা কাজ অবশ্য হওয়া উচিত। কিছু হইতেছে না, কিছু হইতেছে না—বলিয়া আমাদেরই কেহ কেহ ইতিমধ্যে যে ভাঙার গান জুড়িয়া দিয়াছিলেন, ইহার পর সেটা বন্ধ হওয়া সঙ্গত। অবশ্য সচিত্র প্রবন্ধ সাহিত্যিক মাত্রেই লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে দিয়া সে কাজ করাইয়া রুশীয় আদর্শে জাত মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে পতিত না করিলেই ভাল হয়।

—

নয়া দিল্লীর শাসন-পরিষদের আন্তর্জাতিক বিভাগে দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন লোক কি কেহই নাই? আর দূরই বা বলি কেন? মস্কো দূর হইলেও ইংরেজী তর্জমায় ভূরি ভূরি মাল তো সেখান হইতে এখানেও আসিতেছে। কলিকাতায় যখন আসিয়াছে, দিল্লীর পথে ঘাটে স্টেশনে স্টলগুলিতে এ মাল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। লেজ তুলিয়া দেখিবারও কি লোক নাই? মস্কোর "ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ পাবলিশিং হাউস" শস্তা

পুস্তকাকারে যে সকল তথ্য ভারতবর্ষে পরিবেশন করিতেছেন, তাহা যে হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষাও মারাত্মক তাহা কি ভারতের বৈদেশিক যোগরক্ষা বিভাগ জানেন না? ১৯৫০ সনে প্রকাশিত এন. এ. ভিনোগ্রেডভ (Vinogradov) লিখিত একখানি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ 'পাবলিক হেলথ ইন্ দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' অতি মনোরম সুচিত্রিত মুদ্রণে নামমাত্র মূল্যে এ দেশে বিকাইতেছে। তাহার ৪৯ পৃষ্ঠার এই কয়টি পংক্তির দিকে কি কাহারও নজর পড়ে নাই?—

"In India, to which Great Britain recently granted a fictitious independence, epidemics of the plague, cholera, smallpox and other diseases continue to rage with undiminished force."

১৯৫০ সনের বই। ইহাতে বলা হইতেছে—"যে-ভারতবর্ষকে সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেন একটা ভুয়া স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে"......ইত্যাদি। ইহার পরও বিজয়লক্ষ্মী-রাধাকৃষ্ণন-মেনন-ইন্দিরার অনেক প্রেমের মিশন মস্কো গিয়াছে; ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিনিধিদের পুতুল-নাচের খেলা দেখিয়া মস্কো মজা লুটিয়াছে, কিন্তু আসল কথাটা শুনাইবার সৎসাহস মস্কোরও হয় নাই। না হইল, ভারতবর্ষের কর্তারা করিতে-ছিলেন কি? শ্রীযুক্ত অনিল চন্দকে তো খুব তৎপর জানিতাম। তিনিও কি দিল্লীতে গিয়া লাড্ডু বনিয়া গিয়াছেন?

—

শ্যামাপ্রসাদ-জননী যোগমায়া দেবী 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বন্দীদশায় তাঁহার মৃত্যু' নাম দিয়া একটি ইংরেজী পুস্তিকা গত ৩০শে জুলাই প্রচার করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। ৮০ পাতার এই পুস্তিকাটি পড়িয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, শ্যামাপ্রসাদ স্বেচ্ছা-বা-অনিচ্ছাকৃত নিদারুণ অবহেলার মধ্যে মারা গিয়াছেন। ভারতবর্ষে ডেমক্র্যাসির মর্যাদা রাখিতে হইলে এই ঘটনার কার্য-কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতির সুযোগ লইয়া এই ব্যাপারকে ধামাচাপা দিলে ভারত-সরকার কর্তব্যে পতিত হইবেন।

ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' শ্রীনরেন্দ্র দেবের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, নাম "বাংলায় শান্তি-আন্দোলনের ধারা"। বাংলা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টি এই প্রবন্ধের দিকে আকর্ষণ করিতেছি। 'ভারতবর্ষ' ইহা ছোট অক্ষরে শেষের দিকে ছাপিয়া অন্যায় করিয়াছেন, বড় অক্ষরে প্রথম প্রবন্ধরূপে ইহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। মস্কো যদি যথার্থ শান্তিকামী হইতেন, তাহা হইলে এই প্রবন্ধের লেখককে সসম্মানে ক্রেমলিন-প্রাসাদে লইয়া গিয়া স্তালিন-শান্তি-পুরস্কার দিতেন।

'শনিবারের চিঠি'র "পূজা-সংখ্যা" বর্ধিত আকারে ও বর্ধিত মূল্যে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীঅমলা দেবীর একটি সুবৃহৎ উপন্যাস এবং শ্রীমন্মথ রায়ের একটি সম্পূর্ণ নাটক এই সংখ্যায় থাকিবে। ইহা ছাড়া করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, কালিদাস, মহাস্থবির, তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্র. না.বি., অমরেন্দ্র ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অ-কৃ-ব, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাণী রায় প্রভৃতির লেখাও থাকিবে। গ্রাহক এবং এজেন্টগণ তাঁহাদের দেয় টাকা ১০ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে জমা দিবার ব্যবস্থা করিলে সুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন দিবার শেষ তারিখ ৫ই আশ্বিন (২২এ সেপ্টেম্বর)।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব, অংশত তুলিয়া দিয়া তাঁহার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতেছি :—

"এ সংবাদ আজ সর্বজনবিদিত যে এই শান্তি আন্দোলনের স্রষ্টা ও পরিচালক হলেন স্বয়ং বিশ্বত্রাস সোভিয়েট রাশিয়া।

অনেকগুলি কারণ এবং প্রমাণ আছে। কারণ হ'ল, শান্তির মধ্যে সোভিয়েট মতবাদ যে ভাবে দেশে দেশে দারিদ্র্যের ছিদ্রপথে নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে, অভাব ও অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের সহজেই কমিউনিস্ট মতাবলম্বী ও পথাবলম্বী ক'রে তোলে, একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধলে তাতে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। কারণ, সবাই তখন যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও না কোনও কাজ পায়।

বেশ ভালই উপার্জন করে। বেকার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই, দলবৃদ্ধির কাজটাও বাধা পায়। শুধু তাই নয়, দেশে দেশে এঁরা যে ঘরোয়া বিবাদ, সামাজিক অসন্তোষ, দলাদলি, আত্মকলহ, শ্রেণীযুদ্ধ প্রভৃতি বাধিয়ে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ব'লে আওয়াজ তোলেন, হিংসাত্মক আন্দোলন ও অশান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ দেন, আইন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গ ক'রে লাঠি বা গুলি না-চলা পর্যন্ত নিরস্ত হন না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে এসব কাজ-কারবার তাঁদের বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণের জন্য আমাদের একটু ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে।

রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ ক'রে আর হাঁফ ছাড়বার অবসর পেলেন না। চলতে লাগলো এঁদের অস্ত্রসজ্জা। শুরু হ'ল স্নায়ু-যুদ্ধ। তারপর হঠাৎ দেখা গেল মস্কোর রঙ্গমঞ্চে আচম্বিতে এক পট-পরিবর্তন। পোল্যাণ্ড, ইউক্রাইন, পূর্ব-জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলি নাজী ও ফ্যাসিস্ট্ কবল থেকে মুক্ত হয়ে ইতোপূর্বেই সোভিয়েট প্রেমালিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। হঠাৎ মার্শাল টিটো দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সোভিয়েট রাশিয়া প্রমাদ গনলেন। এবার তিনি দেখা দিলেন শান্তির পারাবত কোলে নিয়ে শান্তির অলিভশাখা মাথায় জড়িয়ে শান্তি-সৈনিকের গৈরিক বেশে! লোকে অকস্মাৎ তাঁদের এই ভোল ফেরাতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। এই সেদিনের সেই বজ্রবাহু বিরাটবক্ষ শস্ত্রপাণি সৈনিকের দল সহসা বিভীষণ-পুত্র তরণীসেনের মতো সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে এসে দাঁড়ালেন বটে শান্তির খঞ্জনি হাতে, কিন্তু বৈষ্ণবী বিনয় নিয়ে নয়, দাবির দুর্দান্ত দম্ভ নিয়ে।

কেবলমাত্র পৃথিবীব্যাপী 'শান্তি-আন্দোলনে'র উপরই নির্ভর ক'রে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বিশ্বের নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য এক বিশ্বব্যাপী নারী-আন্দোলনও খাড়া করেছেন। জগতের শিশুদের কল্যাণের জন্যও পৃথিবী জুড়ে এক শিশুরক্ষা আন্দোলন চালাচ্ছেন। বিশ্বের যুব-সমাজের জন্যও বছর বছর বিরাট যুব-উৎসবের বিপুল আয়োজন করছেন। আর, সেই সব সম্মেলনেই ঘুরেফিরে সেই একই প্রস্তাব কানে আসছে—"আমরা শান্তি চাই। আমরা যুদ্ধ চাই না।"

আমাদের বাংলার কমিউনিস্ট কমরেড ভায়ারা দেখি মস্কোর ওস্তাদদের হাতের স্থতোয় বাঁধা পুতুলের মত শহর ও মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে নেমে নৃত্য-নাট্য করছেন। বাংলাদেশে একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দেখলে তিন শ্রেণীর কমিউনিস্ট চোখে পড়বে। একদল খুব উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী এবং মার্ক্‌স এঙ্গেলস্ প্রভৃতির সাম্যবাদ তত্ত্বের অথরিটি বা বিশেষজ্ঞ। এঁরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। এঁরা প্রায়ই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আর এক দল এঁদের সঙ্গে থাকেন যাঁরা—অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। হয় বেকার, নয় কেরাণীগিরি প্রভৃতি সামান্য কিছু কাজ করেন। এঁরা মার্ক্‌স ও এঙ্গেলস্ প্রভৃতির নাম শুনেছেন; পড়বারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু দন্তস্ফুট করতে পারেন নি। লেনিন ও স্ট্যালিনকে দেবতা বা 'পিতৃ' ব'লে জানেন, আর, 'দাদা'রা যা বলেন তাই বেদবাক্য ব'লে মেনে নেন। এঁরা দুই দলই বাংলার অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় দল হলেন—যাঁরা মেহনতি সম্প্রদায়। এঁরা চলেন স্ব স্ব কলকারখানা ও ক্ষেত-খামারের চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের ইঙ্গিতে। এই চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের আবার পরিচালিত করেন দ্বিতীয় দলের নিরভিমান বাবুরা, যাঁরা এঁদের বস্তিতে যান, এঁদের সঙ্গে বিড়ি খান, তাস খেলেন, আবার ক্লাস খোলেন লোকশিক্ষার, সভা করেন বক্তৃতা শোনাবার। অভিনয় ও গানের আসর বসান চিত্তজয়ের প্রচেষ্টায়। মিছিল করেন ঝাণ্ডা উড়িয়ে, শ্লোগান দিয়ে এদের নিরানন্দ জীবনের মধ্যে একটু উত্তেজনার আবেগ সঞ্চার করেন। এ ছাড়া আরও অনেক কাজ এঁরা করেন, সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই যার পরিচয় পাই। যেমন কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, অফিস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে ধর্মঘট, রাইটার্স বিল্ডিং ও পরিষদ-গৃহ অবরোধ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান ঘেরাও, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও মনুমেণ্টের তলায় বিরাট সভা, ছাঁটাই-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দাবী। অল্পবিত্ত শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-বিভাগের অবিচারের প্রতিবাদ।

বাংলার উপবাসী কেরাণী ও লেখক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা। ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালার দ্বন্দ্ব, এবং সম্প্রতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন, জম্মু-কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র কিছুই এঁরা বাদ দেন না। মোট কথা সরকারকে বিব্রত করবার কোন সুযোগই এঁরা ছাড়েন না। আবার এঁরাই যখন আর এক সভায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন "আমরা শান্তি চাই" ব'লে—তখন, সে আওয়াজের মধ্যে আর যাই থাক্, কোন আন্তরিকতার সুর খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ধ্বনি হয়ে ওঠে কলের গানের কৃত্রিম আওয়াজের মতো। কিন্তু এই 'রাম-নাম' তো এঁদের মুখে শোনা যায় না, যখন এঁরা শ্রেণী-সংগ্রামাত্মক গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিয়ে দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটনে ব্রতী হন? তার পরিণামও তো একই! তেলেঙ্গানায় যা ঘটেছিল, মালয় বা ভিয়েৎনামে যা হচ্ছে, কোরিয়ায় তারই রাজসংস্করণ প্রকাশ হয়েছে মাত্র।

জগতে শান্তিস্থাপনের মহৎ আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে আমার মতো নির্বোধ ও অরাজনৈতিক কেউ কেউ এই শান্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে আসেন। তবে সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। নৈবেদ্যের ডালায় সাজানো দু-চারটি চিনির ডেলা সন্দেশের মতো। কিন্তু, মজা হচ্ছে এই যে, তাঁদেরই এই ক'জনকে সর্বত্রই খুব উঁচু করে ধ'রে দেখানো হয় যে, এই দেখ, আমাদের এই শান্তি-আন্দোলনে এমন সব লোকও রয়েছেন যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্তম্ভস্বরূপ অথবা একেবারেই নির্দলীয়! কমিউনিস্ট শান্তি-আন্দোলনের সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হ'ল এই মিথ্যার আশ্রয়, এই সর্বদলীয়ের কাঙাল ছদ্মবেশ। 'শো-বয়' খাড়া ক'রে 'শো-বোট' দেখানো যায় ঘাটে দাঁড়িয়ে। সে বোট কিন্তু কোনও বন্দরেই প্রয়োজনীয় মাল পৌঁছে দিতে পারে না। **They can not deliver the goods!"**

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।